১

আরজ আলী মাতুব্বর

রচনা সমগ্র

COLLECTED WRITINGS OF AROJ ALI MATUBBAR

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বশিক্ষিত দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সমগ্র রচনা নিয়ে চার খণ্ডে বিভক্ত রচনাবলির প্রথম খণ্ড এই বই।

আরজ আলী মাতুব্বর সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালির অভিমত :

... আরজ আলী মাতুব্বরের গ্রন্থ পড়ে আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি নতুন কথা বলে নয়, তাঁর মুক্তবুদ্ধি, সৎসাহস ও উদার চিন্তা প্রত্যক্ষ করে।

— আহমদ শরীফ

... আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনের জিজ্ঞাসার যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তা পাঠকের মনে চিন্তার খোরাক যোগাতে সক্ষম।

— অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান

... আরজ আলী মাতুব্বর প্রথম ও নির্মম যে অন্ধকার সুচিরকাল ধরে স্থায়ী হয়ে আছে এই বাংলাদেশে, তার কথাই বলেছেন তাঁর বইতে। বর্ণনা করে নয়, প্রশ্ন করে।

— সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

... আরজ আলী মাতুব্বর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের অহঙ্কার ও আত্মতৃপ্তিকে শক্ত হাতে নাড়িয়ে দিয়েছেন।

— হাসনাত আবদুল হাই

দাম : ৩০০ টাকা

ISBN 984-8120-04-1

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯০০-১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ
১৩০৭-১৩৯২ বঙ্গাব্দ

স্বশিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিবাদী এই অভিধাগুলো যথার্থভাবে যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ্য তিনি দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ জন্ম গ্রহণের পর হতে নিরন্তর সংগ্রাম সংঘাত প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে আপন জীবনাভিজ্ঞতায় পরিচ্ছন্ন বোধ অর্জন করেছিলেন। কৃষি কাজ ও আমিন পেশায় রত থেকেও এই অগ্রগামী মহাপুরুষ অবিচল আস্থায় সংস্কার ও অন্ধ আবেগের পশ্চাদমুখিতাকে ক্রমাগত শনাক্ত করেছেন। ফলে তার উপর পাকিস্তানি শাসনামলে গ্রেপ্তারি মামলা ও মতপ্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশেও মৌলবাদীসহ সমাজের বিভিন্ন মহল কর্তৃক নিগৃহীত হতে হয়েছে তাকে। সংস্কার বিমুখ মুক্তবুদ্ধি চর্চার জন্য পাঠাগার স্থাপন, মানবকল্যাণে চক্ষু ও শরীর দান এবং দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত, কবিতা ও আত্মজীবনীসহ মোট ১৮টি পাণ্ডুলিপি রচনা—ইত্যবিধ অবদানে মানবমণ্ডলীকে ঋণী করে গেছেন তিনি। ৭ কন্যা ও ৩ পুত্রের জনক এই মহতী ব্যক্তিত্বের মৃত্যু ঘটে ১ চৈত্র ১৩৯২ বঙ্গাব্দে।

প্রচ্ছদ : ত ম মেজলী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Collected Writings of Aroj Ali Matubbar

ধর্ম দর্শন

ধর্মজগতে এরূপ কতগুলি নীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি এবং ঘটনার বিবরণ প্রচলিত আছে, যাহা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নহে, এবং ওগুলি দর্শনও বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিপরীতও বটে।

1 0 0 0 0 0 2

A
PATHAK SHAMABESH BOOK
Philosophy/Religion/Auto-Biography

Pathak Shamabesh

ISBN 984-8120-01-7

9 789848 120019

B. TK 300.00
UK. £ 15
US. $ 18

www.pathakshamabesh.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Pathak Shamabesh
since 1987

Pathak Shamabesh Book

A Publishing and marketing house of books on Economics, Politics, Art, History, Sociology, Philosophy, Aesthetics, Women's Issues, Films, Media in contemporary Bangladesh.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরজ আলী মাতুব্বর

আরজ আলী মাতুব্বর রচনাসমগ্র-১

Collected writings of Aroj Ali Matubbor Vol.-1

Pathak Shamabesh
since 1987

পাঠক সমাবেশ
ঢাকা, বাংলাদেশ
১৯৯৫
২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরজ আলী মাতুব্বর রচনাসমগ্র-১

আরজ আলী মাতুব্বরের স্বাক্ষর

জন্ম : ৩ পৌষ ১৩০৭, মৃত্যু : ১ চৈত্র ১৩৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

যুক্তচিন্তা চর্চা ও প্রসারে উৎসাহী এবং
যুক্তিপ্রবণ পাঠকের উদ্দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনা সমগ্র-১

সূচিপত্র

সত্যের সন্ধান	৪৫-১৩৮
অনুমান	১৩৯-১৯২
স্মরণিকা	১৯৩-১৪৬

অপ্রকাশিত

বেদ-এর অবদান	২৪৭-২৫১

অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি

ভাবি প্রশ্ন	২৫৩-২৫৪
না-বুঝের প্রশ্ন	২৫৫-২৫৯
টুকিটাকি	২৬০-২৬৩
আমার জীবনদর্শন	২৬৪-২৮৩
বিভিন্ন আলোকচিত্র	২৮৫
হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি	২৯১
নির্ঘণ্ট	২৯৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু স্মৃতি, কিছু কথা

আরজ আলী মাতুব্বর বাংলাদেশের এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। বরিশাল শহর থেকে এগারো কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে চরবাড়িয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত লামচরি গ্রামে ১৩০৭ সনে তাঁর জন্ম। লামচরি গ্রামটি ছোট — আরজ আলীরা আরো ছোট। জমি-জিরেত সবই লাখোটিয়ার জমিদাররা নিলাম করে নিয়ে গেছে, বাকি যৎসামান্য যা ছিল তাও মহাজনের কাছে বন্ধক পড়ে। ছোট একটি ঝুপড়ি ঘরে কিশোর আরজ আলী তাঁর মা ও ছোট বোনকে নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করেন। এর করুণ বিবরণ পাওয়া যাবে স্নেহভাজন আইয়ুব হোসেনের লেখা বাংলা একাডেমী প্রকাশিত আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনীগ্রন্থে।

আরজ আলী মাতুব্বর ছিয়াশি বছরের জীবনে প্রায় সত্তর বছর জ্ঞানসাধনা করেছেন। নিজের শ্রম, বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে তিনি তাঁর আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করেছেন। জমিদার ও মহাজনদের কাছ থেকে বন্ধকীকৃত জমিজমা উদ্ধার করেছেন। শুধু তাই নয়। নিজের প্রচেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছেন। কৈশোরের একটি ঘটনা তাঁকে সত্যসন্ধ করে তোলে। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের ছবি তোলার দায়ে মৃতদেহ কেউ জানাজা পড়ে দাফন করতে রাজি হয়নি। শেষে বাড়ির কয়েকজন লোক মিলে তাঁর মায়ের সৎকার করেন।

আরজ আলী মাতুব্বর সামাজিক এই আঘাতের পর সত্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। ধর্মের নামে কুসংস্কার সত্য, না বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান সত্য?

এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে আরজ আলী বিপুলভাবে ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। বাংলা ভাষায় লিখিত এবং প্রাপ্ত অধিকাংশ গ্রন্থাদি অধ্যয়ন তাঁর জীবদ্দশায় প্রায় বাদ পড়েনি।

বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি ছাড়াও বি. এম. কলেজ লাইব্রেরি এবং বিদ্বৎজনের পারিবারিক লাইব্রেরি ব্যবহার করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের কয়েক হাজার বই উনিশশো' একষট্টি সালের সাইক্লোনে ঘরসহ কীর্তনখোলা নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়। আরজ আলী সাহেব বিমর্ষ হৃদয়ে আমার কাছে তার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি বই হারিয়ে পুত্রবিয়োগের শোক পেয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতুব্বর সাহেব পড়াশোনা করতেন প্রচুর, ভাবনা-চিন্তা করতেন আরো বেশি, বলতেন খুবই কম, লিখতেন আরো কম। তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় বক্তব্য প্রকাশ করা ছাড়া বাহুল্য লেখা পছন্দ করতেন না। সেজন্য তাঁর লেখার পরিমাণ খুবই কম। ব্যক্তিগত জীবনে মৃদু এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁর মতের পরিপন্থী কোনো বিষয়ের অবতারণায় তিনি সহজে উত্তেজিত হতেন না। মৃদু হেসে ধীরস্থিরভাবে যুক্তিসহকারে পরমত খণ্ডন করতেন। এমনকি যুক্তিপূর্ণ হলে ভিন্নমত সহজভাবে গ্রহণ করতেন।

মাতুব্বর সাহেবের লেখার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম হাস্যরস আছে – যা তাঁর গম্ভীর লেখাকেও নির্ভর করেছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটা সহজ ও প্রসন্ন দৃষ্টিলাভ করেছেন বলে তাঁর লেখার মধ্যে জ্বালাযন্ত্রণা বা বাহ্যিক বিক্ষোভ নেই। তিনি বলেছেন, জ্ঞানচর্চা ও জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন বলে মূঢ় গ্রামবাসীর ওপর থেকে তাঁর ক্ষোভ অপসৃত হয়ে গেছে। আরজ আলী মাতুব্বর দেখেছেন, উচ্চশিক্ষিত অনেক লোকের মধ্যে অপরিসীম কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা বিরাজমান – কাজেই শিক্ষবঞ্চিত সাধারণ মানুষ তো সংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ হবেই।

আরজ আলী মাতুব্বর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেছেন বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। তাঁর মতে, যা কিছু দুর্জ্ঞেয় এবং রহস্যময়, তা সত্য নাও হতে পারে। সুতরাং তার ওপর অহেতুক বিশ্বাস স্থাপন করে লাজুক কিন্তু চাঁদকে ঘিরে গড়ে ওঠা রহস্য একদিন বৈজ্ঞানিকগণ উদঘাটন করলেন। সত্য বেরিয়ে এল।

মাতুব্বর সাহেব পরম যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন। সেইজন্য তিনি 'সত্যের সন্ধান' গ্রন্থের অপর শিরোনাম দিয়েছিলেন 'যুক্তিবাদ'। তাঁর মতে, 'কোনো তত্ত্বমূলক বিষয়ে তো নয়ই, যুক্তিহীন (আন্দাজি) কথা বাজারেও চলে না।' মাতুব্বর সাহেবের যুক্তিবাদী কথার জবাব না দিয়ে তাঁকে নেয়া হয়েছিল 'পবিত্র হাজতখানায়'।

তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি বিজ্ঞানের প্রচার, প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা চাচ্ছেন কেন? জবাব - কুসংস্কারমুক্ত মানুষের মঙ্গলের জন্য। আপনার ধর্ম কি? ছোট্ট জবাব – মানবতাবাদ। মানুষের মুক্তি এবং বিজ্ঞানের যুক্তি প্রতিষ্ঠার একনম্বর বাধা, দীর্ঘদিনের সঞ্চিত কুসংস্কার।

আরজ আলী মাতুব্বরের মৃত্যুর খবরের সঙ্গে আরেকটি কবর যুক্ত হয়েছিল, তা হলো, মরণের আগে তিনি তাঁর চক্ষু দু'টি দান করে যান। দেহখানিও চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শারীরবিদ্যা শেখার জন্য দান করেন। যে দু'টো চোখ দান করে যান, তা দিয়ে কোনো অন্ধ ব্যক্তি হয়তো বাহ্যিক জগৎ দেখবেন। তিনি সত্যকে হয়তো কোনো দিন দেখতে পাবেন না।

মাতুব্বর আরো দুটো চোখ দান করে যান, যা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমগ্র জাতিকে চক্ষুষ্মান করবে – তা হলো 'সত্যের সন্ধান' ও 'সৃষ্টি-রহস্য' গ্রন্থদ্বয়।

আরজ আলী মাতুব্বর মনে করেন, ধর্ম যুগে যুগে মানুষকে সুশৃঙ্খল করে শুভ ও মঙ্গলের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছে। কাজেই ধর্মের একটা প্রগতিশীল ভূমিকা আছে। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই যা মানুষকে অমঙ্গলের পথে নিয়েছে। বরং মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং সেবাপরায়ণতাই ধর্মের ধ্যেয়। ধৃ ধাতু থেকে ধর্ম – যা মানুষকে ধারণ করে, পোষণ করে। কিন্তু কালে কালে কুসংস্কারের কালোমেঘ ক্রমশ ধর্মকে আচ্ছন্ন করে এক শ্রেণীর মানুষকে মনুষ্যত্ববিবর্জিত করে ফেলেছে। মাতুব্বরের সংগ্রাম এই মনুষ্যত্বহীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের একটি বড় ধর্ম—জ্ঞানচর্চার ভেতর দিয়ে সত্যকে অনুধাবন করা। বিজ্ঞানচর্চা সত্যজ্ঞান লাভের একটি পদ্ধতি মাত্র, সেজন্যে আরজ আলী মাতুব্বর বিজ্ঞানকে এত ভালোবেসেছেন। তাঁর মতে, দেশে যত বেশি বিজ্ঞানচর্চা হবে, দেশ থেকে তত বেশি কুসংস্কার বিদূরিত হবে। আমি তাঁর সঙ্গে কিঞ্চিৎ দ্বিমত পোষণ করে বললাম, সমাজে বিজ্ঞানচর্চা করেন, এমন লোকও ব্যক্তিগত জীবনে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তিনি জবাবে বললেন, তাঁরা সত্যজ্ঞান লাভের জন্য বিজ্ঞানচর্চা করেন না, স্থূল স্বার্থ বা স্বীয় ভরণপোষণের জন্য বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তাই বলে বিজ্ঞানচর্চার ভেতর দিয়ে প্রকৃতি, জগৎ এবং জীবনের রহস্য ভেদ করা থেমে থাকবে না। আজ যা কল্পনা, কাল তা সত্যে প্রমাণিত হলে আর কল্পনা থাকবে না।

মাতুব্বর সাহেব কথা বলতেন কম। কিন্তু যে-কোনো মনোযোগী শ্রোতা বুঝতে পারতেন তাঁর কথার আড়ালে কী গভীর অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতা নিহিত আছে। এ যেন বরফশিলা। পাঁচ ভাগের চার ভাগ পানির নিচে অদৃশ্য। তাঁর কথা শুনতে ক্লান্তি বোধ হতো না, এবং তিনি শুনতে অক্লান্ত ছিলেন।

তাঁর আরো অনেক গুণ ছিল নিজ হাতে বাঁশি বানিয়ে সুন্দর সুর তুলে বাজাতেন। বানাতেন ঢোল, খোল এবং তবলা। নিজে গান রচনা করে সঙ্গীসাথীসহ গেয়ে বেড়াতেন। এক সময় তিনি বয়াতিরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। তাঁর এক নিকটজনের বিয়েতে তাঁকে বরপক্ষের উপযুক্ত সম্মান না-দিয়ে বাজনদার ঢুলিদের সঙ্গে ঘরের বাইরে বেঞ্চে বসতে দেয়া হয়। মনের দুঃখে বিয়েবাড়ি ছেড়ে চলে যান এবং তারপর থেকে আরজ আলী সাহেব আর কোনোদিন গানবাদ্যচর্চা করেননি।

মাতুব্বর সাহেব নিজ হাতে একটি পাখা নির্মাণ করেন, যা কেরোসিন তেল দিয়ে চালানো হতো একষট্টির সাইক্লোনে তা ধ্বংস হয়ে যায়।

আরজ আলী সাহেব তাঁর সময়কার বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের তত্ত্বসহ জীবনের খুঁটিনাটি অবগত ছিলেন। দার্শনিকদের মধ্যে লিবনিজ, স্পিনোজা, কান্ট, হেগেল, মার্কস, এঙ্গেলস, ব্র্যাডলি, বার্কলি প্রমুখের দর্শন সম্পর্কে ওয়াকেবহাল ছিলেন। এত সব জানলেন কি করে? জিজ্ঞেস করলে সলজ্জ হাসি হেসে বলতেন, বরিশাল পাবলিক লাইবেরি, বি.এম. কলেজ লাইব্রেরি এবং অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির আমার অনেক কিছু জানার উৎস। সম্প্রতি আপনাদের মতো। বন্ধুদের কাছ থেকেও বই নিয়ে কম সাহায্য পাচ্ছি না।

কাজী গোলাম কাদির। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের কৃতী ছাত্র। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের স্নেহধন্য ছাত্র। হাই মাদ্রাসা থেকে পাশ করা। বি.এম. কলেজে কবি জীবনানন্দ দাশ ও ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর প্রিয় ছাত্র। উনিশশ' ছেচল্লিশ সালে এম.এ. পাশ করে চাখার কলেজে দর্শনের অধ্যাপক হয়ে যোগদান করেন। আটচল্লিশ সালে বি.এম. কলেজে দর্শনের একটি পদ খালি হয়। তৎকালীন অধ্যক্ষ নীলরতন মুখার্জি নিজের ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া জামাতাকে চাকরি না দিয়ে মেধাবী ছাত্র কাজীকে নিয়োগপত্র দেন। কাজী সাহেব অভিভূত হয়ে স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। অধ্যক্ষ বললেন, ঘরে গিন্নি, কন্যা এবং জামাতা সবাই নাখোশ। জামাতা ও কন্যা সমানে কলকাতার কলেজগুলোতে দরখাস্ত করছে। চাকরি পেলে এখান থেকে সটকে পড়বে। খামোকা আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলেজ 'সাফার' করে কেন। কাদির, শোনো, তোমাকে তো বাবা চাকরি দেইনি – তোমাকে গভীরভাবে পড়াশোনা করার সুযোগ করে দিয়েছি। এই কলেজকে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলা হয়। এর সুনাম রাখার দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পিত হবে।

কাজী গোলাম কাদির আজীবন পড়াশোনা করেছেন। কখনো কর্তব্যকর্মে অবহেলা করেননি। এমনকি অবসর গ্রহণ করার পরও জ্ঞানচর্চার অভ্যাস ত্যাগ করেননি। রাশভারি লোক। সহজে কেউ কাছে ঘেঁষত না। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার পিতৃবন্ধু আরজ আলী মাতুব্বরকে আত্মসাৎ করলেন কিভাবে? – 'আমার বাবা, শ্বশুর এবং মাতুব্বর সাহেব তিন বন্ধু, হরিহর আত্মা।'

পিতৃবন্ধু স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং কাজী সাহেবের হবু শ্বশুরের বড় কন্যার বিয়ে। সন্ধ্যার পর রান্নাবান্নার বিরাট আয়োজন হচ্ছে। রন্ধনশিল্পী আরজ আলী মাতুব্বর।

শুনে আমি চমকে উঠলাম। মাতুব্বর সাহেবের সঙ্গে বিশ বছরের সম্পর্ক। কোনোদিন আমার বাসায় মাছ-মাংস খাননি। আমি অবাক হওয়াতে কাজী সাহেব এই বলে আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে, বিটোফেন কানে শুনতেন না, তবুও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টাদের মধ্যে অনন্য। মাতুব্বর সাহেব মশলাপাতি হাতের আন্দাজে এমনভাবে দিতেন যে, ব্যঞ্জন অত্যন্ত সুস্বাদু হতো। নিজে না-খেলে বুঝবেন না।

সৌভাগ্যবশত সেই সুযোগও আমার বরিশাল ছাড়ার আগে হয়েছিল। কাজী, আমি এবং আরো দুজন সহকর্মীসহ বরিশালের ডিসির স্পীডবোট নিয়ে একদিন লামচরি হাজির হলাম। আগে ডালভাত খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। এমন তৃপ্তির সঙ্গে অনেকদিন খাইনি। রান্নার মান এবং বৈচিত্র্য দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। মাতুব্বর সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে অন্দরমহলে এমন সুখাদ্য নির্মাণের জন্য ধন্যবাদ দিতে বললাম। তিনি মুচকি হেসে বললেন, আপনাদের শুভেচ্ছা অন্দরমহলে পাঠিয়ে দেবো, কিন্তু তা রান্নার জন্য নয়। ও কাজটি আমি স্বহস্তে করেছি, কারণ এ ব্যাপারে অন্য কারো ওপর নির্ভর করতে পারিনি।

কাজী সাহেবকে বললাম, স্যার, এ যে বাখ, বিটোফেন, মোৎসার্ট, শুবার্ট।

কাজী সাহেব বর্ণনা করলেন, শামিয়ানার নিচে বসে গল্প করছিলেন সমবয়সীদের সঙ্গে। একজন ছিপছিপে কালোমতো লোক এসে বললেন, আপনি কি 'পেরপেসার' কাজী গোলাম কাদির? কাজী সাহেব হ্যাঁ-সূচক জবাব দেয়ার পর তিনি বললেন, আপনার বাবা আমার বাল্যবন্ধু, তাঁর মুখে আপনার কথা শুনেছি। আসুন, আমরা একপাশে বসে একটু আলাপ-আলোচনা করি।

সে আলাপ-আলোচনা চলল পরদিন দশটা পর্যন্ত। অনেক লোক চারপাশে জড়ো হলো। অনেক লোক ক্লান্ত হয়ে চলে গেল দশটা পর্যন্ত রুস্তম-সোহরাবের লড়াই চলল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কামারশালায় তৈরি সূক্ষ্ম এবং ধারালো তলোয়ার বনাম গ্রামের আনাড়ি কামারশালায় তৈরি ভারি লোহার তলোয়ার। সারারাত চলল তত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম ও সংস্কার নিয়ে তলোয়ারে-তলোয়ারে ঘর্ষণ।

সেদিন দুই অসমবয়সী নবপরিচিত বন্ধু উপলব্ধি করলেন, তাঁদের পরস্পরকে কতখানি প্রয়োজন। এ যে দুজনের কাছে দুজনের আবিষ্কার। যে-শামিয়ানার তলে বিয়ের মধ্য দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটো আত্মার মিলনের আয়োজন হচ্ছে, সেই শামিয়ানার তল থেকে কাজী গোলাম কাদির তাঁর পিতৃবন্ধুকে ছিনতাই করলেন।

এরই মধ্যে আরজ আলী সাহেব ধর্মভিত্তিক সদ্যোজাত রাষ্ট্র পাকিস্তানে মুক্তবুদ্ধির অপরাধে 'পবিত্র হাজতবাস' খাটলেন। এসব কাজী সাহেব ও মাতুব্বর সাহেবের কাছে একাধিকবার শোনা। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্যে আইয়ুব হোসেনের 'আরজ আলী মাতুব্বরের জীবনীগ্রন্থে'র শরণাপন্ন হওয়ার জন্য সুধী পাঠককে অনুরোধ করছি।

উনিশশো' সাতষট্টি সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে রাজশাহী কলেজ থেকে বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজে পদোন্নতি নিয়ে যোগদান করি। সম্পূর্ণ অচেনা জায়গা। অধ্যাপক হানিফ সাহেব তাঁর বাসায় নিয়ে তুললেন। কিছুদিন পর একটা টিনের বাসার বন্দোবস্ত হলো। থাকি একলা, একটি সুদক্ষ চাকর নিয়ে — যে শিং-মাগুর মাছের লেজ, ঘাড় এবং মাথা আমার জন্যে রেখে বাকিটা স্বীয় গর্ভসাৎ করে। স্ত্রী শিক্ষাসফরে করাচি ও কাবুলে। বিকেল হলেই কলেজের টেনিস লন ও কলেজ ক্লাব আমাকে আকর্ষণ করে এর মধ্যে একটি অতি সামান্য ঘটনা আমার সমবয়সী সহকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক সহকর্মীর মধ্যে কেবল আমার উদ্দেশে এককাপ চা পাঠিয়ে দেন কাজী গোলাম কাদির সাহেব। চায়ের মূল্য আট আনা, কিন্তু কাজী গোলাম কাদিরের এক কাপ চা অমূল্য। এটি বেশ কিছু দিন পর আরো বেশি করে পেলাম। পাণ্ডিত্য, মার্জিত রুচি, ধীরস্থির ভাব নিয়ে কাজী সাহেবদের মতো বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী মফস্বলের অধ্যাপকরা ডাইনোসরদের মতো বিলুপ্ত হয়ে গেলেন।

বি.এম. কলেজের পুরোনো দালানের স্টাফ রুমে তখনকার দিনে শিক্ষকদের ক্লাব বসত। টেনিস খেলে প্রায় ঘর্মাক্ত কলেজের দোতলার বারান্দায় বসে অক্সফোর্ড পকেট সিরিজের ম্যাকিয়াভেলির 'প্রিন্স' বইটি নাড়াচাড়া করছিলাম। তাসের আসর তখনো বসেনি। কাজী সাহেব পাশে ডেকে নিয়ে বললেন, যে-ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন, সেই চেয়ারে কে কে বসতেন জানেন? আমার স্যার কবি জীবনানন্দ দাশ। আর তাঁর এবং আমাদের স্যার ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, দুঃখিত, স্যার, আমি জানতাম না। উনি বললেন, না, না, তাতে কি হয়েছে। সংকোচ বোধ করার কিছু নেই। আমি আর আমার বন্ধু তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পড়া জিজ্ঞেস করতে এখানে ঢুকে পড়তাম। তারকের লেখার হাত ছিল, সেই জন্য স্যাররা স্নেহ করতেন। তারকনাথ পরবর্তীকালে সাহিত্যজগতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নামে খ্যাতি অর্জন করেন। আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি অন্য কারণে। নিচে টেনিস লনের বেঞ্চে বসে যে-অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে তর্ক করছিলেন, তিনি শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতবিদ্বেষী নন—ঘোরতর পাকিস্তানপ্রেমিক। যাকগে, ওসব লোকের সঙ্গে তর্ক করতে যাবেন না নামাজ-রোজার ধার ধারে না — কুতর্কের ওস্তাদ। বলেই কাজী সাহেব পকেট থেকে একটি কাগজের রোল আমার হাতে তুলে দিয়ে একটু দূরে বাতির নিচে বসে পড়তে বললেন। আর বললেন, লেখাটি কাউকে দেখাবেন না — পড়া হয়ে গেলে আপনার মতামত জানাবেন।

এক বিঘত চওড়া এবং প্রায় এক হাত লম্বা সদাগর অফিসের হিসাবের খাতার মতো দেখতে। আমি ভাঁজ খুলে দেখলাম গ্রাম্য দলিল লেখকদের হাতের লেখার মতো হস্তাক্ষর। লেখার শিরোনাম 'কুসংস্কার ও তার স্বরূপ'। লেখক আরজ আলী মাতুব্বর। লেখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিরোনামে নতুনত্ব থাকলেও লেখকের নামের মধ্যে একটা গ্রাম্যতা নিহিত আছে।

আমি একটু অভক্তি নিয়ে পড়তে শুরু করলাম। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর ঘাড় ফেরাতে পারলাম না। মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্রায় বত্রিশ পৃষ্ঠা, মাঝারি রকমের হাতের লেখা। পড়া শেষ হলে আমার শরীর প্রায় ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। আবার পড়া শুরু করলাম। আরম্ভটা অনেকটা এরকম — 'সম্প্রতি লাহোরের এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে পাকিস্তানের মহামান্য প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইউব খান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন — পাকিস্তানে বিজ্ঞানের প্রসারে সবচেয়ে বড় বাধা ধর্মীয় কুসংস্কার। মহামান্য প্রেসিডেন্টের এই উক্তি অত্যন্ত মূল্যবান, সঠিক এবং সময়োচিত। আসুন আমরা এখন উদাহরণসহ কুসংস্কারের স্বরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখি।'

আমার চাকরি হয়েছে মাত্র চার-পাঁচ বছর। ঐ বয়সে যত প্রগতিশীল হই না কেন — অন্তরের অন্তস্থলে কিঞ্চিৎ পিছুটান থাকে। জন্মসূত্রে কিছু সংস্কার থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু লেখাটি আমার সমগ্র সত্তার ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়ে গেল।

লেখাটি দ্বিতীয়বার আধাআধি পড়ার আগে কাজী সাহেব আমার পাশে এসে বসলেন। বললেন, কেমন লাগল? আমি স্যারের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে মনে মনে ভাবলাম, মফস্বল শহরের একজন প্রবীণ অধ্যাপকের মনে এত বৈপ্লবিক চিন্তা? সে সময় ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের 'সিভিলাইজেশন', পাক-ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর ড. ফজলুর রহমানের 'ইসলাম', বজলুর রহমানের 'জিজ্ঞাসা', এইচ.জি. ওয়েলস্-এর 'শর্ট হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্লড', ভ্যান লুমের 'স্টোরি অব ম্যানকাইন্ড' নামক গ্রন্থগুলো একে একে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। পুণ্যবান ধার্মিকবৃন্দ উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর বিরুদ্ধে মিছিল করে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। গ্রন্থগুলো দাহ করা হচ্ছিল — লেখকদের হাতের কাছে পাওয়া যায়নি, তাই রক্ষা পেয়েছেন তাঁরা।

স্যারকে বললাম, ছদ্মনাম নিয়ে গ্রহণ করলেন, কিন্তু হাতের লেখাটা দেখছি আপনার নয়। লেখাটা সম্পর্কে আমার এই মুহূর্তে কিছু বলার সাহসও নেই, সামর্থ্যও নেই। লেখা আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, আপনাকে আগামীকাল বিকেলে ফেরত দেবো। শুধু এটুকু বলব স্যার, আমার ভেতরে অনেক কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। সারারাত যতক্ষণ জেগে থাকব, ততক্ষণ আপনার ছদ্মনামের লেখাটি পড়তে থাকব।

এবার কাজী সাহেবের বিস্ময়ের পালা। বললেন, বলছেন কি? এটি আমার লেখা নয়। এটি লেখকের ছদ্মনামও নয়। তাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করিয়ে দিলে বিশ্বাস হবে তো? আগামী সপ্তাহে দেখা করিয়ে দেবো। শর্ত — কারো কাছে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলবেন না, শুধু নবপরিচিত স্থানীয় বলবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি কাজ করেন এবং লেখাপড়া কতটুকু? কাজী সাহেব বললেন, তিনি একজন কৃষক, বয়স পঁয়ষট্টির ওপর, প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া কিছুই নেই। নিজের চেষ্টায় প্রায় বিদ্যাসাগর। এখন চলে যান - ক্লাবে কেউ নেই।

আমি বাসায় চলে এলাম। আর ভাবতে শুরু করলাম - কে এই লেখক, দেখতেই বা কেমন?

যাঁকে আমরা মনেপ্রাণে কামনা করি — অথচ চোখে দেখি না, তাঁর একটা অবয়ব মনের মধ্যে আপনাতেই তৈরি হয়ে যায়।

একদিন সেই বিরল মুহূর্তটি এল। অক্টোবরের মাঝামাঝি। ক্লাস সেরে নতুন কলাভবন থেকে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরনো ভবনের স্টাফ রুমে ঢুকে দেখি কাজী সাহেবের সঙ্গে পাশাপাশি ভিন্ন একটি ইজিচেয়ারে বসে আছেন আরেকজন লোক। আমাকে দেখে দু'জনে সোজা হয়ে বসলেন। আমি ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ছবিতে মধুসূদন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ছাড়া এমন হৃদয়ভেদী চাহনি আর দেখিনি। আমি অবলীলায় বলে ফেললাম, আরজ আলী মাতুব্বর সাহেব তো? কাজী সাহেব সাড়া দিয়ে বললেন, বলেছিলাম না মাতুব্বর সাহেব, নবীন অধ্যাপক বুদ্ধিদীপ্ত। আগে দেখা না হলে কি হবে, নামটি ঠিকই বলে দিলেন। আমি লজ্জায় মাথা নত করলাম।

গায়ের রং কাজী সাহেবের বিপরীত, শালপ্রাংশু দেহ। কোথাও কোন রকম মেদবাহুল্য নেই। চেহারার মধ্যে একটা প্রকৃতিদত্ত মসৃণতা আছে। ঠিক তাঁর লেখার মতো বাহুল্যবর্জিত। বাঙালী মনীষায় রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর পর সত্যজিৎ রায় ছাড়া খুব কম লোকের মধ্যে পরিমিতিবোধ আছে।

কাজী সাহেব বললেন, তাঁর শত্রুর অভাব নেই। হাড়ভাঙা খাটা মানুষ। আপনার হাতে তুলে দিলাম। গোপন করে রাখবেন। তাঁর লেখাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, এবং কিছু বলার থাকলে কেবল তাকে অথবা আমাকে বলবেন। বাইরের কোনো দায়িত্বহীন লোকের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে আলাপ করবেন না।

তারপর থেকে আমাদের গোপন আলোচনা এবং জ্ঞানের বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগলো। আমাদের বন্ধুত্ব গভীর থেকে সুগভীর হলো। আলোচনা সভায় কাজী সাহেবের অনুমতিক্রমে শ্রদ্ধাভাজন সহকর্মী অধ্যাপক মুসা আনসারী এবং অধ্যাপক শরফুদ্দীন রেজা হাই অংশগ্রহণ করতেন। পরবর্তীকালে হাই সাহেব বদলী হয়ে ঢাকা চলে এলেও মাতুব্বর সাহেবকে বিভিন্নভাবে প্রভূত সাহায্য করেন।

কাজী সাহেব সংসারী এবং ব্যস্ত মানুষ। জ্ঞানচর্চার বাইরেও তাঁকে আত্মীয়-প্রতিবেশী ও অন্যান্য অনেকের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো। মাঝে মাঝে সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করতেন, কেমন? আমারও সংক্ষিপ্ত উত্তর, বেজায় গভীর। উনি বলতেন, গোপনীয়তা বাঞ্ছনীয়।

মোস্তাফিজুর রহমান মেহেদী মৃত্তিকাবিজ্ঞানের ছাত্র ছিল। একটু নাকউঁচু ভাব। বরিশাল USIS লাইব্রেরী প্রধান সুজাউল ইসলামের অফিসকক্ষে একদিন বসে আছি। আমানতগঞ্জের ধনাঢ্য কাঠ ব্যবসায়ী আজিজ বেপারীর সদ্য প্যারিস-ফেরত পুত্র মেহেদী আমাকে পেছন করে বসে ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আলাপ করছেন। একটু পরে আরেকজন অপরিচিত লোক এসে বসলেন। প্রথম লোকটির ওপর একটু বিরূপ ভাব জমলেও দ্বিতীয় লোকটি একটু বেশী প্রাণবন্ত। কথাবার্তার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছে বলে সহজেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা মুখ দিয়ে কথা বলেন, আমরা যাদের বলি চাপাবাজ। আরেক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা হৃদয় দিয়ে কথা বলেন, আমরা বলি হৃদয়বান — ভাবালু। আরেক প্রকারের মানুষ মস্তিষ্ক দিয়ে কথা বলেন, যাদের বুদ্ধিমান বলি।

নূর ভাই, এম. এ. নূর, হৃদয় এবং মস্তিষ্ক দিয়ে কথা বলেন। মুখখানা যেন হৃদয় ও মস্তিষ্কের চাকর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাপ হলো না। নূর ভাই চায়ের কাপটা রেখেই, ইনকাম ট্যাক্স কোর্টে মামলা আছে বলে চলে গেলেন। আলাপ–পরিচয় হলো না বলে মনে দাগ পড়ে গেল।

মেহেদী উড টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা করে এসেছে। দুই বছরের প্যারিস জীবনে সমস্ত ইউরোপ ভ্রমণ করে বিভিন্ন যাদুঘর থেকে স্লাইড এনেছে, যা প্রজেক্টারে দেখার জন্য সুজাউল ইসলাম সাহেবকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কথা প্রসঙ্গে ডেনমার্কের সমুদ্র থেকে উত্থিত মৎস্যকুমারীর নাম ভুলে গিয়ে আমতা আমতা করছিল। আমি বললাম, 'লিটল মারমেইড'। ভদ্রলোক একটু বিরক্তির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আপনি জানেন কি করে? ওখানে গিয়েছিলেন নাকি? আমিও ঠ্যাটামি উত্তর দিলাম, সব জিনিস গিয়ে দেখা লাগে না। এমনিতে জানা যায়। না জানা থাকলে নিজের চোখে দেখলেও মনে থাকে না। সুজাউল ইসলাম সাহেব বললেন, শামসুল হক সাহেব, আপনার কাছে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে বই আছে।

বললাম, হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসেনের কালজয়ী গল্পের সংকলন আমার কাছে আছে।

মেহেদী আর আমি দু'জন দু'পথে চলে গেলাম।

দু'দিন পর দরজায় টোকা। খুলে দেখি মেহেদী সাহেব। বললেন, নিশ্চয় ক্ষমা শিক্ষকতার একটা বড় গুণ।

আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় এবং গভীর হলো। ততদিনে 'সত্যের সন্ধান' ও 'সৃষ্টি–রহস্যে'র পাণ্ডুলিপি একাধিকবার পড়া হয়ে গেছে। এবং পাণ্ডুলিপিগুলো প্রায়ই আমার কাছে থাকে।

একদিন স্যারকে বললাম, মেহেদীর সঙ্গে মাতুব্বর সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিলে কেমন হয়? লামচরি থেকে এতদূর পথ হেঁটে আসেন, বয়স্ক মানুষ হাঁপিয়ে পড়েন। মাঝপথে আমানতগঞ্জে কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ পেলে, ধীরে–সুস্থে আমাদের কাছে আসতে পারবেন। সহজে রিক্সায় চড়তে চান না। একটু স্বাস্থ্যসেবী মানুষও। কাজী সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থেকে সাড়া দিলেন। আমি স্যারকে নিশ্চয়তা দেয়ার জন্যে বললাম, ছেলেটি ভালো এবং মুক্তবুদ্ধির। সারা ইউরোপে মিউজিয়াম দেখে ঘুরে বেড়িয়েছে, আসার সময় একখানা গাড়ী না এনে এক বস্তা স্লাইড এবং একখানা প্রজেক্টার মেশিন নিয়ে এসেছে। কাজের ফাঁকে স্লাইড দেখে। বাজে কাজে নেই। বই পড়ে এবং রুচিশীল ছেলে।

স্যার অনুমতি দিলেন, কিন্তু চোখে সেই নির্দেশ। যা করবেন, নিজ দায়িত্বে করবেন। আরজ আলী সাহেবের যাতে কোন ক্ষতি না হয়।

উনসত্তরের প্রথম দিকে বাংলা বোশেখ মাসের মাঝামাঝি। কালবৈশাখীর দাপট চারদিকে পুরোদমে। মেহেদীর কাঠের পাটাতনযুক্ত ডাকবাংলো প্যাটার্ণের আবাস। দুপুরে খেয়ে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। কীর্তনখোলা নদী থেকে খালের মতো সরু একটি জলাশয় এসে মেহেদীর বাংলো স্পর্শ করেছে। বেদের বহর পড়েছে। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে না তাকিয়েই বলল, প্রজেক্টার খারাপ — কাজেই আজ কিছুই দেখা যাবে না। আমি বললাম, বিনা প্রজেক্টারে বাদ্যানী দেখছেন — তাইবা কম কি?

মেহেদী বললো, সমস্ত ইউরোপে আমাদের দেশের বাদ্যানীদের মতো দেহসৌষ্ঠব আর দেখিনি।

আমি বললাম, আমি আপনার জন্য একটি প্রজেক্টার এনেছি — যার ভেতর দিয়ে দুনিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলে, আপনার পরিচিত দুনিয়ার রং বদলে যাবে। বলে আরজ আলী মাতুব্বরের সামগ্রিক পরিচয় দিলাম। আর বললাম, কাজী গোলাম কাদির স্যার বলে দিয়েছেন, মাতুব্বরের পরিচয় আপনি, কাজী সাহেব এবং আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে।

মেহেদী জিজ্ঞেস করলো, ইসাক মাতুব্বর সাহেবের তিনি কি হন? বললাম — চাচা।

ইসাক মাতুব্বর সাহেব শহরের একজন সম্মানিত এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি। মেহেদীকে কাগজের মোড়কের মধ্যে 'সত্যের সন্ধান'-এর পাণ্ডুলিপিটি দিয়ে আমি কাজের তাড়ায় চলে এলাম।

পরদিন ভরদুপুরে মেহেদী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। বললো, এখনি চলুন মাতুব্বর সাহেবের বাড়ীতে। বললাম, আপনার নতুন কেনা ডাটসন গাড়ী লামচরি পর্যন্ত নেয়া যাবে না। হেঁটে যেতে হবে। আমার স্পীডবোট আছে, চলুন।

স্পীডবোটে লামচরি পৌঁছুলাম প্রায় সাড়ে তিনটায়। আমি বোটে বসে আছি, মেহেদী মাতুব্বর বাড়ীতে রওনা হলো। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো, আমিনের কাজে দূরে গেছেন, ফিরবেন আগামীকাল। আপনার কথা বলে এসেছি।

এই ফাঁকে স্থানীয় একজন মধ্যবয়সী লোককে জিজ্ঞেস করলাম, মাতুব্বর সাহেব কেমন লোক? উত্তর এলো, উনি হাত না দিলে একশ' খুন বাঁচে না।

বরিশালে জায়গাজমি নিয়ে খুনাখুনি লেগে থাকে। এ রকম কোন কোন বিবাদের সময় মাতুব্বর সাহেবের ডাক পড়ে। উনি দু'পক্ষের দলিলপত্র নিয়ে, চেইন ফেলে, অঙ্ক কষে, যার যার জমির সীমানা নির্ধারিত করে দিয়ে চলে আসেন। কারো দিকে ফিরে তাকান না, কারো কাছ থেকে একটা পয়সাও নেন না। মাতুব্বর সাহেবকে সবাই মানেন, সবাই শ্রদ্ধা করেন। এমনকি চরমোনাই'র পীর সাহেবরাও জায়গাজমি সংক্রান্ত মাপজোকের দরকার হলে মাতুব্বর সাহেবকে ডাকেন। মাতুব্বর সাহেব কে এবং কি, তা জানা সত্ত্বেও পীর সাহেবরা তাঁর সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করতেন।

মেহেদীর সঙ্গে মাতুব্বর সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিলাম। মেহেদী আমার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললো, আপনি না হলে এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার কোনোদিন পরিচয় হতো না। অথচ আমার বাংলো থেকে তাঁর বাড়ীর মোড় দেখা যায়। চিরদিনের কাছের মানুষটি চিরদিনের দূরের মানুষ হয়ে থাকতেন। মেহেদীর বাংলোতে আমাদের বহু তাত্ত্বিক বিতর্কের আসর বসতো। আমরা তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিতর্কের অবতারণা করতাম। মুহূর্তের মধ্যে আমরা নীরব শ্রোতায় পর্যবসিত হয়ে যেতাম। তিনি যেন অর্বাচীন শিষ্যদের দুরূহ এবং গভীর বস্তুগুলো নেহাত সোজা ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন। অথচ কখনও তাঁর অহমিকা প্রকাশ পায়নি। অপূর্ব কণ্ঠস্বর এবং বরিশালের গ্রাম্য সরল ভাষার গুণে তাঁর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতাম। মেহেদী একদিন আমাকে বললো, মাটির খবর এই মাটির মানুষটি এতো বেশী রাখেন যে, আমি মৃত্তিকাবিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও তাঁর কাছে লজ্জা পেয়ে যাই। আমি কাঠের ব্যবসা করি — অথচ উদ্ভিদবিদ্যার নাড়ী-নক্ষত্র তাঁর নখদর্পণে।

একদিন মেহেদী তার গাড়ীতে করে মাতুব্বর সাহেবকে আমার বাসায় নিয়ে এলো। চা পানের পর স্থির হলো, পঁচিশ কিলোমিটার দূরে বাবুগঞ্জ থানার দোয়ারিকায় বেড়াতে যাওয়া হবে। পথে মাতুব্বর সাহেবকে তালতলার কাছে তাঁর বাড়ী যাবার রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোয়ারিকার পথে রওনা দিলাম আমরা। মাতুব্বর সাহেব হঠাৎ মেহেদীকে উদ্দেশ করে বললেন, আপনার গাড়ীর কোথাও সামান্য গোলমাল আছে।

মেহেদীর আত্মশ্লাঘায় ঘা লাগলো। নতুন কেনা গাড়ী। বললো সে, গাড়ীর খবরও আপনি রাখেন নাকি?

ফেরার পথে সার্ভিস সেন্টারে পরীক্ষা করে দেখা গেলো, একটা স্ক্রু ঢিলে হওয়ায় সামান্য আওয়াজ হচ্ছিল। দক্ষ মেকানিক তা সেরে তুলল। মেহেদী লজ্জায় মাথা নত করে রাখল। আস্তানায় ফেরার পর ব্যাপারটা সহজ করার জন্য বললাম, মাতুব্বর সাহেব যন্ত্রবিজ্ঞানের সহজ সূত্র জানেন বলে তাঁর কোনো কিছু অজানা নয়।

মাতুব্বর সাহেব ধীরে ধীরে মোটরকারের সমস্ত যন্ত্রাংশের নাম বলতে এবং কোনটার কি কাজ বর্ণনা করতে লাগলেন। বললেন, এক সময় মোটর মেকানিজম শিখেছিলাম গাড়ীর ড্রাইভার হওয়ার জন্য। এ সম্পর্কে কিছু বইও যোগাড় করেছিলাম। পরে আর ড্রাইভার হওয়ার সুযোগ পেলাম না।

কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করলাম, মাতুব্বর সাহেব আমার এখানে কম আসছেন। কাজী সাহেবের ওখানেও আসছেন না। মনে মনে ঈর্ষা বোধ করলাম। নিশ্চয়ই মেহেদীর ওখানে সময় কাটিয়ে চলে যান।

একদিন দুপুরে খেয়ে দেয়ে ছুটলাম আমানতগঞ্জের দিকে। দেখি মেহেদী ঘুমুচ্ছে। পায়ের শব্দ পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে উঠে বললো, মাতুব্বর সাহেব তো কিছুক্ষণ আগে আপনার বাসার দিকে গেলেন। তার মুখে শুনলাম, অনেকদিন ধরে বাবুরহাটে আমিনের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্যে এদিকে আসতে পারেন নি।

মেহেদীসহ বাসায় ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পর মাতুব্বর সাহেব এলেন। তাঁর প্রথম জিজ্ঞাসা, রকেটের ওপর কোন বই আছে কিনা। আমরা কেউ সেই মুহূর্তে সাহায্য করতে পারলাম না।

মেহেদী উনিশশ' সত্তরের প্রথম দিকে ঢাকা চলে এলো। পি. জি. হাসপাতালের সামনের 'টিভোলী' দোকানটির প্রথম মালিক মেহেদী। সৌখিন জিনিসপত্রের দোকান। আমাদের আমন্ত্রণ জানালো যেন মাতুব্বর সাহেব ও আমি ঢাকা এলে তার দোকানে উঠি। দোকানের পেছন দিকে আমাদের জন্য বিশ্রামের জায়গা রাখা হয়েছে।

একাত্তরের শেষদিকে মেহেদীর ছোট ভাই, আমাদের ছাত্র, বারান্দায় ডেকে নিয়ে বললো, মেঝোভাইকে পাক-দুর্বৃত্ত বাহিনী দোকান থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। আচ্ছন্নের মতো সেই চেয়ারটায় বসে পড়লাম, যেখানটায় মাতুব্বর সাহেবের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই মাতুব্বর সাহেব লঞ্চঘাট থেকে সরাসরি আমার বৈদ্যপাড়ার বাসায় এলেন। ইচ্ছা — আমাকে নিয়ে কাজী সাহেবের সঙ্গে দেখা করেই মেহেদী সাহেবের ওখানে দীর্ঘক্ষণ সময় কাটাবেন। শুভেচ্ছা বিনিময় এবং মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের পারস্পরিক বিবরণ নেয়ার পর সেই দুঃসহ দুঃসংবাদটি মাতুব্বর সাহেবকে দিলাম। উনি শক্ত মানুষ। কিন্তু তাঁকেও সে মুহূর্তে অত্যন্ত বিচলিত দেখলাম। চোখের পানি মুছে বললেন, ভাবতে পারিনি।

কিছু নীরব মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পর আমরা কাজী সাহেবের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মেহেদীকে হারানোর বেদনা যে কী অপরিসীম, তা বোঝানোর ভাষা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ দেশের বিঘোষিত নীতি। সাহসে ভর করে একদিন কাজী গোলাম কাদির সাহেবকে বললাম, স্যার, এখন মাতুব্বর সাহেবের প্রথম বইটি (সত্যের সন্ধান) ছেপে দিতে চাই। স্যার ভূয়োদর্শী মানুষ। আমতা আমতা করে বললেন, ধর্মনিরপেক্ষতা তো আমরা পেয়েছি, কিন্তু . . . আচ্ছা, ব্যাপারটা আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম।

আল আমীন প্রেসের জব্বার মিয়া সাহেবের সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি কাজী সাহেবের বড় ভায়রা ভাই। যার বিয়ে উপলক্ষে কাজী সাহেবের সঙ্গে মাতুব্বর সাহেবের আলাপ-পরিচয় হয়। জব্বার মিয়া মাতুব্বর সাহেবের বই ছাপতে এক কথায় রাজি হলেন। শুধু তাই নয়, বললেন, বইয়ের প্রুফও তিনি ভালো করে দেখে দেবেন। মাঝে মাঝে খবর নিই। জব্বার মিয়া বললেন, আমার কম্পোজিটরদের অভিমত, তারা এর আগে কখনো এত সুন্দর বই আর ছাপেনি।

বই ছাপা প্রায় শেষ। এমন সময় কোন এক পীরের কাছ থেকে আদেশ এলো বইটি ছাপা বন্ধ করতে এবং যা ছাপা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে ফেলতে। কম্পোজিটরদের মধ্যে পীরের এবং স্থানীয় একটি মাদ্রাসার লোক ওঁত পেতে ছিল। এ্যাদ্দিন কিছু বলেনি বইটি ছাপার শেষ দেখার জন্যে। বইটির বেশ কিছু 'অফ প্রিন্ট' বাইরে চলে গেছে। জব্বার মিয়া সহ পরামর্শ করে বইয়ের কম্পোজ কপিগুলো রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন ভাগে কিছু আমার বাসায়, কিছু মাতুব্বর সাহেবের বড় ছেলে — পৌরসভার পাম্প ড্রাইভার মালেক মাতুব্বরের আস্তানায় লুকিয়ে রাখা হলো।

পরদিন রাতের লঞ্চে ছাপানো অফ প্রিন্টগুলো ঢাকার বর্ণমিছিল প্রেসে পাঠিয়ে দেয়া হলো। প্রেসের মালিক তাজুল ইসলাম সাহেব অধ্যাপক শরফুদ্দিন রেজা হাই এবং আমার বিশিষ্ট শুভাকাঙ্ক্ষী এবং হৃদয়বান বন্ধু। আমাদের সুবাদে বইয়ের বাকী অংশগুলো ছেপে বাঁধাইয়ের বন্দোবস্ত করে দিলেন।

আরজ আলী মাতুব্বর সাহেব চল্লিশখানা বাঁধাই করা বই নিয়ে বরিশালগামী একটি বৃহদাকার লঞ্চে উঠলেন। দোতলার পাটাতনে একজন প্রবীণ ভদ্রলোক ঘুমোবার আয়োজন করছেন। তখন ভরদুপুর। মাতুব্বর সাহেব বইগুলো তাঁর হাওলায় রেখে খাওয়ার জন্যে নীচে গেলেন। হোটেল থেকে ফিরে এসে দেখেন বইয়ের বোঁচকাটি নেই। রসিক চোর মনে করেছিল দামী কাপড়ের বাণ্ডিল। মাতুব্বর সাহেব আবার ফিরে গেলেন এবং কোনমতে পনের কপি বই বাঁধিয়ে সঙ্গে নিয়ে বরিশাল ফিরলেন।

প্রথমে আমার বাসায় এসে এক কপি বই আমাকে উপহার দিলেন। পরে আমরা দু'জন কাজী সাহেবের বাসায় গেলাম। কাজী সাহেব বই হাতে পেয়ে বেজায় খুশী হলেন, মাতুব্বর সাহেবকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানালেন। আদর করে আমার কাঁধে হাত বুলিয়ে দিলেন। সময়টা উনিশশ' তিয়াত্তরের দোসরা ডিসেম্বর।

আরজ আলী সাহেবকে আমরা দু'জন প্রস্তাব দিলাম — ঢাকায় কাকে কাকে বই উপহার দিতে হবে। এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বনেরও পরামর্শ দেয়া হলো।

চুয়াত্তরের কোনো এক সময় মাতুব্বর সাহেবকে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার কিছু ছাত্র জোর করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিক্সায় তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ছলে মাতুব্বর সাহেবের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানোর মতলব আঁটছিল। অন্তত মাতুব্বর সাহেবের তাই ধারণা হয়েছিল। এমন সময় কাজী সাহেবের ছোট ভাই কাজী শামসুল হুদা দূর থেকে দেখতে পেয়ে বাঁশের লাঠি জোগাড় করে জোব্বাধারীদের ভাগিয়ে দিলেন, আর বলতে লাগলেন, একাত্তরে একবার জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেশ ছারখার করেছিস, এখন আবার বেরিয়েছিস।

কাজী শামসুল হুদা এবং আমরাও ইতোমধ্যে লক্ষ্য করিনি যে, ধর্মনিরপেক্ষ দেশে হিন্দু-মুসলমান কে কত জোরেশোরে ধর্মকর্ম করতে পারে তারই প্রতিযোগিতায় নেমে গেছি। দুর্গাপূজা-সরস্বতীপূজার ধুমধাড়াক্কার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাস্তার মাঝখানে ঘোড়ার লাদি ও গোবর পরিষ্কার করে শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে মহাধুমধামের সঙ্গে সিরাত ও কিরাত মাহফিল অনুষ্ঠান শুরু করে দিয়েছি। সরকারী উদ্যোগে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় জাতীয় নেতার সগৌরব উপস্থিতি — আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতায় নতুন মাত্রা যোগ করে বুকের ভেতরটায় কাঁপুনি ধরিয়ে দিল।

মাতুব্বর সাহেবকে বিপজ্জনক এলাকাগুলো পার করে দেয়ার জন্যে কামাল নামক যে ছেলেটিকে মোতায়েন করেছিলাম, সেই ছেলেটি একদিন সটকে পড়লো। ছেলেটিকে প্রথম যখন অনুরোধ করেছিলাম তখন সে বলেছিল, স্যার, চিন্তা করবেন না। ওনাকে আমার বাপ-চাচা সবাই চেনেন। আপনার আর কাজী স্যারের বন্ধু। কার বাপের সাধ্য তাঁর গায়ে হাত তোলে। বলেই সে যে-অস্ত্র বের করে দেখালো, তাতে আমি আঁতকে উঠলাম। বেশ কিছু দিন পর তার সঙ্গে দেখা হলে বললো, স্যার, তাঁর মতবাদের সঙ্গে আমাদের ধর্মীয় মতবাদের মিল নেই। তা ছাড়া বাড়ীর সবাই তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করেছে।

AMARBOI.COM

আরজ আলী মাতুব্বরকে আবার আড়াল করতে সচেষ্ট হলাম, স্যারের কাছে একটু লজ্জাও পেলাম। মনে হলো সবকিছুর জন্য আমিই দায়ী। আল আমীন প্রেসের মালিকের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন, প্রেসের টাকার চিন্তা করবেন না — শুধু আপনারা সাবধান থাকবেন।

মাতুব্বর সাহেব শহরে আসা-যাওয়া কমিয়ে দিলেন। স্থলপথ ত্যাগ করে লঞ্চে আসা-যাওয়া শুরু করলেন।

এরই মধ্যে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। মানুষের কাছে আরজ আলী মাতুব্বর আর 'ঘোড়ার লাদি ও গোবর' পরিষ্কার করার চেয়ে খাদ্যবস্তু অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠছিলো। মাতুব্বর এ যাত্রা রক্ষা পেলেন।

এম. এ. নূর সাহেব যে কারণে বরিশাল গিয়েছিলেন, আমিও সেই একই কারণে বরিশাল গিয়েছিলাম — অর্থাৎ কারণটা বৈষয়িক। তবে পার্থক্য এখানে, আমি চাকুরী করতে গিয়েছিলাম, তিনি চাকুরী না করতে গিয়েছিলেন। তিনি আয়কর বিভাগের ডাকসাইটে উকিল — স্বাধীন ব্যবসা। এখানে থেমে থাকলে জগত সংসারের পক্ষে তাঁকে লুফে নেয়ার অসুবিধা হতো না। তাঁর আরো কিছু 'দোষ' ছিল। সেই 'দোষ'গুলো তাঁকে সাধারণ একজন আইনজ্ঞ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। তিনি অক্লান্ত পাঠক, সংস্কৃতিসেবী, হৃদয়বান, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। ঢাকা থেকে যে কোনো বড় শিল্পী বরিশাল গেলে তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন বলে আমাদের কাছে খবর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসত — যায় আমানত আলী-ফতেহ আলী, নাজাকাত আলী-সালামত আলী তাঁর বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সকল শিল্পের গভীরে পৌঁছে অনুধাবন করার তাঁর আশ্চর্যজনক ক্ষমতা আছে। নূর ভাইয়ের বন্ধুত্ব কামনা করতাম আন্তরিকভাবে।

একদা সেই সুযোগ ঘটে গেলো। শাহেদা নূর ভাবী বাংলা বিভাগে এম. এ. প্রথম পর্বে ভর্তি হয়ে গেলেন। তাঁকে আমরা সবাই বয়োজ্যেষ্ঠতার কারণে সাধারণ ছাত্রী ভাবতাম না — বরং শ্রদ্ধা করতাম। অন্যান্য ছাত্রছাত্রী এবং বয়োকনিষ্ঠ শিক্ষকরা তাঁকে তমিজ করতেন।

তিনি এসে বললেন, আপনার বন্ধু নূর সাহেবের বসন্ত হয়েছে। মনে মনে ভাবলাম, তৌবা, এই বয়সে বসন্ত। তা মনের হোক আর দেহের হোক, বসন্তমাত্রই রোগ এবং ছোঁয়াচে।

অসুস্থ নূর ভাইয়ের পাশে বসে বললাম, যাঁর মনে এবং দেহে চিরবসন্ত বিরাজমান, তাঁর আবার বিজ্ঞপ্তি-দেয়া বসন্ত কেন! তাঁকে ভরসা দিয়ে বললাম — হাম, বসন্ত, হোস্টেলের সুপার এবং কলেজের অধ্যক্ষ একবার হয়ে গেলে ভবিষ্যতের জন্য আর ভয় থাকে না। তিনি বললেন, মশারির তলে শুয়ে, নিমপাতার ডাল দিয়ে বাতাস করে আর সময় কাটে না। বইটই কিছু থাকলে দিয়ে যাবেন।

অত্যন্ত সংকোচ বোধ করে এবং কয়েকবার ইতস্তত করে 'সত্যের সন্ধান' বইখানা লুকিয়ে নিয়ে তাঁর হাতে দিলাম। বললাম, বইখানা যাতে কেউ না দেখে — সাবধানে রাখবেন। কালকে এসে আপনার মতামত শুনবো।

পরদিন শাহেদা নূর ভাবী এসে বললেন, আপনার বন্ধুকে কি একটা বই দিয়ে এসেছেন — সারারাত ঘুমায়নি। কয়েকবার পড়েছে, আর আপন মনে বিড়বিড় করে কি কি বলেছে। আপনাকে আজ যেতে বলেছে।

আমি বিকেলে যাওয়ার পর নূর ভাই উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আমি অনেক দিন এতো ভালো বই পড়িনি। এই লেখককে আমি দেখতে চাই — তাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই হবে। আরজ আলী মাতুব্বরের পরিচয় প্রকাশ করার পর, তাঁর বই প্রকাশ নিয়ে যে বিপদ ঘটেছিল তা বর্ণনা করে বললাম — তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেয়া কঠিন। তিনি এখন শহরে কম আসেন এবং এলেও তাঁকে আড়াল করে রাখি।

রুগ্ন মানুষের মনে কষ্ট দিতে নেই। বললাম — নূরভাই, কথা দিচ্ছি না, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

কাজী গোলাম কাদির সাহেবের কাছে কথাটা পাড়লে তিনি প্রথমে বিতৃষ্ণ নয়নে তাকালেন। পরে বললেন, নূর সাহেব অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর বাসায় বৈষয়িক-অবৈষয়িক কারণে নানা রকমের মানুষ ওঠাবসা করেন। তাঁদের কারো চোখে পড়লে শেষ পর্যন্ত সামাল দিতে পারবেন তো? ধর্মান্ধদের কুযুক্তির অর্থ খোঁজা যায় ; কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা যখন যুক্তিহীন হয়ে পড়ে, তখন আচরণ করে ম্যাজিস্ট্রেট ফজলুল করিমের মতো। আপনি তো সবই জানেন। একবার বই ছাপতে গিয়ে কি বিপত্তি না ঘটেছিল।

আমি স্যারকে অনুনয় করে বললাম, এ কাজটিও আমার ওপর ছেড়ে দিন। কোন অসুবিধা হবে না আশা করি।

সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তটি এলো। মাতুব্বর সাহেবকে এক দিন ঘুরপথে নূর ভাইয়ের বাসায় নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজির হলাম। সময়টা দেখা করার জন্য অসময়। পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার হলো না। নূর ভাই বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনার বইটি পড়ে আমি এতই মুগ্ধ হয়েছি যে, আমি আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করেছি।

যে প্রশ্ন আমি নিজে জিজ্ঞেস করিনি, অন্যসূত্রে জেনেছি, তা-ই নূর ভাই করে বসলেন — মাতুব্বর সাহেব, আপনার জীবনে এমন কি ঘটনা ঘটেছে যা আপনাকে এ ধরণের চিন্তা-দর্শনে টেনে এনেছে?

মাতুব্বর সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। আমি আর নূর ভাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অপলক তাকিয়ে রইলাম। শক্ত মানুষটির চোখে দ্বিতীয়বারের মতো আবারও চোখের পানি দেখলাম। মাতুব্বর সাহেব তাঁর মৃত মায়ের ছবি তোলার ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। এর বিস্তৃত বিবরণ আইয়ুব হোসেনের লেখা জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যাবে।

নূর ভাইয়ের হৃদয় দ্রবীভূত হল। শিল্পীমনা মানুষ। সহজে আকুল হন। তিনি সেই সকল লোকদের একজন যাঁরা লোকচক্ষুর আড়ালে থাকেন — মানুষের গুণের কদর করেন, অথচ নিজেরা খ্যাতির কাঙাল নন বিন্দুমাত্রও। বনফুলের মতো। আপনাতে আপনি ফুটে নিঃশেষ হয়ে যান।

মাতুব্বর সাহেবকে তিনি বললেন, মাতুব্বর সাহেব, শামসুল হক সাহেবের মতো আমিও আপনার বন্ধু। আপনার যখন খুশী আপনি নিঃসঙ্কোচে আমার এখানে আসবেন। আজ থেকে আমরা পরস্পরের আপনজন। আপনার অন্য কোন বই থাকলে, তার প্রকাশনার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার ওপর ছেড়ে দিন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আমি বললাম, তাঁর 'সৃষ্টি-রহস্য' নামে আরেকটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আছে। আপনাকে পড়তে দেবো। এটি আকারে 'সত্যের সন্ধান' থেকে একটু বড় হবে।

নূর ভাই 'সৃষ্টি-রহস্য' প্রকাশনার খরচ অর্থাৎ সাড়ে দশ হাজার টাকার সবটাই বহন করেন। এরই মধ্যে নূর ভাই ঢাকার লালমাটিয়ায় তাঁর নবনির্মিত বাড়ীতে — বরিশাল ছেড়ে চলে আসেন। একদিন মাতুব্বর সাহেব গল্পচ্ছলে বলেছিলেন, লালমাটিয়ার বাসায় দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর পকেটে হাত দিয়ে বইয়ের বিক্রয়লব্ধ তিন হাজার টাকা নূর ভাইকে দিতে গেলেন, অমনি নূর ভাই বলে উঠলেন — মাতুব্বর সাহেব, ওটা পকেটে রেখে দিন। আমি ফেরত নেয়ার জন্য ও টাকা দেইনি। আপনার মতো চিন্তাশীল ব্যক্তির কাজে ক'টি টাকা লেগেছে — এটাই সার্থকতা। বইটির উৎসর্গ করা হয়েছে এই বলে — 'আমার পরম সুহৃদ মোহাম্মদ আলী নূর সাহেবকে'। দু'জনের মহৎ হৃদয়ের পরিচয়।

'অনুমান' নামক চটি বইটির প্রকাশনায় নূর ভাইয়ের বড় ভাই এক হাজার টাকা খরচ দিয়েছিলেন। তিনি ধর্মভীরু আলহাজ্ব ছিলেন — কিন্তু জ্ঞানতপস্বী মাতুব্বরের ভক্তও ছিলেন।

নূর ভাইকে ঠাট্টা করে কিছুদিন আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যে সময় মাতুব্বর সাহেবকে বই প্রকাশের জন্য সাড়ে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন, এ টাকায় তখন মীরপুরে পাঁচ কাঠা জায়গা কিনতে পারতেন। নূর ভাই উত্তর দেননি। যে মানুষটির মন-মানসিকতা ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের চেয়েও অনেক বড়, তার মন জয় করতে নূর ভাই না হয় কয়টি টাকা ব্যয় করলেনইবা। কাজেই আমার কথার উত্তর দেয়ার তিনি প্রয়োজন বোধ করেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বরিশাল থাকতে আরো দুটো ঘটনা মাতুব্বর সাহেবকে নাড়া দেয়। রোজার ঈদের পর একদিন কাজী সাহেব আমার জন্য জরুরী খবর পাঠালেন। বিকেল চারটা। গিয়ে দেখি মাতুব্বর সাহেব বসে আছেন। চিরাচরিত নিয়মে তিন ইঞ্চি লম্বা পাইপের ভেতর সিগারেট ঢুকিয়ে দিয়ে সুখটান দিচ্ছেন। আমাকে দেখে প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয় মুখ। পকেটে হাত দিয়ে একখানা ঈদ-সংখ্যা ইত্তেফাক বের করে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। দেখি আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী'র একটি লেখা — 'আরজ আলী মাতুব্বরের জীবন-জিজ্ঞাসা'। জোরে জোরে পড়ে আমাদের দু'জনকে শোনাতে লাগলেন। দু'বার তাঁর চোখে পানি দেখেছি। এবার দেখলাম আনন্দের উচ্ছ্বাস। একটি লেখা একজন গ্রন্থকারকে কতটুকু উদ্বুদ্ধ করতে পারে তা প্রত্যক্ষ করলাম। প্রবন্ধটি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী'র 'আরণ্যক দৃশ্যাবলী' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আরেকদিন কাজী সাহেবের বাসায় গিয়ে দেখি মাতুব্বর সাহেব বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। যে ফজলুল করিম সাহেবের ওয়ারেন্টে কমিউনিস্ট আখ্যায়িত হয়ে মাতুব্বর সাহেব যৌবনের প্রথমদিকে 'পবিত্র হাজতবাস' করেছেন, সেই ফজলুল করিমের নাতি জনৈক শফিকুর রহমান এক লম্বা এবং উচ্ছ্বসিত চিঠি লিখে মাতুব্বর সাহেবকে ঢাকায় গেলে তাঁর বাসাবোর বাসায় দেখা করতে বলেছেন। আরো লিখেছেন, শফিকুর রহমান 'সত্যের সন্ধান' বইখানি ফুটপাথ থেকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করেছেন।

আমরা বললাম, চুপচাপ থাকুন। ফাঁদও হতে পারে।

একমাস পর আরেক চিঠি, বেশ লম্বা। অনেক অনুনয়-বিনয়, ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনান্তে লেখা হয়েছে, আপনার ঠিকানা পেলে আমি দেখা করবো। আপনার মতো আমিও মুক্তবুদ্ধিতে বিশ্বাস করি। মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদের ওপর আমার প্রচুর বই আছে। আমি আমার নানার মতো নই।

আমরা শফিকুর রহমানের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিলাম এবং বললাম, সঙ্গে যাতে মাতুব্বর সাহেব তাঁর ডি.আই.টি.-তে কর্মরত মেঝো ছেলেকে নিয়ে যান।

মাতুব্বর সাহেব একদিন বাসাবোতে সকালের দিকে গেলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। জগন্নাথ কলেজে বি. এসসি. ক্লাসে পড়ে, একটি বাচ্চা ছেলে। দাড়ি-গোঁফ গজায়নি। অসম্ভব রকমের বুদ্ধিদীপ্ত মেধাবী ছেলে। তার বইয়ের সংগ্রহ এবং অধ্যয়নের গভীরতা দেখে মাতুব্বর সাহেব খুবই মুগ্ধ হলেন। পরবর্তীতে ঢাকায় শফিকের সঙ্গে আমারও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন মাতুব্বর সাহেব। তাকে আমার খুবই ভালো লেগেছিল। জানি না শফিকুর এখন কোথায় আছে। এক সময় সে মাতুব্বর সাহেবের আলোচনা প্রসঙ্গে ইংরেজীতে মানবতাবাদের ওপর একটি বড় প্রবন্ধ লিখে আমেরিকার আইকনোক্লাস্ট পত্রিকায় ছাপিয়েছিল। শফিক একজন শিল্পীকে দিয়ে মাতুব্বর সাহেবের এক আবক্ষ মূর্তি গড়েছিল। মাতুব্বর সাহেবের বন্ধুভাগ্য ভালোই বলতে হয়।

উনিশশ' পঁচাত্তরের কোন এক সময় ঢাকা থেকে ফিরে মাতুব্বর সাহেব খুবই খুশিমনে বললেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. নূরুল ইসলামের উদ্যোগে দর্শন ক্লাসে আত্মা ও প্রাণের ওপর একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতার বন্দোবস্ত করেন। এই বক্তৃতা শুনে ছাত্র-ছাত্রীরা খুবই মুগ্ধ হন এবং নানা রকম কঠিন প্রশ্ন করেন। মাতুব্বর সাহেব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন। ক্লাসের পর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে অভিনন্দনে অভিভূত করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. নূরুল ইসলামের নিকট আরেক কারণে আমরা কৃতজ্ঞ। তিনিই মাতুব্বর সাহেবের 'সত্যের সন্ধান' বইটি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে পড়তে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর হাত দিয়ে বইটির ওপর একটি অপূর্ব সুন্দর প্রবন্ধ বের হয়।

কুখ্যাত 'পি. ও. নয় নম্বর' ধারাবলে পঁচাত্তর সালে পদোন্নতি পাইনি। সারাজীবন বোর্ডের একখানা সিলেকশন এবং ব্যাকরণের 'কৃৎ' ও 'ঘঞ' প্রত্যয় মুখস্থ করে অধ্যাপনা জীবন সার্থক করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ পদোন্নতি পেয়ে বিভাগীয় প্রধানের চেয়ার অলঙ্কৃত করলেন, যেখানে অনার্স এবং এম. এ. কোর্স একসঙ্গে পড়ানো হয়। ডোবার মাছ সমুদ্রে পড়লে যে দশা হয়। নিজের অক্ষমতা ঢাকার জন্য চতুর্দিকে চোখ পাকিয়ে কথা বলা দেখে বুঝলাম — সরকারী কলেজের ভাত শেষ হয়ে এসেছে। আমার চার বছরের জুনিয়রগণও পদোন্নতি পেল।

আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর রফিকুল ইসলাম এবং প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সাহেব মৌখিক পরীক্ষা নিতে গিয়ে বললেন, তোমার কি এখনো শিক্ষা হয়নি? এখান থেকে সুযোগ পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাও।

কাজেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশশ' ছিয়াত্তর সালের জুলাই মাসে যোগদান করি। পেছনে প্রায় চোদ্দ বছরের কলেজ জীবন, অগণিত বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র-ছাত্রী এবং শুভানুধ্যায়ী ফেলে আসি। কিন্তু আমার স্ত্রী থেকে যান বি. এম. কলেজে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে। তাঁকে তো সঙ্গে সঙ্গে বদলী করানো যায়নি। সুতরাং বরিশালের সঙ্গে সম্পর্ক তাৎক্ষণিক চুকে যায়নি। ছুটি হলেই বরিশাল ছুটতাম। কাজী সাহেব এবং মাতুব্বর সাহেবের সঙ্গে আগের মতোই দেখা-সাক্ষাত গল্প-সল্প হতো। মনে হতোনা — বরিশাল ছেড়েছি।

ইতোমধ্যে আমার বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক আব্দুল হালিম এবং তাঁর স্ত্রী অধ্যাপিকা নুরন্নাহার বেগমের সঙ্গে মাতুব্বর সাহেবের পরিচয় করে দিয়েছি। তাঁরা তাঁকে সবসময় সাদরে গ্রহণ করতেন এবং মাতুব্বর সাহেবের আগমন তাঁদের কাছে সর্বদা আনন্দদায়ক ছিল।

উনিশশ' উনাশি সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমরা বরিশালের পাট চুকিয়ে চলে আসি। বিদায় দিনে একটু একটু বৃষ্টি ছিল, সকাল আটটায় স্টীমার ছাড়বে। আমার এবং স্ত্রীর লটবহর স্টীমারে তোলা হয়ে গেছে। সহকর্মী এবং ছাত্ররা অনেকে বিদায় দিতে স্টীমার ঘাটে এসেছেন। একপাশে কাজী গোলাম কাদির সাহেব বিমর্ষ নয়নে দাঁড়িয়ে আছেন। বিদায় নিতে গিয়ে খুবই ভাবালু হয়ে পড়লাম। দোতলায় উঠে রেলিং ধরে সবার দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ দেখি সুবর্ণকান্তি কাজী সাহেবের পাশে একটি কালো মানুষ কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি দ্রুত ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। এবার বোধহয় চোখের পানি বাধ মানল না। আবার দ্রুত ফিরে এসে দেখি সিঁড়ির আর একটা তক্তা সরাতে বাকী।

জাহাজের প্রথম শ্রেণীর সামনে ডেকচেয়ারে বসে লামচরির দিকে নিস্পলক চোখে তাকিয়ে রইলাম। এক সময়ে বাতাসের পরশে চোখের পানি শুকিয়ে গেল। লামচরির মোড় ঘোরার সময় জাহাজের শেষ ভোঁ বেজে উঠলো। দীর্ঘদিনের স্মৃতিময় কর্মক্ষেত্র বরিশাল একসময় চোখের আড়ালে চলে গেলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরিশাল থেকে বৈষয়িক দিক দিয়ে খালি হাতে ফিরলাম। পদোন্নতি এবং অর্থ কোনটাই হলো না। কিন্তু অজস্র মানুষের ভালোবাসাও ছেড়ে এলাম। কীর্তনখোলা নদী, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, চারিদিকের সবুজ রূপ কোনটাই আর মনকে সান্ত্বনা দিল না। হঠাৎ অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে-প্রবাসে'র কথা মনে পড়ল। 'ল্যুভ' মিউজিয়মে কত অপূর্ব সুন্দর ছবি দেখলেন, 'মোনালিসা'কে হার মানায়! কিন্তু ট্রেনে ইটালীর দিকে আসার সময় লেখকের মন থেকে সব ছবি অপসৃত হয়ে শুধু 'মোনালিসা' চিরভাস্বর হয়ে রইল।

আমার মন থেকে সব ব্যথা দূর হয়ে গেলো। আমি কি পাইনি? একজন সুবর্ণকান্তি রূপবান মানুষ আর তাঁর পাশে দাঁড়ানো, বৃষ্টি-বাদলায় ছুটে আসা — কালো পাথরে খোদাই করা শালপ্রাংশু দেহ, মাইকেলাঞ্জেলোর 'মোজেস'। মনে হলো, জীবনের সবচেয়ে বড় সঞ্চয় কাজী গোলাম কাদির আর তাঁর হাত বেয়ে পাওয়া আরজ আলী মাতুব্বর।

কাজী গোলাম কাদির সাহেবদের মতো বন্ধুদের প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়। কিন্তু মাতুব্বরের মতো বন্ধু — বাংলার ফসল প্রান্তরের ফসল।

বেশ ক'দিন থেকে মন খারাপ। কাজী সাহেব, মাতুব্বর সাহেবকে ছেড়ে আসার বেদনা — নতুন কর্মক্ষেত্রে মনের উড়ু-উড়ু ভাব। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বিভাগ থেকে টেলিফোন পেলাম -- বরিশাল থেকে আমার একজন আত্মীয় এসেছেন। গিয়ে দেখি মাতুব্বর সাহেব। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি করে এলেন? বললেন, বাসের হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে। বাসায় নিয়ে এলাম। বিভাগের সহকর্মীরা আদর-আপ্যায়ন করেছিলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল, এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার পিতৃদেব। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুতেই ঘুম পাড়াতে পারলাম না। তিনি দিনে ঘুমোন না। শ্রমিক মানুষ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ঘুমোন। কথা আর ফুরোয় না।

ঢাকা শহরে এলে, অন্তত তিনদিনের জন্য এলে — একদিন আমার এখানে কাটান। এলে আমার ইজিচেয়ারে জোর করে বসিয়ে দিয়ে পাখা ছেড়ে দেই। প্রথমে চা-নাস্তা, পরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা — নদীর গতি পরিবর্তন, আবহাওয়ার ওপর তার প্রভাব, বন্যার পরিণাম, কেন বন্যার পর পলি পড়লে ফসল ভালো হয়, পলিতে কি গুণ থাকে, প্রতি বছর একই সময় ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা হয় না কেন, গ্রহ-নক্ষত্রের গতিধারার বৈলক্ষণ্য কোন প্রভাব ফেলে কি না, এক এক এলাকায় মাটির গুণের তারতম্য কেন — তিনি বিশদভাবে সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে বলতেন — আমি যে সব কথা বলছি, তা সব আমার কথা নয়। অমুক অমুক বইতে পাবেন। আবদুল জব্বারের 'খ-গোল পরিচয়' থেকে শুরু করে, আল-মূতীর লেখা, আবদুল হালিমের বৈজ্ঞানিক রচনাবলী, এমনকি শাহজাহান তপনের প্রবন্ধাবলীও মাতুব্বর সাহেবের জ্ঞানসীমানায় বিরাজ করতো। দুরূহ বিষয়গুলোকে অপূর্ব সহজ ভঙ্গিমায় অবলীলাক্রমে বর্ণনা করতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। মাঝে মাঝে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের ডেকে আনতাম। তাঁদের অনেকেই মাতুব্বর সাহেবের ভক্ত হয়ে ওঠেন। এঁদের অনেককে মাতুব্বর সাহেব বই উপহার দেন। তাঁরাও বাংলা লেখায় বিজ্ঞানের বা ধর্ম-দর্শনের বই তাঁকে উপহার হিসাবে প্রদান করেন। একবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি বক্তা হিসাবে আগত অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলাপ হয়। অধ্যাপক রায় তাঁর সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাপ করে মুগ্ধ হন। তাঁরা পরস্পরকে নিজেদের লেখা বই উপহার দেন।

দর্শনের যে কোন বিষয় সম্পর্কে সহজ–সরল ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের বরিশাল ছাড়ার মাস চারেক আগে রামকৃষ্ণ মিশনের সচিব, আমার প্রিয় ছাত্র মাণিকলাল চ্যাটার্জী গোটা বিশেক বইসহ একখানা আমন্ত্রণলিপি আমার নামে বাসায় রেখে যান। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমাকে প্রধান বক্তা করা হয়েছে। সম্ভবত প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণ এবং অবসরপ্রাপ্ত স্বামী অক্ষরানন্দ। বিশেষ অতিথি কলকাতা বেলুড় মঠের তরুণ স্বামী প্রেমানন্দ। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। উপনিষদ, বেদান্ত বা চার্বাক দর্শনের কিছুই জানি না। ভরসা মানিকলালের দেয়া বই আর কাজী গোলাম কাদির সাহেব। স্যারের কাছে সব খোলাসা করে বলাতে তিনি বললেন, এ আর এমন কি? এক মাস সময় হাতে আছে। বই পড়ুন আর সন্ধ্যার সময় হোস্টেল সুপারের অফিসে আসুন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বুঝিয়ে দেবোখন।

কাজী সাহেব আমাকে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে বোঝাতে লাগলেন। স্যার যত বোঝান, আমি তত অবুঝ হয়ে পড়ি। কতগুলো ভারী ভারী দার্শনিক শব্দ এবং উপমা আমার মস্তিষ্কের ভেতর কৈ মাছের মতো অবাধে বিচরণ করতে লাগল। তিনি মাঝে মাঝে পরীক্ষা নিলে আমি অবধারিতভাবে ফেল মারতে শুরু করলাম। পরে লজ্জা-শরমের তাড়নায় স্যারের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। এর মধ্যে একদিন দুপুরে মাতুব্বর সাহেব এসে হাজির। খাওয়া–দাওয়ার পর নানা কথার ঝুলি খুলে দিলাম। কথায় কথায় আমার দার্শনিক সংকটের কথা বললাম। তিনি অত্যন্ত সহজ–সরল ভাষায় দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন, কালী দর্শন, উপনিষদ কি, বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে বিবেকানন্দের জীবন দর্শনের সম্পর্ক কি, তিনি পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব কেন গ্রহণ করলেন ইত্যাদি বোঝাতে লাগলেন। শঙ্কর রামানুজের বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যার সঙ্গে বিবেকানন্দের ব্যাখ্যার পার্থক্য কোথায় — এটাও সংক্ষেপে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। আমি তাঁর কথা শুনতে শুনতে কাগজে নোট নিতে লাগলাম।

সেই সময়ের জন্যে আমি আমার প্রয়োজনমাফিক উপাদান পেয়ে গেলাম। কাজী সাহেব মাঝে মাঝে প্রশ্ন করলে আমি 'গুডবয়ে'র মতো উত্তর দিতে লাগলাম। কাজী সাহেব খুশী হয়ে বলতেন, বাহ্ এই তো পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। আসল গোমর কি ফাঁক করা যায়?

বক্তৃতা দেয়ার সেই শুভক্ষণটি এলো। মঞ্চের মাঝখানে বসলাম। ডানদিকে বৃদ্ধ স্বামী, বামদিকে তরুণ স্বামী। আমার পোষাক এবং চেহারার জন্য স্বামীদ্বয় বিরসবদন। তাঁদের গেরুয়া বসন। মাঝখানে আমার অবস্থা যৌতুকবিহীন পাত্রীর মতো। একজন স্বামী পরলোকগত। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসে জীবিত স্বামীদ্বয়কে নিয়ে মনে হলো সংকটে পড়লাম।

সে যাক, অবশেষে সভাপতি শ্রদ্ধাভাজন জয়ন্ত দাশগুপ্ত আমাকে বক্তৃতা দেয়ার জন্য মাইকের সামনে আহ্বান করলেন। সভাপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বোধন করে বললাম, আমার প্রিয় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে আজকে মঠে বন্দী করা হয়েছে — তিনি তো মঠের সন্ন্যাসী নন, তিনি মাঠের সন্ন্যাসী। বলেই তাঁর জীবনদর্শন, বিশ্বমানবতার প্রতি আহ্বান, শিকাগোর বক্তৃতার উদ্ধৃতি ইত্যাদি বর্ণনা করে প্রায় একঘণ্টা বক্তৃতা করলাম। স্বামী দু'জন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। একজন বেলুড় মঠে আমন্ত্রণ জানালেন। আমার যৌতুক দেয়া হয়ে গেলো বুঝি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসায় সারারাত ঘুমের মধ্যেও চোখে ভেসে উঠল আরজ আলী মাতুব্বরের চেহারা। কাজী সাহেব অত্যন্ত উচ্চমার্গ থেকে বলতেন বলে মানসিক প্রস্তুতি না থাকার কারণে তাঁকে বুঝে উঠতাম না। আর মাতুব্বর সাহেব কঠিন বিষয়কে সহজ করে বলার অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর বলার ভঙ্গি, চলার ভঙ্গি এবং লেখার ভঙ্গি তাঁর জীবনাচরণের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

আরজ আলী মাতুব্বর সাহেব মৃত্যুর দু'মাস আগেও আমার বাসায় এসেছিলেন। তাঁর শরীর এবং চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, মাতুব্বর সাহেব, আপনাকে বড্ড দুর্বল দেখাচ্ছে। একা চলাফেরা না করে সঙ্গে কাউকে নেবেন।

উত্তরে তিনি বললেন, একটু দুর্বলতা বোধ করছি, কিন্তু মনোবল হারাইনি।

অনেকের মতো আমি নিজেও নিজেকে বার বার প্রশ্ন করেছি। দীর্ঘ বিশ বছর যাবত তিনি আমার কাছে আসতে সমান আকর্ষণ বোধ করেছেন। দু'জনের বয়সের পার্থক্য দুস্তর। তবু পরস্পরের কাছে মনের ভাব প্রকাশে অসুবিধা হয়নি। আমরা দু'জনেই বয়স এবং শিক্ষা-দীক্ষার অভিমান ভুলে গিয়েছিলাম।

তিনি দশটি সন্তানের জনক ছিলেন। তবুও মনে হয় আরেকটি সন্তানের ক্ষুধা তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে লুকিয়ে ছিল। যে সন্তানের কাছে তিনি তাঁর অপরিসীম বৈদগ্ধকে উন্মোচিত করতে পারেন।

আমি মাতুব্বর সাহেবের একাদশ সন্তান ছিলাম।

উনিশশ' বিরাশি সালে আমার মায়ের মৃত্যুর পর আমার বাবা আমার সঙ্গে থাকতেন। বাবার জীবন সংগ্রামমুখর। তাঁর বাবার মৃত্যু হয় তাঁর দাদার বর্তমানে। সুতরাং ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক বাবা এবং দুই নাবালক ভাই 'লা-মোরম' অর্থাৎ দাদার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। সুতরাং সর্বহারা বিধবা মা এবং দু'টি ভাইকে বাঁচানোর জন্যে বাবা দূর সম্পর্কের এক সারেং আত্মীয়ের হাত ধরে কলকাতার খিদিরপুরে গিয়ে জাহাজে চাকুরীর নলী (Nully) করেন। নলী এক রকমের 'সারভিস বুক'। তখন তাঁর বয়স আঠার বছর। স্থানীয় স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ তখন মন্থরগতি হয়ে এসেছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীতে অনেক লোকের দরকার। সুতরাং বাবার চাকুরী তাড়াতাড়ি হয়ে গেলো। বেতন মাসে সতের টাকা, খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড় সবই বিনি পয়সায়। এত বড় সফলতায় বাবার শুভাকাঙ্ক্ষীরা সুখী, বাকীরা বেজার। বাবা এসব গল্প রসিয়ে রসিয়ে বলতেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর বাবা বিদেশী জাহাজে চাকুরী করেছেন। সারা পৃথিবীর সবগুলো সামুদ্রিক বন্দর স্পর্শ করেছেন। সঙ্গে থাকতো একখানা বিশ্ব ইতিহাস, মোটা একখানা ভূগোল, আর বড় আকারের একখানা ভূচিত্রাবলী। সারা পৃথিবীর মানচিত্র বাবার নখদর্পণে। বাবা ছোটবেলায় আমাকে বলশেভিক বিপ্লবের ইতিহাস শোনাতেন। কিভাবে একটি দেশ পুরনো ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলে শ্রমিকরাজ কায়েম করে কত কম সময়ে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে। বাবা স্টীমারে ভ্লাডিভোস্টক পর্যন্ত গিয়েছিলেন। বলেছেন, সারা বছর বন্দরটি বরফে ঢাকা থাকে। বরফ কাটা জাহাজে কত কত বন্দরে তাঁদের জাহাজ নিয়ে প্রবেশ করতে হয়েছে। মানবজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যক্ষ ফসল নিজের চোখে দেখে এসে স্বদেশবাসীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূঢ়তা নিয়ে আফসোস করতেন। বলতেন, এদেশকে জাগাতে হলে দেশের মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে গণশিক্ষা দিতে হবে এবং ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানচর্চা করতে হবে। বাবার কাছে দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাহিনী শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতাম।

বাবা সিলেটের আলতাফ আলী আর ডা. মালিকের নেতৃত্বে জাহাজী শ্রমিকের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে পুলিশের হাতে নাজেহাল হয়েছিলেন। বাড়ীতে এসে ছয়-সাত মাস চাষ আবাদের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। আবার ডাক এলে জাহাজে চলে যেতেন। আমার কৃষক-শ্রমিক বাবার জন্য আমি এখনো গৌরববোধ করি। জীবনে কারো কাছে তিনি হাত পাতেননি। বিধবা মা আর দুটি নাবালক ভাইকে নিয়ে নিজের ভাগ্য নিজে গড়েছেন, জায়গা-জমি যা খরিদ করেছেন -- সবই তিন ভাইয়ের নামে। আমাকে আর আমার একমাত্র ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বার বার সাবধান করে দিয়েছেন। শিক্ষিত লোকদের কুসংস্কার সমাজের বেশী ক্ষতি করে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

আরজ আলী মাতুব্বরের চেহারা এবং চিন্তা-চেতনার মধ্যে আমি আমার বাবার প্রতিচ্ছবি দেখতাম।

অবসর গ্রহণ করার পর আমার বাবা কেমন যেন বদলে গেলেন। গ্রামে থাকতে থাকতে কুসংস্কারের বেড়িতে আটকা পড়ে গেলেন। বাবা আগে যা বলতেন, এখন ঠিক তার বিপরীত কাজ করতে লাগলেন। আকাশের মতো বিশাল এবং মহাসমুদ্রের মতো গভীরহৃদয় বাবা ক্রমে ক্রমে সংকুচিত হয়ে নোয়াখালীর অন্তর্গত রামগঞ্জ এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লেন। বুঝতে দেরী হলোনা, মহাসমুদ্রের তিমি ডাঙায় আটকা পড়েছে। তাগা-তাবিজ-তুমার এবং ঝাড়ফুঁকে একটু একটু বিশ্বাস করেন। হাতে তসবি এবং পাঞ্জেগানা নামাজ পড়েন। আজকাল ছেলে-পিলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শেরেকি কাজকর্মে লিপ্ত বলে অভিযোগ করেন। যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হলে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনেছেন বলে গৌরববোধ করতেন, নজরুলের গান তাঁর স্বকণ্ঠে শুনেছেন বলে বর্ণনা করেছেন, সেই বাবা ওই সব হিন্দুয়ানী কবি নিয়ে বাড়াবাড়ি করা অপছন্দ করতে শুরু করলেন।

বুঝলাম, আমার বাবা হারিয়ে গেছেন।

বরিশাল থেকে ঢাকা এসে, সময়ে সময়ে বাসের হাতল ধরে, সাভারে আমার বাসায় আসেন একজন অশীতিপর বৃদ্ধ। আত্মীয়-স্বজন নন — এমনকি একজন প্রাক্তন সহকর্মীও নন। স্বাভাবিকভাবে আমার বাবার মনে প্রশ্ন জাগে, লোকটি কে? একদিন জিজ্ঞেস করাতে, আমতা আমতা করে বললাম, তিনি বরিশালের একজন কৃষিজীবী। শহর থেকে ছয়-সাত মাইল দূরে থাকেন। মনে হল, বাবার মন থেকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব গেল না। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সঙ্গে খাতির হলো কেমন করে?

আর কোনরূপ রাখঢাক না করে মাতুব্বর সাহেবের সঙ্গে আমার সম্পর্কের পটভূমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলাম। তাঁর জীবন ও মনন সম্পর্কে ধারণা দিলাম তাঁকে। বললাম, বাবা, তাঁর দুইখানা প্রধান গ্রন্থ থেকে আপনাকে পড়ে শোনাই? অনুমতি পেয়ে 'সত্যের সন্ধান' ও 'সৃষ্টি-রহস্য' থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ পড়ে শোনাতে লাগলাম। বাবা মুগ্ধ হয়ে শুনলেন। একসময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ দুটো ছানাবড়া করে বললেন, •একজন শিক্ষাদীক্ষাহীন কৃষক এমন লেখা লিখলো?

আমি বললাম, মাতুব্বর সাহেব স্বশিক্ষিত ব্যক্তি। দীর্ঘ সত্তর বছর নিজে নিজে লেখাপড়া করে চারখানা বই লিখেছেন।

আমাকে আদেশের স্বরে বাবা বললেন, তোমাকে একটা কথা বলি, লোকটির সব কথার সঙ্গে সবাই হয়ত একমত হবে না, কিন্তু তাঁর কথার মধ্যে চিন্তা আছে, দর্শন আছে। রবীন্দ্রনাথ স্কুলে যাননি, নজরুল তোমাদের মতো এম. এ. পাশ করেননি, তবু তাঁদের সম্মান কত ওপরে!

আবার বললেন, গ্রাম্য কৃষক বলে অবহেলা করবে না। এতদূর থেকে অন্তরের টানে তোমার কাছে আসেন। তিনি বড়মাপের মানুষ। এমনিতেই মুসলমান সমাজে চিন্তাশীল মানুষের অভাব।

আনন্দে আমার মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, মনে হলো অনেক দিন পর আমার হারানো বাবাকে এক ঝলকের জন্য পুনরায় আবিষ্কার করলাম।

একদিন দুপুরে বাসায় ফিরে দেখি বাবা এবং আরজ আলী মাতুব্বর সাহেব পাশাপাশি বসে আলাপ করছেন। দু'জনের আলোচনা বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। উভয়ের চেহারা দেখে আমার তাই মনে হলো।

দুপুরে খেতে বসার সময়ও দু'জন পাশাপাশি বসলেন। আমার বাবা অতি আন্তরিকতার সঙ্গে মাতুব্বর সাহেবের পাতে তরকারী তুলে দিচ্ছেন। খাওয়া শেষে বাবা বললেন, আপনি তো কিছুই খান না। নিন, দুধটুকু দিয়ে কলা মেখে আরেক মুঠ ভাত খান।

আমি মুচকি হাসলাম। আমার এই হাসির অর্থ দু'জনের কেউই জানলেন না। হঠাৎ মনে হলো, আমার চোখের সামনে আমার দু'জন বাবা বসে আছেন।

আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা হামিদা কাওসার সবসময় তাঁকে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ আপনজনের মতো গ্রহণ করতেন। তাঁর সেবা এবং যত্নের কোন সময় বিন্দুমাত্র ত্রুটি হতোনা। আমাদের বাসায় কাজী গোলাম কাদির সাহেবেরও একই রকম অভ্যর্থনা হতো। আমার পরিবার-পরিজন সবার কাছে এঁরা দু'জন শুধুমাত্র বহিরাগত অতিথি হিসাবে পরিগণিত হতেন না। দীর্ঘ বিশ বছরের সম্পর্কে কখনো ছেদ পড়েনি। কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়নি। মতান্তর ছিল বহু বিষয়ে, কিন্তু মনান্তর হয়নি মুহূর্তের জন্যও।

মাতুব্বর সাহেব একদিন অসুস্থ অধ্যক্ষ সাঈদুর রহমান সাহেবকে দেখতে গেলেন। সঙ্গে আমি। প্রথমে বাড়ীতে ঢুকতে দেয়া হয়নি। ডাক্তারের নিষেধ। পরে যখন খবর দেয়া হলো, আরজ আলী মাতুব্বর সাহেব এসেছেন সঙ্গে একজন বন্ধুকে নিয়ে — সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেলো। মাতুব্বর সাহেবকে কাছে পেয়ে ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে কথার অর্গল খুলে দিলেন। কিছুক্ষণ পর মাতুব্বর সাহেব আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অধ্যক্ষ সাঈদুর রহমান সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার বাড়ীতে ঢুকতে ভয় করলো না?

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে তিনি বললেন, আমার বাড়ীর নাম 'সংশয়'। এ বাড়ীতে আসতে অনেকেই ভয় করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, স্যার, আপনার বাড়ীতে ঢুকতে আমার একটুও ভয় করেনি। কারণ যাঁর সঙ্গে এসেছি তিনি আমার কাছে 'সংশয়াতীত' ব্যক্তি।

মাতুব্বর সাহেব মুচকি হেসে বললেন, এই অধ্যাপক শামসুল হকের কথা একদিন আপনাকে বলেছিলাম।

অধ্যক্ষ সাহেব স্মরণ করার চেষ্টা করে পরে বললেন, আপনি এর পর একা যখন খুশী আসবেন। আমি বললাম, 'আপনি' বললে আসব না। আমি আপনার ছেলের বয়সী।

বললেন, সংশয়ের অর্থ বোঝ? সংশয় হলো সব জ্ঞানের উৎস। আবার এসো — বলেই হাতের ওপর হাত রেখে আদর করে দিলেন।

আর কোন দিন অধ্যক্ষ সাঈদুর রহমান সাহেবের বাড়ীতে যাওয়ার সৌভাগ্য হলো না। আরজ আলী সাহেবকে একদিন বললাম, সাঈদুর রহমান সাহেবের সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কেমন করে?

তিনি বললেন, সে অনেক কথা। আমি অনুরোধ করলাম সংক্ষেপে বলার জন্য। মাতুব্বর সাহেব বলতে লাগলেন, সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে অথবা ষাট দশকের প্রথম দিকে মুলাদী যাচ্ছিলাম — জমি মাপার জন্য। দুই পার্টির মধ্যে এক চোট মারপিট হয়ে গেছে। আরেক চোট খুনাখুনির পর্যায়ে যাবার আগে আমার কথা মনে পড়েছে। উভয় তরফের আহ্বানে আমি চেইন আর কাগজ কলম নিয়ে নৌকাযোগে রওনা হলাম। নৌকার মধ্যে দেখলাম এক ভদ্রলোক একখানা বই পড়ছেন, নাম 'মানবমনের আযাদী'। লেখক বিখ্যাত যৌনবিজ্ঞানী আবুল হাসনাত। আমি তাঁর কাছ থেকে বইখানির ঠিকানা এবং প্রাপ্তিস্থান লিখে নিলাম।

বাড়ীতে ফিরে কয়েকদিন পর বইখানি যোগাড় করলাম। এই বইখানি আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। ঠিক করলাম, তোপখানার ঠিকানায় হাসনাত সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আমার 'সত্যের সন্ধান' বইখানির পাণ্ডুলিপি পড়তে দেবো।

মাতুব্বর সাহেব ঢাকা গিয়ে নিজে আর হাসনাত সাহেবের বাসায় গেলেন না। ডি.আই.টি.-তে কর্মরত পুত্র খালেককে হাসনাত সাহেবের বাসায় পাণ্ডুলিপিসহ পাঠালেন। খালেক অতি সংকোচের সঙ্গে তাঁর পিতার আকর্ষণহীন খাতায় লিখিত 'সত্যের সন্ধান' বইখানি হাসনাত সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। গ্রামের 'অশিক্ষিত' একজন কৃষকের লেখা হাসনাত সাহেবকে খুব বেশী আগ্রহী করে তুলতে পারল না। শুধু বললেন, কয়েকদিন পর এসে খবর নিও।

খালেক বলেছিলেন, আমার বাবা আপনার বই পড়েছেন এবং আপনার মতামত তাঁকে নাড়া দিয়েছে। তাতেও হাসনাত সাহেব আগ্রহী হলেন কিনা বোঝা গেলো না।

কয়েক সপ্তাহ পর খালেক আবার তাঁর বাবার লেখা সম্পর্কে খোঁজ নিতে গেলেন। আবুল হাসনাত সাহেব তখনও পাণ্ডুলিপিটি ছুঁয়ে দেখেননি।

খালেকের মলিন মুখ দেখে সম্ভবত হাসনাত সাহেবের সহানুভূতি হলো। বললেন, আগামীকাল বিকেলে এসো, দেখে রাখবো।

আরজ আলী সাহেব আমাকে বললেন, হাসনাত সাহেব প্রথম পরিচয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লেখাটি আপনার নিজের? কি কাজ করেন?

মাতুব্বর সাহেব জবাবে বললেন যে, লেখাটি তাঁর নিজ হাতের এবং তিনি একজন কৃষক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল হাসনাত সাহেব প্রসঙ্গক্রমে বললেন, আপনার বইটির কয়েক পাতা পড়ার পর শেষ হওয়া পর্যন্ত পায়চারি করে পড়েছি। আমার সঙ্গে চলুন, আমাদের একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেবো। আপনার লেখার যেখানে যেখানে দাগ দিয়েছি — সেই অংশগুলো পড়ে শোনাবেন।

মাতুব্বর সাহেবকে তিনি কোথায় এক বিরাট ড্রইংরুমে নিয়ে গেলেন তাঁর মনে পড়ে না। অনেক জ্ঞানী-গুণী উপবিষ্ট। সেই মলিনবেশ গ্রামের কৃষককে নিয়ে হাসনাত সাহেব তাঁদের 'মিলন সংঘের ঘরোয়া আলোচনা অনুষ্ঠানে যখন প্রবেশ করলেন, সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আরজ আলী মাতুব্বর ভয় পেয়ে গেলেন।

হাসনাত সাহেব সবাইকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, আজ আমাদের নির্ধারিত আলোচ্যসূচী বাদ দিয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং বিস্ময়কর বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। আমি সঙ্গে করে যে ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছি, তিনি বরিশাল শহরের কাছে লামচরি গ্রামের একজন সাধারণ কৃষক। নিজের প্রচেষ্টায় তিনি প্রায় চল্লিশ বছর লেখাপড়া করে একখানা বই লিখেছেন। বইয়ের নাম রেখেছেন 'সত্যের সন্ধান'। আরজ আলী মাতুব্বর স্বশিক্ষিত ব্যক্তি। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। মাতুব্বর সাহেব, আপনি আপনার বইয়ের অংশবিশেষ সবাইকে পড়ে শোনান।

মাতুব্বর সাহেব তাঁর আকর্ষণীয় কণ্ঠে, বরিশালের আঞ্চলিক উচ্চারণে 'সত্যের সন্ধান' পড়তে লাগলেন। সমস্ত ড্রইংরুম মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর গ্রন্থপাঠ শুনতে লাগলেন। পাঠ শেষ করে তিনি বসে পড়লেন। কারো মুখে কথা নেই। হঠাৎ সবাই উঠে এসে তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করে প্রস্তাব করলেন মাতুব্বর সাহেব 'মিলন সংঘের' অবৈতনিক সদস্য হবেন। এবং প্রতি সভার আগে তাঁকে চিঠি লেখা হবে। তিনি এক একবার এক একজনের অতিথি হয়ে ঢাকা শহরে অবস্থান করবেন। এভাবে তিনি অনেকের মতো অধ্যক্ষ সাঈদুর রহমানেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠেন। তখনকার সামাজিক পরিবেশে তাঁরা প্রত্যেকেই মাতুব্বর সাহেবকে বই ছাপতে নিষেধ করেছিলেন।

AMARBOI.COM

অধ্যক্ষ সাঈদুর রহমান সাহেব ও আবুল হাসনাত সাহেব ছাড়া শিল্পী আবুল কাসেম ও তৎকালীন পাবলিক সার্ভিস কমিশন চেয়ারম্যান বারী মালিকের সঙ্গেও মাতুব্বর সাহেবের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মিলন সংঘের সভা করে বরিশাল ফিরে তাঁর বন্ধুদের সম্বন্ধে আমাদের কাছে গল্প করতেন।

আরজ আলী মাতুব্বর সাহেবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘ বিশ বছরের। এই সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। আমার কোন আত্মীয়ের সঙ্গেও এত দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠতা ছিলনা। একই রকমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদিরের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গেও আমার শেষ দেখা হয় তাঁর মৃত্যুর একমাস আগে, তাঁর মেঝো কন্যার লালমাটিয়ার বাসায়। দুপুরে কাজী সাহেব সহ শেষ খাওয়া হয় এম. এ. নূর সাহেবের বাসায়।

মৃত্যুর এক বছর আগে থেকে মাতুব্বর সাহেব কিভাবে একটি পাঠাগার করবেন, স্থানীয় মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেবেন, নিজের চোখ দুটো দান করবেন এবং দেহখানি শারীরবিদ্যা শেখার জন্য মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের জন্য রেখে যাবেন ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতেন। তাঁর জীবনের ষাট বছর পর্যন্ত যা কিছু উপার্জন করেছেন, তা উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যাবেন। ষাট বছর বয়সের পর যা আয় করেছেন, তার সবটুকু জনহিতকর কাজে ব্যয় করার জন্যে বরিশালের ডেপুটি কমিশনারকে চেয়ারম্যান করে একটি ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে দিয়ে যাবেন। মাতুব্বর সাহেব তাঁর কথামত কাজ করে গেছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে পাঠাগারের গুরুত্ব যে কোন অংশে কম নয়, তা তিনি একাধিকবার ব্যক্ত করে গেছেন। সেই জন্য তিনি কোন স্কুল প্রতিষ্ঠা না করে পাঠাগার নির্মাণ করে গেছেন। পাঠাগারই তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞানচর্চার উৎস। তাই তাঁর পাঠাগারের প্রতি অপরিসীম দুর্বলতা ছিল।

জীবনে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করে গেছেন। তা ধরে রাখতে পারিনি। তখন তো ভাবতে পারিনি, একদিন আমাকে তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতে হবে।

তিনি বলতেন, 'সত্যের সন্ধান' দিয়ে আমি কুসংস্কারের ডালপালা ছেঁটে দিয়েছি। আর 'সৃষ্টি-রহস্য' দিয়ে কুসংস্কারের মূলশুদ্ধ উপড়ে দিয়েছি।

তাঁর সঙ্গে আমার কোনদিন মনান্তর হয়নি, কিন্তু মাঝে মাঝে মতান্তর হয়েছে। আমি বলতাম, আপনি যে সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক সমাজ কল্পনা করছেন, তা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। একটা সমাজ বা দেশের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে তার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক রূপরেখা।

মাতুব্বর সাহেব বলতেন, একটা দেশের সমাজ অশিক্ষা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হলে সে দেশের রাজনীতিও স্বচ্ছ হবে।

মাতুব্বর সাহেব জিততে পারেন নি। বিশিষ্ট কথাশিল্পী হাসনাত আবদুল হাই সাহেবের অসাধারণ উপন্যাস 'একজন আরজ আলী'তে এই চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। চরমোনাইর পীর সাহেবের সঙ্গে তাঁর ভক্তদের কথোপকথন স্মরণ করলে পাঠক সমস্ত ব্যাপারটি সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

কুসংস্কার-অশিক্ষায় 'লামচরি' গ্রামখানি ছোট ; কিন্তু সত্যসন্ধানী আরজ আলী মাতুব্বর অনেক বড়। বিগত বছরগুলোতে 'লামচরি' গ্রামখানি বড় হতে হতে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল গিলে ফেলেছে। এখন আরজ আলী মাতুব্বরের মতো একজন যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত সত্য ও বিজ্ঞানপ্রেমী মানবতাবাদীর বড়ই প্রয়োজন।

মুহম্মদ শামসুল হক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবেদন

আমাদের সমাজটা কেমন? কী তার বৈশিষ্ট্য, কেমন তার চরিত্র? কতটা সে মানবিক?

সমাজ নিরীক্ষণে উৎসুক এমন যে কেউ উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তরে স্বস্তিবোধ জ্ঞাপক উত্তর যে মেলে ধরবেন না, নিশ্চিত করেই তা বলা যায়। সমাজটা মানব কল্যাণমুখী নয়। জীবনের সুস্থ বিকাশের পথ দেখাতে সে অপারগ। প্রতারণার কলাকৌশলে তার সর্বাঙ্গ সুসজ্জিত। দমনমূলক কানুনের নিগড়ে সে শৃঙ্খলিত। তার যাবতীয় বিধিব্যবস্থা মানুষের কল্যাণবিমুখ। সর্বহিতকর ব্যবস্থা এখানে স্থবির। সমাজের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের জন্য ভরসা জোগায় না। মানবিক বোধ বুদ্ধি বিবেক এখানে অনুপস্থিত। মানবতা এখানে লাঞ্ছিত হয়। মানবিক চেতনা পরিচর্যা পায় না, হয় না বিকশিত। বরং প্রবলভাবে নৈতিকতাহীনতার চর্চা হয়। অকল্যাণ উপাদানগুলো বিস্তারলাভ করে। মানবীয় সুকুমার বৃত্তি কোণঠাসা হয়ে বিপর্যস্ত হয়। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, মূর্খতা, মূঢ়তা, অন্ধকার মানুষকে বিপজ্জনকভাবে গ্রাস করে আছে। জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধানের দ্বার অর্গল আঁটা। অধিকাংশ মানুষ প্রশ্নহীন, জিজ্ঞাসাবিমুখ। জন্ম-জন্ম পরম্পরায় পাওয়া মূল্যবোধ নিয়েই সন্তুষ্ট। একেই চূড়ান্ত ধন-জ্ঞান ভেবে চিন্তাকে সীমাবদ্ধ রাখে।

একটি সমাজের অধিকাংশ মানুষ যদি চিন্তায় স্থবির হয়, হয় জিজ্ঞাসাবিমুখ, তাহলে নিশ্চিত তার সামগ্রিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে অচলায়তনে পরিণত হওয়া। সামাজিক এই ভয়াবহতার মাঝেও অনেকে থাকেন, যারা আপনার তাগিদে একাগ্রচিত্তে জ্ঞানসাধনা করেন। সত্যাসত্য নিরূপণে সচেষ্ট হন। আপনার অন্তরলোককে আলোকিত করে পুনরায় তা ছড়িয়ে দিতে মনোনিবেশ করেন। মানুষের মধ্যে বিবেক উন্মোচনে, জিজ্ঞাসু মন পরিগঠনে এগিয়ে আসেন।

এমন মানুষের একজন আরজ আলী মাতুব্বর। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বর্তমান বিভাগীয় শহর বরিশালের এক প্রত্যন্ত এলাকায় তাঁর জন্ম।

খুব অল্প বয়সে আরজের বাবা মারা যান। একমাত্র সন্তান হিসেবে আরজ মার স্নেহে সাহচর্যে অভিভাবকত্বে বড় হতে থাকেন। আর্থিক দৈন্যে জমিজমা বিক্রী হয়ে নিঃশেষ হতে হতে এক সময় ঋণের দায়ে ভিটেমাটি পর্যন্ত নিলাম হয়ে যায়। আরজের মা অন্যের বাড়ি কাজ করে সংসার চালান। ছেলের ইচ্ছা লেখাপড়া করার। অন্ততঃ বই কেনারও সামর্থ নেই যার সে আবার লেখাপড়া করে কিভাবে? গ্রামের একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি তাকে বই কিনে দেন। ভর্তি হন স্থানীয় মক্তবে। লেখাপড়া শুরু হয়। কিন্তু এক-দেড় বছর পরই বন্ধ হয়ে যায় মক্তবটি। সে সাথে বন্ধ হয়ে যায় আরজের লেখাপড়াও। তবে বর্ণ পরিচয়, বানান ফলা ইত্যাদি আয়ত্ত হয়। এরপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষিশ্রমের পাশাপাশি লেখাপড়া চলতে থাকে প্রবল উৎসাহে; অতিশয় নিষ্ঠার সাথে। পুঁথি, লোক কাহিনী, স্থানীয় ছাত্রদের বই, বরিশাল শহরের বিভিন্ন লাইব্রেরীর বই যেখানে যেমন পেয়েছেন একটানা পড়ে গেছেন। ইতিমধ্যে লেখালেখি শুরু করেছেন, শুরুটা হয়েছে কবিতা দিয়ে। মার মৃত্যুর ঘটনা তার মননে ভয়ানক আলোড়ন তোলে। তিনি হয়ে ওঠেন দ্রোহী, সামাজিক সংস্কার, যুক্তি, বুদ্ধিহীনতার বিরুদ্ধে আপনার চিন্তা-চেতনাকে সংহত করে জিজ্ঞাসা জাল বিস্তার ঘটাতে থাকেন। জিজ্ঞাসায় জর্জরিত করতে থাকেন সমাজে চলমান সনাতনী মূল্যবোধকে। আমৃত্যু এই প্রক্রিয়ায় মগ্ন থেকে মুক্তবুদ্ধি, মুক্তচিন্তা চর্চার এক অনন্য সাধারণ বিরল দিগন্ত উন্মোচন করে গেছেন আরজ আলী মাতুব্বর।

আরজ আলী মাতুব্বর কলম ধরেছেন। লেখা শুরু করেছেন সমিল কবিতা দিয়ে। ত্রিশের দশকের প্রথম থেকে (১৯৩৬—'৪০) তাঁর লেখালেখির হাতেখড়ি। বেশকিছু সমিল কবিতা রচনা করেছেন এসময়। প্রাত্যহিক জীবন, উপদেশ, প্রকৃতি এগুলো ছিলো তাঁর কবিতার উপজীব্য বিষয়। জীবনের প্রতি প্রেম এবং যাপিত জীবনকে শুদ্ধ করার প্রেরণা রয়েছে, জীবনকে সুন্দর সৎ করার তাগিদ রয়েছে। এছাড়া কবিতা রচনায় আরেকটি প্রক্রিয়া লক্ষ্যণীয়। অল্প কিছুকালের জন্য তিনি স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করেছিলেন। ক্লাসে তাঁর ছাত্রদের এক একজনের নাম দিয়ে অসাধারণ অর্থবোধক কবিতা লিখেছেন। কোনো কবিতার প্রতি ছত্রের প্রথম শব্দটি জোড়া দিলে একজনের নাম হয়ে গেল। কোনটিতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শব্দ। এভাবে নাম ও কবিতা নিয়ে চমৎকার ক্রিড়ানৈপূণ্য প্রদর্শন করেছেন। এর দু'একটি নমুনা এখানে উল্লেখ করা যায়।

বংশের মঙ্গল হেতু কড়ি কর দান
গ্রামের মঙ্গল হেতু দাও বংশ মান
সর্বস্ব করিবে ত্যাগ দেশের কারণ
জগতের জন্য কর মৃত্যুকে বরণ।
[ত্যাগ]

অথবা,

হাতে মুখে কাজে যেন থাকে এক যোগ
সহসা না হয় যেন কটুভাষী রোগ
মন দিয়া লেখাপড়া করিও যতনে
তৎপর থাকিও মাতা-পিতার বচনে
আদরে তুমিও তব প্রিয় বন্ধু জনে
লিখিত বচনগুলি রেখ সদা মনে।

'উপদেশ' শিরোনামের ওপরোক্ত কবিতাটি আবদুল হামেদ মোল্লার পুত্র তার ছাত্র হাসমত আলিকে উদ্দেশ্য করে লেখা। উল্লেখ্য কবিতার প্রতিটি চরণের প্রথম অক্ষর পাশাপাশি সাজালে হাসমত আলি নাম মিলে যায়।

জীবনের প্রাথমিক পর্বে এই সৃজনীকর্মে তাঁর মেধার পরিচয় মেলে। এরও আগে দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার বইছে তখন তিনি স্থির করলেন তাঁতশিল্প গড়ে কাপড় বুননের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেনও তাই। কাঠে পেরেক ঠুকে ঠুকে একজোড়া তাঁত বানিয়ে ফেললেন। তাতে কাপড় বোনাও চললো বেশ কিছুদিন।

স্থানীয় জমিদারের বন্ধু পূর্বাঞ্চলীয় রেলের বড় কর্তা এক বিলেতী সাহেব। সাহেব জমিদার বাড়িতে বেড়াতে আসবেন। ঘর ও আশপাশটা সজ্জার দায়িত্ব পড়লো আরজ আলীর ওপর। কারণ লোকমুখে প্রচলিত আরজ আলী ছবি আঁকতে লিখতে এটাসেটা বানাতে পারে।

আরজ আলী ঘরের সাজসজ্জায় পাশাপাশি কেরোসিন তেল চালিত একটি পাখাও বানিয়ে দিলেন। ঘরের বাইরে থাকলো সুইচ। সুইচ টিপলে দিব্যি পাখা ঘোরে। শ্বেতাঙ্গ বিলিতি সাহেব তো বিস্মিত! কি করে, কার দ্বারা এটা সম্ভব হলো? আরজ আলীর পরিচয় পেয়ে সাহেব ঠিকই বুঝেছিলেন জিনিয়াস, গোবরের পঙ্কে প্রস্ফুটিত এক পদ্মফুল। তিনি আরজকে কলকাতায় নিয়ে প্রযুক্তিবিদ্যা পড়াবেন ঠিক করলেন। পরে অবশ্য আরজের কলকাতা যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কলকাতায় রওনা দেবার ঠিক আগের দিন মারা যান তার মা। ফলে যাত্রা স্থগিত। প্রযুক্তিবিদ্যা রপ্ত করতে গেলে হয়তো তার জীবন প্রবাহ বইতো ভিন্ন ধারায়, ভিন্ন গতিতে।

কলের লাঙ্গল, কলের নৌকা (কেরোসিন চালিত) ইত্যাদিও তৈরী করেছিলেন তিনি। বৈজ্ঞানিক অনেক খুঁটিনাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। যখন যা ভেবেছেন, মনে হয়েছে তা-ই বাস্তবায়নে ব্রতী হয়েছেন। এমনিতর বিবিধমুখী প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তার জীবনের প্রথম পর্বে। পরবর্তীতে যা সংহত হয়েছে জীবন দর্শনে। জীবনাচরণের নানাবিধ তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণাকে তিনি গোছগাছ করে তাঁর রচনাবলিতে স্থান দিয়েছেন। মানব মনের প্রবৃত্তিগুলোকে বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বয়ে জারিত করে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেছেন। লেখক হবার বাসনায় বা তাতে খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেননি কখনো। মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা চর্চা যা বিজ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর হবে, সেই পথে গেছেন তিনি। মানুষের চিন্তার জগতকে প্রসারিত ও জিজ্ঞাসু মনোভাবকে ছড়িয়ে দেবার আয়োজন থেকেই তার লেখক হবার প্রক্রিয়া অব্যাহত থেকেছে।

AMARBOI.COM

দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে সুপ্রচুর লেখাপড়া করেছেন। এসব বিষয়ে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন এক সময়। পাণ্ডিত্য অর্জন বলতে যা বোঝায় তা হয়েছিল তার। কিন্তু পাণ্ডিত্য ফলাননি কখনো।

তার লেখা রচনাগুলো দেখলে লক্ষ্য করা যাবে অধিকাংশ বিষয় অনেকটা বিতর্কের আকারে উত্থাপন করেছেন। বিভিন্ন তত্ত্ব ও মত বিশ্লেষণ করেছেন। যা থেকে সঠিক যুক্তিগ্রাহ্য বিজ্ঞানভিত্তিক মতটি আহরণ করতে পাঠকের কোনো বেগ পেতে হয় না। ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। কারিকুরি নেই কোনো। দেশের গরিষ্ঠভাগ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষ অনুধাবনে সক্ষম এমন সাদামাটা বৈঠকি কথ্য উপাদানে রচনাশৈলি নির্মিত। ভাষা বা ভাষাশৈলিতে সুনিপুণভাবে তার দখলদারিত্ব অর্জন হয়েছিল কিনা তা আমরা জানি না, জানার প্রয়োজনও নেই। তবে না হলে তা অধিকার যে খুব কষ্টসাধ্য হতো তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু দেশের অধিক সংখ্যক মানুষ যারা সংস্কারে, অন্ধ আবেগে, অজ্ঞানতা লালন করে জীবন নির্বাহ করে তাদের জন্য সরল কথনে তিনি লেখনি চালিয়ে গেছেন।

আরজ আলী মাতুব্বর ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মের লৌকিক বিশ্বাস এবং যুক্তিবর্জিত উপাদান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে বিস্তর প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন মানবতাহীন আবেগপ্রসূত, আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব ধর্মীয় বিধিবিধানকে। আবদ্ধ চিন্তার অনেকেই এতে সংশয় প্রকাশ করেছেন, আরজ আলী কী ধর্মীয় উপলব্ধিতে আঘাত হানতে চেয়েছেন? তিনি কী মানুষের ধর্মবোধ দুর্বল করার প্রয়াস পেয়েছেন? তিনি কী ধর্মের কোমল অনুভূতিকে হেয় করতে সচেষ্ট হয়েছেন? ধর্ম যদি মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন হয়, মূল উপাদান যদি মানবতা সম্মত হয় তবে তাকে তিনি উর্ধ্বেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই মূলের পরিপার্শ্বে জমে ওঠা বাহুল্যকে সর্বতোভাবেই নাকচ করেছেন। মানবতার ধর্মকে তিনি সমুজ্জ্বল করতে চেয়েছেন। যুক্তি ও মননের আলোকে এবং মানবতার দৃষ্টিভঙ্গিতে যাবতীয় মতামত গ্রহণ ও বর্জনে পক্ষপাতিত্ব করেছেন।

সৎ ও সহজ জীবনাচরণের অধিকারী আরজ আলী মাতুব্বর সাদামাটা আটপৌরে জীবনযাপন করতেন। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে বাহুল্যের কণামাত্র ছিল না। সততার ঘাটতি ছিল না একবিন্দুও জীবনের কোনো পর্যায়ে। তার মতের সাথে দ্বিমত পোষণকারী ব্যক্তিও তাঁর সততায় মুগ্ধ হয়েছেন; তার সত্যবাদিতায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। আমিন পেশায় নিয়োজিত থাকাকালে তাঁর দর্শনের ঘোরতর বিরুদ্ধবাদি চরমোনাই–এর পীর সাহেব তাকে ডেকে নিয়েছিলেন। পীর সাহেবের জমিজিরেত সূক্ষ্মভাবে মাপার জন্য আরজ আলীকেই উপযুক্ত লোক মনে করেছিলেন। আর একটি ঘটনা। তাঁর বাড়ী থেকে বরিশাল শহর প্রায় ৩ কিলোমিটারের মত পথ। যাতায়াত করতেন নৌকায় চেপে। সপ্তাহের অধিকাংশ দিন শহরে যেতেন লাইব্রেরীতে পড়াশোনা বা সমমনা লোকজনের সাথে আলাপ আলোচনার জন্য। সপ্তাহে পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজন মাঝি আমজাদ আলীর নৌকায় আসা যাওয়া চলতো। একারণে মাঝি তার যাবার বা ফেরার সময়ে কিছুটা সময় দেখে নিত তিনি আসেন কিনা। একদিন মাঝিটি তার নৌকা ঘাটে ভিড়িয়ে সন্ধ্যে গেলেও অপেক্ষা করছে তার জন্য। তিনি এলেন হন্তদন্ত হয়ে। নৌকায় চড়ে বললেন, আজ যেতে হবে কিন্তু একটিও পয়সা নেই। বাকিতে নিয়ে যাবে? মাঝি সাগ্রহে সম্মতি দিলে উঠে বসলেন তিনি। বাড়ি ফিরে পড়াশোনায় মগ্ন হন। রাত দুটোর দিকে মনে পড়ে তার মাঝির পাওনার কথা। হ্যারিকেন জ্বেলে নাতিকে (ফরিদ) ঘুম থেকে উঠিয়ে সঙ্গে নিয়ে গেলেন ৩ কিলোমিটার দূরবর্তী মাঝির বাড়ী। ভুলে গেছলেন বলে বারবার ক্ষমা চাইলেন। মাঝি তো বিস্ময়ে হতবাক। ব্যক্তিগত সততার এমন বহু ঘটনার কথা জানা যায় তার সম্পর্কে। আদর্শের সাথে, চিন্তার সাথে জীবনযাপনের এমন সম্মিলন অনন্য সাধারণ। আরজ আলী সেই জীবন আয়ত্ত করেছিলেন।

মার মৃত্যু পরবর্তী ঘটনা আরজ আলী মাতুব্বরের মননে প্রবল নাড়া দেয়; সজোরে ঘা দেয় চৈতন্যে। এই ঘটনার পরই তিনি স্থির সংকল্প হন সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারে গোঁড়ামী দূর করতে আজীবন লড়াই করে যাবেন। না, সে লড়াই হাতিয়ার নিয়ে নয়। বিবেক, বুদ্ধি দিয়ে যুক্তির তোড়ে অন্ধ আবেগকে আঁধারের কালিমাকে ম্লান করে সত্যের আলোর উদ্ভাসন ঘটাবেন। বিভিন্নমুখী প্রচুর পড়াশোনা ও সে সাথে লেখনী হাতে নিলেন। রচনা করলেন বেশ কিছু প্রশ্ন সম্বলিত প্রথম পাণ্ডুলিপি 'সত্যের সন্ধান'। এটি নিয়ে কোর্টকাচারি হয়ে শেষ পর্যন্ত কোর্টের রায় মেনে নিয়ে প্রায় দেড় দশক কাল নিষ্ক্রিয় থাকতে হয় তাকে। পড়াশোনা, তথ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুতি নিতে থাকেন এ সময়। দেশ স্বাধীন হবার পর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবার পর পুনরায় লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। এবার একটানা লিখেই যেতে থাকেন। আমৃত্যু এই অন্যতম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধনায় নিয়োজিত থেকে বেশ ক'খানা পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন। দর্শন, প্রধানত ধর্ম দর্শন সম্পর্কেই অধিকাংশ রচনা, বেশিরভাগ পাণ্ডুলিপি।

আমরা ইতিমধ্যে প্রায়-দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিগুলো বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করে রচনাবলি আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই। একজন ব্যক্তি পুরুষকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করতে তাঁর সমগ্র রচনা পাঠের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। আরজ আলী মাতুব্বরের মানস ও দর্শন উপলব্ধির জন্য তাঁর রচনা সমগ্রের সাথে পরিচিত হওয়াটা জরুরী। আমরা এই উপলব্ধি থেকে তিন খণ্ডে তাঁর রচনাসমূহকে বিভাজন করে আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র-এর প্রথম খণ্ডে কয়েকটি প্রকাশিত ও কয়েকখানি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সবমিলিয়ে পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ৮। প্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে রয়েছে সত্যের সন্ধান, অনুমান ও স্মরণিকা এবং অপ্রকাশিতের মধ্যে বেদ-এর অবদান, না-বুঝের প্রশ্ন, ভাবি প্রশ্ন, টুকিটাকি ও আমার জীবন দর্শন। উল্লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলোর পাশাপাশি থাকছে আরজ আলী মাতুব্বরের ডায়েরীর কয়েকটি পাতা, হস্তলিপি এবং কিছু আলোকচিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত। বর্তমান খণ্ডে — পূর্বমুদ্রিত দুটো বই-এ ব্যবহৃত লেখকের স্বঅঙ্কিত প্রচ্ছদ ডিজাইন বইয়ের শুরুতে রাখা হয়েছে। না-বুঝের প্রশ্ন ও ভাবি প্রশ্ন এ দুটো রচনা লেখকের প্রাথমিক পর্যায়ে উত্থাপিত কেবল কতিপয় প্রশ্নের সন্নিবেশ। ধারণা হয়, পরবর্তীতে এগুলো বিস্তৃতাকারে সঙ্কলিত করে সত্যের সন্ধান, সৃষ্টি-রহস্য ইত্যাদি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। আমার জীবন দর্শন শীর্ষক রচনাটি সম্ভবত তিনি পরিপূর্ণ করে যেতে পারেননি, পাঁচটি বিষয়ে রচনাটি সম্পূর্ণ করার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু লিখতে পেরেছেন তিনটি বিষয়ে। আমরা অসম্পূর্ণতা মেনে তিনটি লেখাই রাখছি।

রচনা সমগ্র'র দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে — সৃষ্টি-রহস্য, ম্যাকগ্লেসান চুলা, সীজের ফুল, কৃষকের ভাগ্য গ্রহ ও ১৭টি ভাষণ প্রভৃতি পাণ্ডুলিপি। তৃতীয় ও শেষ খণ্ডে থাকবে ভিখারীর আত্মকাহিনী, অধ্যয়ন সার, জীবন বাণী, সরল ক্ষেত্রফল ও কয়েকটি সাক্ষাৎকার।

সত্যের সন্ধান তাঁর প্রথম প্রকাশিত পুস্তক। পুস্তকটির মূল খসড়া করেছিলেন ১৩৫৯ সালে। তখন কেবল প্রশ্নাকারে বিষয়গুলো উত্থাপন করেছিলেন, স্ববিস্তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তৈরী করেননি, এ ব্যাপারে কোর্ট কাচারী মামলা ইত্যাদি যা হয়েছিলো অনেক স্থানেই তার উল্লেখ পাওয়া যাবে। এখানে আর তার উল্লেখের প্রয়োজন মনে করছিনা। এই প্রশ্নগুলোতেই পরবর্তীতে ব্যাখ্যা তর্ক সংযোজন করে সত্যের সন্ধান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। সত্যের সন্ধান পুস্তকে প্রচুর প্রশ্ন আছে। মূলত সেগুলো ধর্মভিত্তিক, বর্তমানকালে প্রচলিত সবগুলো ধর্মের বয়স কমপক্ষে সহস্রাধিক বছর। দীর্ঘ কাল পরিক্রমায় বেয়ে আসা প্রতিটি ধর্মের সাথে অধর্মীয় উপাদান সংযোজিত হয়েছে। বস্তুত যা সংস্কারের পর্যায়ভুক্ত। প্রায় প্রতিটি ধর্মই যেহেতু অন্ধ আনুগত্য শেখায় তাই মূলানুগ বর্জিত উপাদানগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলার কথা ভাবেন খুব কম লোক। লেখেন আরও কম। আরজ আলী মাতুব্বর যা ভেবেছেন, যা মনে এসেছে তা-ই অত্যন্ত সাবলিল যুক্তিতর্কে তুলে ধরেছেন এ পুস্তকে। অবাস্তব অলীক কার্যকারণহীন কাহিনীগুলোকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করে গেছেন। তবে সচেতনভাবেই কোনো সিদ্ধান্ত টানেননি। তা সত্ত্বেও যুক্তিবাদী মুক্তচিন্তার যে কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠক অতি সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হতে পারবেন। গ্রহণ-বর্জন নির্ণয় করতে পারবেন। বিশ্লেষিত বিষয়গুলো যথাক্রমে আত্মা, ঈশ্বর, পরকাল, ধর্ম ইত্যাদি। ধর্মের বাইরে প্রকৃতি বিষয়ক একটি অধ্যায়ও রয়েছে এ বইতে। যা সরাসরি ধর্ম সম্বন্ধীয় না হলেও বিষয়গুলো ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে ওতোপ্রোত সম্পর্কিত। অর্থাৎ ধর্মের আলোকে প্রকৃতির নানা ঘটনার যে মত প্রচলিত তা নিয়ে আলোচনা।

হিন্দু ও ইসলাম ধর্মীয় ৬টি বিষয়কে ঘিরে রচিত গ্রন্থ অনুমান। এগুলো যথাক্রমে রাবণের প্রতিভা, ফেরাউনের কীর্তি, ভগবানের মৃত্যু, আধুনিক দেবতত্ত্ব, মেয়ারাজ ও শয়তানের জবানবন্দি। প্রচুর হাস্যরসের যোগান দিয়ে বিষয়গুলোর অবতারণা করা হয়েছে কাহিনী আকারে। লেখক বলেছেন, "পৌরাণিক কতকগুলি কাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বহুক্ষেত্রে অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন কাহিনীকারগণ তাদের দলীয় স্বার্থের কারণেই। যে সমস্ত কাহিনীর বাস্তবরূপ অনুধাবন করার একমাত্র উপায় অনুমান। আর তারই সামান্য চেষ্টা করা হয়েছে এ পুস্তিকাখানার মাধ্যমেই।" অনুমানভুক্ত কাহিনীগুলো পড়তে কৌতুক অনুভূত হয়, রস সঞ্চারের আয়োজনের জন্য উপভোগ করা যায়। কিন্তু এক পর্যায়ে মননে নাড়া লাগে, বাস্তব তথ্যটি বলা হয় যখন সুকৌশলে।

আরজ আলী মাতুব্বর প্রতিষ্ঠিত যে লাইব্রেরীটি, এর উদ্বোধন বা প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতা, লাইব্রেরীর সম্পদ, লাইব্রেরী পরিচালনা বিধি, বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদানের নিয়ম-নীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের সঙ্কলন স্মরণিকা পুস্তক। আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী কেন, কোন উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে, লাইব্রেরী তৈরীর তাড়না অনুভব করলেন ইত্যাদি বিষয় বিবৃত করেছেন এ সঙ্কলন পুস্তকে। ব্যক্তিগত ব্যবহার্য ও সংগৃহীত জিনিসপত্র যা তিনি লাইব্রেরীর সম্পদ বলে বিবেচনা করেছেন, সেগুলোর খুঁটিনাটি তালিকা ছাড়াও দানপত্র, ঋণপত্র, অছিয়তনামা ইত্যাদি মুদ্রিত হয়েছে স্মরণিকায়। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা রয়েছে সঙ্কলনের শেষভাগে। আরজ আলী মাতুব্বর জীবদ্দশায় উইল করে তাঁর চক্ষুদ্বয় এবং শরীরখানি দান করেছিলেন মানব কল্যাণে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে। দেহদানের কৈফিয়ত দিয়েছেন তিনি, 'কেনো আমার মৃতদেহ মেডিকেলে দান করছি' শিরোনামের লেখায়। যা নিয়ে মানব কল্যাণকামী সকল মানুষের ভাববার অবকাশ রয়েছে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ বেদ। অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে জানা যায়, একক পুরুষ বা মহাপুরুষ অথবা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক তা রচিত। কিন্তু একমাত্র বেদ যার রচনা শুরু হয় আজ থেকে পায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এবং সর্বমোট ২১৪ জন মুনিঋষি এর রচয়িতা। ঋষিদের ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণা অভিজ্ঞতা এবং কল্পনায় রচিত শ্লোকের সমষ্টি বেদ। অন্য সবগুলো ধর্মগ্রন্থের চেয়ে বেদ সবচেয়ে পুরনো। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এই গ্রন্থে শ্লোকের আকারে লিপিবদ্ধ বাণীসমূহ মানব জীবনের জন্য কল্যাণকর বলে বিবেচিত। আরজ আলী মাতুব্বর 'বেদ-এর অবদান' শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়টি দেখতে সচেষ্ট হয়েছেন। পাশাপাশি গ্রন্থটি (বেদ) যে ভগবান সৃষ্ট নয়, মনুষ্য সমাজের জন্য মানুষই এর রচিয়তা তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

না-বুঝের প্রশ্ন এবং ভাবী প্রশ্ন নামীয় দুটি পাণ্ডুলিপি আমরা এ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করেছি। বস্তুত এ দুটি প্রশ্নের সঙ্কলন সত্যের সন্ধান গ্রন্থটি রচনার প্রাথমিক প্রস্তুতি বলে অনুমান করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন সময় তাঁর ভেতরে উত্থিত বিভিন্ন প্রশ্নগুলোকে লিপিবদ্ধ করে পরবর্তীতে তা না-বুঝের প্রশ্ন ও ভাবী প্রশ্ন শিরোনামযুক্ত করেছেন। আরো পরে এই প্রশ্নগুলোকে বিন্যস্ত করে এবং তার সাথে আপনার ব্যাখ্যা যুক্ত করে সত্যের সন্ধান এর রচনা সমাপ্ত করেন।

বাজী, বোমা, কার্তুজ, পটকা ইত্যাদি তৈরির ফরমূলা সম্বলিত একটি লেখার নাম 'টুকিটাকি'। ১৪ প্রকার বিস্ফোরণ তৈরির উপকরণ ও পরিমাণ যার কয়েকটি একজন চীনা আতসকরের নিকট হতে এবং অবশিষ্টগুলো একটি পুরনো দৈনিক হতে সংগ্রহ করেছিলেন লেখক। কি ভেবে তিনি এই লেখাটি তৈরি করেছিলেন তা আমরা জানি না। আমরা তাঁর রচনার এটি একটি অংশ বলে বাদ দিই নি এ লেখাটি। যতদূর জানা যায়, আরজ আলী মাতুব্বর শেষ জীবনে 'আমার জীবন দর্শন' শিরোনামে একটি বিস্তৃত পরিসরের রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন নিজেকে। জীবন ও সমাজ এবং এ দুইয়ের সম্পর্কিত ৫টি বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা বোধ সঞ্জাত রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ বিষয়গুলো যথাক্রমে জীবন, সমাজ, দর্শন ও ধর্ম। কিন্তু শেষাবধি তিনি ৩টি বিষয়ে, অর্থাৎ জগৎ, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে নিজ অভিমত লিপিবদ্ধ করে যেতে পেরেছেন। অর্থাৎ জগৎ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা, জীবন সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা এবং সমাজ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই তিনটি লেখার সমন্বয়ে অসম্পূর্ণ আমার জীবন দর্শন পাণ্ডুলিপিটি শেষ হয়েছে। বাকী দুটো বিষয়ে লেখা সমাপ্ত করতে পারলে নিঃসন্দেহে একটা মূল্যবান সংযোজন হতো। কিন্তু জীবন আয়ু তাতে অন্তরায় হয়েছে। এই অতৃপ্তি পাঠককে পীড়া দেবে নিশ্চয়ই।

একজন মৌলিক চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হিসেবে আরজ আলী মাতুব্বর যে স্বীকৃতি, সম্মান ও মর্যাদা পাবার কথা বলাবাহুল্য তা পাননি। সমাজ তাকে পীড়ন করেছে, দিয়েছে কেবল যন্ত্রণা। একদল তাকে দেখেছে সন্দেহের চোখে। আরজ আলী মাতুব্বর নামের আড়ালে ভিন্ন কেউ তার বক্তব্য প্রকাশ করছেন কিনা সে প্রশ্ন উঠেছে। হয়তো ছদ্মনামধারী কেউ সত্যের সন্ধান ও সৃষ্টি-রহস্য বই দু'খানি লিখেছেন। তৎকালীন সরকারের শিক্ষা বিভাগের একজন পদস্থ কর্মকর্তা তো আরজ আলীকে তার বাসায় ডেকে নিয়ে রীতিমত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছিলেন। এ ঘটনা সম্পর্কে মাতুব্বর এক স্থানে লিখেছেন, রাজধানীর বুদ্ধিজীবী মহলের অনেকেই বই দুখানা আমার বলে স্বীকার করতে চাননি। তাঁরা অনেকেই বলেছেন যে পল্লীবাসী কৃষকরা নিরক্ষর হলেও সাধারণত ভালোমানুষ এবং বেশিরভাগই ঈমান ধনে ধনী। তাদের মধ্যে এমন আনাড়ি লোক ও তার এ সমস্ত দান থাকা অসম্ভব। এ বই নিশ্চয়ই কোনো বুদ্ধিজীবীর লেখা। হয়তো তিনি ধুরন্ধরী করে নাম দিয়েছেন একজন কৃষকের। বই দুখানা লেখা আমার পক্ষে সম্ভব কি-না তা যাচাই করবার জন্য প্রাক্তন ডি, পি, আই জনাব ফেরদাউস খান তো তাঁর ধানমণ্ডির বাসায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে রীতিমত পরীক্ষাই নিলেন ৩. ১. ৭৬ তারিখে। পরীক্ষাকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন জনাব আ. ন. ম এনামুল হক এবং চিত্রশিল্পী কাজী আবুল কাসেম সাহেব।

সংশয়াচ্ছন্ন এই বুদ্ধিজীবীদের আশ্বস্ত করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থেকেই এগিয়ে এসেছেন কেউ কেউ। ধরেছেন তারা কলম। লিখেছেন প্রবন্ধ। আরজ আলীর পক্ষে। না, কেউ নাম ভাঁড়িয়ে নয়, আরজ আলী মাতুব্বরই স্বনামে লিখেছেন। রাজধানীর বাইরে বসে আপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে অর্জিত বোধ ও উপলব্ধির উপাদানগুলো নিভৃতে বুনে চলেছেন ক্রমাগত সাধনায়। এঁদের একজন বিশিষ্ট প্রগতিশীল প্রাবন্ধিক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এ বিষয়ে প্রথম লিখলেন একটি দৈনিকে 'কল্পিত নাম নয়, ছদ্মনাম নয় কারো। আরজ আলী মাতুব্বরের নিবাস বরিশাল। তাঁর বইতে যে বই তিনি লিখেছেন অনেক যত্নে ছাপিয়েছেন বিস্তর পরিশ্রমে।' বস্তুত আরজ আলীর জ্ঞান ও বোধের উচ্চতা নির্ণয় করতে পারেননি অনেকে। বুঝতে পারেননি তাঁর পরিবারের লোকজনও। তাঁর উচ্চতা ও বিস্তার এতটাই ব্যাপক যে তা আমাদের নাগালের অনেক দূরে। যতদূর জানা যায় তার জবানীতে ব্যক্ত হয়েছে যে, তার খুব নিকট জনদের দু এক জন তাকে বুঝতে, উচ্চতা মাপতে সমর্থ হয়েছিলেন। এঁদেরই তিনি বন্ধু বলে মনে করতেন। জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর চারখানি বই। এ বইগুলোতে তাঁর যে মৌলিক চিন্তা ও দর্শন প্রতিফলিত তাতে বিপুল মানুষের মনোযোগ কাড়ার দাবী রাখে। আরজ আলীর ক্ষেত্রে তা হয়নি। মনোযোগ কাড়েনি দর্শন ও অন্যান্য বিভাগের একাডেমিক পণ্ডিতদের। তাঁরা তথাকথিত অশিক্ষিত, চলনে-বলনে প্যারিপাট্যহীন একজন গ্রামীণ মানুষকে গ্রহণ করতে পারেন নি। মাতুব্বর এঁদের অনেকের নিকটই গেছেন। কথা বলতে চেয়েছেন। নিজের বই পড়তে দিয়েছেন। কিন্তু মাতুব্বরের ব্যাপারে এঁরা বরাবর নিস্পৃহ নিরাসক্ত থেকেছেন। বাংলা একাডেমীও এর বাইরে নয়। একাডেমীকে পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলেন তিনি প্রকাশের জন্য। কিন্তু তা দীর্ঘদিন পড়ে থেকে অবশেষে সম্ভবত তা ফেরত দেয়া হয়েছে। পত্র-পত্রিকা বা প্রকাশকরা আগ্রহ দেখাবার কারণ খুঁজে পায় নি। গুটিকয় পত্রিকায় লেখা হয়েছে তাকে নিয়ে তাও খুব সামান্যই। আর একজন মাত্র প্রকাশক, এক সময়ের নামী প্রকাশনা সংস্থা বর্ণমিছিলের কর্ণধার তাজুল ইসলাম সাহেব সৎসাহসে তাঁর একখানা পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেছেন, সৃষ্টি-রহস্য। জীবদ্দশায় ৩খানি এবং পরে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, এগুলোর প্রকাশক তিনি নিজে। নিজের অর্থব্যয়ে, পরিশ্রমে প্রকাশিত হয়েছে এ বইগুলো। যার যথাযথ বিতরণও সম্ভব হয় নি। এখনো সেগুলোর বেশকিছু কপি জরাজীর্ণ অবস্থায় বাণ্ডিল বাঁধা অস্পর্শিত অবস্থায় রয়ে গেছে। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলোর অবস্থাও একই রকম। অরক্ষিত কীটদংশিত অবস্থায় আমরা এগুলো উদ্ধার করেছি। সংরক্ষণের কোনো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। দু একটি পাণ্ডুলিপি অনেক খোঁজাখুজি করে কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ায় সন্ধান মিলেছে। লেখক মাতুব্বর অবশ্য বড় যত্নে ও মমতায় পাণ্ডুলিপিগুলো বাঁধাই করে ভিন্ন ভিন্ন ফাইলে তুলে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে আর যত্ন আত্তি পায়নি। এমন কি নেড়ে চেড়ে ধরে দেখাও হয় নি। এক একটি পাণ্ডুলিপির তিনি স্বহস্তে একাধিক কপি করে রেখেছিলেন বলে রক্ষা। নতুবা অনেক পাণ্ডুলিপিরই অনেক স্থানে পাঠোদ্ধার করা বেশ শক্ত ছিল। হদিশ মেলাও কঠিন ছিল অনেক পাণ্ডুলিপির। আরজ আলী মাতুব্বরের প্রায় সারা জীবনের স্বপ্ন ও সাধনার সম্পদ আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী। লাইব্রেরীতে সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা ১২০০। এগুলো সবই তিনি জীবদ্দশায় সংগ্রহ করেছিলেন। রচিত সকল পাণ্ডুলিপি ও যাবতীয় কাগজপত্র তিনি লাইব্রেরীতে বইগুলোর পাশে সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিলেন। অবহেলিত পাণ্ডুলিপিগুলো যেমন বইগুলোও একই দশা প্রাপ্ত হয়েছে। বইগুলোতে স্পর্শ পড়ে না। লাইব্রেরীর সংস্কার হয় না। পাঠকের পা পড়ে না। ধূলিমলিন লাইব্রেরীখানি হাহা করে কেবলি!

ভরসার কথা, সাম্প্রতিককালে বিপুল [illegible] মানুষের আগ্রহ প্রদর্শিত হচ্ছে আরজ আলীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারে। কৌতূহলী মানুষ খোঁজখবর করছেন, জানার চেষ্টা করছেন তাঁর দর্শন, তাঁর বিজ্ঞান জিজ্ঞাসাসমূহ। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত এই সম্পাদক লিখিত জীবনী গ্রন্থ এবং বিশিষ্ট কথাশিল্পী হাসনাত আব্দুল হাই লিখিত জীবনীভিত্তিক সুখপাঠ্য উপন্যাস এবং পূর্বোক্ত জীবনী গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠানের পর মানুষের কৌতূহল বেড়েছে। ইতিমধ্যে ঢাকায় আরজ অনুসারীদের উদ্যোগে আরজ স্মৃতি পরিষদ গঠিত হয়েছে। পরিষদ আরজ-দর্শন বিস্তারের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। আমরা যখন একটা পশ্চাদপদ মূল্যবোধের দ্বারা আক্রান্ত, সংস্কার-গোঁড়ামীর দ্বারা বিপন্ন, মানুষকে লড়াই করতে হচ্ছে এর বিরুদ্ধে এমন একটি অশুভ সময়ে আরজ আলী মাতুব্বরের প্রতি মানুষের মনোযোগ যতটাই নিবদ্ধ হবে ততটাই আমাদের সমাজের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। অন্ধদের আস্ফালন প্রতিরোধ করতে, আঁধারের কুটিল দুর্বৃত্তদের পরাস্ত করতে আরজের দর্শন আলোকবর্তিকা হয়ে কাজ করবে। বিজ্ঞানসিদ্ধ মুক্তচিন্তায় সাবলিল হয়ে সত্যের অনুসন্ধানে অনুবর্তী হতে আমাদের সমর্পিত হতেই হবে আরজের নিকট। এ সময় তাই আরজের প্রয়োজন বড় বেশী। আরজ আলী মাতুব্বরের চর্চা হওয়া প্রয়োজন মাত্রাতিরিক্ত মাত্রায়। অন্ধ আবিলতা দূর করে আলোকোজ্জ্বল পথের যাত্রী হতে শত সহস্র গুণ মনোযোগ ঝরে পড়ুক আরজ আলীর প্রতি — এ আমাদের কামনা।

AMARBOI.COM

রচনাবলি সঙ্কলনে ক্রমাগত সহায়তা ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন যাঁরা, পরম শ্রদ্ধায় তাদের স্মরণ করি। এঁদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক মুহা আনসারী, সরদার ফজলুল করিম, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হাসনাত আব্দুল হাই, আজিজ মেহের, অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হক, আসাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী নূর, আব্দুল খালেক মাতুব্বর, সোহরাব হোসেন সহ অনেকেই। নিরুৎসাহিত বা নিবৃত করারও চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। তারা কিন্তু একদা আরজ আলীর কাছাকাছি থাকতেন। আমার আত্মীজন শাহনাজ হোসেন রচনা সঙ্কলন ও নকল নবিশিতে সহায়তা করে কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন। ক্রমাগত তাগিদ দিয়ে নবীন প্রকাশক পাঠক সমাবেশ এর সাহিদুল ইসলাম বিজু পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সঙ্কলন ত্বরান্বিত করেছেন। ব্যবসায়ী ও বই ব্যবসায়ী তিনি। তদুপরি এমন অব্যবসায়িক এই বই প্রকাশের উদ্যোগ নেহায়েত তার দুর্বলতা ও রুচিশীলতার পরিচয় বহন করে। আমরা এঁদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা আরজ অনুরাগী অসংখ্য পাঠকদের নিকটও। যারা নিরন্তর আগ্রহ দেখিয়েছেন, খোঁজ-খবর নিয়েছেন। আরজ আলী রচনাবলি পাঠে পাঠকের চেতনা কিছুমাত্রও আলোকিত হলে, অগ্রগামী হলে মনে করবো আমাদের এ উদ্যোগ সাফল্য দেখলো।

আইয়ুব হোসেন
লালমাটিয়া
ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যের সন্ধান

রচনাকাল ১১. ৩. ১৩৫৯ — ২০. ৪. ১৩৫৯

প্রকাশকাল [প্রথম সংস্করণ] কার্তিক ১৩৮০

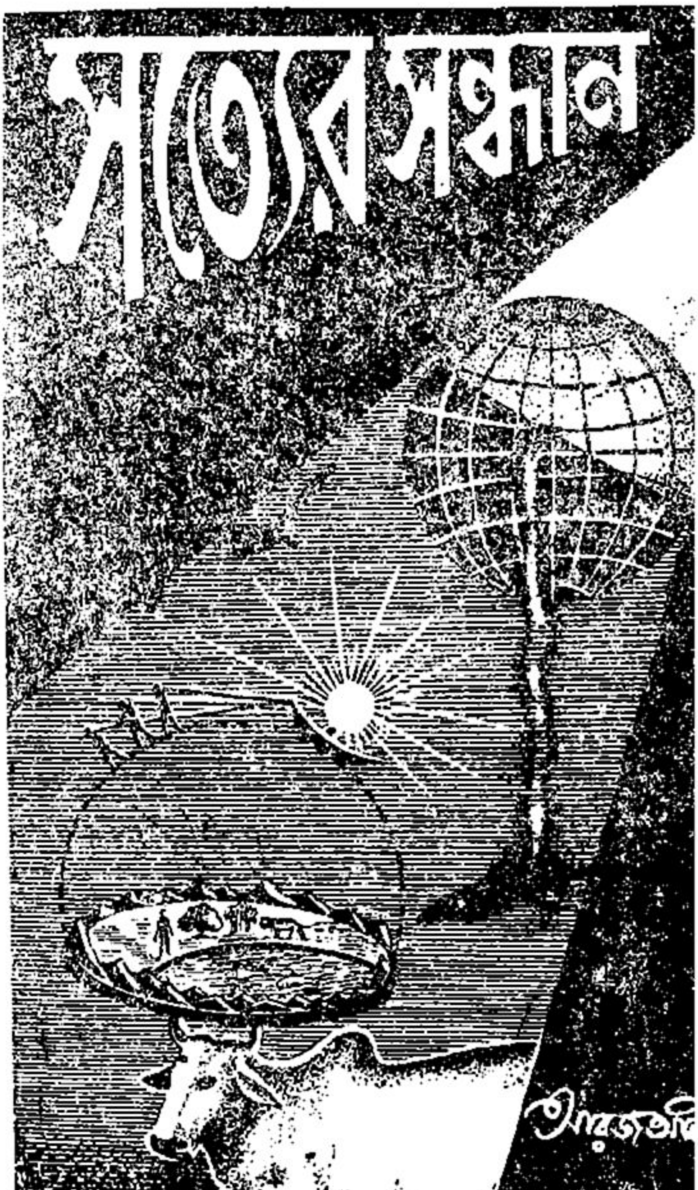

প্রচ্ছদশিল্পী গ্রন্থকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

'সত্যের সন্ধান' পুস্তিকাখানা প্রকাশিত হইলে ইহা সুধীমহলে সমাদৃত হয়, বহু পত্র-পত্রিকায় প্রশংসামূলক সমালোচনা হইতে থাকে এবং বইখানার জন্য বাংলাদেশ লেখক শিবির আমাকে 'হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করে [৮. ৫. ১৯৭৯]।

আশা ছিল যে, 'সত্যের সন্ধান' পুস্তিকাখানার দ্বিতীয় মুদ্রণ সম্ভব হইলে তাহাতে কিছু নতুন তত্ত্ব জানার জন্য কিছু নতুন প্রশ্ন পরিবেশন করিব, কিন্তু নানা কারণে তাহা আর সম্ভব হইল না। এই বইখানা প্রথম প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং বর্তমানেও হইতেছে — আমি আশা করি যে, আমার লিখিত 'মুক্তমন' নামীয় পুস্তকখানার 'ভূমিকা'-এ তাহা ব্যক্ত করিব। তবে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যাহা করা হইল, তাহার মধ্যে — 'ঈশ্বর কি দয়াময়?' শীর্ষক একটি প্রশ্ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ) সরদার ফজলুল করিম সাহেবের লিখিত (সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত) একটি অভিমত ছাড়া আর কিছুই উল্লেখযোগ্য নহে। কালোপযোগী পরিবর্তন করা গেল না সময়ের অভাবে।

'সত্যের সন্ধান' বইখানা প্রণয়নকালে ইহার একটি উপনাম দেওয়া হয় 'যুক্তিবাদ'। কিন্তু বর্তমানে সুধীমহল এ পুস্তিকাখানাকে 'দর্শন' শ্রেণীভুক্ত করায় ইহার উপনাম দেওয়া হইল 'লৌকিক দর্শন'।

বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে এ পুস্তিকাখানার পুনঃপ্রকাশ আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হইত না — ঢাকাস্থ বর্ণমিছিল প্রেসের অধিকারী তাজুল ইসলাম সাহেবের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া। আমি তাঁহার নিকট শুধু কৃতজ্ঞই নহি, অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী।

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০

আরজ আলী মাতুব্বর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এলোমেলোভাবে মনে যখন যে প্রশ্ন উদয় হইতেছিল, তখন তাহা লিখিয়া রাখিতেছিলাম, পুস্তক প্রণয়নের জন্য নহে, স্মরণার্থে। ওগুলি আমাকে ভাসাইতেছিল অকূল চিন্তা–সাগরে এবং আমি ভাসিয়া যাইতেছিলাম ধর্মজগতের বাহিরে।

১৩৫৮ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ। বরিশালের তদানীন্তন ল–ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও তব্‌লিগ জামাতের আমির জনাব এফ. করিম সাহেব আমাকে তাঁহার জামাতভুক্ত করার মানসে সদলে হঠাৎ তস্‌রিফ নিলেন আমার বাড়ীতে। তিনি আমাকে তাঁহার জামাতভুক্তির অনুরোধ জানাইলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, ধর্মজগতে এরূপ কতগুলি নীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি এবং ঘটনার বিবরণ প্রচলিত আছে, যাহা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নহে এবং ওগুলি দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এমনকি অনেকক্ষেত্রে বিপরীতও বটে। ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান এই তিনটি মতবাদের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে চিন্তা করিতে যাইয়া আমার মনে কতগুলি প্রশ্নের উদয় হইয়াছে এবং হইতেছে। আমি ঐগুলি সমাধানে অক্ষম হইয়া এক বিভ্রান্তির আঁধার কূপে নিমজ্জিত হইয়া আছি। আপনি আমার প্রশ্নগুলির সুষ্ঠু সমাধানপূর্বক আমাকে সেই বিভ্রান্তির আঁধার কূপ হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে আমি আপনার জামাতভুক্ত হইতে পারি। জনাব করিম সাহেব আমার প্রশ্নগুলি কি, তাহা জানিতে চাহিলে আমি আমার প্রশ্নের একখানা তালিকা (যাহা অত্র পুস্তকের 'সূচীপত্র' রূপে লিখিত আছে সেই রূপেই) তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তিনি উহা পাঠ করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন, আর বলিয়া গেলেন — "কিছুদিন বাদে এর জওয়াব পাবেন"।

করিম সাহেব চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে আমি পাইয়াছিলাম কম্যুনিজমের অপরাধে আসামী হিসাবে ফৌজদারী মামলার একখানা ওয়ারেন্ট, কিন্তু আমার প্রশ্নগুলির জবাব আজও পাই নাই।

করিম সাহেবকে প্রদত্ত তালিকার প্রশ্নের সহিত কোন ব্যাখ্যা ছিল না। ফৌজদারী মামলার জবাবদিহি করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে প্রশ্নগুলির কিছু ব্যাখ্যা লিখিতে হয়। সেই ব্যাখ্যা লিখাই হইল এই পুস্তক রচনার মূল উৎস। নির্দোষ প্রমাণে মামলা চূড়ান্ত হইলে ঐগুলিকে আমি পুস্তক আকারে গ্রথিত করিলাম। গ্রন্থনায় আমাকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা দান করিয়াছিল স্নেহাস্পদ মো. ইয়াছিন আলী সিকদার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যের সন্ধান

এই পুস্তকখানার সম্পাদনা সম্পর্কে নানাবিধ উপদেশ, ভ্রম সংশোধন, এলোমেলো প্রশ্নগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেব।

এই পুস্তকখানার সম্পাদনা শেষ হইয়াছিল বিগত [illegible] সালে। কিন্তু নানা কারণে এযাবত প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে ইহার কোন কোন অংশের কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া প্রকাশ করা হইল। বর্ধিত অংশের স্থানে সংশোধনের শ্রম স্বীকার করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মুহাম্মদ শামসুল হক সাহেব এবং প্রকাশনায় আর্থিক সাহায্যদান করিয়াছেন মাননীয় অধ্যাপক শরফুদ্দিন রেজা হাই সাহেব। উক্তকারণে সহযোগীদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

লামচরি, বরিশাল — বিনীত

২৩ শ্রাবণ, ১৩৮০ — গ্রন্থকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যের সন্ধান

[লৌকিক দর্শন]

সূচী

মূলকথা
[প্রশ্নের কারণ] ৫০

প্রশ্নাবলী

প্রথম প্রস্তাব
[আত্মা বিষয়ক] ৫৯

দ্বিতীয় প্রস্তাব
[ঈশ্বর বিষয়ক] ৬৩

তৃতীয় প্রস্তাব
[পরকাল বিষয়ক] ৭১

চতুর্থ প্রস্তাব
[ধর্ম বিষয়ক] ৭৮

পঞ্চম প্রস্তাব
[প্রকৃতি বিষয়ক] ১০৮

ষষ্ঠ প্রস্তাব
[বিবিধ] ১১৮

উপসংহার ১৩৫

টীকা ১৩৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূলকথা

[প্রশ্নের কারণ]

অজানাকে জানার স্পৃহা মানুষের চিরন্তন। বাক্যস্ফুরণ আরম্ভ হইলেই শিশু প্রশ্ন করিতে থাকে, এটি কি? ওটি কি? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে, কলেজে ও কাজে-কর্মে অনুরূপ প্রশ্ন চলিতে থাকে, এটি কি, ওটি কি, এরূপ কেন হইল, ওরূপ কেন হইল না ইত্যাদি। এই রকম 'কি' ও 'কেন'র অনুসন্ধান করিতে করিতেই মানুষ আজ গড়িয়া তুলিয়াছে বিজ্ঞানের অটল সৌধ।

প্রশ্নকর্তা সকল সময়ই জানিতে চায় — সত্য কি? সেই সত্যকে জানিতে পারিলে তাহার আর কোন প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু কোন সময় কোন কারণে কোন বিষয়ের সত্যতায় সন্দেহ জাগিলে উহা সম্পর্কে পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে থাকে।

কোন বিষয় বা কোন ঘটনা একাধিকরূপে সত্য হইতে পারে না। একটি ঘটনা যখন দুই রকম বর্ণিত হয়, তখন হয়ত উহার কোন একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা অথবা উভয়ই সমরূপ মিথ্যা ; উভয়ই যুগপৎ সত্য হইতে পারে না — হয়ত সত্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। এক ব্যক্তি যাহাকে 'সোনা' বলিল, অপর ব্যক্তি উহাকে বলিল 'পিতল'। এ ক্ষেত্রে বস্তুটি কি দুই রূপেই সত্য হইবে? কেহ বলিল যে, অমুক ঘটনা ১৫ই বৈশাখ ১২টায় ঘটিয়াছে ; আবার কেহ বলিল যে, উহা ১৬ই চৈত্র ৩টায়। এস্থলে উভয় বক্তাই কি সত্যবাদী? এমতাবস্থায় উহাদের কোন ব্যক্তির কথায়ই শ্রোতার বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। হয়ত কোন একজন ব্যক্তি উহাদের একজনের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিল, অনুরূপ অন্য এক ব্যক্তি অপরজনের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিল, অপরজন তাহা মিথ্যা বলিয়া ভাবিল। এইরূপে উহার সত্যাসত্য নিরূপণে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ঘটিল মতানৈক্য। আর এইরূপ মতানৈক্য হেতু ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ঘটিয়া থাকে নানারূপ ঝগড়া-কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এই রকম বিষয়বিশেষে ব্যক্তিগত মতানৈক্যের ন্যায় সমাজ বা রাষ্ট্রগত মতানৈক্যও আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ; যাহার পরিণতি সাম্প্রদায়িক কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহরূপে আজ আমরা চোখের উপরই দেখিতে পাইতেছি।

জগতে এমন অনেক বিষয় আছে, যে সব বিষয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক কথা বলে না। আবার ধর্মজগতেও মতানৈক্যের অন্ত নাই। যেখানে একই কালে দুইটি মত সত্য হইতে পারে না, সেখানে শতাধিক ধর্মে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচলিত শতাধিক মত সত্য হইবে কিরূপে? যদি বলা হয় যে, সত্য হইবে একটি ; তখন প্রশ্ন হইবে কোনটি এবং কেন? অর্থাৎ সত্যতা বিচারের মাপকাঠি (Criterion of truth) কি? সত্যতা প্রমাণের উপায় (Test of truth) কি এবং সত্যের রূপ (Nature of truth) কি?

আমরা ঐ সকল দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবিষ্ট হইব না, শুধু ধর্মজগতের মতানৈক্যের বিষয় সামান্য কিছু আলোচনা করিব।

আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানিতে পাইতেছি যে, বিশ্বমানবের সহজাত বৃত্তি বা 'স্বভাবধর্ম' একটি। এ সংসারে সকলেই চায় সুখে বাঁচিয়া থাকিতে, আহার-বিহার ও বংশরক্ষা করিতে, সন্তান-সন্ততির ভিতর দিয়া অমর হইতে। মানুষের এই স্বভাবধর্মরূপ মহাব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সংসারে সৃষ্টি হইল কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সমাজ, নীতি এবং রাষ্ট্র ; গড়িয়া উঠিল জ্ঞান-বিজ্ঞানময় এই দুনিয়া। মানুষ যেখানে যে কাজেই লিপ্ত থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, সে তাহার 'স্বভাবধর্ম' তথা 'স্বধর্ম' পালনে ব্রতী। এই মহাব্রত উদ্‌যাপনে কাহারো কোন প্ররোচনা নাই এবং এই ধর্ম পালনে মানুষের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই।

এই স্বভাবধর্মই মানুষের ধর্মের সবটুকু নয়। এমনকি 'ধর্ম' বলিতে প্রচলিত কথায় এই স্বভাবধর্মকে বুঝায় না। যদিও একথা স্বীকৃত হইয়া থাকে যে পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ এমনকি জল, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদিরও এক-একটি ধর্ম আছে, তথাচ বিশ্বমানবের ধর্ম বা 'মানবধর্ম' বলিয়া একটি আন্তর্জাতিক ধর্মকে স্বীকার করা হয় না। সাধারণত আমরা যাহাকে 'ধর্ম' বলি তাহা হইল মানুষের কল্পিত ধর্ম। যুগে যুগে মহাজ্ঞানীগণ এই বিশ্বসংসারের স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। "স্রষ্টার প্রতি মানুষের কি কোন কর্তব্য নাই? নিশ্চয়ই আছে" — এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু মানুষের সমাজ ও কর্মজীবনের গতিপথও দেখাইয়া দিলেন সেই মহাজ্ঞানীগণ। এইরূপে হইল কল্পিত ধর্মের আবির্ভাব। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মনীষী বা ধর্মগুরুদের মতবাদ হইল ভিন্ন ভিন্ন।

এই কল্পিত ধর্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল উহাতে মতভেদ। ফলে পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, এমনকি স্বামী-স্ত্রীতেও এই কল্পিত ধর্ম নিয়া মতভেদের কথা শোনা যায়। এই মতানৈক্য ঘুচাইবার জন্য প্রথমত আলাপ-আলোচনা, পরে বাক-বিতণ্ডা, শেষ পর্যন্ত যে কত রক্তপাত হইয়া গিয়াছে, ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বমানব একমত হইতে পারিয়াছে কি?

কেবল যে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন মত এমন নহে। একই ধর্মের ভিতরেও মতভেদের অন্ত নাই। হিন্দু ধর্মের বেদ যাহা বলে, উপনিষদ সকল ক্ষেত্রে তাহার সহিত একমত নহে। আবার পুরাণের শিক্ষাও অনেক স্থলে অন্যরূপ। 'বাইবেল'-এর পুরাতন নিয়ম (Old Testament) ও নূতন নিয়মে (New Testament) অনেক পার্থক্য। পুনশ্চ প্রোটেস্ট্যান্ট (Protestant) ও ক্যাথলিকদের (Roman Catholic) মধ্যেও অনেক মতানৈক্য রহিয়াছে।

পবিত্র কোরানপন্থীদের মধ্যেও মতবৈষম্য কম নহে। শিয়া, সুন্নী, মুতাজিলা, ওহাবী, কাদিয়ানী, খারিজী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মত এক নহে। আবার একই সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হানাফী, শাফী ইত্যাদি চারি মজহাবের মতামত সম্পূর্ণ এক নহে। এমনকি একই হানাফী মজহাব অবলম্বী বিভিন্ন পীর ছাহেবদের যথা — জৌনপুরী, ফুরফুরা, শর্ষিণা ইত্যাদি বিভিন্ন খান্দানের বিভিন্ন রেছালা। মহাত্মা রামমোহন রায়ের অতিআধুনিক ব্রাহ্মধর্মও অধুনা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে।

এতোধিক মতানৈক্য থাকা সত্বেও ভক্তদের নিকট আপন আপন ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ, সনাতন ও ঈশ্বর-অনুমোদিত, মুক্তি বা পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা। বলা বাহুল্য যে, এরূপ ধারণা প্রত্যেক ধর্মেই বিদ্যমান। কোন ধর্মে একথা কখনও স্বীকার করে না যে, অপর কোন ধর্ম সত্য অথবা অমুক ধর্মাবলম্বী লোকদের স্বর্গপ্রাপ্তি, মুক্তি বা নির্বাণ ঘটিবে। বরং সকল সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকেরা এই কথাই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের আপন আপন ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম, অন্য কোন ধর্মই সত্য নহে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের স্বর্গপ্রাপ্তি, পরিত্রাণ, নির্বাণ বা মোক্ষলাভ ঘটিবে না। এ যেন বাজারের গোয়ালাদের ন্যায় সকলেই আপন আপন দধি মিষ্টি বলে।

বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মই আস্তিক। বিশেষত একেশ্বরবাদী। হিন্দুধর্মও মূলত একেশ্বরবাদী। তাহাই যদি হয়, অর্থাৎ জগতের সকল লোকেই যদি একেশ্বরবাদী হয়, তবে তাহাদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃভাব থাকা উচিত। কিন্তু আছে কি? আছে যত রকম হিংসা, ঘৃণা, কলহ ও বিদ্বেষ। সম্প্রদায়বিশেষে ভুক্ত থাকিয়া মানুষ মানুষকে এত অধিক ঘৃণা করে যে, তদ্রূপ কোন ইতর প্রাণীতেও করে না। হিন্দুদের নিকট গোময় (গোবির) পবিত্র, অথচ অহিন্দু মানুষ মাত্রেই অপবিত্র। পক্ষান্তরে মুসলমানদের নিকট কবুতরের বিষ্ঠাও পাক, অথচ অমুসলমান মাত্রেই নাপাক। পুকুরে সাপ, ব্যাঙ মরিয়া পচিলেও উহার জল নষ্ট হয় না, কিন্তু বিধর্মী মানুষে ছুঁইলেও উহা হয় অপবিত্র। কেহ কেহ একথাও বলেন যে, অমুসলমানী পর্ব উপলক্ষে কলা, কচু, পাঁঠা বিক্রিও মহাপাপ। এমনকি মুসলমানের দোকান থাকিতে হিন্দুর দোকানে কোন কিছু ক্রয় করাও পাপ। এই কি মানুষের ধর্ম? না ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা?

মানবতার মাপকাঠিতে মানুষ একে অন্যের ভাই, ভালবাসার পাত্র, দয়া-মায়ার যোগ্য, সুখ-দুঃখের ভাগী ; এক কথায় একান্তই আপন। কিন্তু ধর্মে বানাইল পর।

স্বভাবত মানুষ সত্যকেই কামনা করে, মিথ্যাকে নয়। তাই আবহমানকাল হইতেই মানুষ 'সত্যের সন্ধান' করিয়া আসিতেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি জ্ঞানানুশীলনের বিভিন্ন বিভাগ সর্বদাই চায় মিথ্যাকে পরিহার করিতে। তাই দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, কোন ঐতিহাসিক কিংবা নৈয়ায়িক সজ্ঞানে তাঁহাদের গ্রন্থে মিথ্যার সন্নিবেশ করেন না। বিশেষত তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থের ভূমিকায় এমন প্রতিজ্ঞাও করেন না যে, তাঁহাদের গ্রন্থের কোথাও কোন ভুলভ্রান্তি নাই। অথবা থাকিলেও তাহা তাঁহারা সংশোধন করিবেন না। পক্ষান্তরে যদি কাহারো ভুলত্রুটি প্রমাণিত হয়, তবে তিনি তাহা অম্লানবদনে স্বীকার করেন এবং উহা সংশোধনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এইরূপ পরবর্তী সমাজ পূর্ববর্তী সমাজের ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া নিয়া থাকে। এইরকম যুগে যুগে যখনই অতীত জ্ঞানের মধ্যে কোন ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, তখনই উহার সংশোধন হইয়া থাকে। এক যুগের বৈজ্ঞানিক সত্য আরেক যুগে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যায় এবং যখনই উহা প্রমাণিত হয়, তখনই বৈজ্ঞানিক সমাজ উহাকে জীর্ণবস্ত্রের ন্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিত্যাগ করেন ও প্রমাণিত নূতন সত্যকে সাদরে গ্রহণ করেন।

ধর্মজগতে কিন্তু ঐরূপ নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। তৌরিত, জব্বুর, ইঞ্জিল, কোরআন, বেদ-পুরাণ, জেন্দ-আভেস্তা ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রত্যেকটি অপৌরুষেয় বা ঐশ্বরিক পুঁথি কি না, তাহা জানি না, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটি গ্রন্থ এই কথাই বলিয়া থাকে যে, এই গ্রন্থই সত্য। যে বলিবে যে, ইহা মিথ্যা — সে নিজে মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী, পাপী অর্থাৎ নারকী।

ধর্মশাস্ত্রসমূহের এইরূপ নির্দেশ হেতু কে যাইবে ধর্মশাস্ত্রসমূহের বিরুদ্ধে কথা বলিয়া নারকী হইতে? আর বলিয়াই বা লাভ কি? অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থই গ্রন্থকারবিহীন অর্থাৎ ঐশ্বরিক বা অপৌরুষেয়, সুতরাং উহা সংশোধন করিবেন কে?

প্রাগৈতিহাসিককাল হইতে জগতে শত শত রাষ্ট্রের উত্থান হইয়াছে এবং পরস্পর কলহ-বিবাদের ফলে তাহাদের পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু ধর্মে-ধর্মে যতই কলহ-বিবাদ থাকুক না কেন, জগতে যতগুলি ধর্মের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহার একটিও আজ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। ইহার প্রথম কারণ হইল এই যে, রাষ্ট্রের ন্যায় ধর্মসমূহের আয়ত্তে তোপ-কামান-ডিনামাইট বা এ্যাটম বোম নাই, যাহা দ্বারা একে অন্যের ধ্বংস সাধন করিতে পারে। ধর্মের হাতে আছে মাত্র দুইটি অস্ত্র — আশীর্বাদ ও অভিশাপ। এহেন অস্ত্রসমূহ ব্যক্তিবিশেষের উপর ক্রিয়াশীল কিনা, জানি না, কিন্তু কোন সম্প্রদায় বা জাতির উপর একেবারেই অকেজো।

উহার দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রত্যেক ধর্মেই তাহার নির্দিষ্ট বিধি-বিধানসমূহের সত্যাসত্যের সমালোচনা একেবারেই বন্ধ। যেমন পাপ ও নরকের ভয়ে ভিতরের সমালোচনা বন্ধ, তেমন বাহিরের (ভিন্নধর্মের লোকদের) সমালোচনা চিরকালই বাতিল। কাজেই ধর্ম নির্বিঘ্নে আপন মনে দিন কাটাইতেছে। কিন্তু এইখানেই কি শেষ? না, বোবারও কল্পনাশক্তি আছে। মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও সে বিশ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে, সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বোবার সেই ভাবসমূহের অভিব্যক্তি ঘটে তাহার কার্যাবলীর মধ্য দিয়া।

ধর্মজগতে মানুষের স্বাধীন চিন্তা-ক্ষেত্র নিতান্তই অপরিসর। তাই বাঁধ-ভাঙ্গা জলস্রোতের ন্যায় সময় সময় মানুষের কল্পনা ধর্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিধি-নিষেধের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া যায়। ধর্মশাস্ত্র যে সকল বিষয় ভাবিতে নিষেধ করিয়াছে, মানুষ তাহাও ভাবে এবং সমস্যার সমাধান না পাওয়ায় দুই একজন আনাড়ী লোক ধর্মযাজকদের নিকট গোপনে প্রশ্ন করে, ইহা কেন? উহা কেন? সমস্যা যতই জটিল হউক না কেন, উহার সমাধান হয়ত জলের মত সোজা। যাজক জবাব দেন, "ঐসকল গুপ্ততত্ত্বসমূহের ভেদ সে (আল্লাহ্) ছাড়া কেহই জানে না। ধরিয়া লও ওসকল তারই মহিমা" ইত্যাদি।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে, জ্ঞানই পুণ্য (Knowledge is virtue)। কিন্তু যে বিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মিল না, সে বিষয়ে পুণ্য কোথায়? কোন বিষয় বা ঘটনা না দেখিয়াও বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু একবারেই না বুঝিয়া বিশ্বাস করে কিরূপে? যাজক যখন দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, না দেখিয়া এমনকি না বুঝিয়াই ঐ সকল বিশ্বাস করিতে হইবে, তখন মনে বিশ্বাস না জন্মিলেও পাপের ভয়ে অথবা জাতীয়তা রক্ষার জন্য মুখে বলা হয়, "আচ্ছা"। বর্তমানকালের অধিকাংশ লোকেরই ধর্মে বিশ্বাস এই জাতীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যে জ্ঞানের অগ্রগতিতে বাধা, মনের অদম্য স্পৃহায় আঘাত, আত্মার অতৃপ্তি, ইহারই প্রতিক্রিয়া — মানুষের ধর্ম-কর্মে শৈথিল্য। এক কথায় — মন যাহা চায়, ধর্মের কাছে তাহা পায় না। মানুষের মনের ক্ষুধা অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। ক্ষুধার্ত বলদ যেমন রশি ছিঁড়িয়া অন্যের ক্ষেতের ফসলে উদরপূর্তি করে, মানুষের মনও তেমন ধর্ম-ক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ছুটিয়া যায় দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

ধর্মের মূল ভিত্তি বিশ্বাস (ঈমান)। ধর্ম এই বিশ্বাসকেই আঁকড়াইয়া আছে। কিন্তু এই বিশ্বাস কি বা ইহা উৎপত্তির কারণ কি, ধর্ম তাহা অনুসন্ধান করে না। এই বিশ্বে যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, নিশ্চয়ই তাহার উপাদান বা কারণ আছে। বিশ্বাস জন্মিবার যে কারণসমূহ বর্তমান আছে, পণ্ডিতেরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন। বিশ্বাস উৎপত্তির কারণাবলী সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, মনোবিজ্ঞানের যে কোন পুস্তকে উহা পাওয়া যাইবে। আমরা শুধু মোটামুটিরূপে উহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

জ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক। বরং বলা হইয়া থাকে যে, জ্ঞানমাত্রেই বিশ্বাস। তবে যে কোন বিশ্বাস জ্ঞান নহে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর যে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই জ্ঞান বলা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই খাঁটি বিশ্বাস। পক্ষান্তরে, যে বিশ্বাস কল্পনা, অনুভূতি, ভাবানুষঙ্গ বা কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা জ্ঞান নহে। তাহাকে অভিমত (Opinion) বলা হইয়া থাকে। চলতি কথায় ইহার নাম 'অন্ধ-বিশ্বাস'। সচরাচর লোকে এই অন্ধ-বিশ্বাসকেই 'বিশ্বাস' আখ্যা দিয়া থাকে। কিন্তু যাহা খাঁটি বিশ্বাস, তাহা সকল সময়ই বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা (Lesson Experience) প্রসূত, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা সর্বদাই বিশ্বাস্য। মানুষ যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করে, তাহা তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই করে এবং যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করে, তাহাই বিশ্বাস করে। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছি, স্বহস্তে যাহা স্পর্শ করিয়াছি তাহাতে আমার সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যাহা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত, তাহাতেই আমাদের অটল বিশ্বাস।

সংসারে এমন বস্তুও আছে, যাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অথচ সেই সকল বস্তুকে যে আমরা সন্দেহ করি এমনও নহে। অনেক অপ্রত্যক্ষীভূত জিনিস আছে, যাহা আমরা অনুমানের ভিত্তিতেই বিশ্বাস করি। এই যে মানুষের 'প্রাণশক্তি', যাহার বলে মানুষ উঠা, বসা, চলাফেরা ইত্যাদি সংসারের নানাপ্রকার কাজকর্ম করিতেছে, তাহা কি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি? করি নাই। কারণ 'প্রাণ' মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। প্রাণকে কোনরূপে প্রত্যক্ষ না করিলেও প্রাণের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ প্রাণ যদিও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে, তবুও ইহার কার্যকলাপ দৈহিক ঘটনারূপে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। 'কার্য থাকিলে তাহার কারণ থাকিতে বাধ্য' — এই স্বতঃসিদ্ধ যুক্তির বলে আমরা দৈহিক ঘটনাবলীর কারণরূপে প্রাণের অস্তিত্বকে অনুমান করিতেছি এবং বিশ্বাস করিতেছি যে, প্রাণ আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটির উপর খাঁটি বিশ্বাস বা জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। যে বিশ্বাসের মূলে প্রত্যক্ষ বা অনুমান নাই, অর্থাৎ যে বিশ্বাসের মূলে জ্ঞানের অভাব, তাহা খাঁটি বিশ্বাস নহে, অন্ধ বিশ্বাস। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আমাদের সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান যাহা বলে, তাহা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বিশ্বাস করি। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকাংশ ধর্ম এবং ধর্মের অধিকাংশ তথা অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রত্যক্ষ বা অনুমানসিদ্ধ নহে। এই জন্য ধর্মের অনেক কথায় বা ব্যাখ্যায় সন্দেহ থাকিয়া যায়। দ্বিধাহীন চিত্তে ধর্মীয় সকল অনুশাসনকে আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তাই বিজ্ঞানের ন্যায় ধর্মের উপর সকল লোকের অটল বিশ্বাস হয় না। ধর্মকে সন্দেহাতীতরূপে পাইতে হইলে উহাকে অন্ধবিশ্বাসের উপর রাখিলে চলিবে না, উহা খাঁটি বিশ্বাস অর্থাৎ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

আজকাল যেখানে-সেখানে শোনা যাইতেছে যে, সংসারে নানা প্রকার জিনিসপত্র হইতে 'বরকত' উঠিয়া গিয়াছে। কারণ লোকের আর পূর্বের মত ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস নাই। পূর্বে লোকের ঈমান ছিল, ফলে তাহারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিত। আর আজকাল মানুষের ঈমান নাই, তাই তাহাদের অভাব ঘোচে না। ঈমান নাই বলিয়াই ক্ষেতে আর সাবেক ফসল জন্মে না, ফলের গাছে ফল ধরে না, পুকুরে-নদীতে মাছ পড়ে না। ঈমান নাই বলিয়াই মানুষের উপর খোদার গজবরূপে কলেরা, বসন্ত, বন্যা-বাদল, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি নানা প্রকার বালামুছিবত নাজেল হয়। অথচ মানুষের হুঁশ হয় না। এইরূপ যে নানা প্রকার অভাব-অভিযোগের জন্য ঈমানের অভাবকেই দায়ী করা হয়, তাহা কতটুকু সত্য?

শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, আর যাহারা জানেন না তাহারা অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আমাদের এই সোনার বাংলার চাষীগণ বিঘাপ্রতি বার্ষিক যে পরিমাণ ধান্য জন্মাইতেছে, তাহার প্রায় সাত-আটগুণ পরিমাণ ধান্য জাপানের চাষীরা জন্মাইতেছে। হয়ত অনুসন্ধান করিলে ইহাও জানা যাইতে পারে যে, জাপানের এই চাষীরা অ-মুসলমান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, কাফের, যাহাদের ধর্মে ঈমানের নামগন্ধও নাই। আমাদের মতে উহারা বে-ঈমান বা অ-বিশ্বাসী। তবুও উহারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে পূর্বের চেয়ে বেশী ফসল জন্মাইতেছে। আমাদের মতে উহারা বে-ঈমান হইলেও তাহাদের ক্ষেতের ফসল বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই।

কিছুদিন পূর্বে রাশিয়া-প্রত্যাগত বাংলাদেশের জনৈক নামজাদা ডাক্তার সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব বাংলায় প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারীর প্রকোপে প্রাণ হারায় — একথা সেদেশের ডাক্তারেরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। কারণ তাহারা একথা ভাবিতেও পারিতেছিলেন না যে, বর্তমান যুগেও কোন দেশে কলেরা বা বসন্তে ভুগিয়া অগণিত মানুষ প্রাণ হারায়। তবে কি একমাত্র বাংলার অধিবাসীদেরই ঈমান নাই? আর একমাত্র ইহাদের উপরই কি খোদার গজব বর্ষিত হয়? রাশিয়ানরা অধিকাংশই সাম্যবাদী (Socialist)। তাঁহারা দেব-দেবী বা আল্লাহ-নবীর ধার ধারেন না। তবু যাবতীয় কাজে তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করিয়াই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিতেছেন।

যাহারা ঈমানের অভাবকে নানাবিধ অভাব-অনটনের জন্য দায়ী করেন, তাঁহারা একটু ভাবিলেই দেখিতে পাইতেন যে, ধনী ও গরীবের আয়-ব্যয়ের ধাপগুলি কোন কালেই এক নহে। গরীব চায় শুধু ভাত ও কাপড়। কিন্তু ধনী চায় তৎসঙ্গে বিলাস-ব্যসন। মানুষ সাধারণত অনুকরণপ্রিয়। তাই ধনীর বিলাসিতা বহুল পরিমাণে ঢুকিয়াছে গরীবের ঘরে। যাহার পিতার সম্পত্তি ছিল পাঁচ বিঘা জমি এবং পরিবারে ছিল তিনজন লোক, তাহার সংসারের নানা প্রকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খরচ নির্বাহ করিয়াও হয়ত কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত। আজও সে ঐ জমির আয় দ্বারা তিনজন লোকই প্রতিপালন করে, কিন্তু উদ্বৃত্ত যাহা থাকিত, তাহা ব্যয় করিতেছে,সাবান, সুবাসিত তৈল, সিল্কের চাদর, ছাতা ও জুতায়। বিলাস-ব্যসনে যে অতিরিক্ত খরচ সে করিতেছে, তাহার হিসাব রাখে না, ভাবে 'বরকত' গেল কোথায়? একথা সে ভাবিয়া দেখে না যে, অমিতব্যয়িতা এবং বিলাসিতাই তাহার অভাব-অনটনের কারণ। অযথা ঈমানের অভাবকে কারণ বলিয়া দায়ী করে।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে যেখানে (অখণ্ড ভারতে) জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২৯ কোটি, বৃদ্ধি পাইয়া আজ সেখানে জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৬৮ কোটি। এই যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ৩৯ কোটি মানুষ, ইহারা খায় কি? লোকবৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যবৃদ্ধি না হইলে খাদ্য-খাদকের সমতা থাকিবে কিরূপে? লোকবৃদ্ধি যতই হোক, জমিবৃদ্ধির উপায় নাই। কাজেই অনাবাদী জমি আবাদ, উপযুক্ত সার প্রয়োগ, উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষাবাদ ছাড়া বর্তমানে খাদ্যবৃদ্ধির উপায় নাই। অথচ আমাদের দেশে কয়জন চাষী এ বিষয়ে সচেতন? আজও সরকারী বীজ ভাণ্ডারে ভাল বীজ বিকায় না। এমোনিয়া সালফেট ও বোনমিল বস্তা ছিঁড়িয়া পড়িয়া থাকে গুদামের মেঝেয়, রেড়ির খৈল পচিয়া থাকে গুদামে। পল্লী অঞ্চলে ইতস্তত ঝোপ-জঙ্গলের অভাব নাই। বসত বাড়ীর আনাচে-কানাচে জন্মিয়া থাকে ভাটুই গাছ আর গুড়ি কচু। বেড়পুকুরে কচুরিপানা ঠাসা। বৃদ্ধি পাইয়াছে শুধু মশা, মাছি, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত আর ডাক্তার খরচ। এই তো আমাদের অশিক্ষিত দেশের অবস্থা। বর্তমানে খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে তাহা সত্য। কিন্তু ইহা খাদ্য-খাদকের সমতার অভাবেই ঘটিয়াছে, 'বে-ঈমান' বা অবিশ্বাসের জন্য নয়।

ম্যালথুস (Malthus) তাঁহার 'পপুলেশন' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অনুপাত আছে, যে অনুপাত জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। তবে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসাধারণের আহার-বিহার এবং রীতি-নীতির তারতম্যে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে।

আমাদের দেশের জন্মহার অত্যধিক। জনসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে — শিশু, বিধবা ও বহুবিবাহে। যে ছেলের ২০ বৎসর বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত, সে ছেলের ঐ বয়সে ছেলে-মেয়ে জন্মে দুই-তিনটি। আবার তিন বৎসর বয়সে যে মেয়ের বিবাহ হয়, বারো-তেরো বৎসর বয়সে সে হয় মেয়ের মা। কথায় বলে — 'কচি ফলের বীজ ভাল না'। অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতা-মাতার সন্তান উৎপাদনে পিতা-মাতা ও শিশু উভয়ই হয় স্বাস্থ্যহীন। পিতার বয়স ত্রিশ হইলে চুল পাকে, পঁয়ত্রিশে দাঁত নড়ে, চল্লিশে হয় কুঁজো, হাঁপানি ও প্রবাহিকায় পঞ্চাশেই ভবলীলা সাঙ্গ করে। এমতাবস্থায় বিধবা স্ত্রীর উপায় কি? কোন ছেলের ব্যথার ব্যারাম, কোন ছেলের জীর্ণজ্বর, ছোট মেয়েটি কোলে লয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা। এইরূপ স্বাস্থ্যহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দেশের অভাব দৈনন্দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর ইহার সাথে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অলসতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি তো আছেই। সুখের বিষয় এই যে, সরকারী নির্দেশে শিশু-বিবাহ বর্তমানে কমিয়াছে।

বহুবিবাহের প্রতিক্রিয়াও সমাজজীবনে কম নহে। ইহা শুধু বংশবিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। ইহার ফলে নানা প্রকার পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। বৈমাত্রেয় সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির ফলে উহাদের মধ্যে ফরায়েজের অংশ লইয়া মনোমালিন্য, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অবশেষে মামলা-মোকদ্দমা ও উকিল-মোক্তার, আমলা-পেশকার ইত্যাদির হয় আয়বৃদ্ধি।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মবৃদ্ধির সাথে সাথে মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুতেও নিস্তার নাই, ইহাতেও খরচ আছে। প্রথমত জানাজা, কাফন ইত্যাদির খরচ তো আছেই, তদুপরি মোর্দাকে গোর-আজাব হইতে রক্ষা করিতে, পোলছিরাত পার করিতে, বেহেস্ত সহজলভ্য করিতে — প্রতি বৎসর রমজান মাসে মৌলুদ শরীফ, কোরান শরীফ খতম ইত্যাদি না-ই হোক, অন্ততপক্ষে কয়েকজন মোল্লা-মৌলবী ডাকিয়া তশবিহ্ পড়াইয়া কিছুটা ডাল-চাল খরচ না করিলেই চলে না। মানুষের অভাববৃদ্ধির কারণাবলীর প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া উগ্রবিশ্বাসীরা ঈমানের অভাবকেই অভাব-অনটনের কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছে।

"এখন আর মানুষের মনে পূর্বের ন্যায় ঈমান নাই" — একথা বলিয়া যাঁহারা রোদন করেন, তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে, বিশ্বাস গেল কোথায়? বিজ্ঞানমতে — পদার্থের ধ্বংস নাই, আছে শুধু পরিবর্তন। দেখা যায়, তদ্রূপ মানবমনের বিশ্বাসেরও লয় নাই, আছে শুধু পরিবর্তন। পূর্বে লোকে নানা প্রকার উপকথা, রূপকথায়ও বিশ্বাস করিত। কিন্তু এখন আর তাহা করে না। নানা প্রকার ভূতের গল্প, জ্বীন-পরীর কাহিনী, নানা প্রকার তন্ত্র-মন্ত্রে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই আজকাল আর বিশ্বাস করেন না। তবে যে উহা সমাজে একেবারেই অচল, তাহা নহে। 'রূপকথা' লোকে রূপকথা বলিয়াই গ্রহণ করিতেছে, 'সত্য' বলিয়া মনে করিতেছে না। এক সময় উপন্যাসকে লোকে ইতিহাস মনে করিত। কিন্তু এখন আর তাহা করে না, ম্যাজিকের আশ্চর্য খেলাগুলি সকলেই আগ্রহের সহিত দেখে, কিন্তু উহা সত্য বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না। তাই বলিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিশ্বাস মুছিয়া যায় নাই। যেমন কতক বিষয় হইতে বিশ্বাস উঠিয়া গিয়াছে, তেমন কতক বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইয়াছে। বিশ্বাসযোগ্য 'বস্তু' বা 'বিষয়'-এর পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র।

AMARBOI.COM

বলা হয় যে, আল্লাহতা'লার অসাধ্য কোন কাজ নাই। বিশেষ বিশ্বাসী ভক্তদের অনুরোধে তিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করেন। হযরত সোলায়মান নবী নাকি সিংহাসনে বসিয়া সপারিষদ শূন্যে ভ্রমণ করিতেন। তাই বলিয়া — **'আল্লাহতা'লা ইচ্ছা করিলে জায়নামাজশুদ্ধ আমাকেও নিমেষের মধ্যে মক্কায় পৌঁছাইতে পারেন' — এইরূপ বিশ্বাস কোন কোন পীর ছাহেবের আছে কি?** থাকিলে একবারও তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কি? না দেখিয়াই বা উড়োজাহাজে চড়িবার কারণ কি? উড়োজাহাজে চড়িবার বিপদ আছে, ভাড়া আছে, আর সময়ও লাগে যথেষ্ট। তবুও উহার উপর জন্মিয়াছে বিশ্বাস।

অতীতে কোন কোন বোজর্গান হাঁটিয়াই নদী পার হইতে পারিতেন। যেহেতু তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, নদী পার করাইবেন আল্লাহতা'লা, নৌকা বা জলযানের প্রয়োজন নাই। আর বর্তমানে খোদার উপর বিশ্বাস নাই, নদী পার হইতে সাহায্য লইতে হয় নৌকার।

সূফীগণ নাকি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পৃথিবীর কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা জানিতে ও দেখিতে পাইতেন। এখন কয়টি লোকে উহা বিশ্বাস করে? বর্তমানে বিশ্বাস জন্মিয়াছে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশনে।

শাহ ছাহেবদের 'কালাম'-এর তাবিজে কৃমি পড়ে না, কৃমি পড়ে স্যান্টোনাইন সেবনে। মানত-শিন্নিতে জ্বর ফেরে না, জ্বর ফেরাইতে সেবন করিতে হয় কুইনাইন। লোকে বিশ্বাস করিবে কোন্‌টি? নানাবিধ রোগারোগ্যের জন্য পীরের দরগাহ হইতে হাসপাতালকেই লোকে বিশ্বাস করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশী। গর্ভিনীর সন্তান প্রসব যখন অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে, তখন পানিপড়ার চেয়ে লোকে বেবী ক্লিনিকের (Baby Clinic) উপর ভরসা রাখে বেশী।

আজ মহাসমুদ্রের বুকে লোক যাতায়াত করে কোন্ বিশ্বাসে? সমুদ্রের গভীর জলের নীচে লোকে সাবমেরিন চালায় কোন্ বিশ্বাসে? মহাকাশ পাড়ি দেয় লোকে কোন্ বিশ্বাসে? যন্ত্রে বিশ্বাস আছে বলিয়াই মানুষ যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছে। দ্রব্যগুণে বিশ্বাস আছে বলিয়াই লোকে কলেরা বসন্তের সময় দোয়া-কালামের পরিবর্তে ইনজেকশন ও টিকা লইতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিশ্বাস ধরাপৃষ্ঠ হইতে অবলুপ্ত হয় নাই, শুধু বিশ্বাসযোগ্য বিষয়-বস্তুর পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, যেখানে যে বিষয়ে মানুষের জ্ঞান জন্মিতেছে, সেইখানেই বিশ্বাস (ঈমান) দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে ; আর যেখানে যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে নাই, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয় হইতে ক্রমশ বিশ্বাস লোপ পাইতেছে। অর্থাৎ সন্দেহ জাগিতেছে। যে কথার বা যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রমাণ নাই, যে বিষয়ের কার্য-কারণ সম্পর্ক নাই বা যাহা বিবেকবিরোধী, বর্তমানে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সে সকল ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না।

ধর্মজগতে এমন কতগুলি বিধি-নিষেধ, আচার-অনুষ্ঠান ও ঘটনাবলীর বিবরণ পাওয়া যায়, যাহার যুক্তিযুক্ত কোন ব্যাখ্যা সাধারণের বোধগম্য নহে। তাই সততই মনে কতগুলি প্রশ্ন উদয় হয় এবং সেই প্রশ্নগুলির সমাধানের অভাবে ধর্মের বিধি-বিধানের উপর লোকের সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মে। ফলে ধর্মের বিধি-বিধানের উপর লোকের শৈথিল্য ঘটে। ধর্মযাজকদের অধিকাংশের নিকটই সেই সকল প্রশ্নাবলীর সদুত্তর পাওয়া যায় না। অনেক সময় উত্তর দেওয়া দূরে থাক, শুধু প্রশ্ন করার জন্য উল্টা কাফেরী ফতুয়া দিতেও তাহাদের দেরী হয় না। অথচ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি তাহাদের মতানুযায়ী পালন না করিলে তাহার উপর তাহারা সাধ্যমত দল বাঁধিয়া অত্যাচার করিতেও ইতস্তত করে না। ধর্মের নাম করিয়া ধর্মবিরোধী কাজ করিতেও উহাদের বাধে না। পবিত্র কোরান যে বলিতেছে — "লা ইক্‌রাহা ফিদ্দীন", অর্থাৎ ধর্মে জবরদস্তি নাই — সেদিকে উহারা ভ্রূক্ষেপ করে না। অধিকন্তু সরকারী আইন বাঁচাইয়া যতদূর ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়, তাহা করিতেও ত্রুটি করে না। উপরন্তু রাজশক্তিকে হস্তগত করিয়া ধর্মের নামে অধর্মকে চালাইবার আকাশ-কুসুমও উহারা রচনা করিতেছে।

ধর্মরাজ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিলে সাধারত মনে যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, আমরা এখন তাহার কতগুলি প্রশ্ন বিবৃত করিব এবং প্রশ্নগুলি কেন হইতেছে, তাহার হেতুস্বরূপ যথাযোগ্য ব্যাখ্যা প্রশ্নের সহিত সন্নিবেশিত করিব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নাবলী

প্রথম প্রস্তাব

[আত্মা বিষয়ক]

১. আমি কে ?

মানুষের আমিত্ববোধ যত আদিম ও প্রবল, তত আর কিছুই নাই। আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি বাঁচিয়া আছি, আমি গরীব ইত্যাদি হাজার হাজার রূপে আমি আমাকে উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু যথার্থ 'আমি' — এই রক্ত-মাংস-অস্থি-মেদ-মজ্জায় গঠিত দেহটিই কি 'আমি'? তাহাই যদি হয়, তবে মৃত্যুর পরে যখন দেহের উপাদানসমূহ পচিয়া-গলিয়া অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তনে কতগুলি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হইবে, তখন কি আমার আমিত্ব থাকিবে না? যদি না-ই থাকে, তবে স্বর্গ-নরকের সুখ-দুঃখ ভোগ করিবে কে? নতুবা 'আমি' কি আত্মা? যদি তাহাই হয়, তবে আত্মাকে 'আমি' না বলিয়া 'আমার' — ইহা বলা হয় কেন? যখন কেহ দাবী করে যে, দেহ আমার, প্রাণ আমার এবং মন আমার, তখন দাবীদারটি কে?

২. প্রাণ কি অরূপ না সরূপ ?

প্রাণ যদি অরূপ বা নিরাকার হয়, তবে দেহাবসানের পরে বিশ্বজীবের প্রাণসমূহ একত্র হইয়া একটি অখণ্ড সত্তা বা শক্তিতে পরিণত হইবে না কি? অবয়ব আছে বলিয়াই পদার্থের সংখ্যা আছে, নিরবয়ব বা নিরাকারের সংখ্যা আছে কি? আর সংখ্যা না থাকিলে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকে কি? পক্ষান্তরে প্রাণ যদি সরূপ বা সাকার হয়, তবে তাহার রূপ কি?

৩. মন ও প্রাণ কি এক ?

সাধারণত আমরা জানি যে, মন ও প্রাণ এক নহে। কেননা উহাদের চরিত্রগত পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা আমাদের নিজেদের উপলব্ধি হইতে জানিতে পাইতেছি যে, 'মন' প্রাণের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু 'প্রাণ' মনের উপর নির্ভরশীল নয়। মন নিষ্ক্রিয় থাকিলেও প্রাণের অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু প্রাণ নিষ্ক্রিয় হইলে মনের অস্তিত্বই থাকে না। যেমন — ক্লোরোফরম প্রয়োগে মানুষের সংজ্ঞা লোপ ঘটে, অথচ দেহে প্রাণ থাকে, শ্বাসক্রিয়া, হৃৎক্রিয়া এমনকি পরিপাকক্রিয়াও চলিতে থাকে। অথচ তখন আর মনের কোন ক্রিয়াই প্রকাশ পায় না। গভীর সুনিদ্রাকালেও কোন সংজ্ঞা থাকে না, ইহা দৈনন্দিন ঘটনা। কিন্তু সংজ্ঞাহীন হইলেই দেহ নিষ্প্রাণ হয় না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রাণবিহীন মন থাকিতেই পারে না, কিন্তু মন বা সংজ্ঞাহীন প্রাণ অনেক সময়ই পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমিত হয় যে, মন আর প্রাণ এক নহে। ইহাও অনুমিত হয় যে, সংজ্ঞা, চেতনা বা সুখ-দুঃখের অনুভূতি মনেরই, প্রাণের নয়। প্রাণ রাগ, শোক, ভোগ ও বিলাসমুক্ত। এক কথায় প্রাণ চিরনির্বিকার।

জীবের জীবন নাকি যমদূত (আজরাইল) হরণ করেন। কিন্তু তিনি কি প্রাণের সহিত মনকেও হরণ করেন? অথবা প্রাণ যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, মনকে তৎসঙ্গে থাকিতেই হইবে, — এইরূপ কোন প্রমাণ আছে কি? নতুবা মনবিহীন প্রাণ পরকালের সুখ-দুঃখ ভোগ করিবে কিরূপে?

৪. প্রাণের সহিত দেহ ও মনের সম্পর্ক কি ?

দেহ জড় পদার্থ। কোন জীবের দেহ বিশ্লেষণ করিলে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, লৌহ, ফস্‌ফরাস ইত্যাদি নানা প্রকার মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন অনুপাতে অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। পদার্থসমূহ নিষ্প্রাণ। কাজেই পদার্থসমূহের যথানুপাতে সংমিশ্রিত অবস্থাকেই প্রাণ বলা যায় না। পদার্থসমূহের যথানুপাতে সংমিশ্রণ এবং আরও কিছুর ফলে দেহে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়। ঐ 'আরও কিছু'কে আমরা মন বলিয়া থাকি। কিন্তু মানুষের দেহ, মন ও প্রাণে কিছু সম্পর্ক বা বন্ধন আছে কি? থাকিলে তাহা কিরূপ? আর না থাকিলেই বা উহারা একত্র থাকে কেন?

AMARBOI.COM

৫. প্রাণ চেনা যায় কি ?

কোন মানুষকে 'মানুষ' বলিয়া অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে আমরা তাহার রূপ বা চেহারা দেখিয়াই চিনিতে পাই, প্রাণ দেখিয়া নয়। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলকে রূপ দেখিয়াই চিনি, সম্বোধন করি, তাহাদের সাথে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম নিষ্পন্ন করি। প্রাণ দেখিয়া কাহাকেও চিনিবার উপায় নাই। তদ্রূপ — পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা ইত্যাদিকে আমরা উহাদের রূপ দেখিয়াই চিনিয়া থাকি। এই রূপ বা চেহারা দেহীর দেহেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখন দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক থাকিবে না অর্থাৎ মৃত্যুর পরে দেহহীন প্রাণকে চিনিবার উপায় কি? বিভিন্ন ব্যক্তি বা জীবের মন, জ্ঞান ও দৈহিক গঠনে যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, উহাদের প্রাণেও কি তেমন বৈচিত্র্য আছে? অর্থাৎ বিভিন্ন জীবের প্রাণ কি বিভিন্নরূপ?

৬. আমি কি স্বাধীন ?

'আমি' মনুষ্যদেহধারী মনপ্রাণবিশিষ্ট একটি সত্তা। প্রাণশক্তিবলে আমি বাঁচিয়া আছি, মনে নানা প্রকার কার্য করিবার স্পৃহা জাগিতেছে এবং দেহের সাহায্যে কার্যাবলী নিষ্পন্ন করিতেছি। আমি যে শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী, তাহা আমার কার্যাবলীর মধ্যেই প্রকাশ পাইতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে, আমি স্বাধীন কি-না। যদি আমি স্বাধীন হই অর্থাৎ আমার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ঈশ্বরের না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার 'সর্বশক্তিমান' নামের সার্থকতা থাকে কি? আর যদি আমি স্বাধীন না-ই হই, তবে আমার কার্যাবলীর ফলাফলস্বরূপ পাপ বা পুণ্যের জন্য আমি দায়ী হইব কিরূপে?

৭. অশরীরী আত্মার কি জ্ঞান থাকিবে?

মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কোন একটির অভাব থাকিলে, ঐ ইন্দ্রিয়টির মাধ্যমে যে জ্ঞান হইতে পারিত, তাহা আর হয় না। যে অন্ধ বা বধির, সে আলো বা শব্দে জ্ঞান পাইতে পারে না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মৃত্যুতে মানুষের দেহ নষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিও নষ্ট হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, মৃত্যুর পরে শরীর ও ইন্দ্রিয়বিহীন আত্মার জ্ঞান থাকিবে কি? থাকিলে তাহা কিরূপে থাকিবে?

৮. প্রাণ কিভাবে দেহে আসা-যাওয়া করে?

কেহ কেহ বলেন, যাবতীয় জীবের বিশেষত মানুষের প্রাণ একই সময় সৃষ্টি হইয়া 'ইল্লিন' নামক স্থানে রক্ষিত আছে। তথা হইতে রমণীদের গর্ভের তৃতীয় কি চতুর্থ মাসে প্রাণ ভ্রূণে আবির্ভূত হয়। গর্ভস্থ শিশুর দেহে আল্লাহতা'লার হুকুমে প্রাণ নিজেই আসে, না কোন ফেরেস্তা প্রাণকে শিশুর দেহে ভরিয়া দিয়া যায়, তাহা জানি না ; কিন্তু ধর্মাধ্যায়ীগণ ইহা নিশ্চিত করিয়াই বলেন যে, একটি জীবের দেহে একটি প্রাণই আমদানী হয়। ইহা কেহ কখনও বলেন না যে, একটি জীবের একাধিক প্রাণ থাকিতে পারে বা আছে। 'পঞ্চপ্রাণ' বলিয়া যে একটি বাক্য আছে, যথা — প্রাণ, অপ্রাণ, সমান, উদান ও ধ্যান — উহা হইল শরীরস্থ বায়ুর পাঁচটি অবস্থা মাত্র। প্রাণশক্তি একই।

সচরাচর এক গর্ভে মানুষ জন্মে একটি। কিন্তু বিড়াল, কুকুর, ছাগ ও শৃগালাদি প্রায়ই একাধিক জন্মিয়া থাকে। মানুষেরও যমজ সন্তান হওয়া চলতি ঘটনা, ক্বচিৎ চারি-পাঁচ বা ততোধিক সন্তান জন্মিবার কথাও শোনা যায়। ঐ সকল ক্ষেত্রে কি প্রতি গর্ভে একাধিক প্রাণ আমদানী হয়, না একটি প্রাণই বিভক্ত হইয়া বহুর সৃষ্টি হয়?

কেঁচো ও শামুকাদি ভিন্ন যাবতীয় উন্নত জীবেরই নারী-পুরুষ ভেদ আছে, ক্বচিৎ নপুংসকও দেখা যায়। কিন্তু জীবজগতে নারী ও পুরুষ, এই দুই জাতিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রতিটি জীব বা মানুষ জন্মিবার পূর্বেই যদি তাহার স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট প্রাণ সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই প্রাণেও লিঙ্গভেদ আছে কি? যদি থাকেই, তাহা হইলে অশরীরী নিরাকার প্রাণের নারী, পুরুষ এবং ক্লীবের চিহ্ন কি? আর যদি প্রাণের কোন লিঙ্গভেদ না থাকে, তাহা হইলে এক জাতীয় প্রাণ হইতে ত্রিজাতীয় প্রাণী জন্মে কিরূপে? লিঙ্গভেদ কি শুধু জীবের দৈহিক রূপায়ণ মাত্র? তাহাই যদি হয়, তবে পরলোকে মাতা-পিতা, ভাই-ভগিনী ইত্যাদি নারী-পুরুষভেদ থাকিবে কিরূপে? পরলোকেও কি লিঙ্গজ দেহ থাকিবে?

প্রকৃতির নিয়মানুসারে কোন জীবের দেহে প্রাণ না থাকিলে সে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। বরং নির্জীবদেহ জৈবধর্ম হারাইয়া জড় পদার্থের ধর্ম পায় এবং তাহা নানারূপ রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে রূপান্তর গ্রহণ করে। অর্থাৎ পচিয়া-গলিয়া নষ্ট হইয়া যায়। মাতৃগর্ভস্থ মানবশিশু যদি তিন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারি মাস বয়সের সময়ে প্রাণপ্রাপ্ত হয়, তবে সে মাতা-পিতার মিলন মুহূর্তের পর হইতে নিষ্প্রাণ (ভ্রূণ) অবস্থায় বৃদ্ধি পায় কেন এবং পচিয়া-গলিয়া নষ্ট হইয়া যায় না কেন? প্রাণের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন বৃক্ষের একটি হইতে দশটি শাখা কাটিয়া রোপণ করিলে তাহা হইতে পৃথক পৃথক দশটি জীবিতবৃক্ষের উৎপত্তি হয়। এই রোপিত দশটি বৃক্ষের যে দশটি স্বতন্ত্র জীবন, ইহা কোথা হইতে, কোন সময়, কিভাবে আসে? স্বর্গ হইতে কোন দূতের মারফতে, না পূর্ব বৃক্ষ হইতে?

সদ্য বধ করা গরু, মহিষ বা ছাগলাদির কাটা মাংস যাহারা স্বহস্তে নাড়া-চাড়া করিয়াছেন, তাহারা কেহ কেহ হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কতগুলি খণ্ডিত মাংস আঘাতে সাড়া দেয়। যে জন্তুটিকে বধ করিবার পর উহার দেহ শত শত খণ্ডে খণ্ডিত করা হয়, উহার সেই মাংসখণ্ডগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া আঘাতে সাড়া দেয় বা স্পন্দিত হয় কেন? কোন রকম আঘাতে সাড়া দেওয়াটি জীবন বা জীবিতের লক্ষণ, কিন্তু মৃত প্রাণীর মাংসখণ্ডে জীবন কোথা হইতে আসে? কোন জীবের জীবন যমদূত হরণ করিয়া লওয়ার পরেও কি প্রাণের কিছু অংশ জীবদেহে থাকিতে পারে? আর থাকিলেও কি একটি প্রাণের শত শত খণ্ডে খণ্ডিত হওয়া সম্ভব?

জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রাণীদেহ কতগুলি জীবকোষ (Cell)-এর সমবায়ে গঠিত। জীবকোষগুলি প্রত্যেকে জীবন্ত। অর্থাৎ প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে জীবিত। সাপ, কেঁচো, টিকটিকি ইত্যাদির লেজ কাটিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলে, তাহা দেহ হইতে দূরে পড়িয়াও লাফাইতে থাকে। এক্ষেত্রে জন্তুটির একটি প্রাণ দুইস্থানে থাকিয়া নড়াচড়া করিতেছে না। লেজস্থিত জীবকোষগুলি স্বতন্ত্র জীবনের কিছু সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তেমন স্বতন্ত্রভাবে মরিতেও পারে। মানুষের খোস, পাঁচড়া, দাদ ইত্যাদি এবং কতিপয় ক্ষতরোগ আরোগ্য হইলে রুগ্নস্থান হইতে যে মরামাস (মৃত চর্মের ফুসকুড়ি) উঠিয়া থাকে, উহাই জীবকোষের স্বতন্ত্র মৃত্যুর নিদর্শন। ইহা ভিন্ন যে কোন জীবিত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার মৃত্যুতেও জীবকোষের স্বতন্ত্র মৃত্যু সূচিত করে।

একটি জীবকোষ বিভাজন প্রণালীতে দুইটিতে, দুইটি হইতে চারিটি এবং তাহা হইতে আটটিতে পরিণত হয়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সৃষ্টি হয়। মানুষের বেলায়ও একটি মাত্র ডিম্বকোষ (Egg cell) আর একটি জননকোষ (Germ cell) একত্র মিলিত হইয়া বিভাজন প্রণালীতে সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে বহু কোটি জীবকোষের সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। একটি মানুষের প্রাণ বহু কোটি প্রাণের সমবায়ী শক্তি। আমরা উহার নাম দিতে পারি 'মহাপ্রাণ'। কাজেই একটি জন্তুর দেহে প্রাণ 'বহু' কিন্তু মহাপ্রাণ 'একটি'। জীবদেহের যাবতীয় জীবকোষের এককালীন মৃত্যুকে অর্থাৎ মহাপ্রাণের তিরোধানকে আমরা জীবের 'মৃত্যু' বলি এবং জীবদেহের কোন অংশের জীবকোষের মৃত্যুকে বলি 'রোগ'।

উপরোক্ত ধর্মীয় ও জীবতত্ত্বীয় মতবাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কোনটি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় প্রস্তাব

[ঈশ্বর বিষয়ক]

১. আল্লাহর রূপ কি ?

জগতের প্রায় সকল ধর্মই একথা স্বীকার করে যে, ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরাকার ও সর্বব্যাপী। কথা কয়টি অতীব সহজ ও সরল। কিন্তু যখন হিন্দুদের মুখে শোনা যায় যে, সৃষ্টি পালনের উদ্দেশ্যে ভগবান মাঝে মাঝে সাকারও হইয়া থাকেন ও যুগে যুগে 'অবতার'রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া লীলা প্রকাশ করেন এবং যখন খৃষ্টানদের নিকট শোনা যায় যে, পরম সত্তা — 'ভগবান, মশীহ, পরমাত্মা' — এই ত্রিত্বে প্রকাশ পাইতেছে ; আবার যখন মুসলিম ধর্মযাজকদের নিকট শোনা যায় যে, আল্লাহতা'লা আরশে 'কুরছি'র উপর বসিয়া রেজওয়ান নামক ফেরেস্তার সাহায্যে বেহেস্ত, মালেক নামক ফেরেস্তার সাহায্যে দোজখ, জেব্রাইলের সাহায্যে সংবাদ এবং মেকাইলকে দিয়া খাদ্য বণ্টন ও আবহাওয়া পরিচালনা করেন — তখনই মন ধাঁধায় পড়ে, বুদ্ধি বিগড়াইয়া যায়। মনে প্রশ্ন জাগিতে থাকে — নিরাকার সর্বশক্তিমান ভগবানের সৃষ্টি পালনে সাকার হইতে হইবে কেন? অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহত্ত্ব প্রকাশে ত্রিত্বের আবশ্যক কি? সর্বব্যাপী আল্লাহতা'লার স্থায়ী আসনে অবস্থান কিরূপ এবং বিশ্বজগতের কার্য পরিচালনার জন্য ফেরেস্তার সাহায্যের আবশ্যক কি?

২. খোদাতা'লা কি মনুষ্যভাবাপন্ন ?

আল্লাহতা'লা দেখেন, শোনেন, বলেন ইত্যাদি শুনিয়া সাধারণ মানুষের মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে — তবে কি আল্লাহর চোখ, কান ও মুখ আছে? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আছে। তবে তাহা মানুষের মত নয়, কুদরতি। কিন্তু 'কুদরতি' বলিতে কিরূপ বুঝায়, তাহা তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন না। আবার যখন শোনা যায় যে, খোদাতা'লা অন্যায় দেখিলে ক্রুদ্ধ হন, পাপীদের ঘৃণা করেন, কোন কোন কাজে খুশী হন ও কোন কোন কাজে হন বেজার, তখন মানুষ ভাবে — খোদার কি মানুষের মতই মন আছে? আর খোদার মনোবৃত্তিগুলি কি মানুষেরই অনুরূপ? ইহারও উত্তর আসে যে, উহা বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। আবার যখন চিন্তা করা যায় যে, খোদাতা'লার জগত-শাসন প্রণালী বহুলাংশে একজন সম্রাটের মত কেন এবং তাঁহার এত আমলা-কর্মচারীর বাহুল্য কেন? উহার উত্তর পাওয়া যায় যে, সম্রাট হইলে তিনি অদ্বিতীয় সম্রাট, বাদশাহের বাদশাহ, ক্ষমতা তাঁহার অসীম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর যাহা পাওয়া গেল, তাহাতে অসাধারণ যাহাদের মনীষা তাঁহারা হয়ত বুঝিলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ ইহাতে কিছু বুঝিতে পাইল কি?

৩. স্রষ্টা কি সৃষ্ট হইতে ভিন্ন ?

ঈশ্বর যদি তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব থাকিতে পারে না এবং ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব অক্ষুণ্ন থাকিলে কোন সৃষ্ট-পদার্থ এমনকি পদার্থের অণু-পরমাণুও ঈশ্বর-শূন্য হইতে পারে না। অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই ঈশ্বরময়। মূল কথা — বিশ্ব ঈশ্বরময়, ঈশ্বর বিশ্বময়।

ধর্ম যদিও ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বে সন্দেহ করে না, কিন্তু একথাও নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে না যে, জগতের যাবতীয় জৈব-অজৈব, পাক এবং নাপাক সকল বস্তুই ঈশ্বরে ভরপুর। বিশ্বাস যদি করিত, তবে নাপাক বস্তুকে ঘৃণা করিবার কারণ কি?

এখন এই উভয়সংকট হইতে ধর্মে বিশ্বাস বাঁচাইয়া রাখার উপায় কি?

৪. ঈশ্বর কি স্বেচ্ছাচারী, না নিয়মতান্ত্রিক ?

'নিয়মতন্ত্র' হইল কোন নির্ধারিত বিধান মানিয়া চলা এবং উহা উপেক্ষা করাই হইল 'স্বেচ্ছাচারিতা'। ঈশ্বর স্বেচ্ছাচারী হইলে তাঁহার মহত্ত্বের হানি হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক হইলে তিনি তাঁহার ভক্তদের অনুরোধ রক্ষা করেন কিরূপে?

সুপারিশ রক্ষার অর্থই হইল, আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা। অর্থাৎ স্বয়ং যাহা করিতেন না, তাহাই করা। ঈশ্বর কি কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধ বা সুপারিশে আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবেন না?

AMARBOI.COM

৫. আল্লাহ ন্যায়বান না দয়ালু ?

অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহাই হউক না কেন, বিচারক্ষেত্রে 'ন্যায়' ও 'দয়া'র একত্র সমাবেশ অসম্ভব। কেননা দয়া করিলে ন্যায়কে উপেক্ষা করিতে হইবে এবং ন্যায়কে বজায় রাখিতে হইলে দয়া-মায়া বিসর্জন দিতে হইবে।

বলা হয় যে, আল্লাহ্ ন্যায়বান এবং দয়ালু। ইহা কিরূপে সম্ভব? তবে কি তিনি কোন ক্ষেত্রে ন্যায়বান আর কোন ক্ষেত্রে দয়ালু?

৬. আল্লাহর অনিচ্ছায় কোন ঘটনা ঘটে কি ?

বলা হয় যে, আল্লাহর অনিচ্ছায় কোন ঘটনা ঘটে না। এমনকি গাছের পাতাও নড়ে না। বিশেষত তাঁহার অনিচ্ছায় যদি কোন ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা হইলে তাঁহার 'সর্বশক্তিমান' নামের সার্থকতা কোথায়? আর যদি আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই সকল ঘটনা ঘটে, তবে জীবের দোষ বা পাপ কি?

৭. নিরাকারের সাথে নিরাকারের পার্থক্য কি ?

'আল্লাহ' নিরাকার এবং জীবের 'প্রাণ'ও নিরাকার। যদি উভয়ই নিরাকার হয়, তবে 'আল্লাহ' এবং 'প্রাণ' — এই দুইটি নিরাকারের মধ্যে পার্থক্য কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. নিরাকার পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় কিভাবে ?

ধর্মযাজকদের নিকট শোনা যায় যে, বেহেস্তে বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ (নূর ও আলোরূপে) দর্শন দান করিবেন। যিনি চির অনন্ত, চির অসীম, তিনি কি চির-নিরাকার নহেন?

বিজ্ঞানীদের মতে — স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, যে রূপেই হউক না কেন, কোন রকম পদার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। আলো একটি পদার্থ। উহার গতি আছে এবং ওজনও আছে। নিরাকার আল্লাহ যদি তাঁহার ভক্তদের মনোরঞ্জনের জন্য নূর বা আলো রূপ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে হিন্দুদের ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশে অর্থাৎ অবতারে দোষ কি?

৯. স্থান, কাল ও শক্তি — সৃষ্ট না অসৃষ্ট ?

এ কথা সত্য যে, 'সৃষ্টিকর্তা' বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি হইবেন এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু ধর্মজগতে তাঁহাকে চিত্রিত করা হইয়াছে বিবিধ রূপে এবং তাঁহার সংজ্ঞা ও সংখ্যা সব ক্ষেত্রে এক রকম নহে। বিশেষত ধর্মরাজ্যে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রেই 'ব্যক্তি'রূপে। বলা হয় যে, ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার ; অথচ প্রত্যক্ষে না হইলেও পরোক্ষে তাঁহার চোখ, মুখ ও কান আছে — তাহার আভাস পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রে। এমনকি তাঁহার পুত্র-কন্যা-পরিবারেরও বর্ণনা পাওয়া যায় কোন কোন ক্ষেত্রে।

সৃষ্টিকর্তা হইলেন — যিনি সৃষ্টি করেন বা করিয়াছেন। কোন সৃষ্ট পদার্থ স্রষ্টার চেয়ে বয়সে অধিক হইতে পারে না, এমনকি সমবয়সীও না। কোন কুমার একটি হাঁড়ি তৈয়ার করিল, এক্ষেত্রে হাঁড়ি কখনও কুমারের বয়োজ্যেষ্ঠ বা সমবয়সী হইতে পারে না। অর্থাৎ কর্তার আগে কর্ম অথবা কর্তা ও কর্ম একই মুহূর্তে জন্মিতে পারে না, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।

কোন পদার্থের সৃষ্টিকাল যতই অতীত বা মহাতীত হউক না কেন, উহা কখনও অনাদি হইতে পারে না। যাহা 'সৃষ্টি' তাহা নিশ্চয় কোন এক সময়ে উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কিন্তু বিশ্বে এমন কোন কোন বিষয় আছে, আমরা যাহার আদি, অন্ত, সীমা ও আকার কল্পনা করিতে পারি না। যেমন — স্থান, কাল ও শক্তি। বলা হইয়া থাকে যে, ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার পক্ষান্তরে স্থান, কাল এবং শক্তিও অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার। যথাক্রমে এ বিষয় আলোচনা করিতেছি।

১. স্থান — বিশ্বের দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় পদার্থই কোন না কোন স্থানে অবস্থিত আছে। 'স্থান' (Space) পদার্থপূর্ণ অথবা পদার্থশূন্য, দুইই থাকিতে পারে। কিন্তু 'স্থান'কে থাকিতেই হইবে।

বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই কোন না কোন সময়ে উৎপত্তি হইয়াছে। এমনকি পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে সৃষ্টির দিন-তারিখও দেওয়া আছে। সে যাহা হউক, কোন কিছু বা সব কিছু সৃষ্টির পূর্বে — পদার্থশূন্য থাকিলেও যে 'স্থান' ছিল না, তাহা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং বলিতে হয় যে, 'স্থান অনাদি'।

পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি সৃষ্টি হইয়া কোন 'স্থান'-এ অবস্থান করিতেছে এবং উহারা বিলয় হইলেও ঐ স্থানসমূহ থাকিবে। কেননা, শূন্যস্থান কখনও বিলয় হইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হয় যে, 'স্থান অনন্ত'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলিয়াছেন, "বিশ্ব অসীম অথচ সসীম"। অর্থাৎ নক্ষত্র-নীহারিকাদির পার্থিব জগত সসীম, কিন্তু 'স্থান' অসীম। বিশ্বের 'শেষ প্রান্ত' বলিয়া এমন কোন সীমারেখা কল্পনা করা যায় না, যাহার বহির্ভাগে আর 'স্থান' নাই। সুতরাং 'স্থান অসীম'।

আমরা দেখিতে বা অনুভব করিতে পারি শুধু পদার্থকে, স্থানকে নয়। স্থান পদার্থের ন্যায় লাল, কালো, সবুজাদি রং, লম্বা-চওড়া ইত্যাদি আকৃতিবিশিষ্ট নয়। স্থানের কোন অবয়ব নাই। উহা আকৃতিহীন ও অদৃশ্য। অর্থাৎ নিরাকার।

২. **কাল** — কাল বা সময়কে আমরা দেখিতে পাই না, দেখিতে পাই শুধু ঘটনাকে। কেহ কেহ বলেন যে 'কাল' বা 'সময়' নামে কোন কিছু নাই, 'কাল' হইল ঘটনা পর্যায়ের ফাঁকমাত্র। সাধারণত কালকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। যথা — ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, 'বর্তমান' নামে কোন কালই নাই। কেননা কাল সতত গতিশীল। যাহা গতিশীল তাহার স্থিরতা বা বর্তমানতা অসম্ভব। ভবিষ্যৎ হইতে কাল তীব্রগতিতে আসে এবং নিমেষে অতীতে চলিয়া যায়। এক সেকেণ্ডকে হাজার ভাগ করিলে যে সময়টুকু পাওয়া যায়, সেই সময়টুকু কাল দাঁড়াইয়া থাকে না 'বর্তমান' নামে আখ্যায়িত হইবার প্রত্যাশায়। বর্তমান হইল — অতীত এবং ভবিষ্যতের সন্ধিস্থল মাত্র। উহার কোন বিন্দুতেই কাল এতটুকু স্থিত বা বর্তমান থাকে না। তবে আমরা যে বর্তমান যুগ, বর্তমান বৎসর, বর্তমান ঘটনা ইত্যাদি বলিয়া থাকি, উহা হইল — অতীত এবং ভবিষ্যতের সংমিশ্রণ। যাক সে কথা।

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কোন এক সময়ে, কিন্তু 'সময়'কে সৃষ্টি করিয়াছেন কোন্ সময়ে, তাহার কোন হদিস পাওয়া যায় না। এরূপ কল্পনা করা মোটেই কষ্টকর নয় যে, এমন একটি সময় ছিল, যখন কোনরূপ সৃষ্টিই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে যে 'কাল' ছিল না, তাহা কল্পনা করা যায় না। কাজেই বলিতে হয় যে, কাল 'অনাদি'। পক্ষান্তরে — মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হইবার পর — কাল আর থাকিবে না, তাহাও মানব কল্পনার বাহিরে। সুতরাং বলিতে হয় যে, কাল 'অনন্ত'।

বিশ্বে, মহাবিশ্বে অথবা আরও বাহিরে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে কাল নাই। কালকে কোনস্থানে সীমিত রাখা যায় না। সুতরাং কাল 'অসীম'। অধিকন্তু কাল 'নিরাকার'ও বটে।

৩. **শক্তি** — 'শক্তি' বলিতে আমরা বুঝি যে, উহা কাজ করিবার ক্ষমতা। শক্তিকে জানিতে বেশী দূরে যাইতে হয় না। কেননা উহা আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে, যাহার সাহায্যে আমরা উঠা-বসা, চলা-ফেরা ও নানাবিধ কাজকর্ম করিয়া থাকি। কিন্তু শুধু গায়ের শক্তিতেই সকল রকম কাজ করা যায় না, অন্যান্য রকম শক্তিরও দরকার। গায়ের শক্তিতে কোন কিছু দেখা বা শোনা যায় না, গায়ে জোর থাকা সত্ত্বেও অন্ধ বা বধির ব্যক্তিরা দেখে না বা শোনে না, উহার জন্য চাই দর্শন ও শ্রবণশক্তি। শুধু তাই নয়, আরও অনেক রকম শক্তি আমাদের দরকার এবং উহা আছেও। যেমন — বাকশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, স্পর্শশক্তি, ধীশক্তি, মননশক্তি ইত্যাদি এবং সর্বোপরি জীবনীশক্তি। আমাদের দেহের মধ্যে যেমন রকম-রকম শক্তি আছে, তেমন প্রকৃতিরাজ্যেরও নানাবিধ শক্তি আছে; যেমন — তাপশক্তি, আলোকশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, রাসায়নিক শক্তি ইত্যাদি।

বস্তুজগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার মধ্যে কোনরূপ শক্তি নাই। সামান্য একটি দূর্বাপত্রেরও রোগ নিরাময় করিবার শক্তি আছে। মূল কথা এই যে, এই জগৎটিই শক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীলাখেলা। অর্থাৎ — শক্তি জগৎময় এবং জগৎ শক্তিময়।

বিজ্ঞানী প্রবর আইনস্টাইন বলিয়াছেন যে, 'পদার্থ' শক্তির রূপান্তর মাত্র। শক্তি সংহত হইয়া হয় পদার্থের উৎপত্তি এবং পদার্থের ধ্বংসে হয় শক্তির উদ্ভব। কি পরিমাণ শক্তির সংহতিতে কি পরিমাণ পদার্থ এবং কি পরিমাণ পদার্থ ধ্বংসে কি পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হইতে পারে, তাহা তিনি অংকের সাহায্যে দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, একটি মটর পরিমাণ পদার্থকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে পারিলে তাহা হইতে যে শক্তির উদ্ভব হইবে, তাহা দ্বারা বড় রকমের একখানা মালবাহী জাহাজ চালানো যাইবে লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক পর্যন্ত। আইনস্টাইনের এই সূত্র ধরিয়াই অধুনা হইয়াছে পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, এই জগতে জৈবাজৈব সমস্ত পদার্থই শক্তির রূপান্তর। অর্থাৎ জগতের সব কিছু সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে 'শক্তি'।

কোনরূপ কাজ করিতে হইলেই আগে চাই সেই কাজটি সমাধা করিবার মত শক্তি। অর্থাৎ শক্তি আগে ও কাজ পরে। এই জগত ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই সৃষ্টিকাজেও তাঁহার আবশ্যক হইয়াছিল শক্তির। যখন হইতে ঈশ্বর আছেন, তখন হইতে তাঁহার শক্তিও আছে। আমরা এমন একটি সময়কে কল্পনা করিতে পারি না, যখন ঈশ্বর ছিলেন অথচ তাঁহার শক্তি ছিল না। ঈশ্বর অনাদি। কাজেই শক্তিও 'অনাদি'। পক্ষান্তরে আমরা এমন একটি সময়কে কল্পনা করিতে পারি না, যখন কোনরূপ পদার্থ না থাকিলেও শক্তি থাকিবে না। কাজেই মানিতে হয় যে, 'শক্তি অনন্ত'।

কোন পদার্থ বা পদার্থের অণুপরমাণুও যেমন শক্তিবিহীন নয়, তেমন সৌরজগত, নক্ষত্র বা নীহারিকাজগত অথবা তাহারও বহির্দেশের কোথায়ও শক্তিবিরল জায়গা নাই। শক্তি কোন স্থানে সীমিত নয়। অর্থাৎ 'শক্তি অসীম'।

তাপশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, চুম্বকশক্তি ইত্যাদি নানাবিধ শক্তির আমরা ক্রিয়া দেখিতেছি। কিন্তু কখনও শক্তিকে দেখিতে পাইতেছি না। আমরা প্রাণশক্তিবলে বাঁচিয়া আছি এবং নানারূপ কর্ম করিতেছি। কিন্তু প্রাণশক্তিকে দেখিতে পাইতেছি না। কেননা, শক্তির কোন আকার নাই, 'শক্তি নিরাকার'।

এ যাবত যে সমস্ত আলোচনা করা হইল, তাহাতে মনে হয় যে, ঈশ্বর যেমন অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার, তেমনই স্থান, কাল ও শক্তি — ইহারা সকলেই অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার। এখন প্রশ্ন এই যে, ইহারা কি সৃষ্ট না অসৃষ্ট। অর্থাৎ ঈশ্বর কি ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, না অনাদিকাল হইতে ইহারা স্বভাবতই বিদ্যমান আছে? যদি বলা হয় যে, ইহারা স্বভাবতই বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে ইহারা ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে; এবং যদি বলা হয় যে, ইহারা ঈশ্বরের সৃষ্টি — তবে পরমেশ্বর 'স্থান'কে সৃষ্টি করিলেন কোন স্থানে থাকিয়া, 'কাল'কে সৃষ্টি করিলেন কোন কালে এবং 'শক্তি'কে সৃষ্টি করিলেন কোন শক্তির দ্বারা?

১০. সৃষ্টি যুগের পূর্বে কোন্ যুগ?

ধর্মীয় মতে, হঠাৎ পরমেশ্বরের খেয়াল হইল যে, তিনি সৃষ্টি করিবেন — জীব ও জগত। তিনি আদেশ দিলেন, 'হইয়া যাও' — অমনি হইয়া গেল জগত এবং পশু-পাখি, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ ও মনুষ্যাদি সবই। **বিশ্বচরাচরের যাবতীয় সৃষ্টিকার্য শেষ হইতে সময় লাগিল মাত্র ছয়দিন।**[১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু অনাদিকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়া পরমেশ্বর হঠাৎ সক্রিয় হইলেন কেন, ধর্মযাজকগণ তাহা ব্যাখ্যা করেন না।

জীব ও জগত সৃষ্টির পর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কে মানুষ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উহার এক এক ভাগকে বলা হয় এক-একটি যুগ। হিন্দুশাস্ত্রমতে যুগ চারিটি। যথা — সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। উহাদের ব্যাপ্তিকাল যথাক্রমে — সত্যযুগ ১৭,২৮,০০০, ত্রেতাযুগ ১২,৯৬,০০০, দ্বাপর ৮,৬৪,০০০, এবং কলি ৪,৩২,০০০ বৎসর। আলোচ্য যুগচতুষ্টয়ের মোট বয়সের পরিমাণ ৪৩,২০,০০০ বৎসর। কিন্তু কলি যুগটি শেষ হইতে এখনও প্রায় ৪,২৭,০০০ বৎসর বাকি।[২] সুতরাং আলোচ্য যুগচতুষ্টয়ের অতীত বয়স মাত্র ৩৮,৯৩,০০০ বৎসর [ইহা বিজ্ঞানীদের সর্বাধুনিক প্লিষ্টোসেন উপযুগটির সমানও নহে। এই উপযুগটির বর্তমান বয়স প্রায় ৫০ লক্ষ বৎসর]।

পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ মতে, জীব ও জগত সৃষ্টি হইয়াছে খৃ. পূ. ৪০০৪ সালে[৩] এবং বর্তমানে খৃ. ১৯৭২। সুতরাং এই মতে জগতের বর্তমান বয়স ৫৯৭৬ বৎসর। অর্থাৎ প্রায় ছয় হাজার বৎসর (ইহা হাস্যকররূপে অল্প)।

কাইপারাদি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, প্রায় ৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে আমাদের সূর্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহারও ৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছিল আমাদের নক্ষত্র জগত। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে আমাদের পৃথিবীর বয়স ৪০০ কোটি বৎসর।[৪]

উক্ত চারিশত কোটি বৎসরকে বিজ্ঞানীগণ (ভূতত্ত্বের স্তরসমূহের ক্রমানুসারে) কয়েকটি যুগ বা উপযুগে বিভক্ত করিয়াছেন। এখন হইতে ৫৫ কোটি বৎসর পূর্বের যাবতীয় সময়কে একত্রে বলা হয় 'প্রাক ক্যামব্রিয়ান মহাযুগ' (Archaeo Zoic)। এই যুগের প্রথম দিকে পৃথিবীতে কোনরূপ জীব বা জীবনের অস্তিত্ব ছিল না। এই যুগটি অতিবাহিত হইয়াছিল — জ্বলন্ত পৃথিবী নির্বাপিত হইয়া তরল ও কঠিন হইতে এবং উত্তাপ কমিয়া জল-বায়ু সৃষ্টি হইয়া প্রাণীদের যুগ (Placo Zoic) ৩১ কোটি বৎসর, মধ্যজীবীয় যুগ বা সরীসৃপদের যুগ (Meso Zoic) ১২ কোটি বৎসর ও নবজীবীয় যুগ বা স্তন্যপায়ীদের যুগ (Caino Zoic) ৭ কোটি বৎসর (এই যুগটি এখনও চলিতেছে)।[৫]

জীববিজ্ঞানীদের মতে, প্রাক ক্যামব্রিয়ান মহাযুগের শেষের দিকে পৃথিবীতে জীবন বা জীবের সূত্রপাত হইয়াছিল মাত্র এবং উহা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ পাইয়াছে নবজীবীয় যুগে। এই যুগেই হইয়াছে পশু, পাখী, মানুষ ইত্যাদি উন্নতমানের জীবের আবির্ভাব।

আলোচ্য যাবতীয় যুগের ব্যাপ্তিকাল কোন মতে মাত্র ছয় হাজার বৎসর এবং কোন মতে এক হাজার কোটি বৎসর। ধর্ম বা বিজ্ঞান, যে কোন মতেই হউক না কেন, সৃষ্টির পর হইতেই যুগ গণনা করা হইয়া থাকে। তাই সামগ্রিকভাবে ইহাকে আমরা বলিতে পারি 'সৃষ্টি-যুগ'। এই সৃষ্টি-যুগেই দেখা যায় সৌরজগত, নক্ষত্রজগত ইত্যাদির পরিচালন এবং জীবজগতের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণ ইত্যাদি পরমেশ্বরের যত সব কর্ম-তৎপরতা।

ঈশ্বর অনাদি এবং 'কাল'ও অনাদি। কিন্তু যুগসমূহ অনাদি নয়, উহা সাময়িক। যখন হইতে ঈশ্বর আছেন, তখন হইতে কালও আছে। সেই 'অনন্ত কাল'-এর সাথে কয়েক হাজার বা কোটি বৎসর সময়ের তুলনাই হয় না। এমন এক কাল নিশ্চয়ই ছিল, যখন কোনরূপ সৃষ্টিই ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই 'অনাদি কাল'কে আমরা বলিতে পারি 'অনাদি যুগ' বা 'অসৃষ্ট-যুগ'। সে অনাদি-অসৃষ্ট যুগে পরমেশ্বর কি করিতেন?

১১. ঈশ্বর কি দয়াময়?

'দয়া' একটি মহৎ গুণ, এই গুণটির অধিকারীকে বলা হয় 'দয়াবান'। মানুষ 'দয়াবান' হইতে পারে, কিন্তু 'দয়াময়' হইতে পারে না। কেননা মানুষ যতই ঐ গুণটির অধিকারী হউক না কেন, উহাতে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। আর ঈশ্বর ঐ গুণে পূর্ণ, তাই তাঁহার একটি নাম 'দয়াময়'।

কোন ব্যক্তি যদি একজন ক্ষুধার্তকে অন্নদান ও একজন পথিকের মাল লুণ্ঠন করে, একজন জলমগ্নকে উদ্ধার করে ও অন্য কাউকে হত্যা করে অথবা একজন গৃহহীনকে গৃহদান করে এবং অপরের গৃহ করে অগ্নিদাহ – – তবে তাহাকে 'দয়াময়' বলা যায় কি? হয়ত ইহার উত্তর হইবে — 'না'। কিন্তু উক্তরূপ কার্যকলাপ সত্ত্বেও ঈশ্বর আখ্যায়িত আছেন 'দয়াময়' নামে। এখন সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

জীবজগতে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বিদ্যমান। যখন কোন সবল প্রাণী দুর্বল প্রাণীকে ধরিয়া ভক্ষণ করে, তখন ঈশ্বর খাদকের কাছে 'দয়াময়' বটে। কিন্তু তখন তিনি কি খাদ্য-প্রাণীর কাছেও দয়াময়? যখন একটি সর্প একটি ব্যাঙকে ধরিয়া আস্তে আস্তে গিলিতে থাকে, তখন তিনি সর্পটির কাছে দয়াময় বটে। কিন্তু ব্যাঙটির কাছে তিনি নির্দয় নহেন কি? পক্ষান্তরে তিনি যদি ব্যাঙটির প্রতি সদয় হ'ন, তবে সর্পটি অনাহারে মারা যায় না কি? ঈশ্বর এক জীবকে অন্য জীবের খাদ্য নির্বাচন না করিয়া নির্জীব পদার্থ যথা— সোনা, রূপা, লোহা, তামা, মাটি, পাথর ইত্যাদি নির্বাচন করিতে পারিতেন কি না? না পারিলে কেঁচোর খাদ্য মাটি হইল কিরূপে?

ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবেরা সকলেই তাঁহার দয়ার সমানাংশ প্রাপ্তির দাবীদার। কিন্তু তাহা পাইতেছে কি? খাদ্য সম্বন্ধে বলা যায় যে, ঈশ্বর মানুষের জন্য চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ইত্যাদি অসংখ্য রকম খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং পশু-পাখীদের জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন ঘাস-বিচালী, পোকা-মাকড় আর কুকুরের জন্য বিষ্ঠা। ইহাকে ঈশ্বরের দয়ার সমবণ্টন বলা যায় কি?

কাহারও জীবন রক্ষা করা যদি দয়ার কাজ হয় এবং হত্যা করা হয় নির্দয়তার কাজ, তাহা হইলে খাদ্য-খাদক ব্যাপারে ঈশ্বর 'সদয়'-এর চেয়ে 'নির্দয়'ই বেশী। তবে কতগুণ বেশী, তাহা তিনি ভিন্ন অন্য কেহ জানে না, কেননা তিনি এক একটি জীবের জীবন রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অসংখ্য জীবকে হত্যা করিয়া থাকেন। কে জানে একটি মানুষের জীবনরক্ষার জন্য তিনি কয়টি মাছ, মোরগ, ছাগল ইত্যাদি হত্যা করেন? কে জানে তিনি একটি শৌল, গজাল, বোয়াল মাছ এবং একটি বক পাখীর জীবনরক্ষার উদ্দেশ্যে কয়টি চুনো মাছ হত্যা করেন? আমিষভোজী জীবদের প্রতি ঈশ্বরের এত অধিক দয়া কেন? তিনি কি হতভাগাদের 'দয়াময়' নহেন?

বলা হইয়া থাকে যে, মানুষ ঈশ্বরের সখের সৃষ্ট জীব। তাই মানুষের উপর তাঁহার দয়া-মায়াও বেশী। কিন্তু মানুষ ভেদে তাঁহার দয়ার তারতম্য কেন? ঈশ্বর দয়া করিয়া সকল মানুষকেই প্রাণদান করিয়াছেন এবং দান করিয়াছেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি সমান মাপে। অথচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের জীবিকা নির্বাহের কোন ব্যাপারেই ঈশ্বরের দয়ার সমবণ্টন নাই কেন? কেহ সুরম্য হর্মে বাস করে সাততলায় এবং কেহবা করে গাছতলায়। কেহ পঞ্চামৃত (দুগ্ধ-দধি-ঘৃত-মধু-চিনি) আহার করে এবং কেহ জল-ভাতে শুধু লবণ ও লঙ্কাপোড়া পায় না কেন? কেহ লম্ফ-ঝম্প ও দৌড় প্রতিযোগিতায় রেকর্ড করে, কেহ মল্লযুদ্ধে পদক পায়; আবার অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গেরা রাস্তায় বসিয়া অন্যের পায়ে আঘাত পায়। ঈশ্বরের দয়াবণ্টনে এরূপ পক্ষপাতিত্ব কেন? আর 'ভাগ্য' বলিয়া কিছু আছে কি-না। থাকিলে কাহারও ভাগ্যে চিরশান্তি নাই কেন? ভাগ্যের নিয়ন্তা কে?

কাহারও জীবন রক্ষা করা দয়ার কাজ বটে, কিন্তু কাহাকেও বধ করা দয়ার কাজ নহে। বরং উহা দয়াহীনতার পরিচয়। জগতে জীবের বিশেষত মানুষের জন্মসংখ্যা যত, মৃত্যুসংখ্যা তত। সুতরাং জন্ম ও মৃত্যুর ব্যাপারে ঈশ্বর যেই পরিমাণ সদয়, সেই পরিমাণ নির্দয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের সদয়তা ও নির্দয়তার পরিমাণ এক্ষেত্রে সমান।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কেহ কেহ মনে করেন যে, **ঈশ্বর সদয়ও নহেন এবং নির্দয়ও নহেন। তিনি নিরাকার, নির্বিকার ও অনির্বচনীয় এক সত্তা। যদি তাহা নাই হয়, তবে পৃথিবীতে শিশুমৃত্যু, অপমৃত্যু, এবং ঝড়-বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাণহানিকর ঘটনাগুলির জন্য তিনিই কি দায়ী নহেন?**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয়প্রস্তাব

[পরকাল বিষয়ক]

১. জীবসৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ?

কেহ কেহ বলেন, মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল — আল্লাহর নাম ও গুণ কীর্তন করা। তাহাই যদি হয়, তবে ইতর জীব সৃষ্টির কারণ কি? তাহারাও যদি ঐ পর্যায়ে পড়ে, তাহা হইলে তাহাদেরও বিচারান্তে স্বর্গ বা নরকবাসী হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হইবে কি? বলা হয় যে, মানুষ ও ইতর জীবের মধ্যে জ্ঞানের বৈষম্য আছে, তাই পরকালেও উহাদের মধ্যে বৈষম্য থাকিবে। বৈষম্য আছে বটে, কিন্তু একবারেই জ্ঞানহীন কোন জীব আছে কি? অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে অতি বৃহৎ হস্তী অবধি প্রত্যেকেই ন্যূনাধিক জ্ঞানের অধিকারী। কাক, শৃগাল, বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদির বুদ্ধিবৃত্তির নিকট সময় সময় সুচতুর মানুষও হার মানে এবং বোল্‌তা, ভীমরুল, মধুমক্ষিকা, উইপোকা ও বাবুই পাখীর গৃহ নির্মাণের কৌশলের কাছে মানুষের জ্ঞানগরিমা ম্লান হইয়া যায়। আবার মানুষের মধ্যেও এমন কতগুলি অসভ্য ও বোকা শ্রেণীর মানুষ দৃষ্ট হয়, যাহারা জ্ঞানের মাপকাঠিতে মনুষ্য পদবাচ্য নহে। তাহারা সৃষ্ট হইল কোন উদ্দেশ্যে?

২. পাপ-পুণ্যের ডায়রী কেন ?

ধর্মযাজকগণ বলিয়া থাকেন, মানুষের পাপ-পুণ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য প্রত্যেকটি মানুষের কাঁধে দুইজন করিয়া ফেরেস্তা বসিয়া আছেন। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, ঐ ফেরেস্তাদের রিপোর্ট অনুসারেই খোদাতা'লা মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন। বলা হয় যে, আল্লাহ্ সর্বদর্শী ও সর্বশক্তিমান। তবে মানুষের কৃত পাপ-পুণ্য তিনি কি নিজে দেখেন না? অথবা দেখিলেও মানুষের সংখ্যাধিক্যের জন্যই হউক অথবা সময়ের দীর্ঘতার জন্যই হউক, বিচারদিন পর্যন্ত উহা স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই কি?

৩. পরলোকের সুখ-দুঃখ শারীরিক, না আধ্যাত্মিক ?

জীবের মৃত্যুর পর তাহার দেহটি রূপান্তরিত হইয়া পৃথিবীর কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয়। আবার ঐ সকল পদার্থের অণুপরমাণুগুলি নানা উপায়ে গ্রহণ করিয়াই হয় নূতন জীবের দেহগঠন। জীবদেহের ত্যাজ্য মসলা। আবার মৃত্যুর পর আমার এই দেহের উপাদানে হইবে লক্ষ লক্ষ জীবের দেহগঠন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করা যাক — কোন এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ডাক্তারকে দিয়া একটি পাঁঠার দেহের প্রতিটি অণু বা কোষ (Cell) কোন উপায়ে চিহ্নিত করা হইল, যাহাতে যে কোন স্থান হইতে উহাদিগকে চিনিয়া বাহির করা যায়। এখন যদি ঐ পাঁঠাটি কোন এক ভোজসভায় পাক করিয়া একশত লোককে ভোজন করান যায় এবং বাকি ত্যাজ্য অংশ শৃগাল, কুকুর, কাক, শকুন, পিপীলিকা ইত্যাদিতে খাইয়া ফেলে তাহা হইলে কিছুকাল পরে ঐ পাঁঠাটির দেহটি পুনর্গঠন করিতে কতগুলি জীবদেহ কর্তন (Operation) করিতে হইবে? চিহ্নিত অংশগুলিকে চিনিয়া বাহির করিতে পারিলেও যতগুলি প্রাণী ঐ পাঁঠাটির দেহ ভক্ষণ করিয়াছিল, ততগুলি প্রাণীর দেহ কর্তন না করিয়া কোনমতেই ঐ পাঁঠাটির দেহ পুনর্গঠন সম্ভব হইবে না। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রাণীবিশেষের দেহ অন্যান্য বহু প্রাণীর দেহ হইতে আহৃত পদার্থসমূহের সমষ্টির ফল। অর্থাৎ যে কোন একটি জীবের দেহ অন্যান্য বহু জীবের দেহ হইতে উদ্ভূত হইতেছে। এমতাবস্থায় পরকালে একই সময় যাবতীয় জীবের দেহ বর্তমান থাকা কি সম্ভব? যদি হয়, তবে প্রত্যেক দেহে তাহাদের পার্থিব দেহের সম্পূর্ণ পদার্থ বিদ্যমান থাকিবে কিরূপে? যদি না থাকে, তবে স্বর্গ-নরকের সুখ-দুঃখ কি আধ্যাত্মিক?

স্বর্গ-নরকের সুখ-দুঃখ ও গোর-আজাব সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ শোনা যায়, তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চলে না। শোনা যায় যে, মৃত্যুর পরে শবদেহকে কবরের ভিতরে পুনর্জীবিত করা হয় এবং 'মনকির' ও 'নকির' নামক দুইজন ফেরেস্তা আসিয়া প্রত্যেক মৃতকে তাহার ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করে। যাহারা পাপী, তাহারা ঐ সবের জবাব দিতে পারে না বলিয়া তাহাদের উপর ঐ ফেরেস্তাদ্বয় অমানুষিক অত্যাচার চালায় ও গুর্জের (গদার?) আঘাতে দেহ ৭০ গজ নীচে প্রোথিত হইয়া যায়। আবার তাহারা উহাকে পুনরোত্তলন করিয়া লয়। দোজখ হইতে সুড়ঙ্গপথে আগুনের উত্তাপ আসিয়া পাপীদিগকে চিরদিন পর্যন্ত জ্বালাইতে থাকে। অবশ্য পুণ্যবান ব্যক্তিগণ সুড়ঙ্গপথে বেহেস্তের মলয় বায়ু উপভোগ করিতে থাকেন।

দোজখের শাস্তির বর্ণনায় শোনা যায় যে, পাপীদিগকে পুঁজ, রক্ত, গরম পানি ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হইবে, সূর্যের অত্যধিক উত্তাপে পাপীদের মস্তিষ্ক বিগলিত হইয়া যাইবে। চক্ষুর সাহায্যে পাপী যে পাপ করিয়াছে — যেমন যে পাপী পরস্ত্রী দর্শন করিয়াছে, তাহার চক্ষুকে শাস্তি দেওয়া হইবে। এইরূপ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও, যাহাদের সাহায্যে কোন প্রকার পাপ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত পাপের জন্য ঐ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শাস্তি হইয়া থাকিবে।

বেহেস্তের সুখের বর্ণনায় শোনা যায় যে, পুণ্যবানগণ নানারকম সুমিষ্ট সুস্বাদু ফল আহার করিবেন, নেশাহীন মদিরা পান করিবেন, হুরীদের সহবাস লাভ করিবেন — এক কথায়, প্রত্যেক পুণ্যবান ব্যক্তি মধ্যযুগের এক একজন সম্রাটের ন্যায় জীবনযাপন করিবেন।

ঐ সকল বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, পারলৌকিক সুখ-দুঃখ ভোগ ও অন্যান্য কার্যকলাপ কোনটিই আধ্যাত্মিক অর্থে বর্ণিত হয় নাই, বরং দৈহিক অর্থেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল ব্যাপার সকলই যে দৈহিক, এ কথারও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা চলে না। এই দুই প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে গ্রহণযোগ্য কোনটি?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. গোর আজাব কি ন্যায়সঙ্গত ?

বলা হইয়া থাকে যে, খোদাতা'লাই একমাত্র পাপ-পুণ্যের বিচারক। মৃত্যুর পর সকল জীব বিচারদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে এবং প্রমাণাদি গ্রহণপূর্বক বিচারের পরে পাপী দোজখে এবং পুণ্যবান বেহেস্তে যাইবে। কিন্তু একথাও বলা হইয়া থাকে যে, মৃতকে কবরস্থ করার পরই মনকির ও নকির ফেরেস্তাদ্বয় আসিয়া নানারূপ প্রশ্ন করিবেন এবং সন্তোষজনক জবাব না পাইলে তাঁহারাই শাস্তি দেওয়া আরম্ভ করিবেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, পাপীদের প্রতি গোর আজাব কেন, খোদাই যদি পাপ-পুণ্যের বিচার করেন এবং বিচারের পরেই যদি পাপীর নরক এবং পুণ্যবানের স্বর্গসুখ ভোগ করিতে হয়, তবে বিচারের পূর্বে পাপী ও পুণ্যবান ন্যায়বিচারক আল্লাহর কাছে একই রকম ব্যবহার আশা করিতে পারে না কি? যদি বলা হয় যে, ঐ গোর আজাব ভোগ পাপীর পাপকর্মেরই ফল, খোদার হুকুমের শাস্তি, — তাহা হইলে বিচারদিনে বিচারের প্রহসন করার প্রয়োজন কি? আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা। মৃত্যুর পর হইতেই তিনি পাপীকে নরক ও পুণ্যবানকে স্বর্গসুখ ভোগ করাইতে পারেন না কি?

গোর আজাবের বর্ণনা পড়িলে বুঝা যায় যে, উহা একমাত্র ভূগর্ভেরই আজাব, ভূ-পৃষ্ঠের নহে। সচরাচর দেখা যায় যে, আকস্মিক দুর্ঘটনায় বহুলোক মারা যায়, যাহাদের লাশ কবরস্থ হয় না। উহারা জলে-স্থলে ইতস্তত পড়িয়া থাকিয়া শিয়াল-কুকুর ও কাক-শকুনের ভক্ষ্য হয়। উহাদের গোর আজাব হয় না কি? হইলে কিরূপ হয়?

ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানাদি (Semitic) জাতিরাই লাশ মাটিতে পুঁতিয়া রাখে, অন্যান্য জাতিরা ইহা করে না। তাহারা কেহ লাশ জলে ভাসাইয়া দেয়, কেহ মাঠে ফেলিয়া রাখে, কেহ পর্বতের চূড়ায় রাখিয়া দেয়, কেহ গাছের শাখায় ঝুলাইয়া রাখে এবং কেহবা আগুনে জ্বালাইয়া দেয়। এইভাবে যে সকল মানুষ পরজগতের যাত্রী হয়, তাহাদের গোর আজাব হয় না কি? যদি হয়, তবে কিরূপে? আর যদি না হয়, তবে লাশকে কবরে রাখিয়া লাভ কি?

কঠিন বা সহজ যেভাবেই হউক, গোর আজাবের সময়সীমা — লাশকে কবরস্থ করার পর হইতে কেয়ামত (মহাপ্রলয়) পর্যন্ত। মনে করা যাক যে, কোন একজন পাপী মরণান্তে লক্ষ বৎসর গোর আজাব ভোগের পর কেয়ামত হইল, অর্থাৎ সে ব্যক্তি একলক্ষ বৎসর গোর আজাব ভোগ করিল। আবার ঐ ব্যক্তির সমান পাপে আর এক ব্যক্তি মারা গেল কেয়ামতের দুই দিন পূর্বে। এ ক্ষেত্রে ঐ উভয় ব্যক্তির গোর আজাব ভোগের পরিমাণ সমান হইল কি?

৫. পরলোকের স্বরূপ কি ?

'পরকাল' থাকিলে পরলোক বা পরজগত নিশ্চয়ই থাকিবে। কিন্তু পরকাল সম্বন্ধে দাবীটি যত অধিক জোরালো এবং পরিষ্কার, পরজগত বিষয়ে বিবরণটি তত অধিক ঘোরালো বা অস্পষ্ট। ইহজগতে মানুষের স্থিতিকাল নিতান্তই অল্প, বড়জোর ৬০, ৭০ কিংবা ১০০ বৎসর। মানুষ এই সামান্য সময়ের জন্য পৃথিবীতে বাস করিতে আসিয়া তাহার বহুমুখী জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার জন্য আকাশ, পাতাল, সাগর, পাহাড় সর্বত্রই বিচরণ ও পর্যবেক্ষণ করিতেছে। এমনকি পদার্থের অণুকে দেখিয়া এখন পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া তাহার শক্তি পরীক্ষা ও ব্যবহার করিতেছে। আর তাহার অনন্তকালের আবাস যে পরজগত, তাহা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা একান্তই ভাসা-ভাসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মগুরুদের আধ্যাত্মিক পর্যটনের বিবরণ হইতে পরজগতের একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের বিবরণ মতে পরজগত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা — হাশর মাঠ, বেহেস্ত ও দোজখ। ইহারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। যেহেতু হাশরের মাঠ হইতে যাত্রা করিয়া দোজখে যাওয়া যায় এবং পোলছিরাত পার হইয়া বেহেস্তেও যাওয়া যায়। পৃথিবীতে ইহার একটি রূপক ব্যবহার করা যাইতে পারে। মনে করা যাক — আরব সাগর একটি অগ্নিসমুদ্র (দোজখ)। ইহার উপর দিয়া বোম্বাই হইতে এডেন পর্যন্ত একটি পুল আছে। এখন ভারতবর্ষ যদি হয় হাশরের মাঠ, তাহা হইলে আরবদেশ হয় বেহেস্ত। অবস্থানটি এইরূপ নয় কি?

> সে যাহা হউক, পরজগত যে কোন এক সৌরজগতের অধীন, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় হাশর মাঠের প্রাকৃতিক বর্ণনায়। কথিত হয় যে, হাশর ময়দানে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে পাপীদের মস্তিষ্ক বিগলিত হইবে এবং বেহেস্তে সুস্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত হইবে। ইহাতে মনে হয় যে, হাশরের মাঠ ও দোজখ, সেখানের বিষুবীয় অঞ্চলে হইবে এবং বেহেস্ত হইবে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত।

পরজগতের আয়তন ইহজগতের তুলনায় কতগুণ বড় বা ছোট এবং হাশর মাঠের সীমা–চৌহদ্দি কি তাহা জানি না। তবে বেহেস্ত–দোজখ সসীম। যেহেতু সংখ্যায় বেহেস্ত ৮টি এবং দোজখ ৭টি। যাহা সংখ্যা দ্বারা সূচিত হয়, তাহা সসীম হইতে বাধ্য। কেননা এক একটি বেহেস্ত বা দোজখ আয়তনে যত বিশালই হউক না কেন, একটির শেষসীমা নির্ধারিত না হইলে আর একটির অবস্থান অসম্ভব। কাজেই যে কোন একটির সীমা নির্ধারিত হইলে সব কয়টির সীমা যে নির্দিষ্ট, তাহা অনিবার্য। তাই প্রশ্ন হইতেছে যে, বেহেস্ত, দোজখ এবং হাশর মাঠের বহির্ভাগে কোন দেশ থাকিবে কি? থাকিলে — সে দেশে কোন বাসিন্দা থাকিবে কি না?

শোনা যায় যে, পরলোকে সূর্য থাকিবে এবং সে উত্তাপ প্রদান করিবে। তবে কি আলো প্রদান করিবে না? যদি করে, তাহা হইলে কি পরলোকেও দিনরাত্রি হইবে? যদি হয়, তবে তাহা কি রকম হইবে? অর্থাৎ সূর্য দৌড়াইবে, না ইহজগত বা পৃথিবীর মত পরজগতটি ঘুরিবে, না অনন্তকাল শুধু দিনই থাকিবে?

৬. ইহকাল ও পরকালে সাদৃশ্য কেন?

পরকালের অন্তর্গত কবর, হাশর, বেহেস্ত, দোজখ ইত্যাদির যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেকটি বর্ণনার বিষয়বস্তুই যেন এই পৃথিবীর বিষয়বস্তুর অনুকরণ বা সংস্করণ। যথা — (কবরে) সওয়াল বা প্রশ্ন, গুর্জ বা গদা, স্নিগ্ধ সমীরণ, উত্তপ্ত বায়ু প্রভৃতি ; (হাশর ময়দানে) তামার পাত, সূর্যের তাপ, সাক্ষ্য–জবানবন্দী, দাঁড়ি–পাল্লা, বিচার ইত্যাদি ; (বেহেস্তে) সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফল, সুপেয় জল, দুগ্ধ, মধু, সুন্দরী রমণী ইত্যাদি এবং (দোজখে) অগ্নি, পুঁজ, রক্ত, গরম জল, পোল, সাঁড়াশী ইত্যাদির যাবতীয় পারলৌকিক বর্ণনাসমূহের আদ্যন্ত পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, পরলোকের সবকিছুই যেন এই পৃথিবী হইতে গৃহীত, কিছুটা পরিবর্ধিত ও কিছুটা পরিবর্তিত। পরলোকে কি কিছুই অভিনব থাকিবে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. স্বর্গ–নরক কোথায় ?

এক কবি বলিয়াছেন —

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ–নরক, মানুষেই সুরাসুর।

কবিকল্পিত ঐ স্বর্গ–নরক এই জগতেই। তবে উহা আধ্যাত্মিক, মানুষের মনোরাজ্যেই উহার অবস্থান। ইহা ভিন্ন পৃথিবীতে আর এক রকম স্বর্গের কথা শোনা যায়, উহা মানুষের শান্তির আবাস।

হিন্দুশাস্ত্র আলোচনায় জানা যায় যে, স্বর্গ দেশটি দেব-দেবীগণের বাসস্থান। ওখানে চিরবসন্ত বিরাজিত এবং শোক–তাপ, জরা–মৃত্যু কিছুই ওখানে নাই। ওখানে নন্দন কানন, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভি গাভী, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি সুখ সাধনের সামগ্রী সমস্তই বিদ্যমান আছে এবং স্বর্গবাসীদের কামনা–বাসনা মিটাইবার জন্য ওখানে অপ্সরা, কিন্নরী, গন্ধর্ব ইত্যাদি দেহবিলাসিনীও আছে।

উক্ত দেবপুরী বা স্বর্গদেশ দুর্গম, দুরারোহ ও অতিউচ্চে অবস্থিত স্থান। হিন্দুমতে উহা সুমেরু পর্বতের উপরে অবস্থিত। বস্তুত উহা হিমালয় পর্বতের অংশবিশেষ।[৬] অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন না হইলে ওখানে কেহই পৌঁছিতে পারিত না। ওখান হইতে নীচু সমতল ভূমিকে বলা হইত 'মর্ত্য'। সাধারণ মানুষ এই মর্ত্যলোকেই বাস করিত। শুধু দেবতারাই স্বর্গে ও মর্ত্যে যাতায়াত করিতে পারিতেন, সাধারণ মানুষ তাহা পারিত না।

মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির পদব্রজে সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গগমনের গতিপথ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, ঐ স্বর্গটি কৈলাসপুরী ভিন্ন আর কোথায়ও নহে এবং হিমালয় পর্বতের একাংশে উহা অবস্থিত ছিল।[৭] ধর্মপুত্র ওখানে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন, না পথেই মারা গিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু তৎপর বিখ্যাত পর্বতারোহী তেনজিং ও হিলারী বাদে বোধহয় আর কোন মানুষ ওখানে যায় নাই।

মর্ত্যবাসী মানুষের ওখানে যাতায়াত নাই বলিয়া, দেবতারা ঐ স্বর্গে এখনও বাঁচিয়া আছেন, না মারা গিয়াছেন এবং ঐ স্বর্গটি আবাদী আছে, না জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে — বর্তমানে তাহার কোন খবর নাই। ঐ স্বর্গটি বা স্বর্গীয় দেব–দেবীগণ বর্তমান থাকিলে ইদানিং পর্বতারোহীদের সামনে পড়িতেন।

রামায়ণ পাঠে জানা যায় যে, লঙ্কাধিপতি রাবণ মর্ত্য হইতে স্বর্গে আরোহণ করিয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করিয়া 'ইন্দ্রজিৎ' আখ্যা পাইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, যে কোন মর্ত্যবাসী গায়ের জোরেই ঐ স্বর্গে যাইতে পারিত। অতঃপর লঙ্কেশ্বর মর্ত্যবাসীগণ যাহাতে সহজে স্বর্গে উঠিতে পারে তাহার জন্য মর্ত্য হইতে স্বর্গ পর্যন্ত একটি সিঁড়ি তৈয়ার করিবার পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু রামের হাতে তাঁহার অকালমৃত্যু হওয়ায় উহা তিনি কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাতে মনে হয় যে, রাবণরাজ দেবপুরী বা স্বর্গ অর্থাৎ হিমালয় পর্বতে আরোহণোপযোগী একটি সহজ পথ আবিষ্কারের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমানদের পুরাণকাহিনী অনেক ক্ষেত্রে তৌরিত কেতাব তথা বাইবেলের অনুসারী। তবে কোন কোন স্থানে নামধামের সামান্য অদলবদল দেখা যায়। যেমন — ইভ = হাওয়া, সর্প = শয়তান, জ্ঞানবৃক্ষ = গন্দম, এদন উদ্যান = বেহেস্ত ইত্যাদি।

তৌরিতে যে স্থানকে 'এদন উদ্যান' বলা হইয়াছে, মুসলমানগণ ঐ স্থানকেই 'বেহেস্ত' এবং ঐ স্থানের ঘটনাবলীকেই বেহেস্তের ঘটনাবলী বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন।

হজরত আদমের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে তৌরিতের বিবরণটি এইরূপ — "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্বদিকে এদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনার নির্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সর্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষ এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে 'জীবন বৃক্ষ' ও 'সদসদজ্ঞানদায়ক বৃক্ষ' উৎপন্ন করিলেন। আর উদ্যানে জলসেচনার্থে এদন হইতে এক নদী নির্গত হইল। উহা তথা হইতে বিভিন্ন হইয়া চতুর্মুখ হইল। প্রথম নদীর নাম পীশোন, ইহা সমস্ত হবিলাদেশ বেষ্টন করে, তথায় স্বর্ণ পাওয়া যায় আর সেই দেশের স্বর্ণ উত্তম। দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন, ইহা সমস্ত কুশদেশ বেষ্টন করে। তৃতীয় নদীর নাম হিদ্দেকল, ইহা অশূরিয়া দেশের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হয়। চতুর্থ নদীর নাম ফরাৎ।"[৮]

তৌরিতের উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, পীশোন, গীহোন, হিদ্দেকল ও ফরাৎ — এই নদী চারিটির উৎপত্তির এলাকার মধ্যে ঐ সময় 'এদন' নামে একটি জায়গা ছিল এবং ঐ এদনস্থিত একটি সুরম্য বাগানে আদমের বাসস্থান ছিল। 'এদন' জায়গাটি বোধ হয় যে, বর্তমান তুরস্ক দেশের পূর্বভাগে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তৌরিত গ্রন্থে লিখিত নদী চারিটি ঐ অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া, পীশোন ও গীহোন নামক নদীদ্বয় কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরে এবং হিদ্দেকল ও ফরাৎ নামক নদীদ্বয় একত্র হইয়া পারস্যোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ঐ এদন উদ্যানে বাস করাকে বলা হয় 'আদমের বেহেস্তবাস' এবং এদন উদ্যানকে বলা হয় 'বেহেস্ত'।

AMARBOI.COM

বর্তমান কালের বহুল প্রচারিত 'বেহেস্ত-দোজখ' নাকি কোটি কোটি বৎসর পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত উহা ব্যবহার করা হয় নাই। শোনা যায় যে, কেয়ামতের পর বিচারান্তে উহাতে লোক ভর্তি করা হইবে। আবার শোনা যায় যে, এস্রাফিল ফেরেস্তার শিঙ্গার ফুঁকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টিই লয় হইয়া যাইবে, স্বয়ং আল্লাহ্ ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। তাহাই যদি হয় তবে বেহেস্ত-দোজখ লয় হইবে কিনা। যদি সংহারের পূর্বেই উহা লয় হইয়া যায়, তবে কেয়ামতের পূর্বে আল্লাহ উহা সৃষ্টি করিলেন কেন, আর যদি না হয়, তবে উহা কি আল্লাহর সৃষ্টির বাহিরে অবস্থিত? অধিকন্তু কেয়ামতের পর বিচারান্তেই যদি উহাতে লোক ভর্তি করা হয়, তবে এতোধিককাল পূর্বে উহা সৃষ্টির সার্থকতা কি?

বহুপূর্বকালে পাশ্চাত্যের এক বড় শহরের নিকট একটি স্থানের নাম ছিল নাকি 'গেহেন্না'। শহরের যাবতীয় ময়লা, রাশি রাশি আবর্জনা ও মৃত লাশ ওখানে ফেলিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হইত এবং অপরাধীগণকে ওখানে নিয়া নানারূপ শাস্তি দেওয়া হইত বা পোড়াইয়া মারা হইত। তৎকালীন লোকে ঐ জায়গাটিকে নোংরা বলিয়া ঘৃণা ও বীভৎস বলিয়া অতিশয় ভয় করিত, কোন লোক ওখানে [illegible] যাইত না। বরং কোন ব্যক্তি কোনরূপ অসৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ করিলে লোকে তাহাকে এই বলিয়া শাসাইত যে, সে গেহেন্না যাইবে। অথবা বলিত, 'তুমি কি গেহেন্না যাইতে চাও?' ইত্যাদি।

উক্ত 'গেহেন্না' শব্দটি ভাষান্তরে — গেহেন্নাম, জেহেন্নাম (ইংরেজী g অক্ষরটির 'জ' উচ্চারণ) এবং আরবী ভাষায় উহা হইয়াছে নাকি 'জাহান্নাম'।

বৈদিক মতে স্বর্গকে মনে করা হয় অতি উচ্চে বা ঊর্ধ্বে অবস্থিত স্থান। তাই স্বর্গের এক নাম 'ঊর্ধলোক'। আবার কুচিৎ ইহার বিপরীত মতও শোনা যায়। কোন কোন ধর্মযাজক বলেন যে, পুণ্যবানদের কবরের সঙ্গে বেহেস্তের এবং পাপীদের কবরের সঙ্গে দোজখের (সুড়ঙ্গপথে) যোগাযোগ হয়। ইহাতে মনে হয় যে, বেহেস্ত-দোজখ ভূগর্ভেই অবস্থিত আছে। বাস্তবিকই কি তাহাই?

বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের গড় উত্তাপ ২০° সেন্টিগ্রেড বা ৬৮° ফারেনহাইট এবং ৩০ মাইল নিম্নের তাপমাত্রা ১২০০° সে. বা ২২০০° ফা.। এই উত্তাপে অনায়াসে পাথরাদি গলিয়া যাইতে পারে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও লাভাক্ষরণ সেখান হইতেই হইয়া থাকে। নিম্নদিকে ক্রমশ উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়া কেন্দ্রের দিকে তাপমাত্রা দাঁড়ায় ৬০০০° সে.।[৯] ইহা সূর্যের বহিরাবরণের তাপের সমান। ইহাতে বুঝা যায় যে, ভূ-গর্ভে নরকাগ্নি থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু স্বর্গীয় উদ্যানসমূহ কোন্ জায়গায়?

স্বর্গ ও নরকের আধ্যাত্মিক, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিবরণ যাহাই হউক, বর্তমানে উহার যে কল্পচিত্র দেখানো হয়, তাহার কোনরূপ ভৌগোলিক সত্তা আছে কি?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ প্রস্তাব

[ধর্ম বিষয়ক]

১. আল্লাহ্ মানুষের পরিবর্তন না করিয়া হেদায়েতের ঝঞ্ঝাট পোহান কেন ?

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা করিলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি ইহাই হয় যে, মানুষ তাঁহার এবাদত–বন্দেগী করিবে, তাহা হইলে তিনি সমস্ত মানবকে দিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য পালন করাইতে পারেন না কি? পারিলে তাহা না করিয়া তিনি মানুষের দ্বারা মানুষ হেদায়েতের ঝঞ্ঝাট পোহান কেন? ইহাতে কি তাঁহার আসল উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটিতেছে না? হযরত ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদ (দ.)-কে কোন মানুষ হেদায়েত করে নাই, করিয়াছেন আল্লাহ্তালা। কিন্তু নমরুদ, শাদ্দাদ, ফেরাউন, আবু জাহেল ইত্যাদি কাফেরদিগকে তিনি হেদায়েত করিলেন না কেন? তিনি কি স্বেচ্ছায় হেদায়েত করিলেন না, না, করিতে পারিলেন না?

২. ভাগ্যলিপি কি অপরিবর্তনীয় ?

AMARBOI.COM

যদিও মানুষ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞ, তবু কর্মফলে বিশ্বাস আছে বলিয়াই সে জগতের সকল রকম কাজকর্ম করিয়া যাইতেছে। সমাজ ও রাষ্ট্র কর্মফলকে ভিত্তি করিয়াই গঠিত হইয়াছে এবং 'কর্মফল আছে' বলিয়াই উহারা টিকিয়া আছে। রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষকে শিক্ষা দিতেছে — কর্ম কর, ফল পাইবে। কিন্তু ধর্ম শিক্ষা দিতেছে ইহার বিপরীত। ধর্ম বলিতেছে — কর্ম করিয়া যাও, ফল অদৃষ্টে (তকদীরে) যাহা লিখিত আছে তাহাই পাইবে। এক্ষেত্রে মানুষ কর্ম করিল বটে, কিন্তু ফল রহিল ভগবানের কাছে ভাগ্যলিপিতে নিবদ্ধ। মানুষ জানিল না যে, সে তাহার কাজের ফল পাইবে কি না। কর্মফলের নিশ্চয়তা থাকিলে সন্দিগ্ধ মনেও কাজ করা চলে। যেহেতু তাহাতে মানুষ ভাবিতে পারে যে, হয়ত সে তাহার কাজের ফল পাইতেও পারে। কিন্তু ধর্ম বলে — কর্ম যা কিছুই কর না কেন, ফল নির্ধারিত যাহা আছে, তাহাই পাইবে, একটুও এদিক ওদিক হইবে না। তাহাই যদি হয়, অর্থাৎ কর্মের দ্বারা ভাগ্যলিপি পরিবর্তিত না হয়, তবে কর্ম করিয়া লাভ কি? বিশেষত মানুষের কৃত 'কর্মের দ্বারা ফলোৎপন্ন' না হইয়া যদি ঈশ্বরের নির্ধারিত 'ফলের দ্বারা কর্মোৎপত্তি' হয়, তবে 'সৎ' বা 'অসৎ' কাজের জন্য মানুষ দায়ী হইবে কেন?

মনে করা যাক — কোন এক ব্যক্তির ভাগ্যলিপিতে লেখা আছে যে, সে 'নারকী'। এখন সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ধারিত ঐ ফলোৎপাদক কার্য, যথা — চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা ইত্যাদি করিবে না কি? যদি করে, তবে তাহা সে কাহার ইচ্ছায় করে? নিজের ইচ্ছায়, না, ভগবানের ইচ্ছায়? আর যদি সে কোন পাপ-কর্ম না করিয়া পুণ্য-কর্মই করে, তবে তাহার ভাগ্যলিপির 'নারকী' শব্দটি কাটিয়া, 'স্বর্গবাসী' এই শব্দটি লেখা হইবে কি? যদি না-ই হয়, তবে হেদায়েতের তম্বিটি কি লৌকিক? আর যদি হয়, তবে ভবিষ্যৎজ্ঞাতা ভগবান এই পরিবর্তনের সংবাদ পূর্বাহ্নে জানিয়া প্রথমবারেই অকাট্য তালিকা প্রস্তুত করেন নাই কেন?

ভাগ্যলিপি অপরিবর্তনীয় হইলে স্বয়ং ভগবানও উহা মানেন কি না। যদি না মানেন, তবে তিনি উহা লিখিয়াছিলেন কেন? আর যদি মানেন, তবে তিনি লিপি প্রস্তুতির সময় স্বাধীন হইলেও বর্তমানে স্বাধীন হন কিরূপে? ভগবানের বর্তমান কর্তব্য কি শুধু তালিকা দেখিয়া দেখিয়া জীবকুলকে দিয়া কার্য করান? তাহাই যদি হয়, তবে বিশ্বস্রষ্টার আশু কর্তব্য কি কিছুই নাই?

৩. আদমের পাপ কি ?

আলেমগণ বলিয়া থাকেন যে, আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল এই যে, আল্লাহ তাঁহার দ্বারা পৃথিবী মানুষপূর্ণ করিবেন এবং শেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (দ.)-এর দ্বারা ইসলাম প্রচার করাইবেন ইত্যাদি। এই সমস্ত পরিকল্পনাই নাকি ভাগ্যলিপির অন্তর্ভুক্ত। আদমকে বেহেস্তে রাখিয়া তাঁহাকে গন্দম খাইতে যে নিষেধ করা হইয়াছিল, সে নিষেধ কি খোদাতা'লার আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল? আদম গন্দম খাইয়া প্রকারান্তরে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ করিলেন। যে কাজ ভাগ্যলিপির অনুকূল এবং আল্লাহর ইচ্ছাকে পূর্ণ করে, তাহাতে পাপ কি? পক্ষান্তরে আদম যদি গন্দম না-ই খাইতেন, তাহা হইলে লওহে মাহফুজের (লিপিফলকের) যাবতীয় লিপিই বরবাদ হইত না কি? অর্থাৎ পৃথিবীতে মানবসৃষ্টি, বেহেস্ত, দোজখ, হাশর ময়দান ইত্যাদির পরিকল্পনা সমস্তই মাঠে মারা যাইত না কি?

৪. শয়তান কি ?

শয়তানের সহিত কোন মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও তাহার নামটির সাথে যথেষ্ট পরিচয় আছে। 'শয়তান' — এই নামটি এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে যে, হাটে, মাঠে, কোর্ট-কাছারীতে, দোকান, স্কুল-কলেজ, ওয়াজের মাহফিল ইত্যাদির সর্বত্র এবং নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, এমনকি অনেক হিন্দুও 'শয়তান' নামটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, "ব্যাটা ভারী শয়তান"।

'শয়তান' কথাটির ধাতুগত অর্থ যাহাই হউক, উহাকে সমাজের যাবতীয় দুষ্কর্মের কারক হিসাবেই লোকে ব্যবহার করিতেছে।

ধর্মাধ্যায়ীগণ বলিয়া থাকেন যে, শয়তান পূর্বে ছিল 'মকরম' বা 'ইবলিস' নামক বেহেস্তবাসী একজন প্রথম শ্রেণীর ফেরেস্তা এবং অতিরিক্ত মুসল্লি। মকরম সেখানে খোদাতা'লার হুকুমমত আদমকে সেজদা না করায় 'শয়তান' আখ্যা পাইয়া চিরকাল মানুষকে অসৎ কাজের প্ররোচনা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া পৃথিবীতে আসে এবং সে অদ্যাবধি নানাবিধ উপায়ে অসৎ কাজে প্ররোচনা বা দাগা দিয়া বেড়াইতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদম ও বিবি হাওয়াকে দাগা দিয়াছিল শয়তান একা। কিন্তু আদমের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শয়তানেরও কি বংশবৃদ্ধি হইতেছে? না হইলে দাগাকাজ সুচারুরূপে চলে কি রকম?

কেহ কেহ বলেন যে, শয়তানেরও বংশবৃদ্ধি হয় এবং উহা হয় মানুষের চেয়ে দশগুণ বেশী। কারণ প্রতিগর্ভে সাধারণত মানুষ জন্মে একটি, আর শয়তান জন্মে দশটি করিয়া। তাহাদের নাম হয় যথাক্রমে — জলিতন, ওয়াছিন, নফছ, আওয়াম, আফাফ, মকার, মছুদ, দাহেম, ওল–হান ও বার। ইহারা ক্ষেত্রবিশেষে থাকিয়া বিশেষ বিশেষ দাগাকার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। অধিকন্তু ইহাদের মানুষের মত মরণ নাই। কেয়ামতের দিন মানবজাতি যখন লয় পাইবে তখন ইহাদের মৃত্যু ঘটিবে।

জন্ম–মৃত্যুর ঠোকাঠুকিতেও বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষ টিকিয়া আছে প্রায় তিনশ' কোটি। আর মানুষের চেয়ে দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়া অমর শয়তানের সংখ্যা কত? আদম হইতে আজ পর্যন্ত যত লোক জন্মিয়াছে, তাহারা যদি সকলেই জীবিত থাকিত, তাহা হইলে লোকসংখ্যা যত হইত, বোধ হয় যে, কোন ভাষার সংখ্যা দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যাইত না। পৃথিবীতে বর্তমান শয়তানের সংখ্যা তাহারই দশগুণ বেশী নয় কি? ইহাতে মনে হয় যে, পৃথিবীর জলে, স্থলে ও বায়ুমণ্ডলে শয়তান গিজগিজ করিতেছে এবং প্রতিটি মানুষের পিছনে লাখ লাখ শয়তান দাগা দিয়া বেড়াইতেছে।

এত অসংখ্য শয়তান মানবসমাজকে পাপের পথে অহরহ প্ররোচিত করিতেছে, কিন্তু শয়তানের সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাইলেও অসৎকাজের মাত্রা ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে না, বরং মানবিক জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অসৎকাজের মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। এখনও দেখা যাইতেছে যে, স্কুল, কলেজ ও মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা অব্যাহত আছে। বরং হিসাব করিলে দেখা যায় যে, শিক্ষিতের সংখ্যা ও শিক্ষায়তনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। ন্যায়নিষ্ঠ সাধুপুরুষদের সংখ্যাও নগণ্য নহে। লণ্ডন শহরে নাকি এমন দোকানও আছে, যেখানে বিক্রেতা নাই। অথচ ক্রেতাগণ উচিত মূল্য দিয়াই জিনিসপত্র ক্রয় করিতেছে। আবার কোন রকম হারান জিনিস প্রাপ্ত হইয়াও কেহ তাহা আত্মসাৎ করে না। বরং লণ্ডন ট্রান্সপোর্টের লষ্ট প্রপার্টি অফিসে উহা জমা দিয়া থাকে, সেখান হইতে জিনিসের মালিক তাহা ফেরত পাইয়া থাকে।[১০] সেখানে কি শয়তান কম?

ধর্মপ্রচারকদের বর্ণনা শুনিয়া মনে হয় যে, ফেরেস্তাগণ সবাই নপুংসক। মকরমও তাহাই [illegible] 'লানত' বা অভিশাপ প্রাপ্তির সময়ও মকরম একাই ছিল এবং নপুংসক ছিল। তৎপর তাহার বংশবৃদ্ধির জন্য লিঙ্গভেদ হইল কখন? শুধু ইহাই নহে, শয়তানের বংশবৃদ্ধি সত্য হইলে, প্রথমত তাহার ক্লীবত্ব ঘুচাইয়া পুংলিঙ্গ গঠনান্তে একটি স্ত্রী–শয়তানেরও আবশ্যক ছিল। বাস্তবিক কি শয়তানেরও স্ত্রী আছে? আর না থাকিলেই বা তাহার বংশবৃদ্ধির উপায় কি?

'শয়তানের দাগা' বলিতে কি শুধু রোজা–নামাজের শৈথিল্যই বুঝায়, না চুরি, ডাকাতি, বদমায়েশী, নরহত্যা ইত্যাদিও বুঝায়? যদি যাবতীয় অসৎকার্য শয়তান কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হয়, তবে জাতিভেদে অসৎ কাজের মাত্রাভেদ হয় কেন? অর্থাৎ, যে কোন দেশের সম্প্রদায়সমূহের জনসংখ্যার অনুপাতে অপরাধী বা কারাবাসীর সংখ্যা হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের মধ্যে কারাবাসীর সংখ্যাধিক্য কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবজগতে দেখা যায় যে, মাংসাশীগণ উগ্রস্বভাববিশিষ্ট এবং নিরামিষাশীরা শান্ত। গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস-মোরগ, কবুতর, ইত্যাদি প্রাণী মাংসাশী নহে, ইহারা শান্ত। অথচ ব্যাঘ্র, সিংহ, শৃগাল, কুকুর, কাক, চিল ইত্যাদি প্রাণীকুল মাংসাশী এবং উগ্রস্বভাববিশিষ্ট। এ কথাও স্বীকার্য যে, স্বভাবের উগ্রতায় নানা প্রকার অঘটন ঘটিয়া থাকে। ইহাও দেখা যায় যে, মানব সমাজের ভিতর যে জাতি অতিরিক্ত মাংসাশী, সেই জাতির মধ্যেই অতিরিক্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নরহত্যা অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল গর্হিত কাজের উৎপাদক কি শয়তান, না মাংস আর উত্তেজক মসল্লা?

বলা যাইতে পারে যে, কোন কোন দেশের মানুষ মাংসাশী হইয়াও বেশ শান্ত-শিষ্ট ও সংযমী। ইহার কারণ এই নয় যে, সে দেশে শয়তানের উপদ্রব কম বা সে দেশের মাংসে উত্তেজনাশক্তি নাই। ইহার কারণ এই যে, এইরূপ কোন জাতি নিরক্ষাঞ্চলের অধিবাসী নহে। অধিকাংশই হিমাঞ্চলের বাসিন্দা। দেশের শীতলতাই তাহাদের স্বভাবের উগ্রতা প্রশমিত করিয়া রাখে।

সুধীগণ বলেন যে, মানুষের মধ্যে ছয়টি আধ্যাত্মিক শত্রু আছে। উহারা 'ষড়রিপু' নামে পরিচিত। যথা — কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। ইহাদের তাড়নায় মানুষ নানাবিধ অসৎকাজ করিয়া থাকে। যে কোন উপায়ে হউক, ইহাদিগকে দমন করিতে পারিলে মানুষ নিষ্পাপ হইতে পারে।

মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সভ্যতার উষালোক পাইবার পূর্বে আহার-বিহারে মানুষ ও ইতর জীবের মনোবৃত্তির বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সে সময়ের মানুষের মন ছিল কৃত্রিমতাহীন, সরল ও স্বাধীন। তখন মানুষ তাহার যে কোন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারিত। তখন প্রবৃত্তিই ছিল মানুষের মনের যথাসর্বস্ব। জ্ঞান উন্মেষের সাথে সাথে মানুষ প্রথমে দলবদ্ধ ও পরে সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতে শুরু করিলে এই দল বা সমাজকে রক্ষা করিতে আবশ্যক হইল ত্যাগ ও সংযমের। আদিতে এই 'ত্যাগ' ও 'সংযম' ছিল স্বেচ্ছাধীন। ক্রমে যখন সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তাহার দল বা সমাজের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য সংযমকে বাঁধিল নীতি ও নিয়মের শৃঙ্খলে। ইহাতে মানুষের সেই স্বাধীন প্রবৃত্তিগুলিকে 'সু' ও 'কু' — এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 'সু' প্রবৃত্তিগুলিকে স্বাধীনই রাখা হইল, কিন্তু 'কু' প্রবৃত্তিগুলিকে করা হইল কারারুদ্ধ। কারাবাসী কুপ্রবৃত্তিগুলি মনের অন্ধকার কারাকক্ষে ঘুমাইয়া রহিল। মনের যে অংশে এই রুদ্ধপ্রবৃত্তি বাস করে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাহাকে বলা হয় 'অচেতন মন' বা 'নির্জ্ঞান মন' (Unconscious Mind)।

মানুষ তাহার জাতিগত জীবনের হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন 'অচেতন মন' স্বরূপ মূলধন (উত্তরাধিকার সূত্রে) লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ যে সকল অশুভ কামনা সমাজের নীতি, ধর্মের বিধান ও রাষ্ট্রের শাসনের ভয়ে চরিতার্থ করিতে পারে না, তাহাও ক্রমে বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবিয়া গিয়া অচেতন মনে স্থান লয়। অচেতন মনে রুদ্ধপ্রবৃত্তিগুলিকে যে শক্তি অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাকে কারারক্ষী (Censor) বলা হয়। কারাবন্দী কুপ্রবৃত্তিগুলি সময় সময় জাগ্রত হইয়া কারারক্ষীকে ফাঁকি দিয়া বাহিরে আসে এবং সুপ্রবৃত্তিগুলির সহিত মেলামেশা করিয়া তাহাদিগকে বিপথে চালিত করে। ইহা হইতে মানব সমাজের যত কিছু বিড়ম্বনা। মানুষের যাবতীয় অশুভচিন্তা ও অসৎকাজের উদ্যোক্তা এই 'অচেতন মন'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতদ্বিষয় পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, **যাবতীয় অসৎকাজের উদ্যোক্তা মানুষের অভ্যন্তরীণ রিপুসমূহ, বাহিরের কিছু নয়।** তবে কি মানুষের 'কু' প্রবৃত্তিগুলিকেই 'শয়তান' বলা হয়, না মানবদেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট 'শয়তান'-এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়?

৫. উপাসনার সময় নির্দিষ্ট কেন?

দেখা যায় যে, প্রায় সকল ধর্মেই কোন কোন উপাসনার জন্য বিশেষ বিশেষ সময় নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে ঐ সকল উপাসনা করিলে বিশ্বপতি কেন উহা মঞ্জুর করিবেন না, তাহার কোন হেতু পাওয়া যায় না।

ইসলামিক শাস্ত্রে প্রত্যহ পাঁচবার নামাজের ব্যবস্থা আছে। এই পাঁচবার নামাজের প্রত্যেকবারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আদেশ আছে, আবার কোন কোন সময়ে নামাজ নিষেধ।

পৃথিবী আবর্তনের ফলে যে কোন স্থিরমুহূর্তে বিভিন্ন দ্রাঘিমার উপর বিভিন্ন সময় সূচিত হয় এবং প্রতি মুহূর্তেই কোন না কোন স্থানে নির্দেশিত উপাসনা চলিতে থাকে। অথচ সূর্য উদয়, সূর্য অস্ত এবং মধ্যাহ্নে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ (হারাম)। ইহার তাৎপর্য কি? এখানে যখন সূর্যোদয় হইতেছে, তখন এখান হইতে পশ্চিমে কোনখানে সূর্যোদয় হয় নাই এবং এস্থান হইতে পূর্বদিকে পূর্বেই সূর্যোদয় হইয়াছে। এখানে যখন নামাজ পড়া হারাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্যত্র হারাম নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বরিশালে যখন সূর্যোদয় হইতেছে, তখন কলিকাতায় হয় নাই এবং চট্টগ্রামে কিছু পূর্বেই সূর্যোদয় হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বরিশালে যখন নামাজ পড়া হারাম, তখন কলিকাতা বা চট্টগ্রামে হারাম নহে। তাহা হইলে নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য কিছু আছে কি?

নামাজের নিষিদ্ধ সময় সম্বন্ধে যে কথা, ওয়াক্ত সম্বন্ধে সেই একই কথা। পৃথিবীর কোনস্থানেই ওয়াক্ত নহে — এরূপ কোন স্থির মুহূর্ত আছে কি? যদি না থাকে, অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তেই যদি পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে নামাজ পড়া চলিতে থাকে, তবে নামাজের সময় নির্ধারণের তাৎপর্য কি?

এক সময় পৃথিবীকে স্থির ও সমতল মনে করা হইত। তাই পৃথিবীর সকল দেশে বা সকল জায়গায় একই রকম সময় সূচিত হইবে, বোধহয় যে এরূপ মনে করিয়া ঐসকল বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবী গোল ও গতিশীল।

☞ পৃথিবীর গোলত্বহেতু যে কোন স্থানে বিশেষত সাগর বা মরুভূমিতে দাঁড়াইয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলে নিজেকে ভূ-পৃষ্ঠের কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ভ্রম হয়। মনে হয় যে, এই কারণেই আরববাসীগণ পবিত্র মক্কা শহরকে পৃথিবীর (ভূ-পৃষ্ঠের) কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ভাবিতেন এবং ওখানের সকাল-সন্ধ্যাকেই 'সকল দেশের সকাল-সন্ধ্যা' বলিয়া মনে করিতেন। এই ভ্রমাত্মক ধারণার ফলে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার কিছু আলোচনা করা যাক।

মনে করা যাক — কোন ব্যক্তি বেলা দেড়টার সময় জোহর নামাজ আদায় করিয়া বিমান-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগে প্রতি ঘন্টায় তিন হাজার মাইল বেগে চট্টগ্রাম হইতে পবিত্র মক্কা যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি দেখেন যে, ওখানে তখন দুপুর হয় নাই। ওয়াক্ত হইলে ঐ ব্যক্তির আর একবার জোহর নামাজ পড়িতে হইবে কি?

প্রতি ঘন্টায় ১০৪১$\frac{২}{৩}$ মাইল বেগে পশ্চিম দিকে বিমান চালাইলে (আপাতদৃষ্টিতে) সূর্যকে গতিহীন বলিয়া দেখা যাইবে। অর্থাৎ আরোহীদের কাছে প্রাতঃ, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন কিছুই হইবে না; সূর্য যেন স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। এমতাবস্থায় আরোহীদের নামাজ ও রোজার উপায় কি?

পৃথিবীর শুধু বিষুবীয় অঞ্চলেই বৎসরের কোন কোন সময় দিন ও রাত্রির পরিমাণ প্রায় সমান হয় না, ব্যবধান অল্প থাকে। কিন্তু উহা হইতে যতই উত্তর বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, দিন ও রাত্রির সময়ের ব্যবধান ততই বাড়িতে থাকে। মেরু অঞ্চলের নিকটবর্তী কোন কোন দেশে বৎসরের কোন কোন সময়ে দিন এত বড় হয় যে, 'সন্ধ্যা' ও 'ভোর'-এর মাঝখানে কোন রাত্রি নাই। সেখানে এশার নামাজের উপায় কি?

মেরু অঞ্চলে বৎসরে মাত্র একটি দিবা ও একটি রাত্রি হয়, অর্থাৎ ছয় মাসকাল একাদিক্রমে থাকে দিন এবং ছয় মাসকাল রাত্রি। ওখানে বৎসরে হয়ত পাঁচবার (পাঁচ ওয়াক্ত) নামাজ পড়া যায়, কিন্তু একমাস রোজা রাখা যায় কি রকমে?

৬. নাপাক বস্তু কি আল্লাহর কাছেও নাপাক?

পৃথিবীর দ্রব্যাদির মধ্যে কতক দ্রব্য ধর্মীয় বিধানে নাপাক (অপবিত্র)। কিন্তু সে সকল কি আল্লাহর কাছেও নাপাক? যদি তাহাই হয়, তবে তাহা তিনি সৃষ্টি করিলেন কেন? আর যদি না হয়, তবে নাপাক অবস্থায় তাঁহার গুণগান করিলে তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিবেন কেন? বলা হয় যে, আল্লাহ্ সর্বত্র বিদ্যমান। যদি তাহাই হয়, তবে নাপাক বস্তুর ভিতরে আল্লাহ্র অবস্থিতি নাই কি?

৭. উপাসনায় দিগ্‌নির্ণয় কেন?

সাকার-উপাসকগণ তাঁহাদের আরাধ্য দেবতার দিকে মুখ করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। যেমন কালী দেবীকে স্থাপন করা হয় দক্ষিণমুখী করিয়া এবং দুর্গাদেবীকে পশ্চিমমুখী। তাই পূজারীকে বসিতে হয় যথাক্রমে উত্তর ও পূর্বমুখী হইয়া। কিন্তু এই দিগ্‌নির্ণয় কেন, তাহা আমরা জানি না। বলা হইয়া থাকে যে, আল্লাহ্ নিরাকার এবং সর্বব্যাপী। তাহাই যদি হয়, তবে নিরাকার উপাসনায় 'কেবলার' আবশ্যক কি এবং হাত তুলিয়া মোনাজাত কেন? ইহাতে আল্লাহ্র দিগবিশেষে স্থিতির সংকেত হয় কি না?

৮. ফেরেস্তা কি?

আমরা শুনিয়া থাকি যে, আল্লাহ্ নিরাকার। কিন্তু নিরাকারমাত্রই আল্লাহ্ নহে। বিশ্বব্যাপী ঈথরও (Ether) নিরাকার। কিন্তু ঈথরকে কেহ ঈশ্বর বলে না। কেননা আকারবিহীন হইলেও ঈথরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং উহার মধ্যে পদার্থের গুণও পাওয়া যায়। বিশেষত ঈথর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাকার হইলেও চেতনাবিহীন। পদার্থ যতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হউক না কেন, উহার অস্তিত্ব এবং স্থিতি আছে। এমন কোন পদার্থ জগতে পাওয়া যায় নাই, যাহার অস্তিত্ব যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে।

শোনা যায় যে, 'ফেরেস্তা' নামক এক জাতীয় জীব আছে এবং উহারা স্বর্গ-মর্ত্য সর্বত্র, এমনকি মানুষের সহচররূপেও বিচরণ করে। অথচ মানুষ উহাদের অস্তিত্বের সন্ধান পায় না। উহারা কি কোন পদার্থের তৈয়ারী নয়? যদি হয়, তবে কোন অদৃশ্য বস্তুর দ্বারা তৈয়ারী? তাহা কি ঈশ্বর হইতেও সূক্ষ্ম? হইলে তাহা কি? আর যদি কোন পদার্থের তৈয়ারী না হয়, তবে কি তাহারা নিরাকার?

আল্লাহ্ নিরাকার, চেতনাবিশিষ্ট ও কর্মক্ষম এক মহাশক্তি। পক্ষান্তরে নিরাকার, চেতনাবিশিষ্ট ও কর্মক্ষম আর একটি সত্তাকে 'ফেরেস্তা' বলিয়া স্বীকার করিলে আল্লাহ্ অতুলনীয় থাকেন কিরূপে?

কেহ কেহ বলেন যে, ফেরেস্তারা নূরের তৈয়ারী। 'নূর' বলিতে সাধারণত বুঝা যায় যে, আলো বা রশ্মি। সাধারণ আলো অদৃশ্য নয়, উহা দৃশ্যমান পদার্থ। কিন্তু বিশ্বে এমন কতকগুলি বিশেষ আলো বা রশ্মি আছে, যাহা চক্ষে দেখা যায় না। যেমন — আলফা রশ্মি, কসমিক রশ্মি ইত্যাদি। বিজ্ঞানীগণ নানা কৌশলে ইহাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ইহাদের গুণাগুণও প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীগণ উহার কোন রকম রশ্মির দ্বারা তৈয়ারী ফেরেস্তার সন্ধান পাইতেছেন না। ফেরেস্তারা কোন জাতীয় রশ্মির (নূরের) দ্বারা তৈয়ারী?

AMARBOI.COM

৯. ফেরেস্তার কাজ কি?

পবিত্র কোরান ও বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে জানা যায় যে, স্বয়ং খোদাতা'লার হুকুমেই সব সৃষ্টি হইয়া গেল। সৃষ্টিকার্য সম্পাদনে আল্লাহ কোন ফেরেস্তার সাহায্য লন নাই। যিনি সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি তাহা রক্ষা বা পরিচালনাও করিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বসংসারের নানাবিধ কার্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও খোদাতা'লা অসংখ্য ফেরেস্তা সৃষ্টি করিলেন কেন? শোনা যায় যে, ফেরেস্তাগণের নিজ ইচ্ছামত কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। যদিও বিভিন্ন কাজ করিবার জন্য বিভিন্ন ফেরেস্তা নিযুক্ত আছেন, তথাপি তাঁহারা আল্লাহর আদেশ ভিন্ন কোন কাজই করিতে পারেন না। বিশ্বের যাবতীয় কার্য নির্বাহের জন্য প্রত্যেক ফেরেস্তাকেই যদি আল্লাহর হুকুম দিতে হয়, তবে তাঁহার ব্যস্ততা কমিল কি?

কথিত হয় যে, অসংখ্য ফেরেস্তার মধ্যে প্রধান ফেরেস্তা চারিজন। যথা — জেব্রাইল, মেকাইল, এস্রাফিল ও আজ্রাইল। ইহাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

ক. জেব্রাইল — এই ফেরেস্তা নাকি পয়গম্বরদের নিকট খোদাতা'লার আদেশ পৌছাইতেন। হজরত মোহাম্মদ (দ.) দুনিয়ার শেষ পয়গম্বর। তাঁহার বাদে নাকি আর কোন নবী জন্মিবেন না। কাজেই জেব্রাইল ফেরেস্তাও আর দুনিয়ায় আসিবেন না। তবে কেহ কেহ বলেন যে, নির্দিষ্ট কয়েকবার আসিবেন। সে যাহা হউক, জেব্রাইল ফেরেস্তা বর্তমানে কোনো কাজ করেন কি?

মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সম্মোহন বিদ্যা (Hypnotism) আয়ত্ত করিতে পারিলে তদ্দ্বারা দূরদূরান্তে অবস্থিত কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে মানসিক ভাবের আদান-প্রদান করা যায়। উহাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিপ্যাথি (Telepathy) বলে। সর্বশক্তিমান খোদাতা'লা এই টেলিপ্যাথির নিয়মে নবীদের সাথে নিজেই কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি ফেরেস্তা সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মারফতে নবীদের কাছে আদেশ পাঠাইয়াছেন কেন এবং হজরত মুসার সঙ্গেই বা স্বয়ং কথা বলিলেন কেন?

খ. মেকাইল — শোনা যায়, মেকাইল ফেরেস্তা নাকি মানুষের রেজেক বা খাদ্য বণ্টন করেন। 'খাদ্যবণ্টন' বলিতে সাধারণত মানুষের খাদ্যই বুঝায়। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী যথা — পশু, পাখী, কীট-পতঙ্গ ও বিভিন্ন জাতীয় জীবাণুদের খাদ্যবণ্টন করেন কে, অর্থাৎ মেকাইল ফেরেস্তা, না স্বয়ং খোদাতা'লা? অন্যান্য প্রাণীদের খাদ্যবণ্টন যদি স্বয়ং খোদাতা'লাই করেন, তবে মানুষের খাদ্যবণ্টন তিনি করেন না কেন? আর যদি যাবতীয় জীবের খাদ্যই মেকাইল বণ্টন করেন, তবে জগতের অন্য কোন প্রাণীকে নীরোগ দেহে শুধু উপবাসে মরিতে দেখা যায় না, অথচ মানুষ উপবাসে মরে কেন? আর মেকাইল ফেরেস্তা যদি শুধু মানুষের খাদ্যবণ্টন করেন, তবে মানুষের মধ্যে খাদ্যবণ্টনে এতোধিক পার্থক্য কেন? হয়ত কেহ নিয়মিত পঞ্চামৃত (দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, চিনি) আহার করেন, অন্যত্র কেহ জলভাতে শুধু লবণ ও লঙ্কাপোড়া পায় না। মেকাইলের এই পক্ষপাতিত্ব কেন?

মেকাইল ফেরেস্তা নাকি বিশ্বপতির আবহাওয়া বিভাগও পরিচালনা করেন। কিন্তু এই বিভাগেও তাঁহার যোগ্যতা বা নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। অতীতকালে যাহাই হইয়া থাকুক না কেন, বর্তমানে ব্যাপকভাবেই পৃথিবীতে খাদ্যসংকট দেখা দিয়াছে এবং বিভিন্ন দেশের নেতাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত পতিত জমি আবাদ কার্যে মনোযোগ দিয়াছেন। কিন্তু সসীম ক্ষমতার জন্য সকল ক্ষেত্রে কৃতকার্য হইতে পারিতেছেন না। অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন মেকাইল ফেরেস্তার অসাধ্য কিছুই নাই। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের সঙ্গে যদি সাহারা মরুপ্রদেশের তাপ বিনিময় করিয়া যথারীতি বৃষ্টিপাত ঘটান যাইত, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ একর জমি চাষাবাদ ও ফসল উৎপাদনের যোগ্য হইত এবং তাহাতে দুনিয়ার খাদ্যসংকট কতকাংশে কমিয়া যাইত। মেকাইল ফেরেস্তা উহা করিতে পারেন কি না। যদি পারেন, তবে উহা তিনি করেন না কেন?

শোনা যায়, আরবদেশ বিশেষত মক্কা শহর নাকি খোদাতা'লার খুব প্রিয় স্থান। কেননা দুনিয়ার প্রায় যাবতীয় পয়গম্বর আরব দেশেই জন্মিয়াছিলেন এবং শেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ (দ.) পবিত্র মক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই আরবদেশে বৃষ্টিপাত ও চাষাবাদ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু খোদাতা'লার অপ্রিয় দেশ ভারতবর্ষে বিশেষত আসামের চেরাপুঞ্জিতে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় কেন?

ভারত-বাংলার কথাই ধরা যাক। 'কাশী' হিন্দু জাতির একটি তীর্থস্থান ও নানাবিধ দেব-দেবীর প্রতিমার যাদুঘর এবং চট্টগ্রামে মুসলিম বারো আওলিয়ার দরগাহ। এই কাশীর উপর না হইয়া চট্টগ্রামের উপর এতোধিক ঝড়-বন্যা (Cyclone) হয় কেন? দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তাপ, বায়ু প্রবাহ, মেঘ-বৃষ্টির অত্যধিক পরিমাণে বৈষম্য আছে। ইহার কারণ কি ঐ সকল অঞ্চল ও তাহার নিকটবর্তী সাগর-পাহাড়ের ভৌগোলিক অবস্থান, না মেকাইলের পক্ষপাতিত্ব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. এস্রাফিল — এই ফেরেস্তা নাকি শিঙ্গা (বাঁশী) হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। খোদাতা'লার হুকুমে যখন ঐ শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, তখনই মহাপ্রলয় (কেয়ামত) হইবে এবং পুনঃ যখন খোদাতা'লার হুকুমে ফুঁক দিবেন, তখন হাশর ময়দানাদি পুনঃ সৃষ্টি হইবে।

আদিতে খোদাতা'লার হুকুমেই বিশ্ব-সৃষ্টি হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার হুকুমে ধ্বংস হইতে পারিবে না কেন? যদি পারে, তবে এস্রাফিলের শিঙ্গা ফুঁকিবার আবশ্যক কি? আবার — প্রথমবারে বিশ্বসৃষ্টি খোদাতা'লার হুকুমে হইতে পারিল, কিন্তু মহাপ্রলয়ের পরে পুনঃ হাশর ময়দানাদি সৃষ্টির জন্য শিঙ্গার ফুঁক লাগিবে কেন?

শোনা যায় যে, অনন্ত অতীতকাল হইতে এস্রাফিল ফেরেস্তা শিঙ্গা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন এবং শেষ দিন (কেয়ামত) পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিবেন। অথচ এত অধিককাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন মাত্র দুইটি। কেয়ামতের নির্দিষ্ট তারিখটি আল্লাহ্ জানেন না কি? জানিলে এস্রাফিল ফেরেস্তাকে এতকাল পূর্বে শিঙ্গা হাতে দিয়া দাঁড় করিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি?

ঘ. আজ্রাইল — 'যমদূত' জীবের জীবন হরণ করেন, এই কথাটি হিন্দুদের বেদে বর্ণিত আছে এবং উহারই ধর্মান্তরে নামান্তর 'আজ্রাইল ফেরেস্তা'। আজ্রাইল ফেরেস্তা যে মানুষের জীবন হরণ করেন, তাহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা শোনা যায় ধর্মপ্রচারকদের কাছে। কিন্তু উহাতে মৃত্যু সম্পর্কে অনেক প্রশ্নই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। গরু, ঘোড়া, বাঘ, মহিষাদি পশু, কাক, শকুনাদি পাখী, হাঙ্গর-কুমীরাদি জলজ জীব ও কীট-পতঙ্গাদির জীবন হরণ করাও কি আজ্রাইলের কাজ? নানাজাতীয় জীবদেহের ভিতরে ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এত অধিক অতিক্ষুদ্র জীবাণু বাস করে যে, তাহার সংখ্যা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই জানেন। বিশেষত ঐ সকল জীবের পরমায়ুও খুব বেশী নয়, কয়েক মাস হইতে কয়েক ঘন্টা বা মিনিট পর্যন্ত। উহাদের জীবনও কি আজ্রাইল হরণ করেন?

আম, জাম, তাল, নারিকেলাদি উদ্ভিদের জন্ম-মৃত্যু আছে বলিয়া লোকে বহুকাল পূর্ব হইতেই জানিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, শুধু তাহাই নহে, উদ্ভিদেরও ক্ষুধা, পিপাসা, সুখ-দুঃখ, স্পর্শানুভূতি, এমনকি শ্রবণশক্তিও আছে। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় যন্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গাছের নিকট গান-বাজনা হইলে উহাদের মন প্রফুল্ল হয়। সুতরাং উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবের 'জীবন'-এ কোন পার্থক্য নাই। এই গাছের জীবন হরণ করেন কে? ইহা ভিন্ন অতিক্ষুদ্র এক জাতীয় উদ্ভিদ আছে, উহাকে 'বীজাণু' বলা হয়। ইহারা অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া খালি চোখে দেখা যায় না। ইহারা বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়ায় এবং উপযুক্ত পরিবেশ পাইলে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন — (জলে) শেওলা, বাইছা, (স্থলে) ব্যাঙের ছাতা, সিঁধুল ইত্যাদি। ইহাদের জন্ম এবং মৃত্যু আছে। ইহাদের জীবন হরণ করেন কে?

এমন অনেক জাতের জীবাণু বা বীজাণু আছে যাহারা জীবদেহে বিশেষত মানুষের দেহে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ রোগ সৃষ্টি করে। উহাদের আকার এতই ক্ষুদ্র যে, রোগীর দেহের প্রতি ফোঁটা রক্তে লক্ষ লক্ষ জীবাণু ও বীজাণু থাকে এবং যথাযোগ্য ঔষধ প্রয়োগে অল্প সময়ের মধ্যেই উহারা মারা যায়। উহাদের জীবন হরণ করেন কে?

মানুষ ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় জীবের জীবন যদি আল্লাহতা'লার আদেশেই উড়িয়া যায়, তবে মানুষের জন্য যমদূত কেন? আর বিশ্বজীবের যাবতীয় জীবন যদি আজ্রাইল একাই হরণ করেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে তাঁহার সময় সংকুলান হয় কিরূপে? আজ্রাইলের কি বংশবৃদ্ধি হয়? অথবা আজ্রাইলের সহকারী (Assistant) আজ্রাইল আছে কি? থাকিলে — তাহারা কি এককালীন সৃষ্টি হইয়াছে, না জগতে জীববৃদ্ধির সাথে সাথে নূতন নূতন আজ্রাইল সৃষ্টি হইতেছে?

সর্বশেষ প্রশ্ন এই যে, যমদূতই যদি জীবের জীবন হরণ করেন, তবে 'কারণে মরণ' হয় কেন? অর্থাৎ রোগ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি কোন 'কারণ' ব্যতীত জীবের মৃত্যু হয় না কেন?

প্রকাশ আছে যে, আলোচ্য ফেরেস্তা চতুষ্টয় ভিন্ন আরও চারিজন ফেরেস্তা আছেন, যাঁহারা প্রত্যেক মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট। উহারা হইলেন — কেরামান ও কাতেবীন এবং মনকির ও নকির। উহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

ঙ. কেরামান ও কাতেবীন — ধর্মযাজকগণ বলিয়া থাকেন যে, মানুষের সৎ ও অসৎ কাজের বিবরণ লিখিয়া রাখিবার জন্য প্রত্যেক মানুষের কাঁধের উপর 'কেরামান' ও 'কাতেবীন' নামক দুইজন ফেরেস্তা বসিয়া আছেন। উহাদের একজন লেখেন সৎকাজের বিবরণ এবং অপরজন অসৎ কাজের বিবরণ। এই ফেরেস্তাদ্বয়ের লিখিত বিবরণ দেখিয়া মানুষের পাপ ও পুণ্যের বিচার হইবে।

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই কোন শিশু পাপ-পুণ্যের অধিকারী হয় না। কেননা তখন তাহাদের ন্যায় বা অন্যায়ের কোন জ্ঞান থাকে না। বলা হইয়া থাকে যে, নাবালকত্ব উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষের উপর নামাজ ও রোজা ফরজ হয় না।

মানুষ সাবালক হইবার নির্দিষ্ট কোন তারিখ নাই। শৈশব উত্তীর্ণ হইয়া কৈশোরে পদার্পণ ও কৈশোর পার হইয়া যৌবনে পদার্পণ, ইহার কোনটিই একদিনে হয় না। মানুষ সাবালক হইবার বয়স — কেহ বলেন ১২ বৎসর, কেহ বলেন নারীর ১৪ ও পুরুষের ১৮ বৎসর ইত্যাদি। এমতাবস্থায় কেরামান ও কাতেবীন ফেরেস্তাদ্বয় মানুষের কাঁধে আসেন কোন সময়? শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরমুহূর্তে না সাবালক হইবার পর? শিশুর জন্মমুহূর্তের পর হইতে আসিলে ফেরেস্তাদ্বয়কে বেশ কয়েক বৎসর কর্মহীন অবস্থায় বসিয়া দিন কাটাইতে হয়। পক্ষান্তরে মানুষ সাবালক হইবার সুনির্দিষ্ট কোন তারিখ নাই। ঐ বিষয়ে ঈশ্বরানুমোদিত সার্বজনীন কোন তারিখ আছে কি?

শোনা যায় যে, ফেরেস্তারা নাপাক ও দুর্গন্ধময় স্থানে থাকেন না বা উহা পছন্দ করেন না। তাই ফেরেস্তাদের মনোরঞ্জনের জন্য কেহ কেহ পাক সাফ থাকেন ও খোশবু ব্যবহার করেন। ধর্মীয় মতে অমুসলমান মানুষ মাত্রেই নাপাক। যেহেতু উহারা যথারীতি ওজু-গোসল করে না, হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করে, এমনকি কেহ কেহ মলত্যাগ করিয়া জলশৌচও করে না। আবার ডোম, মেথর ইত্যাদি অস্পৃশ্য জাতি নাপাক ও দুর্গন্ধেই ডুবিয়া থাকে। উহাদের কাঁধে ফেরেস্তা থাকেন কি না?

যে কোন মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কাঁধের ফেরেস্তাদের কার্যকাল শেষ হইয়া যায়। অতঃপর তাঁহারা কি করেন? অর্থাৎ কোন ঊর্ধ্বতন ফেরেস্তা বা আল্লাহ্‌তা'লার নিকট তাঁহার নথিপত্র বুঝাইয়া দিয়া অবসর জীবন যাপন করেন, না নিজ জিম্মায় কাগজপত্র রাখিয়া উহার হেফাজতে দিন কাটান, না অন্য কোন মানুষের কাঁধে বসিয়া নতুন কাজ শুরু করেন?

শোনা যায় যে, ফেরেস্তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই এবং থাকিলেও তাহা আল্লাহ ব্যতীত আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেহ জানে না। উহাদের মধ্য হইতে শুধুমাত্র কেরামান ও কাতেবীন ফেরেস্তাদ্বয় ব্যতীত আর কোন ফেরেস্তার সহিত মানুষের ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা নাই। বাকিদের মধ্যে মাত্র আজ্রাইল ফেরেস্তা কাছে আসেন একদিন, তাহা অন্তিমকালে এবং মনকির ও নকির ফেরেস্তাদ্বয় কাছে আসেন একদিন, তাহা মৃত্যুর পরে কবরে। কিন্তু কেরামান ও কাতেবীন ফেরেস্তাদ্বয় মানুষের চিরসহচর। হাঁটিতে, বসিতে, ভোজনে, শয়নে সবসময়ই উহারা মানুষের পার্শ্বচর। বিশেষত উহাদের অবস্থান মানুষের চক্ষু ও কর্ণ হইতে চারি-পাঁচ ইঞ্চির বেশী দূরে নয়। অথচ মানুষ উহাদের গতিবিধি দেখিতে, শুনিতে, অথবা অস্তিত্বই অনুভব করিতে পারে না। ইহার কারণ কি?

মানুষের কার্যবিবরণী ফেরেস্তাগণ যে ভাষাতেই লিখুন না কেন, উহাতে কালি, কলম ও কাগজ বা অনুরূপ অন্য কিছু আবশ্যক। আলোচ্য বিবরণগুলি যদি বাস্তব হয়, তবে উহা লিখিবার উপকরণও হওয়া উচিত পার্থিব। অথচ মানুষ উহার কোন কিছুরই সন্ধান পায় না। উহার বাস্তবতার কোন প্রমাণ আছে কি? যদি না থাকে, তাহা হইলে — যখন ফেরেস্তারা অদৃশ্য, কালি অদৃশ্য, কলম এবং কাগজও অদৃশ্য, তখন বিবরণগুলিও ঐরূপ নয় কি?

চ. মনকির ও নকির — কথিত হয় যে, মানুষ কবরস্থ হইবার কিছুক্ষণ পরই 'মনকির' ও 'নকির' নামক দুইজন ফেরেস্তা আসিয়া মৃতকে পুনর্জীবিত করেন ও তাহাকে ধর্ম-বিষয়ে কতিপয় প্রশ্ন করেন। সদুত্তর দিতে পারিলে তাহার সুখের অবধি থাকে না। কিন্তু তাহা না পারিলে তাহার উপর হয় নানারূপ শাস্তি। গুর্জের (গদার) আঘাতে ৭০ গজ মাটির নীচে প্রোথিত হইয়া যায়, আবার ঐ ফেরেস্তাদ্বয় নখর দ্বারা তুলিয়া তাহাকে পুনরাঘাত করিতে থাকেন এবং সুড়ঙ্গপথে দোজখের আগুন আসিয়া পাপাত্মা মৃতকে জ্বালাইতে থাকে ইত্যাদি।

কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে সচরাচর মৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টা সময়ের মধ্যেই কবরস্থ করা যায়। ঐ সময়ের মধ্যে মৃতদেহের অস্থি, মজ্জা ও মাংসাদির বিশেষ কোন বিকৃতি ঘটে না। এই সময়ের মধ্যেই যদি সে পুনর্জীবন লাভ করিয়া সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহার সেই নবজীবন হয় বিগত জীবনের অনুরূপ। কেননা দেখা যায় যে, সর্পাঘাত, উগ্র মাদকদ্রব্য সেবন, ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ, কতিপয় রোগ, গভীর নিদ্রা ইত্যাদিতে মানুষের সংজ্ঞালোপ ঘটে। এইরূপ সংজ্ঞাহীনতা কয়েক ঘন্টা হইতে কয়েক দিন, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সপ্তাহকাল স্থায়ী হইতে দেখা যায়। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সংজ্ঞাপ্রাপ্তির পর কাহারো পূর্বস্মৃতি লোপ পাইতে দেখা বা শোনা যায় নাই। কেননা মগজস্থিত কোষসমূহে (Cells) বিকৃতি না ঘটিলে কোন মানুষের স্মৃতি বা জ্ঞানের ভাবান্তর ঘটে না। তাই কাহারো ভাষারও পরিবর্তন ঘটে না।

হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও মস্তিষ্ক — দেহের এই তিনটি যন্ত্রের সুষ্ঠু ক্রিয়ার যৌথ ফলই হইল জীবনীশক্তি। উহার যে কোন একটি বা দুইটির ক্রিয়া সাময়িক লোপ পাওয়াকে 'রোগ' বলা হয়। কিন্তু ঐ তিনটির ক্রিয়া একযোগে লোপ পাওয়াকে বলা হয় 'মৃত্যু'। শরীর বিজ্ঞানীগণ দেখিয়াছেন যে, উক্ত যন্ত্রত্রয়ের একটি বা দুইটি নিষ্ক্রিয় হইলে, কৃত্রিম উপায়ে উহা পুনঃসক্রিয় করা যায়। তাই তাঁহারা আশা করেন যে, কোন ব্যক্তির ঐ তিনটি যন্ত্রই নিষ্ক্রিয় (মৃত্যু) হইলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত তাহাও সক্রিয় (পুনর্জীবিত) করা সম্ভব হইবে। তাহাই যদি হয়, তবে কোন মৃত বাঙ্গালী পুনর্জীবিত হইলে সে কি ফরাসী ভাষায় কথা বলিবে, না, বাংলা ভাষায়?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীতে প্রায় ৩৪২৪টি বোধগম্য ভাষা আছে এবং অধিকাংশ মানুষই মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা জানে না। কাজেই কোন মৃতকে পুনর্জীবিত করা হইলে, অধিকাংশই তাহার মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় কথা বলিবার বা বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। এমতাবস্থায় মনকির ও নকির ফেরেস্তাদ্বয় মৃতকে প্রশ্ন করেন কোন্ ভাষায় — ফেরেস্তী ভাষায়, না মৃতের মাতৃভাষায়?

কেহ কেহ বলেন যে, হাশর ময়দানাদি পারলৌকিক জগতের আন্তর্জাতিক ভাষা হইবে 'আরবী', বোধহয় ফেরেস্তাদেরও। হাশর ময়দানাদি পরজগতেও যদি পার্থিব দেহধারী মানুষ সৃষ্টি হয়, তবে তাহা হইবে এক অভিনব দেহ। কাজেই তাহাদের অভিনব ভাষার অধিকারী হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু মৃতের কবরস্থ দেহ অভিনব নয়, উহা ভূতপূর্ব। এক্ষেত্রে সে অভিনব (ফেরেস্তী বা আরবী) ভাষা বুঝিতে বা বলিতে পারে কিভাবে?

পক্ষান্তরে, যদি ফেরেস্তারা আঞ্চলিক ভাষায়ই প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন ৩৪২৪টি ভাষাভাষী ফেরেস্তা আবশ্যক। বাস্তবিক কি তাহাই?

ধর্মীয় বিবরণ মতে, পারলৌকিক ঘটনাবলীর প্রায় সমস্তই মানুষের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বাহিরে। কিন্তু 'গোর আজাব' — এই ঘটনাটি যদিও পরলোকের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি উহার অবস্থান ইহলোকে অর্থাৎ এই পৃথিবীতেই। বিশেষত উহা মানুষের বাসস্থান হইতে বেশী দূরেও নয়। বড় বড় শহরের গোরস্থানগুলি ছাড়া গ্রামাঞ্চলের কবরগুলি প্রায়ই থাকে বাসস্থানের কাছাকাছি এবং উহার গভীরতাও বেশী নয়, মাত্র ফুট তিনেকের মত। ওখানে বসিয়া ফেরেস্তা ও পুনর্জীবিত ব্যক্তির মধ্যে যে সকল কথাবার্তা, মারধর, কান্নাকাটি ইত্যাদি কাণ্ডকারখানা হয়, অতি নিকটবর্তী মানুষও তাহা আদৌ শুনিতে পায় না কেন?

দেখা যাইতেছে যে, হত্যা সম্পর্কিত মামলাদিতে কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতকে কবর দেওয়ার তিন-চারদিন বা সপ্তাহকাল পরে কবর হইতে তুলিয়া নেওয়া হয় এবং উহা অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু যত বড় দুর্দান্ত ব্যক্তির লাশই হউক না কেন, কোন ডাক্তার উহার গায়ে গুর্জের আঘাতের দাগ বা আগুনে পোড়ার চিহ্ন পান নাই। অধিকন্তু খুব লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মুর্দাকে যেইভাবে কবরে রাখা হইয়াছিল, সেইভাবেই আছে, একচুলও নড়চড় হয় নাই। বিশেষত কবরের নিম্নদিকে ৭০ গজ গর্ত বা কোন পার্শ্বে (দোজখের সঙ্গে) সুড়ঙ্গ নাই। ইহার কারণ কি? গোর আজাবের কাহিনীগুলি কি বাস্তব, না অলীক?

এ কথা সত্য যে, কোন মানুষকে বধ করার চেয়ে প্রহার করা সহজ এবং সবল ব্যক্তির চাইতে দুর্বল ব্যক্তি বধ করা সহজ। রেল, জাহাজ, বিমান ইত্যাদির আকস্মিক দুর্ঘটনায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এক মুহূর্তে শত শত সুস্থ ও সবল মানুষ বধ করেন আজ্রাইল ফেরেস্তা একা। আর রুগ্ন, দুর্বল ও অনাহারক্লিষ্ট মাত্র একজন মানুষকে শুধু প্রহার করিবার জন্য দুইজন ফেরেস্তা কেন? পক্ষান্তরে শুধুমাত্র মৃতকে প্রশ্ন করিবার জন্য দুইজন ফেরেস্তার আবশ্যকতা কিছু আছে কি?

জেব্রাইল, মেকাইল, এস্রাফিল ইত্যাদি নামগুলি উহাদের ব্যক্তিগত নাম (Proper Noun)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কেরামান, কাতেবিন, মনকির ও নকির — এই নামগুলি উহাদের ব্যক্তিগত নাম নয়, সম্প্রদায় বা শ্রেণীগত নাম (Common Noun)। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ জীবিত আছে।* তাহা হইলে সমস্ত মানুষের কাঁধে কেরামান আছে ৩০০ কোটি এবং কাতেবিন ৩০০ কোটি, জানিনা মনকির ও নকির ফেরেস্তাদ্বয়ের সংখ্যাও ঐরূপ কিনা! সে যাহা হউক, উহাদের ব্যক্তিগত কোন নাম আছে কি? না থাকিলে উহাদের কোন বিশেষ ফেরেস্তাকে আল্লাহ্ তলব দেন কি প্রকারে?

১০. দূরত্বহীন যাতায়াত কি সম্ভব?

শোনা যায় যে, স্বর্গীয় দূত জেব্রাইল আল্লাহর আদেশ মত নবীদের নিকট অহি (বাণী) লইয়া 'আসিতেন' এবং তাহা নাজেল (অর্পণ) করিয়া চলিয়া 'যাইতেন'। 'আসা' ও 'যাওয়া' — এই শব্দ দুইটি গতিবাচক এবং গতির আদি ও অন্তের মধ্যে দূরত্ব থাকিতে বাধ্য। আল্লাহতা'লা নিশ্চয়ই নবীদের হইতে দূরে ছিলেন না। তবে কি জেব্রাইলের 'আসা' ও 'যাওয়া' দূরত্বহীন? আর দূরত্ব থাকিলে তাহার পরিমাণ কত (মাইল)?

১১. মেয়ারাজ কি সত্য, না স্বপ্ন?

শোনা যায় যে, হজরত মোহাম্মদ (দ.) রাত্রিকালে আল্লাহর প্রেরিত 'বোরাক' নামক এক আশ্চর্য জানোয়ারে আরোহণ করিয়া আকাশভ্রমণে গিয়াছিলেন। ঐ ভ্রমণকে 'মেয়ারাজ' বলা হয়। তিনি নাকি কোটি কোটি বৎসরের পথ অতিক্রম করিয়া আরশে পৌঁছিয়া আল্লাহর সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ তাঁহাকে ইসলামের দুইটি মহারত্ন 'নামাজ' ও 'রোজা' উপহার দিয়াছিলেন। ঐ রাত্রে তিনি বেহেস্ত-দোজখাদিও পরিদর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ইহাতে নাকি তাঁহার সময় লাগিয়াছিল কয়েক মিনিট মাত্র।

কথিত হয় যে, মেয়ারাজ গমনে হজরত (দ.)-এর বাহন ছিল — প্রথম পর্বে 'বোরাক' ও দ্বিতীয় পর্বে 'রফরফ'। উহারা এরূপ দুইটি বিশেষ জানোয়ার, যাহার দ্বিতীয়টি জগতে নাই। বোরাক — পশু, পাখী ও মানব এই তিন জাতীয় প্রাণীর মিশ্ররূপের জানোয়ার। অর্থাৎ তাহার ঘোড়ার দেহ, পাখীর মত পাখা এবং রমণীসদৃশ মুখমণ্ডল। বোরাক কোন দেশ হইতে আসিয়াছিল, ভ্রমণান্তে কোথায় গেল, বর্তমানে কোথায়ও আছে, না মারা গিয়াছে, থাকিলে — উহার দ্বারা এখন কি কাজ করান হয়, তাহার কোন হদিস নাই। বিশেষত একমাত্র শবে মেয়ারাজ ছাড়া জগতে আর কোথাও ঐ নামটিরই অস্তিত্ব নাই। জানোয়ারটি কি বাস্তব না স্বাপ্নিক?

হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন পৃথিবীতে অনেক আছে। খৃ. পূ. তিন হাজার বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে নির্মিত মিশরের পিরামিডসমূহ আজও অক্ষত দেহে দাঁড়াইয়া আছে। হজরতের মেয়ারাজ গমন খুব বেশীদিনের কথা নয়, মাত্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা। ঘটনাটি বাস্তব হইলে — যে সকল দৃশ্য তিনি মহাশূন্যে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন (আরশ ও বেহেস্ত-দোজখাদি), তাহা আজও সেখানে বর্তমান থাকা উচিত। কিন্তু আছে

---

* মূল পাণ্ডুলিপির রচনাকাল ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি? থাকিলে তাহা আকাশ-বিজ্ঞানীদের দূরবীনে ধরা পড়েনা কেন?

মেয়ারাজ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিতে হইলে প্রথম জানা আবশ্যক যে, হজরত (দ.)-এর মেয়ারাজ গমন কি পার্থিব না আধ্যাত্মিক ; অর্থাৎ দৈহিক, না মানসিক। যদি বলা হয় যে, উহা দৈহিক, তবে প্রশ্ন আসে — উহা সম্ভব হইল কিভাবে?

আকাশবিজ্ঞানীদের মতে — সূর্য ও গ্রহ-উপগ্রহরা যে পরিমাণ স্থান জুড়িয়া আছে, তাহার নাম সৌরজগত, সূর্য ও কোটি কোটি নক্ষত্র মিলিয়া যে পরিমাণ স্থান জুড়িয়া আছে তাহার নাম নক্ষত্রজগত বা নীহারিকা এবং কোটি কোটি নক্ষত্রজগত বা নীহারিকা মিলিয়া যে স্থান দখল করিয়া আছে, তাহার নাম নীহারিকাজগত।

বিজ্ঞানীগণ দেখিয়াছেন যে, বিশ্বের যাবতীয় গতিশীল পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ ও আলোর গতি সর্বাধিক। উহার সমতুল্য গতিবিশিষ্ট আর জগতে নাই। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬ হাজার মাইল। আলো এই বেগে চলিয়া এক বৎসরে যতটুকু পথ অতিক্রম করিতে পারে, বিজ্ঞানীগণ তাহাকে বলেন 'এক আলোকবৎসর'।

বিশ্বের দরবারে আমাদের এই পৃথিবী খুবই নগণ্য এবং সৌরজগতটিও নেহায়েত ছোট জায়গা। তথাপি এই সৌরজগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলোক পৌঁছিতে সময় লাগে প্রায় ১১ ঘণ্টা। অনুরূপভাবে নক্ষত্রজগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলোক পৌঁছিতে সময় লাগে প্রায় ৯৭৫ হাজার বৎসর এবং নীহারিকাজগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দূরত্ব প্রায় ৪০০০ কোটি আলোকবৎসর।[১১] এই যে বিশাল বিশ্ব, ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানীদের পরিচিত দৃশ্যমান বিশ্ব। এই বিশ্বের ভিতরে বিজ্ঞানীরা বেহেশত, দোজখ বা আরশের সন্ধান পান নাই। হয়ত থাকিতে পারে ইহার বহির্ভাগে, অনন্ত দূরে। হজরত (দ.)-এর মেয়ারাজ গমন যদি বাস্তব হয়, অর্থাৎ তিনি যদি সশরীরে একটি বাস্তব জানোয়ারে আরোহণ করিয়া সেই অনন্তদূরে যাইয়া থাকেন, তবে কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে আলোচ্য দূরত্ব অতিক্রম করা কিভাবে সম্ভব হইল? বোরাকের গতি সেকেণ্ডে কত মাইল ছিল?

বোরাকের নাকি পাখাও ছিল। তাই মনে হয় যে, সেও আকাশে (শূন্যে) উড়িয়া গিয়াছিল। শূন্যে উড়িতে হইলে বায়ু আবশ্যক। যেখানে বায়ু নাই, সেখানে কোন পাখী বা ব্যোমযান চলিতে পারে না। বিজ্ঞানীগণ দেখিয়াছেন যে, প্রায় ১২০ মাইলের উপরে বায়ুর অস্তিত্ব নাই।[১২] তাই তাঁহারা সেখানে কোনরূপ বিমান চালাইতে পারেন না, চালাইয়া থাকেন রকেট। বায়ুহীন মহাশূন্যে বোরাক উড়িয়াছিল কিভাবে?

নানা বিষয় পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, হজরত (দ.)-এর মেয়ারাজ গমন (আকাশ ভ্রমণ) সশরীরে বা বাস্তবে সম্ভব নহে। তবে কি উহা আধ্যাত্মিক বা স্বপ্ন?

⟹ এ কথায় প্রায় সকল ধর্মই একমত যে, 'সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র বিরাজিত'। তাহাই যদি হয়, তবে তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য দূরে যাইতে হইবে কেন? আল্লাহতা'লা ঐ সময় কি হযরত (দ.)-এর অন্তরে বা তাঁহার গৃহে, মক্কা শহরে অথবা পৃথিবীতেই ছিলেন না?

পবিত্র কোরানে আল্লাহ্ বলিয়াছেন — "তোমরা যেখানে থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছেন" (সুরা হাদিদ – ৪)। মেয়ারাজ সত্য হইলে এই আয়াতের সহিত তাহার কোন সঙ্গতি থাকে কি?

১২. কতগুলি খাদ্য হারাম হইল কেন?

বিভিন্ন ধর্মমতে কোন কোন খাদ্য নিষিদ্ধ এবং কোন কোন দ্রব্য স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল বলিয়া স্বাস্থ্যবিজ্ঞানমতেও ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যে সকল দ্রব্য ভক্ষণে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে, তাহা নিষিদ্ধ হইলে বুঝা যায় যে, কেন উহা নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু যে খাদ্য ভক্ষণে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা নাই, এমন খাদ্য নিষিদ্ধ (হারাম) হইল কেন?

১৩. এক নেকী কতটুকু?

স্থান, কাল, বস্তু ও বিভিন্ন শক্তি পরিমাপের বিভিন্ন মাপকাঠি বা বাটখারা আছে। যথা — স্থান বা দূরত্বের মাপকাঠি গজ, ফুট, ইঞ্চি, মিটার ইত্যাদি ; সময় পরিমাপের ইউনিট ঘণ্টা, মিনিট ইত্যাদি ; ওজন পরিমাপে মণ, সের ; বস্তু পরিমাপে গণ্ডা, কাহন ; তাপ পরিমাপে ডিগ্রি ; আলো পরিমাপে ক্যাণ্ডেল পাওয়ার ; বিদ্যুৎ পরিমাপে ভোল্ট, আম্পিয়ার ইত্যাদির ব্যবহার হয়। অর্থাৎ কোন কিছু পরিমাপ করিতে হইলেই একটি ইউনিট বা একক থাকা আবশ্যক। অন্যথায় পরিমাপ করাই অসম্ভব।

কোন কোন ধর্মপ্রচারক বলিয়া থাকেন যে, অমুক কাজে 'দশ নেকী' বা অমুক কাজে 'সত্তর নেকী' পাওয়া যাইবে। এ স্থলে 'এক নেকী'-এর পরিমাণ কতটুকু এবং পরিমাপের মাপকাঠি কি?

১৪. পাপের কি ওজন আছে?

মানুষের মনের সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ঘৃণা, স্নেহ, হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার ইত্যাদি কোন পদার্থ নহে, ইহারা মনের বিভিন্ন বৃত্তি মাত্র। ব্যক্তিভেদে এসবের তারতম্য লক্ষিত হয়। কাজেই বলিতে হয় যে, ইহাদেরও পরিমাণ আছে। কিন্তু পরিমাপক কোন যন্ত্র নাই। কারণ ইহারা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। যাহা কিছু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতার বাহিরে, সেই সমস্ত তৌলযন্ত্র বা নিক্তি দ্বারা মাপিবার চেষ্টা বৃথা।

মনুষ্যকৃত 'ন্যায়' ও 'অন্যায়' আছে এবং ইহারও তারতম্য আছে। কাজেই ইহারও পরিমাণ আছে। কিন্তু উহা পরিমাপ করিবার মত কোন যন্ত্র অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

'অন্যায়'-এর পরিমাপক কোন যন্ত্র না থাকিলেও বিচারপতিগণ অন্যায়ের পরিমাণ নির্ধারণকরত অন্যায়কারীকে যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে বিচারকগণ নানা প্রকার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণপূর্বক অন্যায়ের পরিমাণ নির্ধারণ করেন, কোনরূপ যন্ত্র ব্যবহার করেন না বা করিতে পারেন না।

কঠিন ও তরল পদার্থ ওজন করিবার জন্য নানা প্রকার তৌলযন্ত্র ও বাটখারা আছে। বর্তমান যুগে তৌলযন্ত্রের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। লণ্ডন শহরের বৃটিশ ব্যাঙ্কে একটি তৌলযন্ত্র আছে। তদ্দ্বারা নাকি একবারে একশত আশি মণ সোনা, রূপা বা অনুরূপ অন্যান্য দ্রব্যাদি ওজন করা চলে। ঐ নিক্তিটি এমন সুকৌশলে গঠিত যে, মাত্র এক আনার একখানা ডাকটিকিটের ওজনে উহার কাঁটা দশ ইঞ্চি হেলিয়া পড়ে। তৌলযন্ত্রের এরূপ উন্নতি হইলেও — তাপ, আলো, কাল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূরত্ব, বিদ্যুৎ ইত্যাদি উহা দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। যেহেতু ইহারা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, যাহা কিছু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতার বাহিরে, তাহা তৌলযন্ত্র বা নিক্তি দ্বারা মাপিবার চেষ্টা বৃথা।

'অন্যায়'-এর নামান্তর পাপ বা অন্যায় হইতেই পাপের উৎপত্তি। সে যাহা হউক, কোনরূপ তৌলযন্ত্র বা 'নিক্তি' ব্যবহার করিয়া পাপের পরিমাণ ঠিক করা যায় কিরূপে?

১৫. ইসলামের সাথে পৌত্তলিকতার সাদৃশ্য কেন?

আমরা শুনিয়া থাকি যে, সুসংস্কৃত ইসলামে কুসংস্কারের স্থান নাই। বিশেষত নিরাকার-উপাসক হইতে সাকার-উপাসকগণই অত্যধিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। যদিও বেদ বিশেষভাবে পুতুল-পূজা শিক্ষা দেয় নাই, তথাপি পরবর্তীকালে পুরাণের শিক্ষার ফলে বৈদিক ধর্ম ঘোর পৌত্তলিকতায় পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বৈদিক বা পৌত্তলিক ধর্মের সহিত ইসলাম ধর্মের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার ভাষা ও রূপগত পার্থক্য থাকিলেও ভাবগত পার্থক্য নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় বাদ দিলেও নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে উভয়ত্র সাদৃশ্য দেখা যায়। যথা —

১. ঈশ্বর এক — একমেবাদ্বিতীয়ম (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)।
২. বিশ্ব-জীবের আত্মাসমূহ এক সময়ের সৃষ্টি।
৩. মরণান্তে পরকাল এবং ইহকালের কর্মফল পরকালে ভোগ।
৪. পরলোকের দুইটি বিভাগ — স্বর্গ ও নরক (বেহেস্ত-দোজখ)।
৫. স্বর্গ সাত ভাগে এবং নরক সাত ভাগে বিভক্ত। (কেহ কেহ বলেন যে, ইহা ভিন্ন আর একটি স্বর্গ আছে, উহা বাদশাহ শাদ্দাদের তৈয়ারী।)
৬. স্বর্গ বাগানময় এবং নরক অগ্নিময়।
৭. স্বর্গ উর্ধদিকে অবস্থিত।
৮. পুণ্যবানদের স্বর্গপ্রাপ্তি এবং পাপীদের নরকবাস।
৯. যমদূত (আজ্রাইল ফেরেস্তা) কর্তৃক মানুষের জীবন হরণ।
১০. ভগবানের স্থায়ী আবাস 'সিংহাসন' (আরশ)।
১১. স্তব-স্তুতিতে ভগবান সন্তুষ্ট।
১২. মন্ত্র (কেরাত) দ্বারা উপাসনা করা।
১৩. মানুষ জাতির আদি পিতা একজন মানুষ — মনু (আদম)।
১৪. নরবলি হইতে পশুবলির প্রথা প্রচলন।
১৫. বলিদানে পুণ্যলাভ (কোরবানী)।
১৬. ঈশ্বরের নামে উপবাসে পুণ্যলাভ (রোজা)।
১৭. তীর্থভ্রমণে পাপের ক্ষয় — কাশী-গয়া (মক্কা-মদিনা)।
১৮. ঈশ্বরের দূত আছে (ফেরেস্তা)।
১৯. জানু পাতিয়া উপাসনায় বসা।
২০. সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত (সেজ্‌দা)।
২১. করজোড়ে প্রার্থনা (মোনাজাত)।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২. নিত্যউপাসনার নির্দিষ্ট স্থান — মন্দির (মস্‌জিদ)।
২৩. মালা জপ (তস্‌বিহ্‌ পাঠ)।
২৪. নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা করা — ত্রিসন্ধ্যা (পাঁচ ওয়াক্ত)।
২৫. ধর্মগ্রন্থপাঠে পুণ্যলাভ।
২৬. কার্যারম্ভে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ — নারায়ণং সমস্কৃত্যং নবৈঞ্চব নরোত্তমম (বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মানির রাহিম)।
২৭. গুরুর নিকট দীক্ষা (তাওয়াজ্জ)।
২৮. স্বর্গে গণিকা আছে — গন্ধর্ব, কিন্নরী, অপ্সরা (হুর-গেলমান)।
২৯. উপাসনার পূর্বে অঙ্গ ধৌত করা (অজু)।
৩০. দিগ্‌নির্ণয়পূর্বক উপাসনায় বসা বা দাঁড়ান।
৩১. পাপ-পুণ্য পরিমাপে তৌলযন্ত্র ব্যবহার (মিজান)।
৩২. স্বর্গগামীদের নদী পার হওয়া — বৈতরণী (পোলছিরাত) ইত্যাদি।

ঐ সমস্ত ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধি-নিষেধেও অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যথা — মিথ্যা বলিবে না, চুরি করিবে না, মাতা-পিতার সেবা করিবে ইত্যাদি।

উপরোক্ত যে সকল বিষয়ে উভয়ত সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে চিন্তা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হয়ত ইসলাম হইতে বিষয়গুলি পৌত্তলিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন, নচেৎ পৌত্তলিকদের নিকট হইতে ইসলাম উহা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, পূর্ববর্তীগণের নিকট হইতেই পরবর্তীগণ গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ববর্তী কাহারা?

AMARBOI.COM

১৬. আরবের বৈশিষ্ট্য কি ?

ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক গঠন ভেদে বিভিন্ন দেশের মাটি, জল, বায়ু ও তাপের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য হেতু উষ্ণ মণ্ডল, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ও হিম মণ্ডলের জীবজন্তু ও গাছপালার আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই জন্য পর্বত, মরুভূমি, সমভূমি ও মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহের বাসিন্দাদের আকৃতি ও প্রকৃতি একরূপ হয় না। এমনকি একই ফলের দুইটি বীজ দুই দেশে রোপিত হইলে উভয় দেশে উৎপন্ন ফলের স্বাদ এক রকম হয় না। কিন্তু ইহা যে প্রকৃতির নিয়ম মতই হইতেছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহাও বুঝা যায় যে, কেন সাহারা মরু অঞ্চলে আদৌ বৃষ্টি না হইয়া আসামের চেরাপুঞ্জিতে এত অধিক বৃষ্টিপাত হয়।

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, কোন দেশের উপর বৃষ্টিবর্ষণ নির্ভর করে তথাকার পর্বত ও সমুদ্রের অবস্থানের উপর। কিন্তু কোন দেশের উপর খোদাতা'লার 'রহমত বর্ষণ' নির্ভর করে কিসের উপর? সকল দেশের উপর কি আল্লাহতা'লার রহমত সমান মাপে বর্ষিত হইয়া থাকে? যদি তাহাই হয়, তবে লক্ষাধিক পয়গম্বর প্রায় সবাই আরব দেশে জন্মিলেন কেন? সে যুগের আরব দেশের আবহাওয়া, উষ্ণতা, মাটির উপাদান, ভৌগোলিক অবস্থান ও পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির অনুরূপ কি কোন দেশই পৃথিবীতে ছিল না?

হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে, পয়গম্বরী জিনিসটি প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) নহে। সাধারণত কোন দেশ যখন অন্যায়, অত্যাচার, কদাচার, নীতিগর্হিত কাজ ইত্যাদি ঈশ্বর-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরোধিতায় পাপে ভরপুর হইয়া উঠিত, তখন সেই সকল দেশের পাপ-পঙ্ক দূর করিয়া ইহ-পরকালের শান্তি স্থাপনের জন্য আল্লাহতা'লা ঐ দেশে এক একজন লোককে পয়গম্বরী প্রদান করিতেন।

উপরোক্ত মত সত্য হইলে — যে সকল দেশে একেশ্বরবাদের পরিবর্তে বহু দেব-দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল এবং যে সকল দেশের আচার, ব্যবহার, চালচলন ও খাদ্যাদি নিতান্ত জঘন্য আকারে ছিল, সেই সকল পাপপূর্ণ দেশে কোন পয়গম্বর না হওয়ার কারণ কি? বিশেষত চিরপৌত্তলিকতার দেশ ভারতবর্ষে একজন নবীও জন্মিলেন না কেন? ভারতের গুনাহগার বান্দাদের জন্য কি আল্লাহর দরদ কম?

প্রসঙ্গত এখানে আর একটি বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। শোনা যায় যে, নবীদের সংখ্যা নাকি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। উঁহাদের মধ্যে এক লক্ষ তেইশ হাজার নয় শত আটানব্বই জন নবীই জন্মিয়াছিলেন হজরত ঈসা নবী জন্মিবার আগে, অর্থাৎ ৪০০৪ বৎসরের মধ্যে (বাইবেলের বিবরণমতে হজরত আদম হইতে হজরত ঈসার জন্ম পর্যন্ত সময় ৪০০৪ বৎসর)[১৩]। তাহা হইলে ওদেশে ঐ সময়ে প্রতি বৎসর গড়ে নবী জন্মিয়াছিলেন প্রায় ৩১ জন! আর উহা অসম্ভবও নহে। কেননা নবীদের বিবরণে জানা যায় যে, হয়ত কোন নবীর বাবা, দাদা, এবং পুত্র-পৌত্রাদিও নবী ছিলেন। আবার কখনও ভাইয়ে ভাইয়ে এবং শ্বশুর-জামাতাও নবিত্ব পাইয়াছিলেন। কিন্তু হজরত ঈসা নবী জন্মিবার পরে নবীদের জন্মহার কমিয়া ৫৭০ বৎসরে জন্মিলেন মাত্র একজন, অতঃপর কেয়ামত পর্যন্ত নাকি একেবারেই বন্ধ।

নবীদের আবির্ভাব হ্রাস বা বন্ধ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে এইরূপ মনে হয় যে, হয়ত পাপীর সংখ্যা বা পাপের পরিমাণ আগের চেয়ে হ্রাস পাইয়াছে, নতুবা এ যুগের পাপীদের উপর বীতস্পৃহ হইয়া আল্লাহ তাঁহার হেদায়েত বন্ধ করিয়াছেন ; অথবা সভ্যতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি হেতু 'বাস্তববাদ'-এর আবির্ভাবের ফলে 'ভাববাদ'-এর অবসান ও ভাববাদীর তিরোধান ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে — এ যুগে কোন নবী না হওয়ার আসল কারণ কোনটি?

হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবী যখন নানারূপ পাপভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত, তখন পৃথিবীর পাপভার লাঘব করিবার জন্য স্বর্গবাসী দেবগণ সময় সময় মর্ত্যে অবতীর্ণ হইতেন। এইভাবে একা বিষ্ণুই — মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি — এই দশরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহারা হিন্দুদের মতে — পথভ্রষ্ট মানবের পথপ্রদর্শক ও ঐশ্বরিকবাণী বাহক। মুসলমানদের যেমন 'পয়গম্বর', তেমন হিন্দুদের মতে দেবগণের এক একটি 'অবতার'। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অবতারসমূহের একটিও ভারতবর্ষের বাহিরে — চীনে বা জাপানে হয় নাই।

উপরোক্ত বিবরণগুলি কি শাস্ত্রকারদের দেশপ্রেমের নিদর্শনস্বরূপ স্বদেশের মহত্ত্বকীর্তন, না বহির্জগত সম্বন্ধে অজ্ঞতা?

১৭. বার-এর মহত্ত্ব কি ?

রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি নাম কয়টি পণ্ডিত, মূর্খ, যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই মুখস্থ। কিন্তু একই রূপের দিনগুলির মাসে ৩০টি অথবা বৎসরে ৩৬৫টি নাম না হইয়া মাত্র ৭টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম কেন হইল এবং কোথা হইতে এই নামগুলি আসিল, তাহা অনেকেই ভাবেন না।

রবি, সোম ইত্যাদি সবগুলিই গ্রহাদির নাম। মানব সভ্যতার মধ্যযুগে, জ্যোতির্বিদ্যার শৈশবে, সভ্য মানব সমাজের কাজের সুবিধার জন্য সম্ভবত কোন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত অসংখ্য ও অনন্ত দিনগুলির ৭টি নামকরণ করিয়া থাকিবেন।

গরু, ঘোড়া বা মানুষের স্বকীয় রূপে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কাজেই উহাদের রূপ দেখিয়া চেনা যায়। কিন্তু কাক বা কোকিল সনাক্ত করা সহজ নয়, যেহেতু উহারা সবই একরঙা। স্বাদ, গন্ধ বা বর্ণে সাদৃশ্যযুক্ত পদার্থ অনেক আছে। তাই ডাক্তার বা কবিরাজগণ ঔষধের শিশি বা মোড়কের গায়ে লেবেল আঁটিয়া দেন। বারের সাতটি নামও যেন একরঙা দিনের গায়ে সাতটি লেবেল।

সে যুগের জ্যোতিষীগণ জ্যোতিষ্কদের শ্রেণীবিভাগ বোধহয় এইরূপ করিয়াছিলেন যে, যে সকল জ্যোতিষ্ক অচল তাহারা 'নক্ষত্র' এবং যেগুলি সচল তাহারা 'গ্রহ'। তাই রবি ও সোম অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রকে তাঁহারা গ্রহ বলিয়া গণনা করিতেন। কাজেই রবি ও সোম 'সাত বার'-এর তালিকাভুক্ত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহ নহে। পক্ষান্তরে আমাদের এই পৃথিবী গ্রহ হইলেও ইহার কোন নাম সাত বারের তালিকায় নাই। মাটি-পাথরের তৈয়ারী নিরালোক পৃথিবীটি যে একটি গ্রহ, তাহা বোধহয় সে যুগের জ্যোতিষীগণ জানিতেনই না, জানিলে — ধরা বা মেদিনী ইত্যাদি একটি নাম সাত বারের সহিত যোগ হইয়া সাত বারের স্থলে 'আট বার' হইত।

সে যাহা হউক — রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি — এই নামগুলি কেন এইরূপ সাজানো হইয়াছে, তাহার কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণত ঐ নামগুলিকে চারি প্রকারে সাজানো যাইতে পারে। প্রথমত (সহজদৃষ্ট) আয়তন অনুযায়ী। অর্থাৎ বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম এবং ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তমকে গণনা করা। দ্বিতীয়ত দূরত্ব অনুযায়ী। সৌরজগতের কেন্দ্রের নিকটতম হইতে দূরতম এবং দূরতম হইতে নিকটতমকে গণনা করা। কিন্তু প্রচলিত সাত বারের নামগুলি কোন নিয়মের ভিত্তিতেই সাজানো নাই। এখন দেখা যাক যে, উক্ত চারিটি নিয়মের ভিত্তিতে ঐ নামগুলি সাজাইলে 'সাত বার' কি রূপে দাঁড়ায়।

ক. বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম (সহজদৃষ্ট)

রবি, সোম, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও বুধ।

খ. ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম

বুধ, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র, সোম ও রবি।

গ. নিকটতম হইতে দূরতম

রবি, বুধ, শুক্র, সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।

ঘ. দূরতম হইতে নিকটতম

শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সোম, শুক্র, বুধ ও রবি।

এতদ্ব্যতীত অধুনা ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো ও ভালকান নামে আরও চারিটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বের আবিষ্কৃত গ্রহগুলির নাম যদি দিন বা 'বার'-এর নাম বলিয়া লোকসমাজে চলিতে পারে, তবে নব আবিষ্কৃত গ্রহদের নামের দোষ কি? ন্যায়বিচারের স্বার্থে ইহাদের নামও সাত বারের সহিত যোগ হইয়া 'এগার বার' হওয়া উচিত নয় কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মপ্রচারকদের নিকট শোনা যায় যে, প্রত্যেক 'বার'-এর গুণাগুণ ভিন্ন এবং কোন কোন বার ভগবানের নিকট খুবই প্রিয়। বারবিশেষে স্বর্গের দ্বার খোলা এবং নরকের দ্বার বন্ধ থাকে। কতিপয় ধর্মে বিশেষ সাপ্তাহিক উপাসনাও প্রচলিত আছে। যথা — ইহুদী ধর্মে শনিবার, খৃষ্টান ধর্মে রবিবার এবং ইসলাম ধর্মে শুক্রবার। এই সকল উপাসনায় নাকি পুণ্যও খুব বেশী।

সাত বারের নামগুলি মানুষেরই দেওয়া এবং উহা মানুষের কল্পনার সৃষ্টি। ঐ নামগুলি গ্রহ-উপগ্রহের নাম না হইয়া পশু-পাখীর নামও হইতে পারিত। বর্তমান যুগে দূর হইয়াছে নিকট এবং পর হইতেছে বন্ধু। দূর-দূরান্তে অবস্থিত মানুষ এখন অনেক বিষয়েই একাত্মবোধের প্রমাণ দিতেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ-এর বদৌলতে কোন আন্তর্জাতিক বিধান প্রবর্তন করা এখন আর অসম্ভব নহে। মানব সমাজ যদি একমত হইয়া সাত বারের বিশৃঙ্খল নামগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নবাবিষ্কৃত গ্রহদের নাম যোগ করিয়া, গ্রহদের আয়তন বা দূরত্ব, যে কোন একটির ভিত্তিতে সাজাইয়া একটি নূতন সংশোধিত বারের তালিকা প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেন, তাহা হইলে সাপ্তাহিক উপাসনা চলিবে কোন 'বার'-এ? সংশোধিত বারে উপাসনা করিলে ভগবান তাহা মঞ্জুর করিবেন কি?

১৮. চাঁদের ফজিলত কি?

বিজ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন যে, সূর্যের প্রজ্বলিত বাষ্পীয় দেহের ছিন্ন অংশে পৃথিবীর সৃষ্টি এবং পৃথিবীর ঘূর্ণায়মান গতির ফলে কেন্দ্রাপসারণী শক্তির (Centrifugal force) প্রভাবে বিচ্ছিন্ন অংশে চন্দ্রের জন্ম হইয়াছে। এই মতে চন্দ্র, সূর্য এবং পৃথিবীর দেহের মৌলিক উপাদান একই। বিশেষত চন্দ্র জলবায়ুশূন্য একটি দেশ মাত্র। চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় ২,৩৭,০০৮½ মাইল দূরে থাকিয়া প্রায় সাড়ে উনত্রিশ দিনে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।[১৪] একবার প্রদক্ষিণের সময়কে এক চান্দ্রমাস বলা হয় এবং বারো চান্দ্রমাসে ধরা হয় এক চান্দ্র বৎসর।

বারোবার চন্দ্রের উদয়কে 'এক বৎসর' বলিয়া কে প্রথম গণনা করিয়াছিলেন, জানিনা। বোধ হয় যে, অতীতকালের কোন জ্যোতিষীই হইবেন। তিনি ইচ্ছা করিলে আট, দশ বা বিশ-পঁচিশ মাসেও চান্দ্র বৎসর গণনা করিতে পারিতেন। কেননা পৃথিবী তাহার স্বীয় কক্ষের কোন বিন্দু হইতে যাত্রা করিয়া একবার সূর্য প্রদক্ষিণান্তে পুনঃ কক্ষের সেই বিন্দুতে পৌঁছিতে যে সময়টুকু লয়, তাহাই এক সৌর বৎসর। সৌর বৎসর হইবার একটি স্থির মুহূর্ত বা বিন্দু আছে। কিন্তু চান্দ্র বৎসর শেষ হইবার সেরূপ কোন বাঁধন নাই, উহা কাল্পনিক। তাই চান্দ্র মাস ও বৎসর প্রকৃতির ষড়ঋতুকে তুচ্ছ করিয়া আপন খেয়ালমত চলিয়া যায়। সে যাহা হউক, প্রত্যেক মাসের চন্দ্রই যদি পূর্বচন্দ্রের পুনরোদয় হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন বার উদিত চন্দ্রের ফজিলত (গুণাগুণ) ভিন্ন ভিন্ন হয় কিরূপে? আকাশে চন্দ্র মাত্র একটি এবং তাহার নূতন উদয়ের সংখ্যা হইল অনন্ত, 'বারচাঁদ' বলা হয় কেন?

বলা যাইতে পারে যে, চন্দ্র একটি বস্তুপিণ্ড, তাহার কোন ফজিলত নাই। কিন্তু কোন কোন সময়ের ফজিলত আছে। লোকে চন্দ্রকে দেখিয়া সেই সময়কে চিনিয়া লয় মাত্র।

মানুষ অতীতের কোন ঘটনার স্মৃতিকে চিত্র, লেখা, আখ্যায়িকা ইত্যাদিরূপে রক্ষা করিতে পারে এবং রঙ্গমঞ্চে তাহার কতকটা পুনরাভিনয় করাও চলে। কিন্তু 'কাল' বা সময়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনরাভিনয় করা যায় কি? অতীতের কোন পুণ্যমুহূর্ত বা পবিত্রদিনকে যে 'বার্ষিক পবিত্রদিন' বলিয়া মনে করা হয়, তাহাতে কি কালের পুনরাবৃত্তি হয়, না ঘটনার নামের পুনরুক্তি হয় মাত্র?

হয়ত কেহ বলিবেন যে, অতীতকালের পুনরাগমন না হইলেও অতীত ঘটনার স্মৃতিরক্ষার সার্থকতা আছে। তাহা না থাকিলে জগতে শত শত স্মৃতিদিবস উদ্‌যাপিত হয় কেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, স্মৃতিদিবস উদ্‌যাপনের সার্থকতা আছে বটে, কিন্তু উহা সৌরবৎসরের হিসাব মতেই আছে, চান্দ্রবৎসরের নহে। কেন, তাহা বলিতেছি।

স্মৃতি বা বিস্মৃতি মনের ধর্ম। সুতরাং যে কোন 'স্মৃতিদিবস' বা বার্ষিক অনুষ্ঠান মানসিক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে কোন অনুষ্ঠানের আদি ঘটনাকারী বা তৎসহযোগীদের মনে যে ভাবাবেগ জন্মিয়াছিল, পরবর্তীকালে তদনুবর্তীদের মনে সেইরূপ ভাবের পুনরোদয় করিবার বা করাইবার প্রচেষ্টাই স্মৃতিবার্ষিক অনুষ্ঠান। কিন্তু সেই আদি ঘটনা ঘটিবার সময়ের ঘটনাকারী বা তৎসহযোগীদের মনোভাবের পর্যায়ে পরবর্তীকালের মানুষের মনকে পৌঁছাইতে হইলে পূর্বরূপ প্রাকৃতিক অবস্থারও আবশ্যক।

জীব প্রকৃতির দাস, মানুষও তাহাই। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে বা ঋতু পরিবর্তনে জীবের স্বাস্থ্যগত ও শারীরিক পরিবর্তন হয়, ফলে মনোরাজ্যেরও পরিবর্তন হয়। তাই প্রতি বৎসর বসন্তে কোকিল গান গায়, বর্ষাকালে ভেক ডাকে, ফুলবাগানে মৌসুমী ফুল ফোটে। ইহা যেন উহাদের বার্ষিক মহোৎসব। যুগ যুগ ধরিয়া উহারা উহাদের মহোৎসব পালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে উহাদের মনে প্রেরণা জাগায় কে? উহাদের তো কোন খাতাপত্র বা লিপিপঞ্জি নাই।

পৃথিবী তাহার স্বীয় কক্ষের যেই যেই অংশে অবস্থানকালে কোকিল গান গায়, গাছে গাছে আম পাকে, ডোবায় ডোবায় ভেক ডাকে — একবার আবর্তনের পর পুনঃ কক্ষের সেই সেই অংশে পৃথিবী পৌঁছিলে, আবার কোকিল গাহিবে, আম পাকিবে এবং ভেক ডাকিবে ; তা ঋতু বা মাসের নাম আমরা যাহাই রাখি না কেন। বসন্ত ঋতুকে শরৎ ও ফাল্গুন মাসকে ভাদ্র বলিলেও কোকিল নির্দিষ্ট সময়েই ডাকিবে। তেমনি আষাঢ় মাসকে পৌষ মাস বলিলেও ভেক ঐ সময়ই ডাকিবে। ফল কথা এই যে, কাল বা সময়ের পুনরাগমন না হইলেও সৌর বৎসরে স্বভাবের বা ঋতুর পুনরাগমন হয় এবং তাহাতে জীবের মনোভাবের পুনরাবৃত্তি হয়। চান্দ্র বৎসরের কোন মাসবিশেষের সাথে জীবের মনোরাজ্যের কোন সম্পর্ক আছে কি?

চান্দ্র বৎসর ও সৌর বৎসরে প্রায় ১১$\frac{১}{৪}$ দিনের পার্থক্য হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সৌর বৎসর শেষ হইবার প্রায় ১১ দিন পূর্বে চান্দ্র বৎসর শেষ হইয়া যায়। কাজেই তিন বৎসরে প্রায় একমাস ও ছয় বৎসরে প্রায় দুই মাস পার্থক্য হয়। অর্থাৎ একটি ঋতুই পার হইয়া যায়। উপরোক্ত হিসাবমতে এই বৎসর যে অনুষ্ঠান হইল বসন্তে, আঠার বৎসর পর (চান্দ্র বৎসরের হিসাবমতে) তাহা দাঁড়াইবে হেমন্তে। এই রকম প্রাকৃতিক পরিবর্তনযোগ্য ঈদ, কোরবানী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে চাঁদ নির্ণয়ের সার্থকতা কি?

প্রায় সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিই অনুষ্ঠিত হয় চান্দ্রমাসের হিসাব মোতাবেক। কিন্তু হিন্দুগণ উহা পুরাপুরি মানেন না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, চান্দ্রবৎসর ও সৌরবৎসরে প্রায় এগারো দিনের পার্থক্য হইয়া পড়ে। সৌরবৎসরের সহিত হিন্দু চান্দ্রবৎসরের মোটামুটি মিল রাখিবার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দুগণ কয়েক বৎসর পর পর বিশেষ একটি চান্দ্রমাসকে গণনা হইতে বাদ দেন। কাজেই চান্দ্রবৎসর ও প্রচলিত (সৌর) বৎসরের মধ্যে প্রায় মিল হইয়া পড়ে।

এই রকম অধিমাসকে 'মল-মাস' বলা হয়। এই মাসটিকে হিন্দুরা মাসের মধ্যেই ধরেন না। কোন যাগ-যজ্ঞ, পূজা-হোম বা শুভকার্য হিন্দুরা এই মাসে করেন না।

ইংরেজদের 'বড়দিন' ইত্যাদি উৎসব সৌর বৎসরের হিসাবমতেই হইয়া থাকে এবং প্রতি বৎসরেই একটি বাঁধা তারিখে হয়। কিন্তু হিন্দুদের দুর্গাপূজা ইত্যাদি সেইরূপ বাঁধা তারিখে হয় না বটে, তবে 'মল-মাস'-এর ব্যবস্থার ফলে উহার ব্যবধান এক মাসের বেশী হইতে পারে না। অর্থাৎ চিরকাল একই মাস বা একই ঋতুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। কিন্তু মুসলিম জাহানের যে কোন ধর্মানুষ্ঠান অবিরাম ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ছত্রিশ বৎসরে পুরা সৌর বৎসরটিকে একবার আবর্তন করিয়া পূর্বস্থানে (সময়ে) ফিরিয়া আসে।

আধুনিককালের প্রায় সব দেশে যাবতীয় পর্ব বা বার্ষিক অনুষ্ঠানাদি সৌর বৎসরের হিসাবানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, চান্দ্র বৎসরের নয়। আমাদের 'স্বাধীন বাংলা' রাষ্ট্রের জন্ম ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর মোতাবেক ২৭শে শাওয়াল মাস। ঐ তারিখে জাতীয় মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ করার বাণী শ্রবণে যে উদ্যম-উৎসাহে বঙ্গবাসীদের মন নৃত্য করিয়াছিল, তাহা ডিসেম্বর মাসের তান-মান-লয় যোগেই করিয়াছিল। বৎসরের অপর কোন মাসেই প্রকৃতিবীণা ঐরূপ সুরে বাজিবে না এবং মন নাচিলেও ঐরূপে নাচিবে না। তাই 'স্বাধীন বাংলা' রাষ্ট্রের জন্মবার্ষিকী মহোৎসব প্রতি বৎসর ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে হইতেছে। কিন্তু ২৭শে শাওয়াল তারিখে উহা হইবার কোন যুক্তি আছে কি?

AMARBOI.COM

১৯. শবেবরাতের ফজিলত কি ?

'শবেবরাত' বা ভাগ্যের রজনী মুসলমানদের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান। কথিত হয় যে, ঐ রাত্রে খোদাতা'লার গুণগান করিলে পরবর্তী এক বৎসরের রুজী-রোজগারে বরকত হয় ও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। এককথায় জীবন যাপন সুখের হয়। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া অনেকেই উহা পালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই অনুষ্ঠান যাহারা পালন করেন এবং যাহারা করেন না, তাহাদের মধ্যে খাওয়া-পরা বা সুখ-শান্তিতে কোনই পার্থক্য নাই ; বরং এমনও দেখা যায় যে, যাহারা করেন না তাঁহারাই অত্যধিক সমৃদ্ধিশালী। **মুসলিম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন মহামান্য আগা খাঁ। তিনি কি শবেবরাতের নামাজ পড়িতেন?**

হিন্দুদের ঐরূপ অনেক অনুষ্ঠান পালন করিতে দেখা যায়। 'লক্ষ্মীপূজা' এই জাতীয় একটি অনুষ্ঠান। হিন্দুমতে লক্ষ্মীদেবী সম্পদ বিতরণের মালিক। তাই তাঁহার পূজা করিলে তিনি প্রসন্না হইয়া তাঁহার ভক্তকে বেশী পরিমাণ ধনরত্ন দান করেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া হিন্দুগণ লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, চারি আনা পয়সা খরচ করিয়া লক্ষ্মীদেবীর প্রতিমা কিনিতে না পারিয়া কেষ্ট সাধু (লেখকের প্রতিবাসী) ছেলেবেলা হইতেই কলাগাছের লক্ষ্মী সাজাইয়া তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল, আর এখন তাহার পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও কলাগাছ ছাড়িয়া প্রতিমা কিনিবার তওফিক হইল না। অথচ আমেরিকার ফোর্ড সাহেব (Henry Ford) লক্ষ্মীপূজা না করিয়াও সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হইলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দুধর্মের আর একটি অনুষ্ঠান সরস্বতী পূজা। তিনি নাকি মানুষের বিদ্যাদাত্রী দেবী। তাঁহার পূজা করিলে তিনি সদয় হইয়া তাঁহার ভক্তকে অসীম বিদ্যা দান করেন। অথচ দেখা যাইতেছে যে, সাত বৎসর পর্যন্ত সরস্বতী দেবীর পূজা দিয়াও গোপাল চাঁদ (লেখকের প্রতিবাসী) বর্ণমালা আয়ত্ত করিতে পারিল না, আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরস্বতী পূজা না দিয়াও কবিসম্রাট হইলেন।

'শবেবরাত' ঐ শ্রেণীর একটি অনুষ্ঠান নয় কি?

২০. কসুফ ও খসুফ কি?

খুব বেশী দিনের কথা নয়। কলম্বাস সাহেব সদলবলে আমেরিকা পৌঁছিলে একদা তাঁহাদের খাদ্যের অভাব হয়। তাঁহারা ভাবিলেন — মহাবিপদের কথা। অজানা অচেনা দেশ, কোথায় কি খাদ্য পাওয়া যায় না যায়, তাহার ঠিক নাই। কলম্বাস সাহেব মনে মনে এক ফন্দি আঁটিলেন। ঐদিন ছিল সূর্যগ্রহণ। তিনি জানিতেন, অসভ্যরা সূর্যগ্রহণকে অতিশয় ভয় করে। কেননা তাহারা মনে করে যে, সূর্য হঠাৎ নিভিয়া গেলে তাপ এবং আলোর অভাবে তাহারা শীত ও অন্ধকারে মরিয়া যাইবে। কলম্বাস সাহেব আমেরিকার কয়েকজন আদিম (অসভ্য) অধিবাসীকে ডাকিয়া ইশারায় বুঝাইয়া বলিলেন, "আমরা দেবতার বংশধর! আমাদের খাদ্যের অভাব হইয়াছে, তোমরা আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া দাও ; নচেৎ আমরা সূর্যকে নিভাইয়া দিব। তাহা হইলে তোমরা শীত ও অন্ধকারে না খাইয়া মরিবে।" প্রথমত অসভ্যেরা উহা গ্রাহ্য করিল না । কিন্তু কিছু সময় পর যখন দেখিল যে, সত্যই সূর্য নিভিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন উহারা নানারকম খাদ্য আনিয়া দিতে লাগিল এবং বিচিত্র ভঙ্গিতে কলম্বাসের স্তবস্তুতি করিয়া ইশারায় বলিতে লাগিল — তোমরা সূর্যকে মুক্ত করিয়া দাও, আমাদিগকে বাঁচাও, আমরা আজীবন তোমাদের অনুগত থাকিব। কলম্বাস সাহেব দেখিলেন যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তখন তিনি অসভ্যদের ইশারায় জানাইলেন — তোমরা শান্ত হও, আমরা অচিরেই সূর্যকে মুক্ত করিয়া দিতেছি। কিছুক্ষণ বাদে যখন সূর্য মুক্ত হইল, তখন অসভ্যরা ভাবিল — তাইত। শ্বেতাঙ্গরা সত্যই দেবতার বংশধর। ইহাদের নিয়মিত ভোগ দিয়া স্তবস্তুতি করিতেই হইবে। সেইদিন হইতে কলম্বাস সাহেব যতদিন আমেরিকায় ছিলেন, তাহার মধ্যে আর কখনও তাঁহার খাদ্যের অভাব হয় নাই।

এতদ্দেশের লোকও অতি প্রাচীনকাল হইতে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণকে অমঙ্গলসূচক বলিয়া ভয় করিত এবং এখনও অনেকে করে। তাই হিন্দুদের মধ্যে গ্রহণের সময় মন্ত্রপাঠ, শঙ্খ ও ঘণ্টাবাদন, উলুধ্বনি, কুম্ভমেলায় যাওয়া ও গঙ্গাস্নানের রেওয়াজ আছে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতরেও চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় 'কসুফ' ও 'খসুফ' নামক নামাজ পড়ার নিয়ম আছে।

যাঁহারা গ্রহণের সময় স্তবস্তুতি করার প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় যে, তাঁহাদের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য হইল, চাঁদ-সুরুজকে গ্রহণমুক্ত করিয়া বিপদকালে তাহাদের সাহায্য করা ; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল, চাঁদ-সুরুজকে গ্রহণমুক্ত করিয়া পরোক্ষভাবে নিজেদের মঙ্গল করা। তাঁহারা হয়ত ভাবিতেন — গ্রহণের সময় চাঁদ-সুরুজের খুব কষ্ট হয়। কেননা সাপে ব্যাঙ ধরিয়া যেরূপ ধীরে ধীরে গিলিতে থাকে, রাহু ও কেতু আসিয়া সেইরূপ চাঁদ-সুরুজকে গিলিতে থাকে এবং উহাদের কষ্ট হয়। গ্রহণ দীর্ঘস্থায়ী হইলে বেচারারা হয়ত মরিয়াও যাইতে পারে। সুতরাং উহাদের আশু মুক্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ভিন্ন তাঁহাদের হাতে আর কোন উপায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না। তাই অতীতকালের মহানুভব ব্যক্তিগণ চাঁদ–সুরুজের মঙ্গল, নিজেদের মঙ্গল ও বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় নানাবিধ স্তবস্তুতির প্রবর্তন ও প্রচলন করিয়া গিয়াছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, মহাকাশে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া এক গোলাকার কক্ষপথে পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া এক গোলাকার কক্ষপথে চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছে। এই ঘূর্ণনে সময় সময় চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী এক সরলরেখায় দাঁড়ায়। ঐ সময় অমাবস্যা তিথি হইলে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চন্দ্র দাঁড়াইয়া সূর্যকে আড়াল করিয়া ফেলে, ইহাকে আমরা 'সূর্যগ্রহণ' বলি এবং ঐ অবস্থায় পূর্ণিমা তিথি হইলে চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী দাঁড়ায়। ইহাতে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে পতিত হওয়ার ফলে আমরা 'চন্দ্রগ্রহণ' দেখি। আসলে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ — চন্দ্র ও পৃথিবীর ছায়ামাত্র ; রাহু, কেতু বা অন্য কিছু নয়। সূর্য হইতে পৃথিবী ও পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব এবং উহাদের ব্যাস ও গতিবেগ জানা থাকিলে, কোন গ্রহণ কখন হইবে এবং কত সময় স্থায়ী হইবে, তাহা অঙ্ক কষিয়া বলা যায়। বলা বাহুল্য যে, কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ উহা বলিতেছেন এবং যাহা বলিতেছেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইতেছে, এক মিনিটও এদিক–ওদিক হইতেছে না।

একবার ১৯৬৫ সাল হইতে ২০০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৫ বৎসরের চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন আকাশ–বিজ্ঞানীগণ। এযাবৎ (১৯৮২) তাহার মধ্যে ১৮ বৎসরের গ্রহণসমূহ যথানির্ধারিত সময়েই ঘটিয়া গিয়াছে এবং আগামী বৎসরগুলিতেও তাহার কোন ব্যত্যয় হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। গ্রহণগুলি অলৌকিক বা ঐশ্বরিক কোন ঘটনা নহে, উহা সম্পূর্ণ লৌকিক ও পার্থিব ঘটনা । চাক্ষুষ প্রমাণের জন্য আগামী ১৯৮৩ হইতে ২০০০ সালের শুধু সূর্যগ্রহণের একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইল। বাহুল্যবোধে চন্দ্রগ্রহণের তালিকা দেওয়া হইল না এবং পৃথিবীর সকল অঞ্চলে একই সময়ে গ্রহণ দৃষ্ট হয় না বলিয়া সময় দেওয়া হইল না।

সাল	তারিখ
১৯৮৩	১১ জুন
৮৪	৩০ মে ও ২২ নভেম্বর
৮৫	১২ নভেম্বর
৮৬	৩ অক্টোবর.
৮৭	২৯ মে
৮৮	১৮ মার্চ
৮৯	—
৯০	২২ জুলাই
৯১	১১ জুলাই
৯২	৩০ জুন
৯৩	—
৯৪	৩ নভেম্বর
৯৫	২৪ অক্টোবর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬	—
১৭	৯ মার্চ
১৮	২৬ ফেব্রুয়ারী
১৯	১১ আগষ্ট
২০০০	পূর্ণ গ্রহণ হইবে না।

এমতাবস্থায় চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সময় 'কসুফ' বা 'খসুফ' নামাজ অথবা অন্য কোনরূপ স্তবস্তুতি করার উপকারিতা কিছু আছে কি?

২১. জীবহত্যায় পুণ্য কি ?

কোন ধর্ম বলে, 'জীবহত্যা মহাপাপ'। আবার কোন ধর্ম বলে, 'জীবহত্যায় পুণ্য হয়'। জীবহত্যায় পাপ বা পুণ্য যাহাই হউক না কেন, জীবহত্যা আমরা অহরহই করিতেছি। তাহার কারণ — জগতে জীবের খাদ্যই জীব। নির্জীব পদার্থ যথা — সোনা, রূপা, লোহা, তামা বা মাটি-পাথর খাইয়া কোন জীব বাঁচে না। পশু-পাখী যেমন জীব ; লাউ বা কুমড়া, কলা-কচুও তেমন জীব। উদ্ভিদকুল মৃত্তিকা হইতে যে রস আহরণ করে, তাহাতেও জৈবপদার্থ বিদ্যমান থাকে। কেঁচো মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেও উহার দ্বারা সে জৈবিক পদার্থই আহরণ করে এবং মৃত্তিকা মলরূপে ত্যাগ করে।

জীবহত্যার ব্যাপারে কতগুলি উদ্ভট ব্যবস্থা আছে। যথা — ভগবানের নামে জীবহত্যা করিলে পুণ্য হয়, অখাদ্য জীব হত্যা করিলে পাপ হয়, শত্রু শ্রেণীর জীব হত্যা করিলে পাপ নাই এবং খাদ্য জীব হত্যা করিলে পাপ-পুণ্য কিছুই নাই ইত্যাদি।

☞ সে যাহা হউক, ভগবানের নামে জীবহত্যা করিলে পুণ্য হইবে কেন? কালীর নামে পাঁঠা বলি দিয়া উহা যজমান ও পুরোহিত ঠাকুরই খায়। কালীদেবী পায় কি? পদপ্রান্তে জীবহত্যা দেখিয়া পায় শুধু দুঃখ আর পাঁঠার অভিশাপ। কেননা কালীদেবীর ভক্তগণ যাহাই মনে করুন, পাঁঠায় কামনা করে কালীদেবীর মৃত্যু। যেহেতু কালীদেবী মরিলেই সে বাঁচিত।

জীবমাত্রেই বলির পাত্র নহে। আবার ধর্মে ধর্মে বলির জীবে পার্থক্য অনেক। মুসলমানদের কোরবানীর (বলির) পশু — গরু, বকরী, উট, দুম্বা ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দুদের বলির পাত্র — ছাগল, ভেড়া, হরিণ, মহিষ, শূকর, গণ্ডার, শশক, গোসাপ এবং কাছিম।

ইসলামের বিধানমতে 'কোরবানী' একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান। শোনা যায় যে, হজরত ইব্রাহিম (আ.) স্বপ্নাদেশমত তাঁহার প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কোরবানী করিয়া খোদাতা'লার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাই মুসলমানগণ গরু, ছাগল, উট, দুম্বা ইত্যাদি কোরবানী দিয়া খোদাতা'লার প্রিয়পাত্র হ'ন।

কোরবানী প্রথার মূল উৎস সন্ধান করিলে মনে কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হয়। প্রশ্নগুলি এমন —

ক. হজরত ইব্রাহিমের 'স্বপ্নাদেশ' তাঁহার মনের ভগবদ্ভক্তির প্রবণতার ফল হইতে পারে না কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. খোদাতা'লা নাকি স্বপ্নে বলিয়াছিলেন, 'হে ইব্রাহিম, তুমি তোমার প্রিয়বস্তু কোরবানী কর।' এই 'প্রিয়বস্তু' কথাটির অর্থে হজরত ইব্রাহিম তাঁহার পুত্র ইসমাইলকে বুঝিয়াছিলেন এবং তাই তাহাকে কোরবানী করিয়াছিলেন। হজরত ইব্রাহিমের প্রিয়বস্তু তাঁহার 'পুত্র' ইসমাইল না হইয়া তাঁহার 'প্রাণ' হইতে পারে না কি?

শোনা যায় যে, একদা আল্লাহতা'লা হজরত মুসার নিকট দুইটি চক্ষু চাহিয়াছিলেন। হজরত মুসা অনেক কোসেস করিয়াও কাহারও কাছে চক্ষুর খোঁজ না পাইয়া পরের দিন (তুর পর্বতে গিয়া) আল্লাহর কাছে বলিলেন, সমস্ত দেশ খোঁজ করিলাম, কিন্তু কোন ব্যক্তিই আমাকে চক্ষু দিতে রাজী হইল না। তখন নাকি আল্লাহ বলিয়াছিলেন, হে মুসা! তুমি সমস্ত দেশ খোঁজ করিয়াছ সত্য, কিন্তু তুমি তোমার নিজ দেহটি খোঁজ করিয়াছ কি? তোমার নিজের দুইটি চক্ষু থাকিতে অপরের চক্ষু চাহিতে গিয়াছ কেন? হজরত মুসা নিরুত্তর হইলেন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, **নবীগণও কোন কোন সময় আল্লাহর বাণীর উদ্দেশ্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভ্রমে পতিত হইতেন।** হজরত ইব্রাহিম বহির্জগতে তাঁহার 'প্রিয়বস্তু'র খোঁজ করিয়া তাঁহার পুত্রকে পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার অন্তর্জগত খোঁজ করিলে কি পাইতেন?

গ. 'কোরবানী' কথাটির অর্থ 'বলিদান' না হইয়া 'উৎসর্গ' হইতে পারে কিনা। ঈসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্তান উৎসর্গের নিয়ম আছে। কোন সন্তানকে তাহার পিতা-মাতা মহাপ্রভুর নামে উৎসর্গ করিতে পারেন। ঐরূপ উৎসর্গ করা সন্তানের কর্তব্য হয় — সর্বস্বত্যাগী হইয়া আজীবন ধর্মকর্ম ও মন্দির-মসজিদের সেবা করা। এই প্রথাটি ইহুদী জাতির মধ্যেও দেখা যায়। হজরত ঈসার মাতা বিবি মরিয়ম জেরুজালেম মন্দিরে উৎসর্গ করা একজন সেবিকা ছিলেন। সমস্ত নবীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের বংশধর। হজরত ইসমাইল, হজরত ইসহাক, হজরত ইয়াকুব, হজরত ইউসুফ, হজরত মুসা, হজরত ঈসা এবং হজরত মোহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত সকলেই। ইসমাইল ও ইসহাক পুত্র, হজরত ইয়াকুব পৌত্র এবং হজরত ইউসুফ ছিলেন প্রপৌত্র। অন্যান্য নবীদের মধ্যেও সকলেই ছিলেন হজরত মোহাম্মদ (দ.)-এর পূর্ববর্তী এবং হজরত ইব্রাহিমের অনুসারী। ছেলেদের খাৎনা (ত্বকচ্ছেদ) করার প্রথাটি হজরত ইব্রাহিম প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং তাহা অন্যান্য নবীগণও পালন করিয়া গিয়াছেন। বিশেষত ইহুদী ও খৃষ্টানগণ উহা এখনও পালন করেন। কিন্তু স্বগোত্রীয় ও অনুসারী হইয়াও উহারা 'কোরবানী' প্রথাটি পালন করেন নাই। কিন্তু হজরত ইব্রাহিমের আবির্ভাবের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পর উহা প্রবর্তন হইল কেন?

ঘ. যাঁহারা স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে, স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে যাহা কিছু দেখে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই থাকে 'রূপক'। হজরত ইব্রাহিমের স্বপ্নের কোরবানীর দৃশ্যটি 'রূপক' হইতে পারে কিনা?

উপরোক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, কোরবানী প্রথার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় নয়। একটি স্বপ্নের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ পশুর জীবন নষ্ট হইতেছে। উপন্যাসকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিলে যেরূপ ভুল করা হয়, স্বপ্নের রূপককে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিলে সেইরূপ ভুল হইতে পারে না কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে যাহা হউক, হজরত ইব্রাহিম যে একজন খাঁটি খোদাভক্ত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যদি স্বপ্নাদেশের প্রিয়বস্তু বলিতে তাঁহার নিজ প্রাণকে বুঝিতেন, বোধ হয় যে, তাহাও তিনি দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আল্লাহর প্রেমে তিনি এত অধিক আত্মভোলা হইয়াছিলেন যে, তখন তাঁহার কাছে স্ত্রী, পুত্র ও ধনরত্নাদির কোনই মূল্য ছিল না। তাই তিনি অম্লানবদনে তাঁহার প্রিয় পুত্র ইসমাইলের গলে ছুরি চালাইয়াছিলেন। হজরত ইব্রাহিমের সন্তান-বাৎসল্য যতই গভীর হউক আর না হউক, উহাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক ছিল, তাহা 'পিতা ও পুত্র'। আজকাল যে সকল ব্যক্তি পশু কোরবানী করেন, তাহাদের সঙ্গে ঐ পশুর সম্পর্ক কি?

কোরবানীর পশুর সঙ্গে কোরবানীদাতার সম্পর্ক শুধু টাকার। তাহাও অনেক ক্ষেত্রে সুদ, ঘুষ, চোরাবাজারী, লোক ঠকানো ইত্যাদি নানা প্রকার অসদুপায়ে অর্জিত। কাজেই কোরবানীদাতা মনে করেন — 'যত্র আয় তত্র ব্যয়'। মাঝখানে লাভ হয় কোরবানী করার যশ।

দেখা যায় যে, কেহ কেহ কোরবানীর দুই-তিন দিন পূর্বেই কন্যা-জামাতা ও আত্মীয়-বন্ধুদের দাওয়াত করেন এবং কোরবানীর দিন সকাল হইতে আটা-ময়দা ও চাউলের গুঁড়া তৈয়ারে ব্যস্ত থাকেন। কোরবানীর পশুর মাংস দিয়া মাংস-রুটির এক মহাভোজ হয়। হজরত ইব্রাহিম যখন ইসমাইলকে কোরবানী করিতে লইয়া গিয়াছিলেন, তখন কি বিবি হাজেরাকে তিনি আটার রুটি তৈয়ার করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন?

কোরবানীর পশুর জবেহ হইতে আরম্ভ করিয়া — মাংস কাটা, বখরা ভাগ ইত্যাদি ও খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে যত রকম হাসি-তামাসা, গল্প-গুজব ও পান-সিগারেটের ধুম। হজরত ইব্রাহিমের কোরবানীর সাথে ইহার পরিবেশগত কোন সামঞ্জস্য আছে কি?

হজরত ইব্রাহিমের কোরবানীর মূল বস্তু ছিল তাঁহার 'প্রাণ' কোরবানী করা। কেননা ইসমাইল তাঁহার প্রাণ-সমতুল্যই ছিলেন। বিশেষত তাঁহার ঔরসজাত বলিয়া তিনি তাঁহার প্রাণের অংশীদারও ছিলেন (ছিয়াশী বৎসর বয়স্ক সুবৃদ্ধ ইব্রাহিমের একই মাত্র সন্তান ইসমাইল)। তাই ইসমাইলকে কোরবানী করার মানে হজরত ইব্রাহিমের প্রাণকে কোরবানী করা। আর আজকাল যে কোরবানী করা হয়, তাহাতে কোরবানীর পশুর সাথে কোরবানীদাতার কোনরূপ স্নেহ বা মায়ার বন্ধন থাকে কি?

হজরত ইব্রাহিম আল্লাহর নির্দেশ মানিয়া শুধু কোরবানীই করেন নাই। আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে চলিতে যাইয়া তিনি নাকি ভীষণ অগ্নিকুণ্ডেও পতিত হইয়াছিলেন। **হজরত ইব্রাহিমের পদাঙ্ক অনুসরণ বা তাঁহার কৃতকর্মের অনুকরণ করাই যদি তাঁহার অনুসারীদের উদ্দেশ্য হয়, তবে তিনি যেই তারিখে অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়াছিলেন, সেই তারিখে তাঁহারা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেন না কেন?**

হজরত ইব্রাহিম তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়বস্তুই কোরবানী করিয়াছিলেন। বর্তমান কোরবানীদাতাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়বস্তু কি দশ-বিশ টাকা মূল্যের একটি পশু?

হজরত ইব্রাহিমের খোদাভক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে ইসমাইল পাইয়াছিলেন। তাই নিজেকে কোরবানী করার বাণী শ্রবণে মহানন্দে তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন এবং পিতার ছুরিকার নীচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বেচ্ছায় শয়ন করিয়াছিলেন। আর বর্তমান কোরবানী প্রথায় পশুর কোন সম্মতি থাকে কি? একাধিক লোকে যখন একটি পশুকে চাপিয়া ধরিয়া জবেহ করেন, তখন সে দৃশ্যটি বীভৎস বা জঘন্য নয় কি?

মনে করা যাক, মানুষের চেয়ে বেশী শক্তিশালী এক অসুর জাতি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া, তাহারা পুণ্যার্থে মহেশ্বর নামক এক দেবতার নামে জোরপূর্বক মানুষ বলি দিতে আরম্ভ করিল। তখন অসুরের খাঁড়ার (ছুরির) নীচে থাকিয়া মানুষ কি কামনা করিবে? 'মহেশ্বরবাদ ধ্বংস হউক, অসুর জাতি ধ্বংস হউক, অন্ধ বিশ্বাস দূর হউক' — ইহাই বলিবে না কি?

হজরত ইব্রাহিম দ্বিধাহীন চিত্তেই ইসমাইলের গলে ছুরি চালাইয়াছিলেন। কিন্তু বলির শেষে দেখিলেন যে, কোরবানী হইয়াছে একটি দুম্বা, ইসমাইল তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। ঐ সময় দুম্বা কোরবানী না হইয়া প্রকৃতপক্ষে যদি ইসমাইলই কোরবানী হইতেন, তবে তাঁহার অনুকরণে মুসলিম জাহানে আজ কয়টি কোরবানী হইত?

হজরত ইব্রাহিমের কোরবানী দেওয়া হইল বটে, কিন্তু ইসমাইল কোরবানী হইলেন না এবং যে দুম্বাটি কোরবানী হইল, তাঁহার কেনা নয় এবং পালেরও নয়। অধিকন্তু উহা কোথা হইতে কিভাবে আসিল, তাহাও তিনি জানিলেন না। ঘটনাটি আজগুবি নয় কি?

কোরবানী প্রথায় দেখা যায় যে, কোরবানীর পশুর হয় 'আত্মত্যাগ' এবং কোরবানীদাতার হয় 'সামান্য স্বার্থত্যাগ'। দাতা যে মূল্যে পশুটি খরিদ করেন, তাহাও সম্পূর্ণ ত্যাগ নহে। কেননা মাংসাকারে তাহার অধিকাংশই গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, সামান্যই হয় দান। এই সামান্য স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে যদি দাতার স্বর্গলাভ হইতে পারে, তবে কোরবানীর পশুর স্বর্গলাভ হইবে কিনা? যদি না হয়, তবে ঐ সকল পশুর আত্মত্যাগের সার্থকতা কি? আর যদি হয়, তবে সকল পশুর হইবে কিনা; অর্থাৎ অসদুপায়ে অর্জিত (হারাম) অর্থে দেওয়া কোরবানীর পশুর স্বর্গলাভ হইবে কিনা? যদি না হয়, তবে ঐ সকল পশুর অপরাধ কি?

বাইবেল তথা তৌরিতে পুণ্যার্থে বাহুল্যরূপে গোহত্যার বিবরণ পাওয়া যায়। হজরত ইব্রাহিম ঐ মতের প্রবর্তক বা সমর্থক ছিলেন এবং হজরত মোহাম্মদ (দ.) ঐ মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ গোপালন করিয়া আসিতেছে — দুগ্ধপ্রাপ্তির ও কৃষিকাজের জন্য। কিন্তু মরুময় আরবদেশে কৃষিকাজ নাই বলিলেই চলে। সুতরাং ওদেশে দুগ্ধবতী গাভী কাজে লাগিলেও বলদগুলি কোন কাজেই লাগে না। তাই আরব দেশের লোকে পুণ্যার্থেই হউক আর ভোজার্থেই হউক, বাহুল্যরূপেই গোহত্যা করিতেন। কাজেই ঐ দেশীয় ধর্মশাস্ত্রগুলিতেও গোহত্যার ব্যবস্থা দেখা যায়। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে গোজাতি মানুষের পরম উপকারী পশু। কৃষিকাজের সহায়ক বলিয়া আর্যগণ গোহত্যা অন্যায় মনে করিতেন। তাই তাহাদের ধর্মশাস্ত্রেও 'গোহত্যা মহাপাপ' বলিয়া উল্লেখ আছে। আর্যগণ মনে করিতেন — গাভী আমাদিগকে দুগ্ধদান করে, সুতরাং সে মাতৃ-সমতুল্যা এবং বলদ কৃষিকাজের সহায়ক হইয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করে, তাই সে পিতৃ-সমতুল্য, কাজেই উহারা আমাদের সম্মানের ও পূজার পাত্র। অধিকন্তু হিন্দুগণ ছাগ ভক্ষণ করে, অথচ দুগ্ধদাতৃ বলিয়া ছাগী ভক্ষণ করে না। কিন্তু 'দুগ্ধদাতৃ' বলিয়া কোন পশুর প্রতি মুসলমানদের কৃতজ্ঞতা নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে আজও ব্যাপক ক্ষেত্রে গরুর দ্বারা কৃষিকাজ চলিতেছে। যদিও ক্বচিৎ ট্রাক্টরাদি দ্বারা যান্ত্রিক চাষাবাদের চেষ্টা চলিতেছে, উহা কবে যে গরুর চাহিদা মিটাইবে, তাহা আজও বলা যায় না। সুতরাং কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে গোহত্যা ক্ষতিজনক নয় কি?

২২. পাথর চুম্বন কেন?

যে সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র মক্কা শহরে হজ্বক্রিয়া সম্পাদন করিতে যান তাঁহাদের কতগুলি বিশেষ নীতি পালন করিতে হয়। যথা — তওয়াফ (কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ), এহরাম বাঁধা, সাফা-মারওয়া দৌড়, কঙ্কর নিক্ষেপ ও 'হেজরল আসোয়াদ' নামক পাথর চুম্বন ইত্যাদি। শেষোক্ত 'হেজরল আসোয়াদ' একখানা কালো রং-এর পাথর। ঐ পাথরখানা নাকি পাহাড়াদির সাধারণ পাথর নয়। শোনা যায় যে, কোন এক সময় ঐ পাথরখানা বেহেস্ত (আকাশ?) হইতে পতিত হইয়াছিল। তাই মক্কার লোকে ঐ পাথরখানাকে যথেষ্ট তাজিম করিতেন। বহুদিন ঐ পাথরখানা উন্মুক্ত জায়গায় পতিত ছিল। অতঃপর পবিত্র কাবাগৃহ মেরামতের সময় ঐ পাথরখানা কাবাগৃহের দেওয়ালের সংগে গাঁথিয়া সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে। হাজীগণকে ঐ পাথরখানা সম্মানের সাথে চুম্বন করিতে হয়।

পিতা-মাতা স্নেহবশে শিশুদের মুখ চুম্বন করে এবং প্রেমাসক্তিবশে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখ চুম্বন করিয়া থাকে। যাহাকে চুম্বন করা হয়, তাহার মমতাবোধ বা সুখানুভূতি থাকা আবশ্যক। যাহার মমতাবোধ বা সুখানুভূতি নাই, তাহাকে চুম্বন করার কোন মূল্য থাকিতে পারে না। 'হেজরল আসোয়াদ' চেতনাবিহীন একখণ্ড নির্জীব পাথর মাত্র। উহাকে চুম্বন করিবার উপকারিতা কি? উহাকে চুম্বন করিলে তাহাতে আল্লাহ্‌তা'লা খুশি হন কেন? নির্জীব ও অচেতন একখানা কালো পাথরকে এতোধিক সম্মান প্রদর্শনের কারণ — উহা বেহেস্তী পাথর। তাহাই নয় কি?

> একদা হজরত ওমর (রা.) কাবার হেজরল আসোয়াদ পাথরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে কালো প্যাথর, যদি রসুলুল্লাহ (দ.) তোমাকে চুম্বন না করিতেন, তবে আমি তোমাকে চুম্বন তো করিতামই না, বরং কাবাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তোমাকে দূরে নিক্ষেপ করিতাম।"[১৫]

জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সুদূর অতীতকালে কোন নক্ষত্রের আকর্ষণের ফলে সূর্যের জ্বলন্ত বাষ্পীয় দেহের খানিকটা ছিন্ন হইয়া দূরান্তে গিয়া কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে পৃথিবীর জন্ম হয়। প্রথমত উহা জ্বলন্ত বাষ্পাকারে ছিল। ক্রমে শীতল হইয়া তরল অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। কালক্রমে আরও শীতল হইয়া পৃথিবীর বহির্ভাগ কঠিন হইতে থাকে। কিন্তু অভ্যন্তরভাগ তরল অবস্থায়ই থাকে। পৃথিবীর বহিরাবরণ শীতল ও কঠিন হইয়া সঙ্কুচিত হইবার ফলে ভূ-গর্ভস্থ তরল পদার্থের উপর যে পরিমাণ চাপ পড়িতে থাকে, অভ্যন্তরভাগের তরল পদার্থ তাপ ত্যাগ করিয়া ঐ পরিমাণ সঙ্কুচিত হইতে না পারিয়া সময় সময় পৃথিবীর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া ফোয়ারার আকারে উর্ধে উঠিতে থাকে। এইরূপ তরল পদার্থের উদ্গীরণ সময় সময় এত অধিক শক্তিসম্পন্ন হইত যে, উহা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাহিরে চলিয়া যাইত এবং মহাকাশের শীতলস্পর্শে শীতল হইয়া কঠিন পাথরের আকার প্রাপ্ত হইত ও মহাকাশে ইতস্তত ভাসিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়াইত। কালক্রমে পৃথিবী আরও শীতল ও কঠিন হইয়া প্রাণীবাসের যোগ্য হইয়াছে এবং মহাকাশে ঐ ভাসমান পাথরগুলি আজও ভাসিয়া বেড়াইতেছে। উহারা মহাকাশে ভাসিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কোন কোন সময় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সীমার ভিতরে আসিয়া পড়ে এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে ভূপতিত হইতে থাকে। ভূপতিত হইবার সময় বায়ুর ঘর্ষণে উহারা প্রথমত উত্তপ্ত হয়, পরে জ্বলিয়া উঠে। ঐ সকল পাথরকে 'উল্কাপিণ্ড' বলে। কিন্তু সাধারণ লোকে বলে 'তারা খসা'।[১৬] উল্কাপিণ্ডগুলি ওজনে দুই-তিন ছটাক হইতে বিশ-পঁচিশ মণ বা ততোধিক ভারি হইয়া থাকে। যে সকল উল্কাপিণ্ড আকারে ছোট, তাহারা জ্বলিয়া মধ্যপথে নিঃশেষ হইয়া ভস্মে পরিণত হয় এবং যেগুলি আকারে বড়, তাহারা জ্বলিয়া নিঃশেষ হইতে পারে না, আধাপোড়া অবস্থায় সশব্দে ভূপতিত হয়। দহনের ফলে সাধারণত উহাদের রং হয় কালো।

ঐ রকম কোন উল্কাপিণ্ড লোকালয়ে পতিত হইলে লোকে উহা সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষা করে। ঐরূপ সংগৃহীত অনেক আধপোড়া উল্কাপিণ্ড বড় বড় মিউজিয়মে বিশেষত কলিকাতা মিউজিয়মেও রক্ষিত আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উল্কার দেহ ও পৃথিবীর মাটি-পাথর একই উপাদানে গঠিত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, উল্কাপিণ্ডগুলি পৃথিবীর অংশবিশেষ এবং সুদূর অতীতকালে উহারা পৃথিবীতেই ছিল।

'হেজরল আসোয়াদ' পাথরখানা ঐরকম একখণ্ড উল্কাপিণ্ড নয় কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম প্রস্তাব

[প্রকৃতি বিষয়ক]

১. মানুষ ও পশুতে সাদৃশ্য কেন ?

ধর্মাচার্যগণ বলেন যে, যাবতীয় জীবের মধ্যে মানুষ আল্লাহতা'লার শখের সৃষ্ট জীব। পবিত্র মক্কার মাটির দ্বারা বেহেস্তের মধ্যে আদমের মূর্তি গঠিত হইয়া বেহেস্তেই তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

জগতের যাবতীয় জীবের নাকি একই সময়ে সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু জগতের বিভিন্ন জীবের দেহ যথা — পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি কোন স্থানের মাটির দ্বারা কোথায় বসিয়া কখন সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং আদমের পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই উহারা এখানে বংশবিস্তার করিয়াছিল কিনা, উহাদের অনেকের সাথে অনেক বিষয়ে মানুষের সৌসাদৃশ্যের কারণ কি এবং আদমের দেহ ও বিভিন্ন জীবের দেহ একই বস্তু দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছিল কি?

আদম হইতে আদমী বা মানুষ জাতির উৎপত্তি — এই মতবাদের পর্যালোচনায় উপরোক্ত প্রশ্নগুলি স্বতই মনে উদিত হয় এবং আরও যে সকল প্রশ্ন জাগে, তাহার সামান্য আলোচনা করা যাইতেছে।

AMARBOI.COM

মানুষের রক্তের প্রধান উপাদান — শ্বেত কণিকা, লোহিত কণিকা, জল ও লবণ জাতীয় কিছু পদার্থ এবং দেহ বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় — লৌহ, কার্বন, ফসফরাস ও গন্ধকাদি কতিপয় মৌলিক পদার্থ। অন্যান্য জীবের রক্তের উপাদানও উহাই কেন?

জীবগণ আহার করে তাহাদের দেহের স্বাভাবিক ক্ষয় পূরণের জন্য। ইহাতে দেখা যায় যে, দেহের যে বস্তু ক্ষয় হইতেছে, তাহা পূরণ করিবার জন্যই আহারের প্রয়োজন। জীবজগতে যখন খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বিদ্যমান, তখন উহাদের দেহ গঠনের উপাদানও হইবে বহুল পরিমাণে এক। যেমন — বাঘ মানুষ ভক্ষণ করে, মানুষ মাছ আহার করে, আবার মাছেরা পোকা-মাকড় খাইয়া বাঁচিয়া থাকে ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উহাদের একের শরীরের ক্ষয়মান পদার্থ অপরের শরীরে বর্তমান আছে। মাতৃহীন শিশু যখন গোদুগ্ধ পানে জীবন ধারণ করিতে পারে, তখন গাভী ও প্রসূতির দেহের উপাদান এক নয় কি?

প্লেগ, জলাতঙ্ক ইত্যাদি রোগসমূহ ইতর প্রাণী হইতে মানবদেহে এবং মানবদেহ হইতে ইতর প্রাণীতে সংক্রমিত হইতে পারে। ইহাতে উহাদের টিসু (Tissue) ও রক্তের সাদৃশ্য প্রমাণিত হয় না কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চা, কফি ও মাদক জাতীয় দ্রব্যাদি গ্রহণে এবং কতক বিষাক্ত দ্রব্য প্রয়োগে মানুষ ও পশুর একই লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে উভয়ের পেশী (Muscle) ও স্নায়ুর (Nerve) সাদৃশ্য প্রমাণিত হয় না কি?

গো-মহিষাদি লোমশ প্রাণী, মানুষও তাহাই। উহাদের শরীরে যেরূপ পরজীবী বাস করে, মানুষের শরীরেও তদ্রূপ উকুনাদি পরজীবী বাস করে। প্রজনন কার্যে মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। পূর্বরাগ, যৌনমিলন, ভ্রূণোৎপাদন, সন্তান প্রসব ও প্রতিপালন সকলই প্রায় এক রকম কেন?

মানুষের সন্তানোৎপাদনের শক্তির বিকাশ হয় যৌবনে। এই শক্তির (নারীর) পার্থিব বিকাশকে বলা হয় 'রজঃ'। জীবমাত্রেই রজঃ না থাকিলেও স্তন্যপায়ী প্রায় সকল জীবকেই রজঃশীলা হইতে দেখা যায়। তবে বিভিন্ন জীবের যৌবনে পৌঁছিবার বয়স, 'রজঃ'-এর লক্ষণ ও স্থিতিকাল এক নহে। তথাপি একজন মানবীর রজঃ বা ঋতুর অন্তর এক মাস (সাধারণত ২৮দিন) এবং একটি বানরীরও ঋতুর অন্তর এক মাস ; আর একজন মানবীর গর্ভধারণকাল দশ মাস (দশ ঋতুমাস — ২৮০ দিন) এবং একটি গাভীরও ঐরূপ। ইহার কারণ কি? বিশেষত আদি নারী বিবি হাওয়া নাকি রজঃশীলা হইয়াছিলেন গন্দম ছেঁড়ার ফলে, কিন্তু অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীকুল রজঃশীলা হয় কেন?

মানুষের ন্যায় পশু-পাখীদেরও সন্তানবাৎসল্য এবং সামাজিকতা আছে। সর্বোপরি মানুষের ভাষা আছে। কিন্তু পশু-পাখীদের ভাষা কি আছে নাই? মানুষ যেরূপ আহ্, উহ্, ইস্ ইত্যাদি অনেক প্রকার শব্দ দ্বারা হর্ষ, বিষাদ, ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি মানসিক ভাব ব্যক্ত করে, তদ্রূপ অনেক ইতর প্রাণীও কতগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। গৃহপালিত কুকুরের ঘেউঘেউ শব্দের পাঁচটি রকমভেদ আছে। ইহাতে শত্রুর আগমন বোধক শব্দ, হর্ষের শব্দ, বেদনার শব্দ ইত্যাদি লক্ষিত হয়। গৃহপালিত মোরগ প্রায় বারোটি শব্দ ব্যবহার করে। গাভীর হাম্বা রবে তিন-চারি প্রকার মনোভাব প্রকাশিত হয়। ইতর প্রাণী কথা যে একেবারেই বলিতে পারে না, এমন নহে। ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া ইত্যাদি পাখীরা মানুষের মতই কথা বলিতে শেখে। তাহা হইলে মানুষ ও জীব-জন্তুর ভাষায় পার্থক্য কোথায়? শুধু ধারাবাহিকতা ও ব্যাপকতায় নয় কি?

গরু, ঘোড়া, হাতি, বাঘ, শিয়াল, বিড়াল ইত্যাদি পশুরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী জীব মানুষও তাহাই। ঐ সকল পশুর ও মানুষের রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ইত্যাদি এবং অভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্র যথা — হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রযন্ত্র, পাকস্থলী ইত্যাদির গঠন, ক্রিয়া, সংযোজন ও অবস্থিতি তুলনা করিলে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বিশেষত শিম্পাঞ্জী, গরিলা ও বানরের সহিত মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতির সাদৃশ্য যথেষ্ট। ইহার কারণ ক্রমবিবর্তন নয় কি?

২. আকাশ কি?

'আকাশ' বলিতে সাধারণত শূন্যস্থান বুঝায়। কিন্তু কোন কোন ধর্মাচার্য বলিয়া থাকেন যে, আকাশ সাতটি। ইহা কিরূপে হয়? যাহা শূন্য, তাহা সংখ্যা দ্বারা সূচিত হয় কিরূপে? যাঁহারা আকাশকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত করেন, তাঁহারা কি 'আকাশ' বলিতে 'গ্রহ'কে বুঝেন? কিন্তু গ্রহ তো সাতটি নহে, নয়টি (অধুনা ১০টি)। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান ইত্যাদি ধর্ম প্রবর্তন ও তৎসংক্রান্ত শাস্ত্রাদি প্রণয়নকাল পর্যন্ত পরিচিত গ্রহের সংখ্যা ছিল ছয়টি। তবে রাহু, কেতু ও সূর্যকে গ্রহদলে ধরিয়া নামকরণ হইয়াছিল নবগ্রহ। প্রকৃতপক্ষে সূর্য গ্রহ নহে এবং রাহু ও কেতু হইল চন্দ্র ও পৃথিবীর ছায়া। প্রকৃত গ্রহ হইল বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি — এই ছয়টি। গ্রহরা আকাশ বা শূন্য নহে।

কেহ কেহ সপ্তাকাশকে পদার্থের তৈয়ারী বলিয়া মনে করেন। তাহারা বলেন যে, আকাশ প্রথমটি জলের, দ্বিতীয় লৌহের, তৃতীয় তাম্রের, চতুর্থ স্বর্ণের তৈয়ারী। উহারা আরও বলেন যে, ছাদে ঝুলান আলোর মত চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রাদি আকাশে ঝুলান আছে। কিন্তু এ সবের প্রমাণ কিছু আছে কি? কোন কোন ধর্মবেত্তা আকাশের দূরত্ব নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। কেননা বলা হইয়া থাকে যে, পৃথিবী হইতে প্রথম আসমান ও তদূর্ধে প্রত্যেক আসমান হইতে প্রত্যেক আসমান পাঁচশত বৎসরের পথ দূরে দূরে অবস্থিত।

কোন গতির সাহায্যে দূরত্ব নির্ণয় করিতে হইলে সেই গতির বেগও জানা দরকার। সে যুগে রেল, ষ্টিমার বা হাওয়াই জাহাজ ছিল না। সাধারণত পায়ে হাঁটিয়াই পথ চলিতে হইত। 'পাঁচশত বৎসরের পথ' এই বলিয়া যাঁহারা আকাশের দূরত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহারা উহা — হাতী, ঘোড়া, উট, গাধা বা মানুষের গতি অথবা হাঁটা গতি, না দৌড়ের গতি তাহা কিছু বলেন নাই। সে যাহা হউক, মানুষের পায়ে হাঁটা গতিই মাইলে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, ধর্মীয় মতে কোন্ আকাশের দূরত্ব কত মাইল।

যথারীতি আহার ও বিশ্রাম করিয়া একজন লোক সাধারণত দৈনিক বিশ মাইল পথ চলিতে পারে। তাহা হইলে এক চান্দ্র বৎসরে অর্থাৎ ৩৫৪ দিনে চলিতে পারে ৭ হাজার ৮০ মাইল। সুতরাং পাঁচশত বৎসরে চলিতে পারে ৩৫ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল। ধর্মীয় মতে ইহা প্রথম আকাশের দূরত্ব অর্থাৎ চন্দ্রের দূরত্ব। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল। উপরোক্ত হিসাবমতে চতুর্থ আকাশের দূরত্ব অর্থাৎ সূর্যের দূরত্ব ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৬০ হাজার মাইল। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে উহা প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। সে যাহা হউক, আকাশে যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক আছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ উহার দূরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন যান্ত্রিক ও গাণিতিক সূত্রে। কিন্তু ধর্মগুরুগণ উহা পাইলেন কোথায়, কি সূত্রে?

ধর্মীয় মতে প্রথম আকাশ জলের তৈয়ারী এবং চন্দ্র সেই জলে ভাসিতেছে। অধুনা প্রথম আকাশে অর্থাৎ চন্দ্রের দেশে মানুষ যাওয়া-আসা করিতেছেন এবং তাঁহারা দেখিতেছেন যে, চন্দ্র ভাসিতেছে শূন্যে এবং সেখানে জলের নাম-গন্ধও নাই।

শাস্ত্রীয় মতে চতুর্থ আকাশের দূরত্ব দেড় কোটি মাইলেরও কম। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানীগণ ৩ কোটি মাইলেরও অধিক দূরে শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে রকেট প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু কোথাও লোহা, তামা বা সোনার আকাশ (ছাদ) দেখিতেছেন না, সবটাই শূন্য।

ধর্মগুরুদের আকাশ বিষয়ক বর্ণনাগুলি অলীক কল্পনা নয় কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. দিবা-রাত্রির কারণ কি ?

সাধারণত আমরা দেখিয়া থাকি যে, সূর্য প্রত্যহ পূর্বদিক হইতে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। কিন্তু সূর্য তো কোন জীব নয় যে, সে নিজেই দৌড়াইতে পারে। তবে সে চলে কি রকম? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, চতুর্থ আসমানে একখানা সোনার নৌকায় সূর্যকে রাখিয়া ৭০ হাজার ফেরেস্তা সূর্যসহ নৌকাখানা টানিয়া পূর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে লইয়া যায় ও সারারাত আরশের নীচে বসিয়া আল্লাহ্‌র এবাদত করে এবং প্রাতে পুনরায় সূর্য পূর্বদিকে হাজির হয় (প্রচ্ছদ দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে হিন্দুদের পুরাণশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কশ্যপ মুনির ঔরসে তৎপত্নী অদিতির গর্ভে সূর্যের জন্ম হয়। এই হেতু সূর্যের আর এক নাম 'আদিত্য'। ইনি সপ্ত-অশ্ব-যুক্ত রথে চড়িয়া আকাশ ভ্রমণ করেন এবং অরুণ ঐ রথের সারথি।

জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, সূর্য এক জায়গায় দাঁড়াইয়া আছে আর তাহা হইতে প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরপাক খায়। ইহাতেই দিবারাত্রি হয় এবং সূর্যকে গতিশীল বলিয়া আমাদের ভ্রম হয়।

যদিও 'সূর্য এক জায়গায় দাঁড়াইয়া আছে' — ইহা বলা হইল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য এক জায়গায় দাঁড়াইয়া নাই। পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির ন্যায় সূর্যেরও দুইটি গতি আছে। সূর্য স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর প্রায় ২৭ দিনে একবার ঘুরপাক খাইতেছে এবং সে আমাদের নক্ষত্রজগতের ব্যাসের $\frac{1}{3}$ দূরে থাকিয়া প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৭৫ মাইল বেগে নক্ষত্রজগতের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।[১৭] ইহার একপাক শেষ করিতে সূর্যের সময় লাগে প্রায় সাড়ে বাইশ কোটি বৎসর। কিন্তু মানুষ তাহার সহজ দৃষ্টিতে সূর্যের এই দুইটি গতির কোনটিরও সন্ধান পায় না।

সে যাহা হউক, দিবা-রাত্রির যে তিনটি কারণ বর্ণিত হইল, ইহার মধ্যে প্রামাণ্য ও গ্রহণীয় কোন্‌টি?

৪. পৃথিবী কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ?

কেহ কেহ বলেন যে, পৃথিবী একটি বলদের শৃঙ্গের উপর আছে। কেহ বলেন, পৃথিবী একটি মাছের উপর এবং কেহ বলেন, পৃথিবী জলের উপর অবস্থিত তাহাই যদি হয়, তবে সেই মাছ, বলদ বা জল কিসের উপর অবস্থিত? অধুনা বহু পর্যটক জল ও স্থল এবং বিমানপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহ ওসবের সাক্ষাত পান না কেন? বিশেষত পৃথিবী যদি বলদের শৃঙ্গের উপর অবস্থিত থাকে, তবে সেই বলদটির পানাহারের ব্যবস্থা কি? (প্রচ্ছদ দ্রষ্টব্য)

আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, পৃথিবী কোন কিছুর উপরই প্রতিষ্ঠিত নহে। পৃথিবীর কোন দৃশ্যমান অবলম্বন নাই। ইহার সকল দিকেই আকাশ বা শূন্যস্থান। ফুটবল খেলোয়াড়ের পায়ের আঘাতে একটি ফুটবল যেমন ভন্‌ভন্‌ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে (শূন্যে) চলিতে থাকে, পৃথিবীও তদ্রূপ সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া উহার আকর্ষণে বাঁধা থাকিয়া শূন্যে ঘুরিতেছে। সূর্যের চারিধারে একবার ঘুরিয়া আসিতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা। ইহাকে বলা হয় সৌরবৎসর বা 'বৎসর'। বাস্তব ঘটনা ইহাই নয় কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. ভূমিকম্পের কারণ কি ?

কেহ কেহ বলেন যে, পৃথিবীধারী বলদ ভারাক্রান্ত হইয়া কখনও কখনও শৃঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করে এবং তাহার ফলে পৃথিবী কম্পিত হয়। যদি ইহাই হয়, তবে একই সময়ে পৃথিবীর সকল অঞ্চলে ভূমিকম্প হয় না কেন?

ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে — আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ভূগর্ভস্থ অতিশয় উষ্ণ গলিত পদার্থের হঠাৎ স্পর্শে ফাটল পথে প্রবেশ করা সামুদ্রিক জলের বাষ্পীয় রূপ ধারণে উহা বিস্ফোরণের চেষ্টা বা অকস্মাৎ ভূস্তর ধ্বসিয়া যাওয়া ইত্যাদি কারণে ভূমিকম্প হয়।

আলোচ্য দুইটি মতের মধ্যে গ্রহণীয় কোনটি?

৬. বজ্রপাত হয় কেন ?

কোন কোন ধর্মপ্রচারক বলিয়া থাকেন যে, স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হওয়ার পরেও শয়তান স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিত এবং আল্লাহ কর্তৃক পৃথিবীতে প্রযোজ্য ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর নির্দেশ পূর্বাহ্নেই জানিয়া আসিয়া পৃথিবীতে ভবিষ্যদ্বাণী করিত। পৃথিবীর লোক শয়তানের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতেছে দেখিয়া তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিত। অর্থাৎ শয়তান যাহার মুখ দিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করাইত, তাহাকেই লোকে ভগবানের ন্যায় বিশ্বাস করিত এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর কথা একেবারেই ভুলিয়া যাইত। এইরূপে শয়তান খোদাতা'লার বিরুদ্ধাচরণ করিত এবং লোকদিগকে কুপথে লইয়া যাইবার সুযোগ পাইত। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (দ.)–এর জন্মের পরে স্বর্গরাজ্যে শয়তান যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে এবং উপরোক্ত পদ্ধতিতে মানুষকে বিপথে নিতে না পারে, এজন্য খোদাতা'লা শয়তানের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ চিরতরে নিষিদ্ধ করিয়া দেন এবং ফেরেস্তাগণকে কড়া হুকুম দিয়া দেন, যেন শয়তান আর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। অধিকন্তু শয়তান বিতাড়নের অস্ত্রস্বরূপ ফেরেস্তাগণকে বজ্রবাণ প্রদান করেন। যখনই শয়তান স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে, তখনই ফেরেস্তাগণ শয়তানের উপর বজ্রবাণ নিক্ষেপ করেন। উহাকে আমরা 'বজ্রপাত' বলিয়া থাকি।

উপরোক্ত বিবরণ যদি সত্য হয়, তবে সকল সময় এবং বিনা মেঘে বজ্রপাত হয় না কেন? শীত ঋতুতে বজ্রপাত হইতে শোনা যায় না কেন? সাধারণত আকাশে চারি শ্রেণীর মেঘ জমিয়া থাকে, কিন্তু উহার সকল শ্রেণীর মেঘে বজ্রপাত হয় না কেন? চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে বজ্রপাত ছিল না কি?

সচরাচর দেখা যায় যে, অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানেই বজ্রপাত হয় বেশী। যথা — মাঠের উচু শস্যক্ষেত্র, বাগানের তাল–নারিকেলাদি বৃক্ষ, শহরের উঁচু দালানাদি, এমনকি মসজিদের চূড়াতেও বজ্রপাতের কথা শোনা যায়। শয়তান কি ঐ সমস্ত উঁচু জায়গায়ই বাস করে?

হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন যে, দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্রবাণ তৈয়ারী এবং উহা ব্যবহার করেন দেবরাজ ইন্দ্র, তাঁহার শত্রু নিপাতের জন্য। 'জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এবং চ। পুনস্ত্যঃ পুলহো জিষ্ণু ষড়েতে বজ্র বারকা' — এই মন্ত্রটি উচ্চারিত হইলে সেখানে বজ্রপাত হয় না।[১৮] পক্ষান্তরে মুসলমানগণ বলিয়া থাকেন, 'লা হওলা অলা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহেল আলিউল আজিম' — এই কালাম পাঠ করিলে সেখানে বজ্রপাত হয়না। এসবের পরীক্ষামূলক সত্য কিছু আছে কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বজ্রবারক (Lightning proof) ব্যবহার করিলে সেখানে বজ্রপাত হয় না। শহরে উঁচু দালানাদি তৈয়ার করিয়া ইঞ্জিনিয়ারগণ উহার উপরে 'বজ্রবারক' সন্নিবেশিত করেন এবং তাহাতে বজ্রপাত হইতে দালানাদি রক্ষা পাইয়া থাকে। তবে কি বজ্রবারক দেখিয়াই শয়তান দূর হয়? যদি তাহাই হয়, তবে শয়তান দূর করিবার জন্য অনুরূপ কোসেস না করিয়া 'বজ্রবারক' ব্যবহার করা হয় না কেন?

বজ্রপাত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য কিছুটা জটিল। তবে সংক্ষিপ্ত এইরূপ — গ্রীষ্মকালে কোন কোন অঞ্চলে সময়বিশেষে বায়ুর উর্ধ্বগতি হয়। ঐ সময় ঐ অঞ্চলের আকাশে যদি মেঘ থাকে এবং সেই মেঘের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যদি নিম্নগতিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সেই নিম্নগতিসম্পন্ন মেঘ ও উর্ধ্বগতিসম্পন্ন বায়ুর সংঘর্ষের ফলে সময় সময় মেঘের জলকণা ভাঙ্গিয়া অণু ও পরমাণুতে পরিণত হয়। সংঘর্ষের মাত্রাধিক্যে কোন কোন সময় আবার ঐ সকল পরমাণু হইতে ইলেক্ট্রন ও প্রোটন মুক্ত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। এইরূপ বিদ্যুৎযুক্ত মেঘ আকাশে থাকিলে তন্নিম্ন ভূমিতে আর একদফা বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়, ইহাকে 'আবিষ্ট বিদ্যুৎ' বলে। এইরূপ অবস্থায় আকাশের বিদ্যুৎ ও মাটিস্থ আবিষ্ট বিদ্যুতের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ চলিতে থাকে। মাটিস্থ আবিষ্ট বিদ্যুৎ আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে মিশিবার জন্য ভূপৃষ্ঠের অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে যাইয়া উঁকি মারিতে থাকে। বিদ্যুতাবিষ্ট স্থানটি সূচাগ্রবৎ হইলে সেখানে বিদ্যুৎ জমিতে পারে না, অল্পে অল্পে মুক্ত হইয়া আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে মিশিয়া যায়। কিন্তু ঐ স্থানটি সূচাগ্রবৎ না হইলে সেখান হইতে বিদ্যুৎ মুক্ত হইতে পারে না। বরং ক্রমশ জমিয়া শক্তিশালী হইতে থাকে। আকাশের মেঘে যে বিদ্যুৎ থাকে, তাহা হইতে মাটির আবিষ্ট বিদ্যুতের শক্তি বেশী হইলে, তাহা আকাশের বিদ্যুৎকে টানিয়া ভূপাতিত করে। এইভাবে আকাশের বিদ্যুৎপতনকে আমরা বজ্রপাত বলি। বিদ্যুৎপতনের তীব্রগতির পথে যে সকল বায়বীয় পদার্থ ও ধূলিকণা থাকে, উহা জ্বলিয়া তীব্র আলোর সৃষ্টি হয় এবং বায়ু কম্পনের ফলে হয় শব্দ।

AMARBOI.COM

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ, একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বজ্রপাত কেন উঁচুস্থানে হয়, কেন সকল মেঘে ও শীতকালের মেঘে হয় না, কেন উঁচু গাছ কাছে থাকিলে নীচু গাছে হয় না এবং বজ্রবারক ব্যবহার করিলে কেন সেখানে বজ্রপাত হয় না।

(ধর্মযাজকগণ আলোচ্য বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবেন কি?)

৭. রাত্রে সূর্য কোথায় থাকে?

আল্লাহর 'আরশ' কোথায় কোন্‌দিকে জানি না। কিন্তু কোন কোন ধর্মপ্রচারক বলিয়া থাকেন যে, রাত্রে সূর্য থাকে আরশের নীচে। সেখানে থাকিয়া সূর্য সারারাত আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী করে এবং ভোরে পূর্বাকাশে উদয় হয়।

সৌর-বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সূর্য প্রায় ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মাইল ব্যাসবিশিষ্ট অগ্নিপিণ্ড। উহার কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় ৬ কোটি ডিগ্রী এবং বাহিরের তাপমাত্রা প্রায় ৬ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।[১৯] প্রজ্জ্বলনরত সূর্যের দেহ হইতে সতত প্রচণ্ড তাপ ও সুতীব্র আলো বিকীর্ণ হইতেছে এবং সূর্যের সেই আলোর সীমার মধ্যে থাকিয়া পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘুরপাক খাইতেছে। ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশ যখন সূর্যের দিকে থাকে, তখন সেই অংশে হয় দিন, অপর অংশে হয় রাত্রি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর যে অংশে আমরা বাস করি, তাহার বিপরীত দিকে আছে আমেরিকা রাজ্য। কাজেই আমরা যখন সূর্যের দিকে থাকি, তখন আমেরিকা থাকে বিপরীত দিকে। অর্থাৎ আমাদের দেশে যখন রাত্রি, তখন আমেরিকায় দিন এবং আমাদের দেশে যখন দিন, তখন আমেরিকায় রাত্রি। কাজেই রাত্রে সূর্য থাকে আমেরিকার আকাশে। এ বিষয়টি সত্য নয় কি?

৮. ঋতুভেদের কারণ কি ?

কেহ কেহ বলেন যে, দোজখের দ্বার যখন বন্ধ থাকে, তখন শীত ঋতু হয় এবং যখন খোলা থাকে, তখন গ্রীষ্ম ঋতু।

আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া এক বর্তুলাকার কক্ষে ঈষৎ হেলান অবস্থায় থাকিয়া পৃথিবী বার মাসে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ইহাতে সূর্য-রশ্মি পৃথিবীর উপর কখনও খাড়াভাবে এবং কখনও তেরচাভাবে পড়ে। সুতরাং যখন খাড়াভাবে পড়ে, তখন গ্রীষ্ম এবং যখন তেরচাভাবে বা হেলিয়া পড়ে তখন হয় শীত ঋতু। আলোচ্য মত দুইটির মধ্যে গ্রহণীয় কোনটি?

৯. জোয়ার-ভাটা হয় কেন ?

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীধারী বলদ যখন শ্বাস ত্যাগ করে তখন জোয়ার হয় এবং যখন শ্বাস গ্রহণ করে, তখন ভাটা। তাহাই যদি হয়, পৃথিবীর সব অঞ্চলে একই সময় জোয়ার বা ভাটা হয় না কেন?

বিজ্ঞানীদের মতে জোয়ার-ভাটার বিশেষ কারণ হইল চন্দ্রের আকর্ষণ। ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন স্থানে চন্দ্র যখন মধ্যাকাশে থাকে, তখন সেই স্থানে চন্দ্রের আকর্ষণ জোরালো থাকে এবং চন্দ্র দিগন্তে থাকিলে তখন তাহার আকর্ষণ হয় ক্ষীণ। কাজেই চন্দ্র মধ্যাকাশে থাকিলে যেখানে জোয়ার হয়, দিগন্তে থাকিলে সেখানে ভাটা। অধিকন্তু ভূপৃষ্ঠের যে অংশে যখন জোয়ার বা ভাটা হয়, তাহার বিপরীত পৃষ্ঠেও তাহাই হয়, তাহার বিপরীত পৃষ্ঠেও তখন জোয়ার বা ভাটা হইয়া থাকে। তাই একই স্থানে জোয়ার বা ভাটা হয় দৈনিক (২৪ ঘণ্টা) দুই বার।

আলোচ্য দুইটি মতের মধ্যে বাস্তব কোন্‌টি?

১০. উত্তাপবিহীন অগ্নি কিরূপ ?

শোনা যায় যে, বাদশাহ নমরূদ হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে বধ করিবার জন্য ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহতালার অসীম কৃপায় তিনি মারা যান নাই বা তাঁহার দেহের কোন অংশ দগ্ধ হয় নাই। বস্তুত এই জাতীয় ঘটনার কাহিনী জগতে বিরল নয়। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন কেচ্ছা-কাহিনীতে এরূপ অনেক ঘটনার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

সেকালে হিন্দুদের ধারণা ছিল যে, সতী নারী অগ্নিদগ্ধ হয় না। তাই রাম-জায়া সীতা দেবীকে অগ্নিপরীক্ষা করা হইয়াছিল। সীতা দীর্ঘকাল রাবণের হাতে একাকিনী বন্দিনী থাকায় তাঁহার সতীত্বে সন্দেহবশত তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু উহাতে নাকি তাঁহার কেশাগ্রও দগ্ধ হয় নাই। আর আজকাল দেখা যায় যে, চিতানলে সতী বা অসতী, সকল রমণীই দগ্ধ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহাতে মনে হয় যে, হয়ত অগ্নিদেব দাহ্য পদার্থ মাত্রেই দহন করে, সতী বা অসতী কাহাকেও খাতির করে না, নতুবা বর্তমানকালে সতী নারী একটিও নাই।

হজরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে পার্শি ধর্মের প্রবর্তক জোরোয়াস্টার নিজদেহে উত্তপ্ত তরল ধাতু ঢালিয়া দিয়া অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতেন। ক্যাপিডোসিয়ার অন্তর্গত ডায়ানার মন্দিরে পুরোহিতগণ উত্তপ্ত লাল বর্ণের লোহার উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া লোকদিগকে স্তম্ভিত করিতেন। ভারতবর্ষে বিশেষভাবে বাংলাদেশে গাজন্নাথের সন্ন্যাসীগণ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিতেন।

জাপানের 'সিন্ট' পুরোহিতগণ তাঁহাদের 'মাৎসূরী'র (উৎসবের) সময় অনেক অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইয়া থাকেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিয়াটির নাম 'হাই ওয়াতারী'। অর্থাৎ জ্বলন্ত আগুনের উপর দিয়া যাতায়াত করা। জ্বলন্ত আগুনের উপর দিয়া পুরোহিতগণ তো হাঁটেনই, অধিকন্তু হাত ধরিয়া দর্শকগণকেও হাঁটাইতে পারেন। 'সিন্ট' পুরোহিতগণ আর একটি বিভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, উহার নাম 'কুগা-দুচী' অর্থাৎ ফুটন্ত জলের দ্বারা স্নান করা।[২৩]

উপরোক্ত অগ্নিঘটিত বিভূতিগুলি সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর (Magician) পি. সি. সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে উহার ভৌতিক (অলৌকিক) অংশ চলিয়া যাইয়া 'ম্যাজিক' অংশটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ তিনি উহার অধিকাংশই প্রদর্শন করিতে পারিতেন ও করিতেন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, দহনের একমাত্র সহায়ক হইল 'অক্সিজেন'। ইহা এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ। যেখানে অক্সিজেনের অভাব, সেখানে আগুন জ্বলে না। এই কারণেই বৃহদায়তনের কাঠের গুঁড়িতে আগুন ধরাইলে, উহার অভ্যন্তর বা কেন্দ্রভাগ জ্বলে না এবং বিপুল আয়তনের কাষ্ঠরাশিতে আগুন দিলেও উহার মধ্যভাগের কাষ্ঠ থাকে অদগ্ধ।

হজরত ইব্রাহিম (আ.) যখন ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াও দগ্ধ হইলেন না, তখন কি প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া অগ্নির দাহিকা শক্তি লোপ পাইয়াছিল, না বৃহদায়তন হেতু কাষ্ঠরাশির অভ্যন্তরভাগ অক্সিজেন-এর অভাবে অদাহ্যই ছিল?

শোনা যায় যে, আগের দিনে মুনি-ঋষিদের কেহ কেহ কুম্ভক প্রক্রিয়া দ্বারা নাকি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ রাখিয়া অর্থাৎ অক্সিজেন ছাড়া দীর্ঘ সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.) তাহা জানিতেন কি?' নতুবা তিনি অক্সিজেনশূন্য স্থানে বাঁচিলেন কিরূপে?

১১. হযরত নূহ নবীর সময়ের মহাপ্লাবন পৃথিবীর সর্বত্র হইয়াছিল কি ?

ধর্মাচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে, হযরত নূহের সময়ে নানাবিধ পাপাচার করায় মানুষ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে খোদাতা'লা পৃথিবীতে এক গজব (মহাপ্লাবন) নাজেল করেন। চল্লিশ দিবারাত্র অবিরাম বৃষ্টির ফলে সমস্ত পৃথিবী জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। এমনকি পর্বতের উপরেও ১৫ হাত জল জমিয়াছিল। পৃথিবীতে মানুষ, পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গাদি কোন প্রাণীই জীবিত ছিল না। হযরত নূহ তাহার জাহাজে যে সকল প্রাণীদের আশ্রয় দিয়াছিলেন, মাত্র তাহারাই জীবিত ছিল।

হযরত আদম হইতে হযরত নূহ দশম পুরুষ এবং উক্ত মহাপ্লাবন হইয়াছিল হযরত আদমের জন্মের তারিখ হইতে ১৬৫৬ বৎসর পরে।[২০] মাত্র এক জোড়া মানুষ হইতে এত অল্প

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ের মধ্যে তখন পৃথিবীতে মানুষ খুব বেশি জন্মিতে পারে নাই। বিশেষত সেকালের মানুষ ছিল শান্ত ও সরল প্রকৃতির। তথাপি তাহাদের পাপকার্য সহ্য করিতে না পারিয়া আল্লাহ্ জগতময় মহাপ্লাবন-রূপ গজব নাজেল করিলেন, আর বর্তমানে সহ্য করেন কিরূপে? বর্তমান জগতে পাপকর্ম নাই কি?

ধর্মীয় মতে ইরান, তুরান, ইরাক ও আরবের কোন কোন অংশেই তখন লোকের বসতি ছিল। বাকী এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় কোন লোকই ছিল না এবং আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া ছিল অজ্ঞাত। এমতাবস্থায় সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া মহাপ্লাবন হইবার কারণ কি এবং মানুষের পাপের জন্য অন্যান্য প্রাণীরা মরিল কেন?

মানুষের জীবন হরণ করা আজ্রাইল ফেরেস্তার কাজ। সে আল্লাহর আদেশ পাইলে যে কোন সময়ে, যে কোন অবস্থায়ই মানুষের 'জান-কবজ' করিয়া নিতে পারে এবং গুটিকতক পাপীর 'জান-কবজ' করা হয়ত তাহার এক মুহূর্তের কাজ। মানুষের মৃত্যুই যদি আল্লাহর কাম্য হইত, তবে তিনি আজ্রাইলকে দিয়া উহা এক মুহূর্তে করাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করাইয়া তিনি চল্লিশ দিন স্থায়ী প্লাবনের ব্যবস্থা করিলেন কেন?

ভূমণ্ডলে জলের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, আছে শুধু স্থানান্তর ও রূপান্তর। কোন দেশের উপর যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, তৎসন্নিহিত সাগরাদির জল সেই পরিমাণ কমিয়া যায়। কেননা বাষ্পাকারে ঐ জল সাগরাদি হইতেই আসিয়া থাকে। আর জলের একটি বিশেষ ধর্ম এই যে, বাহিরের কোন শক্তির প্রয়োগ না হইলেও উহার উপরিভাগ থাকে সমতল।

অরারট পর্বতের চতুর্দিকেই ভিন্ন ভিন্ন সাগর অবস্থিত। যথা — কৃষ্ণ সাগর, কাস্পিয়ান সাগর, পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্যসাগর ইত্যাদি। অরারট পর্বতের চূড়ার উপর নাকি পনর হাত জল জমিয়াছিল এবং হজরত নূহের জাহাজখানা ঐ পর্বতের চূড়ায় আটকাইয়াছিল (তৌরিতে লিখিত অরারট পর্বতকে মুসলমানগণ বলে 'যুদী' পাহাড়)। কিন্তু ঐ পরিমাণে সাগরগুলির জল কমিয়াছিল কিনা? যদি কমিয়া থাকে, তাহা হইলে সাগরের নীচু জলের সহিত অরারট পর্বতের উঁচু জল চল্লিশ দিন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিল কিরূপে, জল কাত হইয়াছিল কি?

প্রবল প্রবাহের ফলে হয়ত সমুদ্রের জল আসিয়া কোন দেশ প্লাবিত করিতে পারে এবং বায়ুর বেগ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ জল স্থলভাগের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু আলোচ্য প্লাবনে কোনরূপ বায়ুপ্রবাহ ছিল না, ছিল অবিরাম বৃষ্টি।[২১] ঐ প্লাবনে কোনরূপ ঝড়-বন্যা হওয়ার প্রমাণ আছে কি?

হজরত নূহের জাহাজখানা নাকি দৈর্ঘ্যে ৩০০ হাত, প্রস্থে ৫০ হাত ও উচ্চতায় ৩০ হাত ছিল এবং প্লাবনের মাত্র সাতদিন পূর্বে উহা তৈয়ারের জন্য খোদাতা'লার নিকট হইতে হযরত নূহ ফরমায়েশ পাইয়াছিলেন।[২২]

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে লোহা-লক্কড়, কলকব্জা ও ইঞ্জিন-মেশিনের অভাব নাই। তথাপি ঐ মাপের একখানা জাহাজ মাত্র সাত দিনে কোন ইঞ্জিনিয়ার তৈয়ার করিতে পারেন না। হজরত নূহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উহা পারিলেন কিরূপে? নদ-নদী ও সাগরবিরল মরুদেশে যন্ত্রের ও কাঠের অভাব ছিল না কি? বিশেষত কাঠ চেরাইয়ের যন্ত্র ছিল কি? অধিকন্তু ইহারই মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গাদি জোড়া জোড়া এবং যাবতীয় গাছ-পালার বীজ সংগ্রহ করিয়া জাহাজে বোঝাই করিলেন কোন্ সময়?

উক্ত প্লাবনে নাকি পৃথিবীর সকল প্রাণীই বিনষ্ট হইয়াছিল, মাত্র জাহাজে আশ্রিত কয়েকটিই জীবিত ছিল। বর্তমান জগতের প্রাণীই নাকি ঐ জাহাজে আশ্রিত প্রাণীর বংশধর। তাহাই যদি হয়, তবে মানুষ ও পশু-পাখী সেখান হইতে আসিতে পারিলেও, কেঁচো ও শামুকগুলি বাংলাদেশে আসিল কিভাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ প্রস্তাব

[বিবিধ]

১. আদম কি আদিমানব?

হিন্দু মতে ব্রহ্মার মানসপুত্র 'মনু' হইতে মানবের উৎপত্তি। ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের মতে 'আদম' হইতে আদমী বা মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে এবং পারসিকগণের মতে আদিমানব 'গেও-মাড'।

জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে জীবসৃষ্টির আদিতে অতিক্ষুদ্র এককোষবিশিষ্ট জীব 'এ্যামিবা' (Ameba) ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিবর্ধনের ফলে প্রথমে ব্যাক্টেরিয়া, তাহা হইতে স্পঞ্জ, মৎস, সরীসৃপ, পশু ইত্যাদি বহু জীবে রূপান্তরিত হইয়া শেষে বন-মানুষ (Anthorpaidape) ও তাহাদের ক্রমোন্নতির ফলে বর্তমান সভ্য মানুষ উৎপত্তি হইয়াছে। কয়েক কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অবিচ্ছিন্ন জলরাশিতে 'এ্যামিবা' জন্মলাভ করিয়াছিল এবং বিবর্তনের ফলে তাহা হইতে পৃথিবীর সর্বত্র নানাবিধ জীব সৃষ্টি হইয়াছে।

মানুষের আদি জন্ম সম্পর্কে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ শুনিয়া সাধারণ লোক কোনও সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারে কি? যে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহারা মানুষকে সেই মতবাদই বিশ্বাস করাইতে চায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে ইহাতে যে সকল প্রশ্ন জাগে, তাহার কিছু আলোচনা করা যাক।

হিন্দু মতে মনুর জন্ম ভারতে এবং খৃষ্টানাদি সেমিটিক জাতির মতে আদমের প্রথম বাসস্থান আরব দেশে। অন্যান্য যে কোন মতেই হউক, মানুষের আদি জন্ম এশিয়ার বাহিরে নয়।

আদি মানব যদি এশিয়ায়ই জন্মলাভ করিয়া থাকিত, তাহা হইলে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যেই বসতি বিস্তার ঘটিত। কেননা ইহারা পরস্পর প্রায় অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণ কি প্রকারে জন্মিল? কলম্বাস সাহেবের আমেরিকা ও ক্যাপ্টেন কুক-এর অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পূর্বে সেখানে কি কোন লোক যাতায়াতের প্রমাণ আছে?

আদম যেখানে বাস করিতেন, তাহার নাম ছিল 'এদন উদ্যান'। সেই উদ্যানটি বর্তমান তুরস্ক দেশের পূর্বাঞ্চলে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস (ফরাৎ ও হিদ্দেকল) নদীদ্বয়ের উৎপত্তির এলাকার মধ্যে অবস্থিত ছিল (৮নং টীকা দ্রষ্টব্য)। মহাপ্রভুর নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের অপরাধে আদম এদন উদ্যান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে বিতাড়িত হইয়া বহু বৎসর ঘোরাফেরার পর আরবের আরাফাতে তাঁহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হন এবং ঐ অঞ্চলেই কালাতিপাত করেন।

আদিকালে পৃথিবীতে মানুষ ছিল অল্প এবং ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র মানুষের বসতি ছিল না, ছিল উর্বর অঞ্চলে। তাই প্রথম লোকবসতি ও সভ্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল নীল, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদী বিধৌত মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় এবং ভারতের সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে। কালদিয়া, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশগুলিও ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর অববাহিকা অঞ্চল এবং 'এদন' স্থানটিও তাহাই।

জীববিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছিল লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে। তবে আধুনিক চেহারার মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে মাত্র প্রায় ৩০ হাজার বৎসর পূর্বে। আদমের আবির্ভাবের সমকালে ও তাহারও পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে মানুষের বসতি ছিল, ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছেন। চীন ও ভারতাদির ন্যায় দূরদেশের কথা না-ই বলিলাম, আরবের নিকটবর্তী মিশর, প্যালেস্টাইন ও ব্যাবিলোন ইত্যাদির মত স্থানে মানব সভ্যতার যে অজস্র নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার মধ্যে কয়েকটির আলোচনা করা যাইতেছে, যাহা আদমের সমকালীন বা তাহারও পূর্বের বলিয়া সাক্ষ্য দেয়। যথা —

খৃ. পূ. ৪০০৪ সালে হজরত আদম সৃষ্ট হন।

খৃ. পূ. ৩০৭৪ সালে হজরত আদমের মৃত্যু হয়।

খৃ. পূ. ৪২৪১ সালে মিশরে সিরিয়াস নক্ষত্রের আবিষ্কার হইতে বর্ষ গণনা আরম্ভ হয়।

খৃ. পূ. ৪৪৪১ সালে মিশরে 'সোথিক চক্র' আবিষ্কৃত হয় (ঊষাকালে উদয় হইতে মহাকাশ প্রদক্ষিণ করিয়া সিরিয়াস নক্ষত্রটির আবার পূর্ব স্থানে ফিরিয়া আসিতে সময় লাগে প্রায় ১৪০০ বৎসর। এই সুদীর্ঘ কালটিকে বলা হয় 'সোথিক চক্র')।

খৃ. পূ. ৪২২১ সালে মিশরে পঞ্জিকা আবিষ্কৃত হয়।

খৃ. পূ. ৩০৯৮—৩০৭৫ সালে মিশরে নীলনদের পশ্চিমে গিজাতে রাজা খুফুর সমাধির উপর ১৩ একর জমি ব্যাপিয়া ৪৮১ ফুট উঁচু একটি পিরামিড তৈয়ার হয়।[৪৩]

খৃ. পূ. ৫০০০ সালের তৈয়ারী পাথরের হাতিয়ারের সহিত সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুর জিনিস পাওয়া গিয়াছে মিশরের অন্তর্গত নেগাদা, এমিডোস, এল-আমরা প্রভৃতি অঞ্চলের কবরগুলিতে।

খৃ. পূ. ৪০০০ সালে মিশরে চাষাবাদ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে নীল নদের পশ্চিমে ফাইয়ুম ও মেরিমডে অঞ্চলে এবং মধ্য ইরানের পশ্চিম সীমান্তে 'সিয়াল্‌ফ' অঞ্চলে।

খৃ. পূ. ৫০০৮—৪৫০০ সালে প্যালেস্টাইনের কারমেল পাহাড়ের 'ওয়াদি এল-নাটুর্ফ' স্থানের প্রাচীন অধিবাসী নাটুর্ফিয়ানরা কিছু চাষাবাদ করিত তাহার প্রমাণ আছে।

খৃ. পূ. ৪৩০০ সালের পূর্বের লোকবসতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে পশ্চিম ইরানের কাশানের কাছাকাছি 'টেল-শিয়াল্‌ফ' নামক স্থানে। সেখানে ১৭টি ভগ্নস্তূপে ৯৯ ফুট উঁচু একটি ঢিবির সবচাইতে নীচের ভগ্নস্তূপটিতে লোকবসতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খৃ. পূ. ৭০০০ সালে লোকবসতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে মোসালের নিকটস্থ 'টেপ পাওয়া'তে। সেখানে ২৬টি ভগ্নস্তূপ মিলিয়া ১০৪ ফুট উঁচু একটি ঢিবির সবচাইতে নীচের ভগ্নস্তূপটিতে লোকের বসতি ছিল।

খৃ. পূ. ৩৪০০ সালে মিশরে রাজা মেনেসের রাজত্ব আরম্ভ হয়।

খৃ. পূ. ৮০০০ সালে লোকবসতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে সিরিয়ার উত্তর উপকূলে 'বাস-সামরা'তে। সেখানে ৪০ ফুট উঁচু একটি ঢিবির নীচে লোকবসতির চিহ্ন আছে।[৪৪]

পবিত্র তৌরিত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্বদিকে এদনে, এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনার নির্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সর্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষ এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে জীবনবৃক্ষ ও সদসদজ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন। আর উদ্যানে জল সেচনার্থে এদন হইতে এক নদী নির্গত হইল, উহা তথা হইতে বিভিন্ন হইয়া চতুর্মুখ হইল।"[৪৫]

উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, সদাপ্রভু পূর্বদিকে এদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু উহা কোন্ স্থান হইতে পূর্ব — অর্থাৎ আদমের সৃষ্টির স্থান, না তৌরিত লেখকের বাসস্থান, তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হয় না। হয়ত লেখকের বাসস্থানই হইবে। তৌরিতের লেখক বোধহয় কেনান দেশবাসী হিব্রু সম্প্রদায়ের কোন অনামা ব্যক্তি ছিলেন এবং এদন স্থানটি কেনান দেশ হইতে প্রায় পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল।

তৌরিতের বর্ণনামতে — সদাপ্রভু ভূমি হইতে সর্বজাতীয় 'সুদৃশ্য' ও 'সুখাদ্যদায়ক' বৃক্ষ ঐ বাগানে উৎপন্ন করিলেন। সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি যে, পরমেশ্বরের সৃষ্ট (প্রকৃতিজাত) গাছ-গাছড়ার সমাবেশকে কখনও বাগান বলা হয় না, বলা যায় 'বন' বা 'জঙ্গল'। কেননা জল, বায়ু ও তাপের আনুকূল্যে উর্বর মাটিতে হরেক রকম উদ্ভিদই জন্মিয়া থাকে এবং উহাতে সুখাদ্য, কুখাদ্য ও সুদৃশ্য বৃক্ষের হয় একত্র সমাবেশ। অবাঞ্ছিত বৃক্ষোৎপাটনপূর্বক 'বাঞ্ছিত বৃক্ষ সমাবেশ'কে বলা হয় উদ্যান বা বাগান। এই 'বাগান' সর্বত্রই মানুষের তৈয়ারী, ঈশ্বরের নহে। যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি ঈশ্বর-সৃষ্ট (প্রকৃতিজাত) হইলেও অলঙ্কারসমূহ মানুষের তৈয়ারী, কোন অলঙ্কারই ঈশ্বর-সৃষ্ট নহে। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, এদনের ঐ উদ্যানটি মানুষের তৈয়ারী ছিল, পরমেশ্বরের নহে।

জীবতত্ত্ববিদগণের মতে মানুষ এককালে গুহাবাসী ছিল এবং বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিত। নিয়মিত ফলমূল সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য কাজ, হয়তবা ফলমূল দুষ্প্রাপ্যও ছিল। তাই আদিম মানবরা রুচিসম্মত ও সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষাদি কোন নির্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিয়া খাদ্যের ব্যাপারে স্বনির্ভর হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। মানব সভ্যতার আদিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ 'বাগান চাষ'-এর প্রচলন হইয়াছিল। এমতাবস্থায় মনে উদয় হইতে পারে যে, এদনের উল্লিখিত উদ্যানটি ঐরূপ একটি বাগান চাষেরই ক্ষেত্র।

আদম সৃষ্টি হইয়া সেইদিন বা তাহার পরের দিন হইতেই ঐ বাগানের ফল ভক্ষণ শুরু করিয়াছিলেন। কোন ফলের বীজ রোপিত হইলে তাহাতে বৃক্ষোৎপন্ন হইয়া দুই-চারিদিনের মধ্যেই ফল ধরে না, উহাতে বেশ কয়েক বৎসর সময়ের দরকার হয়। কাজেই একথা স্বীকার্য যে, ঐ বাগানের ফলোৎপাদক বৃক্ষসমূহ আদম সৃষ্টির বহুদিন পূর্বে রোপিত হইয়াছিল। এদন উদ্যানটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। কাজেই সেখানকার বাগানে জলসেচের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা ছিল অত্যধিক, তাহা তৌরিত গ্রন্থে উল্লেখ আছে। নিয়মিত জলসেচের সামান্য ত্রুটিতেও বাগানটি নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। ইহাতে প্রশ্ন আসে যে, আদম সৃষ্টির পূর্বে উহার সেচকার্য করিত কে? উত্তরে স্বভাবতই মনে আসে যে, আদমের পূর্বেও মানুষ ছিল।

সেচকার্য করিত 'কে' না বলিয়া 'কাহারা' বলাই সঙ্গত। কেননা সেই সেচকার্য সম্পাদন করা কাহারো একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যেহেতু বাগানটি আয়তনে ছোট ছিল না, বেশ বড়ই ছিল। তৌরিতে বর্ণিত আছে, "পরে তাঁহারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইলেন, তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন করিতেছিলেন, তাহাতে আদম ও তাঁহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকাইলেন।"[৪৬] যেহেতু আদম তখন উলঙ্গ ছিলেন।

'বৃক্ষ' বৃক্ষই, উহা লতা-গুল্ম বা ঝোপ নহে। আদম লুকাইয়াছিলেন উদ্যানস্থ 'বৃক্ষসমূহের' মধ্যে, কোন একটি বিশেষ বৃক্ষের আড়ালে বা কোন ঝোপের মধ্যে নহে। আম, জাম, তাল, নারিকেল, বিশেষত খেজুর (খুরমা) ইত্যাদি বৃক্ষের গোটা কাণ্ডই শাখা-পত্রহীন এবং উহাদের অবস্থানও সাধারণত দূরে দূরে। অধিকন্তু 'স্বর্গ' নামধেয় 'এদন উদ্যান'টিতে যে ঝোপ-জঙ্গল ছিল না, তাহাও নিশ্চিত। এমতাবস্থায় সেখানে কোন লোক কাহারো দৃষ্টির আড়াল হইতে হইলে, তাহার যে কতটুকু দূরে যাওয়া আবশ্যক তাহা অনুমানসাপেক্ষ। এহেন বাগানটির রক্ষণাবেক্ষণ যথা — কোপান (বোধহয় সেটি ছিল লাঙ্গলচাষের পূর্ববর্তী কোদাল যুগ)[৪৭], বীজ সংগ্রহ ও উহা রোপণ-বপন, বিশেষত জলসেচ ইত্যাদি কাজে বহু লোকের আবশ্যক ছিল এবং আবশ্যক ছিল তাহাদের কঠোর পরিশ্রম। বহু লোকের একত্র বসবাস এবং কোন এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করিতে হইলে একজন অধিনায়কও থাকা দরকার। আর ইহা একটি চিরাচরিত নিয়ম যে, অধিনায়কের আদেশ অমান্যকারী ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য।

AMARBOI.COM

শোনা যায় যে, স্বর্গবাসীরা কোনরূপ কায়িক শ্রম করেন না। এমনকি কোন বৃক্ষের ফলও তাঁহারা ছিঁড়িয়া খান না বা উহা হাতে ধরিয়া মুখে দেন না, ঈপ্সিত ফল আপনি আসিয়াই স্বর্গবাসীর মুখে প্রবেশ করে। মনে হয় যে, এদন উদ্যানে আদম ছিলেন এই ধরণের একজন বাসিন্দা, তিনি কোন কাজ করিতেন না। তাই তিনি ছিলেন উদ্যানের অন্যান্যদের, বিশেষত অধিনায়কের (প্রভুর) অপ্রীতিভাজন।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী মর্গানের মতে — আদি মানবরা দলবদ্ধ হইয়া বসবাস করিত। সেই দল বা সমাজ ছিল জ্ঞাতিভিত্তিক। দলের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের থাকিত জ্ঞাতি সম্পর্ক। মর্গান তাহার নাম দিয়াছিলেন 'গেনটাইল সোসাইটি' বা জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজ বা 'ক্লান'। ক্লানের বাসিন্দারা সকলে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিত। হয়ত এরূপ নিয়মও ছিল যে, কোন ব্যক্তি কোন কাজ না করিলে তাহার জন্য ক্লান-উৎপন্ন ফলাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ক্লানের নিয়ম মানিয়া চলে না, বা কোন কাজকর্ম করে না এমন অবাধ্য ব্যক্তির চরম শাস্তি ছিল বহিষ্করণ বা ক্লান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া। দলের সকলের সহিত মিলিয়া, সকলের উপর নির্ভর করিয়া, সকলের সহযোগিতায় বাঁচার চেষ্টা করিলেই বাঁচা সম্ভব ছিল, নচেৎ নয়। কোন দল হইতে কেহ বিতাড়িত হইলে, সে বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়-পর্বতে ঘুরিতে ঘুরিতে দিশাহারা হইত বা মারা যাইত।[৩৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করিলে মনে আসিতে পারে যে, আদম হয়ত এশিয়া মাইনর বা আর্মেনিয়া দেশের কোন ক্লানের বিতাড়িত ব্যক্তি এবং আরব দেশে আগন্তুক প্রথম মানুষ, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আদিম মানুষ নয়। হজরত আদমের আদিত্বের বাস্তব ও তত্ত্বগত কোন প্রমাণ আছে কি?

২. নীল নদের জল শুকাইল কেন?

কেহ কেহ বলেন যে, ফেরাউনের দাসত্বমুক্ত হইয়া বনিইস্রায়েলগণ মিশর দেশ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে (কেনান দেশে) আসিবার সময় নীল নদ পার হইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বনিইস্রায়েলগণ মিশরের যে অঞ্চলে বাস করিতেন, তাহার নাম 'গোশন' বা 'রামিষেষ' প্রদেশ। নীল নদ ইহার পশ্চিমে অবস্থিত। কাজেই সেখান হইতে কেনান দেশে (পূর্বদিকে) আসিতে হইলে নীল নদ পার হইতে হয় না, পার হইতে হয় লোহিত সাগর বা সুয়েজ উপসাগর অথবা মোররাত বা তিমছাহ্ হ্রদ। তৌরিতে বলা হইয়াছে — সুপ সাগর।

ধর্মযাজকগণ বলেন যে, খোদাতা'লার হুকুমে হজরত মুসা তাঁহার হাতের (লাঠি) দ্বারা জলের উপর আঘাত করিতেই নদীর এপার হইতে ওপার পর্যন্ত একটি (মতান্তরে বারটি) রাস্তা হইয়া গেল এবং রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রাচীরের আকারে জলরাশি দাঁড়াইয়া রহিল। জলধির তলদেশ দিয়া শুকনা পথে বনিইস্রায়েলগণ এপারে আসিলে, ফেরাউন সসৈন্যে ঐ পথ দিয়া বনিইস্রায়েলগণের পশ্চাদ্ধাবন করিল। ফেরাউন ঐ পথের মধ্যভাগে আসিলে হঠাৎ জলপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ফেরাউন সদলে ডুবিয়া মরিল।

আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বনিইস্রায়েলদের বারোটি বংশ বা দলের জন্য বারোটি ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক রাস্তার মাঝখানে জলের প্রাচীর ছিল। ঐ সকল রাস্তায় চলিবার কালে এক দলের লোক অন্য দলের লোককে দেখিতে না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলে, ঐ সকল প্রাচীরের গায়ে জানালা এবং খিড়কীও হইয়াছিল।

বলা হইয়া থাকে যে, আল্লাহ হায়াত, মউত রেজেক ও দৌলত — এই চারিটি বিষয় ভিন্ন আর সমস্ত কাজের ক্ষমতাই মানুষকে দান করিয়াছেন। আল্লাহ মানুষকে শিখাইয়াছেন রেল, ষ্টিমার, হাওয়াই জাহাজ, ডুবো জাহাজ ও রকেট তৈয়ার করিতে ; তিনি শিখাইয়াছেন টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও ও টেলিভিশন তৈয়ার করিতে এবং আরও কত কিছু। কিন্তু এই পারমাণবিক যুগের কোন মানুষকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ জলের দ্বারা (বরফের নহে) প্রাচীর, জানালা, খিড়কী-কবাট ইত্যাদি তৈয়ার করা শিক্ষা দিলেন না কেন?

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। ধর্মযাজকদের কথিত জলের প্রাচীর ও খিড়কী-কবাটাদির আখ্যান কতটুকু সত্য তাহা জানি না ; কিন্তু 'ফেরাউন'-এর মৃত্যু সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেকে মনে করেন যে, 'ফেরাউন' কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম এবং সে হাজার বৎসর জীবিত ছিল। আসলে 'ফেরাউন' কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয় এবং হাজার বৎসর বাঁচিয়াও ছিলেন না। সেকালের মিশরাধিপতিদের উপাধি ছিল 'ফেরাউন'। ফেরাউনদের মধ্যে কেহ কেহ দুর্দান্ত ছিল বটে, কিন্তু কেহ কেহ ছিলেন গুণী-জ্ঞানী ও মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। হজরত মুসার আমলে মিশরের ফেরাউন বা সম্রাট ছিলেন প্রথম 'সেটি'র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্র দ্বিতীয় 'রেমেসিস'। হজরত মুসার জন্মের আগের বৎসর খৃ. পূ. ১৩৫২ সালে তিনি সিংহাসন লাভ করেন এবং ৬৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া খৃ. পূ. ১২৮৫ সালে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।[২৪] ফেরাউন দ্বিতীয় রেমেসিস হাজার বৎসর জীবিত ছিলেন না। তবে তাঁহার 'ফেরাউন' উপাধিটি জীবিত থাকিতে পারে।

শোনা যায় যে, মিশরে ইস্রায়েল বংশের প্রতিষ্ঠাতা হজরত ইউসুফকে কূপ হইতে তুলিয়া বণিকগণ কেনান দেশ হইতে মিশরে নিয়া বিক্রয় করিয়াছিল। হজরত ইউসুফের ভাইগণ কেনানে দুর্ভিক্ষের সময় স্বদেশ হইতে মিশরে যাইয়া একাধিকবার খাদ্যশস্য আনিয়াছিলেন এবং শেষবারে হজরত ইয়াকুব নবীকে সঙ্গে লইয়া সপরিবারে কেনান দেশ হইতে মিশর যাইয়া সেখানে তাঁহারা স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহারা কেহ কখনও নদী বা সাগরে বাধা পান নাই। কিন্তু হজরত মুসা বাধা পাইলেন কেন?

বলা যাইতে পারে যে, পূর্ববর্তী মিশর ভ্রমণকারী কেনানীয়রা যে পথে মিশরে যাতায়াত করিতেন, হজরত মুসা 'পলাতক' বলিয়া সেপথে না চলিয়া শত্রুর অনুগমন ব্যর্থ করিবার জন্য বাঁকাপথে চলিয়া লোহিত সাগর বা সুয়েজ উপসাগর পার হইয়া সীনয় বা তুর পর্বতে পৌঁছিয়াছিলেন।

বনিইস্রায়েলগণের মিশর ত্যাগ করাকে কেহ কেহ 'পলায়ন' বলিয়া থাকেন। কিন্তু আসলে উহা পলায়ন বা গোপন ব্যাপার ছিল না। হজরত মুসার অভিশাপে নাকি ফেরাউন ও তাঁহার জাতির উপর ভয়ানক গজব নাজেল হইয়াছিল। সেই গজবে অতিষ্ঠ হইয়া ফেরাউন বনিইস্রায়েলগণকে তাঁহাদের স্বদেশে যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। বিশেষত বিশাল পশুপাল ও যাবতীয় মালামালসহ বনিইস্রায়েলদের যে সুবিশাল বাহিনী সংগঠিত হইয়াছিল তাহাতে নারী ও শিশু ছাড়া শুধু পুরুষের সংখ্যাই ছিল ছয় লক্ষ।[২৫] এত লোকের রাষ্ট্রত্যাগ করার ঘটনাকে পলায়ন বা গোপন ব্যাপার বলা যায় কিরূপে?

AMARBOI.COM

হজরত মুসার মিশর ত্যাগ সম্বন্ধে তৌরিত কেতাবে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় — "তখন রাত্রিকালেই ফরৌণ মোশি ও হারোনকে ডাকাইয়া বলিলেন, তোমরা উঠ, ইস্রায়েলদিগকে লইয়া আমার প্রজাদের মধ্য হইতে বাহির হও, তোমাদের কথানুসারে মেষপাল ও গো-পাল সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাও এবং আমাকেও আশীর্বাদ কর। . . . আর সদাপ্রভু মিশ্রীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে (বনিইস্রায়েলগণকে) অনুগ্রহপাত্র করিলেন, তাই তাহারা যাহা চাহিল মিশ্রীয়রা তাহাদিগকে তাহাই দিল। এইরূপে তাহারা মিশ্রীয়দের ধন হরণ করিল।"[২৬]

উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, তখন ফেরাউন ও মিশরবাসীগণ সরল মনেই বনিইস্রায়েলগণকে মিশর ত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন ভাবিতেছিলেন যে, বনিইস্রায়েলগণ তাঁহাদের দেশের আপদস্বরূপ, উহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইতে পারিলেই তাঁহারা নিরাপদ হইবেন। তাই তাঁহারা বিস্তর ধনরত্ন দিয়াও বনিইস্রায়েলগণকে তাঁহাদের স্বদেশে যাইবার সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশ্য মিশরীয়দের এই মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অনেক পরে। পুনঃ বনিইস্রায়েলগণকে আটক করিবার ইচ্ছা ফেরাউনের যখন হইয়াছিল, তখন পর্যন্ত বনিইস্রায়েলগণ মিশর অতিক্রম করিয়া 'পীহহীরোত' নামক স্থানের নিকট সমুদ্রতীরে শিবির স্থাপনান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় হজরত মুসা নিশ্চিন্ত মনে সহজ ও সরলপথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বদিকে (স্বদেশের দিকে) না চলিয়া, বাঁকাপথ ধরিয়া প্রায় দুইশত মাইল দক্ষিণে যাইয়া লোহিত সাগর পাড়ি দেওয়ার হেতু কি?

কেহ কেহ বলেন যে, হজরত মুসা যে জলাশয় পার হইয়াছিলেন, পূর্বে উহা ভূমধ্যসাগরের সাথে যুক্ত ছিল এবং উহার গভীরতা ছিল নিতান্ত কম। উহা ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল বলিয়া পূর্বীয় বায়ুপ্রবাহের দরুন ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশের জল হ্রাস হইলে উহা সম্পূর্ণ শুকাইয়া যাইত এবং ঐ বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হইলে পুনরায় উহা জলপূর্ণ হইত। যেমন আমাদের বাংলাদেশের দক্ষিণ বায়ুপ্রবাহে বঙ্গোপসাগরের জল আসিয়া দেশ প্লাবিত করে, পক্ষান্তরে উত্তরীয় বায়ুপ্রবাহে জল কমিয়া যায়। ইহার ফলে নদী ও উপকূলভাগের অগভীর স্থান শুকাইয়া যায়। এই মতের অনুকূলে তৌরিত গ্রন্থে একটি বিবরণ পাওয়া যায়। বিবরণটি এইরূপ — "তাহাতে সদাপ্রভু সেই সমস্ত রাত্রি পূর্বীয় বায়ু দ্বারা সমুদ্রকে সরাইয়া দিলেন ও তাহা বিশুষ্ক করিলেন। তাহাতে জল (গভীর ও অগভীর) দুই ভাগ হইল আর ইস্রায়েল সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল।"[২৭]

উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে সমস্ত রাত্রি পূর্বদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রায় বার ঘন্টা স্থায়ী বন্যা হইয়াছিল। কাজেই অগভীর জলাশয়টি শুকাইয়া যাওয়ায় বনিইস্রাইয়েলগণ প্রায় শুকনা পথেই উহা পার হইয়াছিলেন। উঁহাদের পথানুসরণ করিয়া ফেরাউন যখন ঐ জলাশয়ের মধ্যভাগে আসিলেন, তখন রাত্রি শেষ হইয়াছিল এবং বন্যাও থামিয়াছিল। কাজেই তখন অতি দ্রুত ভূমধ্যসাগরের জল আসিয়া ফেরাউনকে ডুবাইয়া মারিল। যেহেতু পূর্বীয় বায়ু কেবলমাত্র রাত্রেই প্রবাহিত হইয়াছিল এবং ভোরে উহা থামিয়াছিল। এই মর্মে তৌরিতের অন্যত্র লিখিত আছে, "তখন মোশি (মুসা) সমুদ্রের উপর হস্ত বিস্তার করিলেন, আর প্রাতঃকাল হইতে না হইতে সমুদ্র সমান হইয়া গেল। তাহাতে মিশ্রীয়েরা তাঁহার দিকেই পলায়ন করিল, আর সদাপ্রভু সমুদ্রের মধ্যে মিশ্রীয়দিগকে ঠেলিয়া দিলেন।"[২৮]

AMARBOI.COM

অধুনা কোন কোন গবেষক বলেন যে, হজরত মুসা 'তিমছাহ্ হ্রদ' পার হইয়াছিলেন। তখন উহাতে জোয়ার-ভাটা হইত। হ্রদ বা সমুদ্রোপকূলের জোয়ার-ভাটা এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমাদের বঙ্গোপসাগরের উপকূলে [illegible] দৃশ্য হয়ত কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবেন। উহাকে 'সর ডাকা' বা 'বান ডাকা' বলে।

ভাটার শেষে যেখানে শুকনা ভূমি দেখা যায়, জোয়ার হওয়ামাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সেখানে হয় অথৈ জল। ঐ জল এত দ্রুতবেগে আসিয়া থাকে যে, পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকিলে, সেখানে যাইয়া কেহই বাঁচিতে পারে না। এমনকি সময় সময় অভিজ্ঞ লোকও মারা পড়ে।

ঐরূপ জলাশয় পার হইবার বিপদ ও উপায় অর্থাৎ জোয়ার ও ভাটা সম্বন্ধে বনিইস্রায়েলগণ বোধহয় পূর্বজ্ঞাত ছিলেন। হয়ত তাঁহারা জানিতেন যে, ভাটার প্রথমাবস্থায় ওপার হইতে যাত্রা না করিলে জোয়ারের পূর্বে এপারে পৌছিতে পারা যায় না। তাই ভাটার প্রথমাবস্থায় হ্রদে কিছু জল থাকিতেই হজরত মুসা তাঁহার হাতের আসা দ্বারা (অন্ধের পথ চলিবার মত) অগভীর স্থান নির্ণয়পূর্বক সদলে হ্রদ পাড়ি দিয়াছিলেন। ফেরাউনের তখন একমাত্র লক্ষ্য বনিইস্রায়েলগণকে আক্রমণ ও ধৃত করা, জোয়ার বা ভাটার প্রতি লক্ষ্য ছিল না। হয়ত শাহী উমরতবাসী ফেরাউনের ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞতাও ছিল না। তিনি ভাটার প্রথম বা শেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বনিইস্রায়েলগণ যখন এপারে আসিয়াছিলেন, ফেরাউন তখন মধ্যহ্রদে ছিলেন। এই সময় হঠাৎ বান ডাকিয়া জোয়ার আসিলে ফেরাউন দ্বিতীয় রেমেসিস সদলে ডুবিয়া মরিলেন (খৃ. পূ. ১২৮৫)।

হজরত মুসার জলাশয় পার হইবার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের মধ্যে বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য কোন্‌টি?

৩. হজরত মুসা সীনয় পর্বতে কি দেখিয়াছিলেন?

শোনা যায়, হজরত মুসা মিশর হইতে সদলে বাহির হইবার পর তৃতীয় মাসের প্রথম দিনে সীনয় পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হন এবং তৃতীয় দিন ভোরে ঐ পর্বতের উপরে আল্লাহ্‌কে দেখিতে ও তাঁহার বাক্য শুনিতে পান। এই সম্বন্ধে তৌরিতের লিখিত বিবরণটি এইরূপ — "পরে তৃতীয় দিন প্রভাত হইলে মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎ এবং পর্বতের উপরে নিবিড় মেঘ হইল; আর অতিশয় উচ্চরবে তূরীধ্বনি হইতে লাগিল। পরে মোশি ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাত করিবার জন্য লোকদিগকে শিবির হইতে বাহির করিলেন আর তাহারা পর্বতের তলে দণ্ডায়মান হইল। তখন সমস্ত সীনয় পর্বত ধূমময় ছিল। কেননা সদাপ্রভু অগ্নিসহ তাহার উপর নামিয়া আসিলেন আর ভাটির ধূমের ন্যায় তাহা হইতে ধূম উঠিতে লাগিল এবং সমস্ত পর্বত অতিশয় কাঁপিতে লাগিল। আর তূরীর শব্দ ক্রমশ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন মোশি কথা কহিলেন, এবং ঈশ্বর বাণী দ্বারা তাঁহাকে উত্তর দিলেন।"[২৯]

উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, ঐদিন ভোরে সীনয় পর্বতে (কোহেতূরে) মেঘগর্জন, বিদ্যুৎচমক ও তূরীধ্বনি (শিলাবৃষ্টির সময়ে মেঘস্থিত অবিরাম গর্জন) হইতেছিল এবং মুসা মুহুর্মুহু বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার নূর (আলো) দর্শন করিয়াছিলেন, এই বলিয়া যে একটি আখ্যান আছে, উহা মেঘ-গর্জন ও বিদ্যুতালোক হইতে পারে না কি?

প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ এরিখ ফন দানিকেনের মতে ইহুদীদের আরাধ্য দেবতা 'যিহোবা' নিরাকার ঈশ্বর নহেন, তিনি ব্যক্তিসত্তার অধিকারী ভিন্ন গ্রহবাসী মানুষ। যিহোবার তূরপর্বতে অবতরণের আখ্যানটি আসলে ভিন্ন গ্রহবাসী কোন বৈমানিকের বিমানযোগে পৃথিবীতে আগমন ও তূরপর্বতে অবতরণ।

৪. হজরত সোলায়মানের হেকমত না কেরামত?

শোনা যায় যে, হজরত সোলায়মান একাধারে বাদশাহ্‌ এবং পয়গম্বর ছিলেন। পয়গম্বর হিসাবে তাঁহার প্রসিদ্ধি বোধহয় খুব বেশী ছিল না। কিন্তু 'বাদশাহ' হিসাবে বিশাল সাম্রাজ্য, বিভিন্ন জাতির উপর একাধিপত্য ও তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্যের বিষয় পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, তিনি সেই যুগের একজন প্রথম শ্রেণীর সম্রাট ছিলেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

কোন কোন ধর্মপ্রচারক বলিয়া থাকেন যে, হজরত সোলায়মান পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, এমনকি পিপীলিকারও ভাষা জানিতেন এবং উহারা তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিত; জ্বীন-পরী, দেও-দানব, এমনকি পবনও। অধিকন্তু তিনি হাওয়ায় উড়িতে পারিতেন।

হজরত সোলায়মান ইতর প্রাণীর ভাষা জানিতেন কি না এবং জ্বীন-পরীরা তাঁহার আজ্ঞাবহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল কি না, তাহা প্রশ্ন নহে। এখানে প্রশ্ন হইল এই যে, তিনি যে হাওয়ায় উড়িতে পারিতেন বলিয়া দাবী করা হয়, তাহা কি তাঁহার হেকমত, না কেরামত। অর্থাৎ তিনি কি কোন কৌশলে উড়িতেন, না আল্লাহ্‌র কৃপায় উড়িতেন? যদি তিনি আল্লাহ্‌র দয়ায়ই উড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে লক্ষাধিক পয়গম্বরের মধ্যে অপর কেহ উড়িতে পারিলেন না কেন? তাঁহাদের প্রতি কি আল্লাহ্‌র ঐরূপ অনুগ্রহ ছিল না?

লঙ্কেশ্বর রাবণের পুত্র মেঘনাদ (ইন্দ্রজিৎ)-এর শূন্যে উড়িবারও একটি প্রবাদ আছে। তিনি নাকি ছিলেন অসভ্য রাক্ষস জাতি এবং নানা দেব-দেবীর উপাসক। তিনি যে কোন কৌশলে উড়িতেন তাহা বলা যায় না এবং তিনি যে আল্লাহ্‌র রহমতে উড়িতেন, তাহাও কল্পনা করা যায় না। তবে তাঁহার বিমানে (রথে) আরোহণ সম্ভব হইল কিরূপে? উহা কি রামায়ণের কবি বাল্মীকির কল্পনা মাত্র? তাহাই যদি হয়, তবে সোলায়মানের বেলায় ঐরূপ হইতে পারে কি না?

ভগবানের দয়া অথবা জ্ঞানের ক্রিয়া, যাহাই হউক, হজরত সোলায়মানের বিমানে আরোহণ যে সত্য, তাহার প্রমাণ কি? তিনি কি শুধু স্বদেশেই উড়িতেন?

আধুনিক বিজ্ঞানীগণ বিদ্যুৎ ও পেট্রোল খরচ এবং নানাবিধ দুর্ঘটনার (Accident) ভয়কে উপেক্ষা করিয়া সারেজাহান সফর করেন। হজরত সোলায়মান কি বিনা খরচে বিঘ্নহীন বিমানে আরোহণ করিয়াও দেশান্তর গমন করেন নাই? যদি করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে তৎকালের কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে উহা লিপিবদ্ধ নাই কেন? চীনদেশ না হয় একটু দূরেই ছিল, গ্রীস বা মিশর দেশে কি তিনি কখনও যান নাই? অথবা সে দেশের ঐ যুগের কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বর্তমানে জানা যায় না কি?

AMARBOI.COM

হজরত সোলায়মান সিংহাসন লাভ করেন খৃ. পূ. ৯৭১ সালে[৩০] এবং মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতে আসেন খৃ. পূ. ৩৩০, সময়ের ব্যবধান মাত্র ৬৪১ বৎসর। ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসের দূরত্ব হজরত সোলায়মানের বাসস্থান জেরুজালেমের দূরত্ব হইতে প্রায় ৭/৮ শত মাইল অধিক। তথাপি গ্রীসাধিপতি আলেকজাণ্ডার হাঁটিয়াই ভারতে আসিয়াছিলেন। আর হজরত সোলায়মান কি উড়িয়াও এ দেশে আসিতে পারিলেন না? যদি আসিয়াই থাকিতেন, তাহা হইলে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ঘটনা যখন এদেশের ঐতিহাসিকগণ ভুলিতে পারিলেন না, তখন হজরত সোলায়মানের ভারতে আগমনের বিষয় ভুলিলেন কিরূপে?

৫. যীশুখ্রীষ্টের পিতা কে ?

'পিতা' — এই শব্দটিতে সাধারণত আমরা জন্মদাতাকেই বুঝিয়া থাকি, অর্থাৎ সন্তান যাহার ঔরসজাত তাহাকেই। কিন্তু উহার কতিপয় ভাবার্থও আছে। যেমন, শাস্ত্রীয় মতে পিতা পাঁচজন। যথা — অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, জন্মদাতা ও উপনেতা। কেহ কেহ আবার জ্ঞানদাতা অর্থাৎ শিক্ষাগুরু এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পিতৃতুল্য বলিয়া মনে করেন। এ মতে পিতা সাতজন।[৩১]

শোনা যায় যে, যীশুখ্রীষ্ট (হজরত ঈসা আ.) অবিবাহিতা মরিয়মের গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কেহ পিতা নাই, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু তিনি কি ভগবানের ঔরসে ভগবতীর গর্ভজাত গণেশের ন্যায় পুত্র? সেমিটিক জাতির প্রত্যেকেই ইহাতে বলিবেন, "না"।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে তিনি ঈশ্বরের কোন্ শ্রেণীর পুত্র? 'সৃষ্টিকর্তা' বলিয়া যদি পরমেশ্বরকে 'পিতা' বলা যায়, তবে তিনি তাঁহার সৃষ্ট সকল জীবেরই পিতা, যীশুর একার নয়। মহাপ্রভুর দয়া-মায়া, ভালবাসা ইত্যাদি এমন কোন্ বিষয় আছে, যাহা অন্যান্য আম্বিয়াদের প্রতি ছিল না, যদ্দারা যীশু একাই মহাপ্রভুর পুত্রত্ব দাবী করিতে পারেন? মহাপ্রভু নাকি হজরত মুসাকে সাক্ষাতদান ও তাঁহার সাথে বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, হজরত সোলায়মানকে হাওয়ায় উড়াইয়াছিলেন এবং হজরত মোহাম্মদ (দ.)-কে মে'রাজে নিয়া তাঁহার সহিত নানাবিধ কথোপকথন করিয়াছিলেন। ইহারা কেহই মহাপ্রভুর পুত্র নহেন কেন? পক্ষান্তরে, **তৎকালীন ইহুদীগণ রাষ্ট্র ও ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে আরোহণ করাইয়া তাঁহার হস্ত ও পদে পেরেক বিদ্ধ করিয়া যখন অন্যায় ও নির্মমভাবে হত্যা করিল, তখন তাঁহার পিতা ন্যায়বান পুত্রের পক্ষে একটি কথাও বলিলেন না বা তাঁহাকে উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা করিলেন না।** কোন পিতা তাঁহার পুত্রহত্যা দর্শনে নীরব ও নির্বিকার থাকিতে পারেন, এরূপ দৃষ্টান্ত কোথায়ও আছে কি?

হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে, খোদাতা'লা ফেরেস্তার মারফতে বিবি মরিয়মের প্রতি তাঁহার 'বাণী' পাঠাইয়াছিলেন এবং সেই বাণীর বদৌলতেই তাঁহার গর্ভ হইয়াছিল এবং তাহাতে যীশু জন্মিয়াছিলেন, তাই তিনি খোদার পুত্র বলিয়া আখ্যায়িত। তাহাই যদি হয়, তবে হজরত জাকারিয়া নবীর স্ত্রী ইলীশাবেত চিরবন্ধ্যাহেতু কোন সন্তানাদি না হওয়ায় বৃদ্ধা বয়সে ফেরেস্তার মারফতে খোদাতা'লার 'বাণী' প্রাপ্তিতে তাঁহার নাকি গর্ভ হইয়াছিল এবং সেই গর্ভে হজরত ইয়াহিয়া নবী জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তিনি খোদার পুত্র নহেন কেন?

বিজ্ঞানীদের মতে — পুরুষের প্রধান জননেন্দ্রিয় শুক্রাশয় (Testes)। উহার ভিতর এক শ্রেণীর কোষ (Cell) আছে, তাহাকে বলা হয় শুক্রকীট। সেগুলি দেখিতে ব্যাঙাচির মত। কিন্তু এত ছোট যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তাহাদের দেখা যায় না। ইহারা শুক্রাশয়ের ভিতরে যথেচ্ছ সাঁতরাইয়া বেড়ায়।

শুক্রাশয়ের সাথে দুইটি সরু নল দিয়া মূত্রনালীর যোগ আছে। সঙ্গমের সময় শুক্রকীটগুলি ঐ নল বাহিয়া মূত্রনালীর ভিতর দিয়া স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করিতে পারে।

মেয়েদের প্রধান জননেন্দ্রিয় ডিম্বাধার (Ovaries)। ইহা তলপেটের ভিতর ছোট দুইটি গ্লাণ্ড। ইহার সহিত সরু নলের দ্বারা জরায়ুর যোগ আছে। ডিম্বাধারের ভিতর ডিম্বকোষ প্রস্তুত হইয়া পূর্ণতা লাভ করিলেই উহা নলের ভিতর দিয়া জরায়ুতে নামিয়া আসে।

স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সময়ে পুরুষের বীর্যের সহিত শুক্রকীট স্ত্রী-অঙ্গ দিয়া প্রবেশ করিয়া জরায়ুর ভিতর ঢোকে। সেখানে স্ত্রীর ডিম্বকোষ তৈয়ারী থাকে শুক্রকীটের আগমনের অপেক্ষায়। শুক্রকীটগুলি জরায়ুতে প্রবেশ করিয়াই লেজ নাড়িয়া (ব্যাঙাচির মত ইহাদের লেজ থাকে) সাঁতার কাটিয়া ডিম্বকোষের দিকে ছুটিয়া আসে। উহাদের মধ্যে মাত্র একটিই ডিম্বকোষের ভিতর ঢুকিতে পারে। কেননা একটি ঢোকামাত্রই ডিম্বকোষের বাহিরের পর্দায় এমন পরিবর্তন ঘটে যে, অন্য কোন শুক্রকীট আর ঢুকিতে পারে না। ডিম্বকোষের মধ্যে ঢুকিবার সময় শুক্রকীটের লেজটি খসিয়া বাহিরে থাকিয়া যায়।

মানুষের বেলায় সচরাচর প্রতিমাসে নির্দিষ্টদিনে একটি করিয়া ডিম্বকোষ স্ত্রীলোকের ডিম্বাধারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন জন্তুর তিন মাস, কোন জন্তুর ছয় মাস, কাহারো বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৎসরান্তে একবার ডিম্বকোষ জন্মে। যদি সেই সময় শুক্রকীটের সঙ্গে উহার মিলন না হয়, তবে দুই-চারিদিনের মধ্যেই ডিম্বকোষটি শুকাইয়া মরিয়া যায়। আবার যথাসময়ে (ঋতুতে) আর একটি প্রস্তুত হয়।

শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের মিলন হইলে, মিলনের পরমুহূর্ত হইতে ডিম্বকোষের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। ডিম্বকোষের মধ্যে ঢুকিবার পর শুক্রকীটের কোষকেন্দ্র আরও বড় হইতে থাকে এবং খানিকটা বড় হইয়া ডিম্বকোষের কোষকেন্দ্রের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যায়। নানা বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনের পর আরম্ভ হয় বিভাজন। একটি হইতে দুইটি, দুইটি হইতে চারিটি এবং তাহা হইতে আটটি, এইভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া তিন সপ্তাহের মধ্যে ডিম্বকোষসমূহ সংখ্যায় বাড়িয়া গিয়া আয়তনে এত বড় হয় যে, তখন তাহাকে 'ভ্রূণ' বলিয়া চেনা যায়। মানুষের বেলায় শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তখনও উহা $\frac{১}{৫}$ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। দুই মাস পরে পুরা এক ইঞ্চি হয় এবং তখন হইতে উহাকে 'মানুষের ভ্রূণ' বলিয়া চেনা যায়। পুরাপুরি শিশুর মত হইতে সময় লাগে আরও সাত মাস। ন্যূনাধিক নয় মাস পর জরায়ু বা মাতৃজঠর ত্যাগ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় 'মানব শিশু'।

নারী ও পুরুষের মিলনের অর্থই হইল শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের মিলন সাধন। নারী ও পুরুষের রতিক্রিয়া ব্যতীত শুক্র ও ডিম্বকোষের মিলন সম্ভব হইতে পারে। কোন পুরুষের বীর্য সংগ্রহপূর্বক তাহা যথাসময়ে কোন কৌশলে নারীর জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের মিলন ঘটাইতে পারা যায় এবং তাহাতে সন্তানোৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু কোনও না কোন প্রকারের যৌনমিলন ব্যতীত সন্তানোৎপত্তি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সমাজবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সভ্যতা প্রাপ্তির পূর্বে মানুষ ও পশু-পাখীর আহার-বিহার, চাল-চলন ইত্যাদিতে বিশেষ পার্থক্য ছিল না, যৌন ব্যাপারেও না। তখন তাহাদের যৌনমিলন ছিল পশু-পাখীদের মতই যথেচ্ছ। কেননা তাহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা ছিল না। সেকালের অসভ্য মানবসমাজে কাহারো জনক নির্ণয় করা ছিল প্রায় দুঃসাধ্য। মানব সভ্যতার ক্রমবৃদ্ধির একটি মস্ত বড় ধাপ হইল বিবাহপ্রথার প্রবর্তন। ইহাতে মানুষের জনক নির্ণয় সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ণায়ত্ত হইয়াছে কি? এ কথা বলিলে হয়ত অসত্য বলা হইবে না যে, সামাজিক তথা আনুষ্ঠানিক পরিণয়াবদ্ধ স্বামী বর্তমান থাকিতে উপস্বামী ধারণ সভ্য মানবসমাজে বিরল নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে কোন সন্তান জন্মিলে প্রায় সর্বত্র বিবাহিত স্বামীকেই বলা হয় শিশুর পিতা এবং মনে করা হয় 'জনক' (স্মরণ রাখা উচিত যে, 'পিতা' ও 'জনক' এক কথা নয়। 'পিতা' = পালনকর্তা এবং 'জনক' = জন্মদাতা)। এহেন অবস্থায় শিশুর জনক চিরকাল অপ্রকাশ্যই থাকিয়া যায়। কিন্তু জাতকের দৈহিক অবয়ব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রুচি, ধর্মাধর্ম বা বিষয়বিশেষের প্রতি অনুরাগ-বিরাগ ইত্যাদি বিষয়সমূহে জনকের সহিত বহু সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু উহা কেহ তলাইয়া দেখে না বা সকল ক্ষেত্রে দেখা সম্ভবও নয়।

যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের সময় সখরিয়া (হজরত জাকারিয়া আ.) নামক জনৈক ব্যক্তি ছিলেন ইহুদীদের ধর্মযাজক ও জেরুজালেম মন্দিরের সেবাইত বা পুরোহিত। শোনা যায় যে, যীশুর মাতা মরিয়মকে তাঁহার পিতা এমরান মরিয়মের তিন বৎসর বয়সের সময় জেরুজালেম মন্দিরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেবাকাজের জন্য প্রেরণ করেন এবং সেখানে তিনি সখরিয়া কর্তৃক পালিতা হন।[৩২] সখরিয়ার কোন সন্তান ছিল না, তাঁহার ঘরে ছিলেন অতিবৃদ্ধা বন্ধ্যা স্ত্রী ইলীশাবেত।[৩৩]

সখরিয়া তাঁহার ১২০ বৎসর বয়সের সময় ফেরেস্তার মারফতে পুত্রবর প্রাপ্ত হন ও তাহাতে ইলীশাবেত গর্ভবতী হন এবং ইহার ছয় মাস পরে ফেরেস্তার মারফতে পুত্রবর প্রাপ্ত হইয়া ১৬ বৎসর বয়সে মরিয়মও গর্ভবতী হন।

অবিবাহিতা মরিয়ম সখরিয়ার আশ্রমে থাকিয়া গর্ভবতী হইলে লোক-লজ্জার ভয়ে ধর্মমন্দির ত্যাগ করিয়া নিজ জ্ঞাতিভ্রাতা যোসেপের সঙ্গে জেরুজালেমের নিকটবর্তী বৈৎলেহম (বয়তুলহাম) নামক স্থানে গিয়া অবস্থান করেন এবং ঐ স্থানে যথাসময়ে এক খর্জুরবৃক্ষের ছায়ায় যীশুখ্রীষ্ট ভূমিষ্ঠ হন।

অবিবাহিতা মরিয়ম এক পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া (মরিয়ম ও সখরিয়ার স্বজাতীয়) ইহুদীগণ তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিতে থাকে এবং তাহারা মরিয়মের পালক পিতা সুবৃদ্ধ সখরিয়ার উপর ব্যভিচারের অপরাধ আরোপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। প্রথমত ইহুদীগণ সখরিয়াকে ধৃত করিবার চেষ্টা করে এবং সখরিয়া এক বৃক্ষকোটরে লুকাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহুদীগণ খোঁজ পাইয়া করাত দ্বারা ঐ বৃক্ষটি ছেদন করার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ সখরিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।[৩৪] মরিয়ম সদ্যোজাত শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া যোসেপের সঙ্গে রাত্রিকালে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মিশরে চলিয়া যান এবং সেখান হইতে গালীল প্রদেশের নাসরৎ নগরে যাইয়া কালাতিপাত করেন।[৩৫]

তৎকালে সে দেশের রাজার নাম ছিল হেরোদ, তিনি জাতিতে ছিলেন ইহুদী। তাই রাজ্য শাসিত হইত তৌরিতের বিধানমতে। তৌরিতের বিধানমতে 'ব্যভিচার' ও 'নরহত্যা' — এই উভয়বিধ অপরাধেরই একমাত্র শাস্তি 'প্রাণদণ্ড'।[৩৬] এখানে ব্যভিচারের অপরাধে সখরিয়ার প্রাণদণ্ডের বিষয় জানা যায় বটে, কিন্তু সখরিয়াকে বধ করার অপরাধে কোন ইহুদীর প্রাণদণ্ডের বিষয় জানা যায় না। ইহাতে ধারণা হইতে পারে যে, সখরিয়া নিরপরাধ হইলে, তাঁহাকে বধ করার অপরাধে নিশ্চয় ঘাতক ইহুদীর প্রাণদণ্ড হইত। কেননা সখরিয়া ছিলেন তৎকালীন ইহুদী সমাজের একজন উচ্চস্তরের ব্যক্তিত্বশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি।

এতদ্বিষয়ে পর্যালোচনা করিলে মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে যে, যীশুখ্রীষ্টের জনক মহাপ্রভু, না সখরিয়া?

(যীশুর প্রসঙ্গে — হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত মহর্ষি পরাশরের ঔরসে অবিবাহিতা মৎস্যগন্ধার গর্ভজাত মহামনীষী ব্যাসের কাহিনী অনুধাবনযোগ্য। তবে উহাতে পরাশরের বিকল্পে স্বর্গদূতের পরিকল্পনা নাই।)

৬. জ্বীন জাতি কোথায়?

শোনা যায় যে, এই জগতে জ্বীন নামক একজাতীয় জীব আছে। তাহাদের নাকি মানুষের মত জন্ম, মৃত্যু, পাপ-পুণ্য এবং পরকালে স্বর্গ বা নরকবাসের বিধান আছে। কোন জীব যদি পাপ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুণ্যের অধিকারী হয়, তবে সে জাতি যে জ্ঞানবান, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অদ্যাবধি পৃথিবীতে জ্বীন জাতির অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ক্যাপ্টেন কুক, ড্রেক, ম্যাগিলন প্রভৃতি ভূ-পর্যটকগণের পর্যটনের ফলে পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত দেশ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু জ্বীন জাতির অস্তিত্বের সন্ধান মিলিল কৈ? তবে কি তাহারা গ্রহ-উপগ্রহ বা নক্ষত্রলোকে বাস করে?

দশটি গ্রহ এবং তাহাদের গোটা ত্রিশেক উপগ্রহ আছে। খুব শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যেও ঐ সকল গ্রহ বা উপগ্রহে কোনরকম জীবের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আর যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, নক্ষত্রগুলি সবই অগ্নিময় এবং উহাদের তাপমাত্রা কোনটিরই দুই হাজার ডিগ্রীর কম নয়, কোন কোনটির তেইশ হাজার ডিগ্রীর উপর। সেখানে কোনরূপ জীব বাস করা তো দূরের কথা, জন্মিতেই পারে না। যদি বা পারে, তাহা হইলে বাসিন্দাদের দেহও হওয়া উচিত অগ্নিময় এবং কেহ কেহ বলেনও তাহাই। বলা হয় যে, জ্বীনগণ আগুনের তৈয়ারী। তাহাই যদি হয়, তবে তাহাদের পরকালে আবার দোজখ বা অগ্নিবাস কিরূপ? পক্ষান্তরে তাহারা যদি এই পৃথিবীতেই বাস করে, তবে তাহারা কোন্ (অদৃশ্য) বস্তুর তৈয়ারী?

ইহুদীশাস্ত্রে 'শেদিম' নামে এক শ্রেণীর কাল্পনিক জীবের বর্ণনা পাওয়া যায়। জ্বীনগণ তাহাদের প্রেতমূর্তি নয় কি?

AMARBOI.COM

৭. সূর্যবিহীন দিন কিরূপ?

দিন, রাত, মাস ও বৎসরের নিয়ামক সূর্য এবং গতিশীল পৃথিবী। ইহার কোনটিকে বাদ দিয়া আমরা দিবা, রাত্রি, মাস ও বৎসর কল্পনা করিতে পারি না। কেননা সূর্য থাকিয়াও পৃথিবী বিশেষত তাহার গতি না থাকিলে পৃথিবীর একাংশে থাকিত চিরকাল দিবা এবং অপর অংশে থাকিত রাত্রি। সেই অফুরন্ত দিন বা রাত্রিতে মাস বা বৎসর চিনিবার কোন উপায় থাকিত না। পক্ষান্তরে সূর্য না থাকিয়া শুধু গতিশীল পৃথিবীটি থাকিলে, সে চিরকাল অন্ধকারেই ঘুরিয়া মরিত, দিন-রাত-মাস-বৎসর কিছুই হইত না।

শোনা যায় যে, এস্রাফিল ফেরেস্তা যখন আল্লাহর আদেশে শিঙ্গা ফুঁকিবেন, তখন মহাপ্রলয় হইবে। তখন পৃথিবী এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিলয় হইবে। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। এমনকি যে এস্রাফিল শিঙ্গা ফুঁকিবেন তিনিও না। এহেন অবস্থায় চল্লিশ দিন (মতান্তরে ৪০ বৎসর) পরে আল্লাহ এস্রাফিলকে পুনঃ সৃষ্টি করিবেন এবং আল্লাহর হুকুমে তিনি পুনরায় শিঙ্গা ফুঁকিবেন, ফলে পুনরায় জীব ও জগৎ সৃষ্টি হইবে।

মহাপ্রলয়ের (কেয়ামতের) পরে সূর্য বা তদনুরূপ আলোবিকিরণকারী কোন পদার্থই থাকিবে না। এইরূপ অবস্থার পরে এবং পুনঃ সৃষ্টির পূর্বে 'চল্লিশ দিন বা বৎসর' হইবে কিরূপে? যদি বা হয়, তবে ঐ দিনগুলির সহিত রাত্রিও থাকিবে কি? থাকিলে, সূর্য ভিন্ন সেই 'দিন' ও 'রাত্রি' কিরূপে হইবে? আর দিনের সঙ্গে রাত্রি না থাকিলে, অবিচ্ছিন্ন আলোকিত 'দিন'-এর সংখ্যা 'চল্লিশ' হইবে কিভাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. ফরায়েজে 'আউল' কেন ?

মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি তাহার ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টনব্যবস্থাকে বলা হয় 'ফরায়েজ নীতি'। ইহা পবিত্র কোরানের বিধান। মুসলিম জগতে এই বিধানটি যেরূপ দৃঢ়ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে, সেরূপ অন্য কোনটি নহে। এমনটি পবিত্র নামাজের বিধানও নহে। ইহার কারণ বোধহয় এই যে, **ফরায়েজ বিধানের সঙ্গে জাগতিক স্বার্থ জড়িত আছে। কিন্তু পবিত্র নামাজের সাথে উহা নাই। থাকিলে বোধ হয় যে, নামাজীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইত।** সে যাহা হউক, এই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানটিতেও একটি 'আউল' দেখা যায়। 'আউল' কথাটির ধাতুগত অর্থ যাহাই হউক, এতদ্দেশে উহাতে মনে করা হয় — 'অগোছাল' বা 'বিশৃঙ্খল'।

ফরায়েজ বিধানের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি তাহার ওয়ারিশগণের মধ্যে নির্ধারিত অংশ মোতাবেক বণ্টন করিলে কেহ পায় এবং কেহ পায় না। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায় যে, যদি কোন মৃত ব্যক্তির মা, বাবা, দুই মেয়ে ও এক স্ত্রী থাকে, তবে মা $\frac{১}{৬}$, বাবা $\frac{১}{৬}$, দুই মেয়ে $\frac{২}{৩}$ এবং স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ অংশ পাইবে। কিন্তু ইহা দিলে স্ত্রী কিছুই পায় না। অথচ স্ত্রীকে দিতে গেলে সে পাইবে $\frac{১}{৮}$ অংশ। এ ক্ষেত্রে মোট সম্পত্তি '১'-এর স্থলে ওয়ারিশগণের অংশের সম্পত্তি হয় $১\frac{১}{৮}$। অর্থাৎ ষোল আনার স্থলে হয় আঠার আনা। সমস্যাটি গুরুতর বটে।

মুসলিম জগতে উক্ত সমস্যাটি বহুদিন যাবত অমীমাংসিতই ছিল। অতঃপর সমাধান করিলেন হজরত আলী (রা.)।[৪০] তিনি যে নিয়মের দ্বারা উহার সমাধান করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'আউল'।

হজরত আলী (রা.)-এর প্রবর্তিত 'আউল' বিধানটি এইরূপ :

মৃত — অনামা ব্যক্তি (ফরায়েজ মতে)

মা	বাবা	মেয়ে (২)	স্ত্রী
$\frac{১}{৬}$	$\frac{১}{৬}$	$\frac{২}{৩}$	$\frac{১}{৮}$

প্রথমত উক্ত রাশি চারিটিকে সমান হরবিশিষ্ট করিতে হইবে এবং তাহা করিলে উহা হইবে –

$\frac{৪}{২৪}$	$\frac{৪}{২৪}$	$\frac{১৬}{২৪}$	$\frac{৩}{২৪}$

ইহার যোগফল হইবে $\frac{২৭}{২৪}$। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যেখানে মূল সংখ্যা (হর) ছিল ২৪, সেখানে অংশ বাড়িয়া (লব) হইয়া যাইতেছে ২৭। সুতরাং '২৭'-কেই মূল সংখ্যা (হর) ধরিয়া অংশ দিতে হইবে। অর্থাৎ দিতে হইবে—

$$\frac{৪}{২৭} + \frac{৪}{২৭} + \frac{১৬}{২৭} + \frac{৩}{২৭} = \frac{২৭}{২৭} = ১।$$

➡ **পবিত্র কোরানে বর্ণিত আলোচ্য ফরায়েজ বিধানের সমস্যাটি সমাধান করিলেন হজরত আলী (রা.) তাঁহার গাণিতিক জ্ঞানের দ্বারা এবং মুসলিম জগতে আজও উহাই প্রচলিত। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই মনে উদয় হয় যে, তবে কি আল্লাহ্ গণিতজ্ঞ নহেন? হইলে, পবিত্র কোরানের উক্ত বিধানটি ত্রুটিপূর্ণ কেন?**

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহ্ পবিত্র কোরানে পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে, যাহারা আল্লাহর হুকুম পালন করিয়া তাঁহার ফরায়েজ আইন মান্য করিবে, তাহারা বেহেস্তী হইবে এবং অমান্যকারীরা হইবে দোজখী। যথা — "ইহা অর্থাৎ এই ফরায়েজ আইন ও নির্ধারিত অংশ আল্লাহর সীমারেখা এবং আল্লাহর নির্ধারিত অংশসমূহ। যাহারা আল্লাহর আদেশ এবং তাঁহার রসুলের আদেশ মান্য করিবে, তাহাদিগকে আল্লাহ বেহেস্তে স্থান দান করিবেন . . . .।"[৩৮]

পুনশ্চ "যে কেহ আল্লাহর আদেশ, আল্লাহর আইনে নির্ধারিত অংশ ও তাঁহার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে আল্লাহ দোজখবাসী করিবেন, তথায় সে চিরকাল থাকিবে এবং তথায় তাহার ভীষণ অপমানজনক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।"[৩৯]

পবিত্র কোরানে বর্ণিত ফরায়েজ বিধানের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কতগুলি (হজরত আলীর প্রবর্তিত) 'আউল' নীতির পর্যায়ে পড়ে এবং উহাতে কোরান মানিয়া বণ্টন চলে না, আবার 'আউল' মানিলে হইতে হয় দোজখী। উপায় কি?

ফরায়েজ বিধানের একশ্রেণীর ওয়ারিশকে বলা হয় 'আছাবা'। অর্থাৎ অবশিষ্টভাগী। মৃতের ওয়ারিশগণের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা আছাবাগণ পাইয়া থাকে। আছাবাদের মধ্যে অংশ বণ্টনের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, নিকটবর্তী ওয়ারিশ একজনও থাকিলে দূরবর্তী কেহ অংশ পায় না এবং এই নিয়মের ফলেই পুত্র থাকিলে পৌত্র (নাতি) কিছুই পায় না। কিন্তু অধুনা রাষ্ট্রীয় বিচারপতিগণ পুত্র থাকিলেও পৌত্রকে অংশ দিতে শুরু করিয়াছেন। যে বিচারপতিগণ উহা করিতেছেন, তাঁহারা পরকালে যাইবেন কোথায়?

AMARBOI.COM

৯. স্ত্রীত্যাগ ও হিলা প্রথার তাৎপর্য কি ?

কেহ কেহ স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলিয়া থাকেন। এ কথাটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। অর্ধ-অঙ্গিনী বা সিকি-অঙ্গিনী না হইলেও আদিপুরুষ হজরত আদমের বাম পঞ্জরের অস্থি হইতেই নাকি প্রথমা নারী হাওয়া বিবি সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাই বিবি হাওয়াকে আদমের অঙ্গজ হিসাবে 'অঙ্গিনী' বলা খুবই সমীচীন। ইহা ছাড়া সংসার জীবনে নারীরা পুরুষদের একাংশ হিসাবেই বিরাজিতা।

মানুষের হস্তপদাদি কোন অঙ্গ রুগ্ন হইলে উহার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসা করান হয়। রোগ দুরারোগ্য হইলে ঐ রুগ্নাঙ্গ লইয়াই জীবন কাটাইতে হয়। রুগ্নাঙ্গ লইয়া জীবন কাটাইতে প্রাণহানির আশঙ্কা না থাকিলে কেহ রুগ্নাঙ্গ ত্যাগ করে না। স্ত্রী যদি স্বামীর অঙ্গই হয়, তবে দূষিতা বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করা হয় কেন? কোনরকম কায়ক্লেশে জীবনযাপন করা যায় না কি?

জবাব হইতে পারে যে, শখের বশবর্তী হইয়া কেহ কখনও স্ত্রীত্যাগ করে না। সাংসারিক বিশৃঙ্খলা ও মানসিক অশান্তি যখন চরমে পৌঁছে, তখনই কেহ কেহ স্ত্রীত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কথাটি কতকাংশে সত্য, কিন্তু যাহারা একাধিক স্ত্রী ত্যাগ করিয়া বাছা বাছা রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহারা কি কায়েমী বিবাহিতদের (হিন্দুদের) চেয়ে দাম্পত্যসুখে অধিক সুখী?

রসায়ন শাস্ত্রের (Chemistry) নিয়মে দুইটি পদার্থের মিশ্রণ ঘটাইতে হইলে পূর্বেই জানা উচিত যে, পদার্থ দুইটি মিশ্রণযোগ্য কি না। কেহ যদি জলের সহিত বালু বা খড়িমাটি মিশাইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চান, তাহা পারিবেন না। সাধারণত তৈল ও জল একত্র মিশে না। তবে উহা একত্র করিয়া বিশেষভাবে রগড়াইলে সাময়িকভাবে মিশিয়া পুনরায় বিযুক্ত হয়। কিন্তু চিনি বা লবণ জলে মিশাইলে উহা নির্বিঘ্নে এক হইয়া যায়। বিবাহ ব্যাপারে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনও এইরূপ একটি মিশ্রণ।

পাত্র ও পাত্রীর মৌলিক চরিত্রসমূহ শেষোক্ত পদার্থের ন্যায় মিশুক কি-না, তাহা বিচার না করিয়া জল-খড়ি ও তৈল-জল মিশ্রণের মত যথেচ্ছ মিলন প্রচেষ্টার বিফলতাই 'তালাক' প্রথার কারণ নয় কি?

এতদ্দেশে অনেক হিন্দুর ভিতর কোষ্ঠী বা ঠিকুজীর সাহায্যে বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের প্রচেষ্টা চলিতে দেখা যায়। মানুষের জন্মমুহূর্তে তিথি, লগ্ন ও রাশির সংস্থান এবং চন্দ্র, সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদির আকাশে বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠান জাতকের দেহ-মনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে আর এ বিষয়ে ফলিত জ্যোতিষ (Astrology)-এর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত কি না তাহা জানি না। কিন্তু ইহাতে অন্তত ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুগণ জানিতে চেষ্টা করেন যে, বিবাহে বর-কন্যার মিল হইবে কি না। মুসলমানদের বিবাহ প্রথায় পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে যদি কোনরূপ মনোবিজ্ঞানসম্মত বিচার প্রণালী উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করা যাইত, তাহা হইলে তালাক প্রথা এত অধিক প্রসার লাভ করিত না।

স্বামী ও স্ত্রীর মনোবৃত্তি বা স্বভাবের বৈষম্যবশতই যে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়, তাহা সুনিশ্চিত। তবে এই বৈষম্য দুই প্রকারে হইতে পারে। কোন ক্ষেত্রে হয়তো স্ত্রীই দোষী, কিন্তু স্বামী সাধু ও সচ্চরিত্র। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রী সচ্চরিত্রা, কিন্তু স্বামী অসচ্চরিত্র ও বদমায়েশ। ভালর সহিত মন্দের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই উপরোক্ত যে কোন ক্ষেত্রেই স্বামী ও স্ত্রীর মনোমালিন্য হইতে পারে এবং তাহাতে বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটিতে পারে। দোষ যাহারই হউক না কেন, বাহিরের লোক উহার বিশেষ কিছু জানিতে পায় না। কিন্তু পরিণাম উভয় ক্ষেত্রেই এক। অর্থাৎ স্ত্রীত্যাগ।

তালাকের ঘটনা যেভাবেই ঘটুক না কেন, ত্যাজ্যা স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণে স্ত্রী যে নির্দোষ, ইহাই প্রমাণিত হয়। মনে হয় যে, ক্রোধ, মোহাদি কোন রিপুর উত্তেজনায় স্বামী ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়াই অন্যায়ভাবে স্ত্রীত্যাগ করে এবং পরে যখন সম্বিৎ (জ্ঞান) ফিরিয়া পায়, তখন স্থিরমস্তিষ্কে সরলান্তকরণে ত্যাজ্যা স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। অর্থাৎ স্বামী যখন তাহার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারে, তখনই ত্যাজ্যা স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে অভিলষিত হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, স্ত্রীর উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া অথবা ক্রোধাদির বশবর্তী হইয়া স্ত্রীত্যাগে স্বামীই অন্যায়কারী বা পাপী। **অথচ পুনঃগ্রহণযোগ্যা নির্দোষ স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণে 'হিলা' প্রথার নিয়মে স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় সেই নির্দোষ স্ত্রীকেই। অপরাধী স্বামীর অর্থদণ্ড, বেত্রাঘাত ইত্যাদি না-ই হউক, অন্তত তওবা (পুনরায় পাপকর্ম না করিবার শপথ) পড়ারও বিধান নাই, আছে নিষ্পাপিনী স্ত্রীর ইজ্জতহানির ব্যবস্থা।** একের পাপে অন্যকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় কেন?

ত্যাগের পর স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্যবন্ধন থাকেনা বটে, কিন্তু দাম্পত্যভাবটি কি সহজেই তাহাদের হৃদয় হইতে মুছিয়া যায়? যদি যায়-ই, তবে হিলা প্রথার নিয়মানুসারে অস্থায়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(Temporary) কলেমাটি যে কোন লোকের সাথে বিশেষত পূর্বস্বামীর চাচা, ফুফা, মামার সহিত না হইয়া প্রায়ই ভগ্নিপতি বা ঐ শ্রেণীর কুটুম্বদের সহিত হয় কেন?

ত্যাগের পর স্বামী তাহার মস্তিষ্কের উত্তেজনা বা ক্রোধাদি বশত স্ত্রীর প্রতি কিছুদিন বীতস্পৃহ থাকিলেও সরলা স্ত্রী সহজে স্বামীরূপ হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যদি সে স্বামীর পুনঃগ্রহণের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহার হৃদয়পটে পূর্ব দাম্পত্য-জীবনের স্মৃতি আরও গাঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। এমতাবস্থায় স্ত্রী পূর্বস্বামীর পুনঃগ্রহণের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দেয়। কিন্তু ইহার পরে হিলাকৃত নবীন দুলহার অস্থায়ী কলেমার ইজাব (সম্মতি) দেওয়াটি কি তাহার আন্তরিক?

হিলা প্রথায় বর নির্বাচনে বেশ একটু কারসাজী আছে। বয়স্কা হইলেও হিলাকৃত বর নির্বাচনে স্ত্রীর কোন অধিকার থাকে না, নির্বাচনকর্তা সর্বক্ষেত্রেই পূর্বস্বামী। প্রথমত সে বিচার করে যে, সিন্দুকের চাবি কাহার হস্তে দেওয়া উচিত। নবীন দুলহা তাহার হাতের লোক কি-না। সে তাহার নির্দেশমত সময়োচিত কাজ করিবে কি না। সর্বোপরি লক্ষ্য রাখা হয় যে, নবদম্পতির মধ্যে ভালবাসা জন্মিতে না পারে।

এইরূপ হিসাব মিলাইয়া প্রাক্তন স্বামীর দ্বারা বর নির্বাচিত হইলে, সেই বিবাহকালীন স্ত্রীর ইজাব বা সম্মতির কোন মূল্যই থাকিতে পারে না বা থাকে না। স্ত্রী সম্মতি যাহা দিল তাহা তাহার পূর্ব-স্বামী লাভের জন্য, হাল স্বামীর জন্য নয়। অর্থাৎ সে জানে যে, তাহার এই বিবাহ মাত্র একদিনের জন্য এবং এই বিবাহের মাধ্যমেই হইবে তাহার পূর্বস্বামী লাভ। তখন সে মনে মনে এই সিদ্ধান্তই করে —

"মোর বাড়ী আর স্বামীর বাড়ী, মধ্যখানে নদী —
কেমনে যাব, এই খেওয়া পার না হই যদি?"

ফলত স্ত্রী মুখে ইজাব দিল নূতন দুলহার আর অন্তরে কামনা করিল পূর্বস্বামীকে।

অতঃপর বাসর ঘর। এখানে নবীন দুলহার অত্যাচার সহ্য না করিলে শাস্ত্রমতে স্ত্রীর মুক্তির উপায় নাই। কাজেই — মান-অভিমান, লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়া স্ত্রী প্রভাতের অপেক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু তাহার হৃদয় পূর্বস্বামীর উদ্দেশ্যে ব্যাকুলস্বরে গাহিতে থাকে —

"হয়ে তব অভিলাষী আমি এখন কারাবাসী,
বুকে মম চাপিল পাষাণ।
জানিনা মোর কি-বা পাপ, কি কারণ এই পরিতাপ,
হবে না কি নিশি অবসান?"

নবদম্পতির এইরূপ মিলন ব্যভিচারের নামান্তর নয় কি?

০ ০ ০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপসংহার

মানুষের মনে জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। কোনও না কোন বিষয়ে কোনও না কোন রকমের জিজ্ঞাসা প্রত্যেকের মনেই আছে, যেমন আপনার, তেমন আমার। অসংখ্য জিজ্ঞাসার মধ্যে মাত্র কতিপয় জিজ্ঞাসা এই পুস্তকখানিতে আমরা প্রশ্নাকারে ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু ইহা শুধু আমাদেরই প্রশ্ন নহে। যে সকল চিন্তাশীল মনীষী জীব ও জগত বিষয়ক ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করেন, হয়তো তাঁহাদের মনেও অনুরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু অনেকেই তাহা প্রকাশ করেন না। হয়ত কেহ তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলে দুই-চারিটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, কেহবা অন্তরে চাপিয়া রাখেন।

বর্তমান যুগটি বিজ্ঞানের যুগ এবং যুক্তিবাদেরও। বিজ্ঞান পৃথিবীর বুকে আত্মশক্তি বা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, কাহারও অনুকম্পায় নয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মিটাইতেছে বিজ্ঞান। আপনি যদি বিজ্ঞানের দান গ্রহণে সম্মত করেন, তাহা হইলে আকাশের দিকে তাকান, ঘড়ির দিকে নয়। আপনি যদি বিজ্ঞানের দান গ্রহণ করিতে না চাহেন, তাহা হইলে যানবাহনে বিদেশ সফর ও জামা-কাপড় ত্যাগ করুন এবং কাগজ-কলমের ব্যবহার ও পুস্তক পড়া ত্যাগ করিয়া মুখস্থ শিক্ষা শুরু করুন। ইহার কোনটি করা আপনার পক্ষে সম্ভব? বোধহয় একটিও না। কেননা মানব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞানের দান অনস্বীকার্য। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন হইতে শুরু করিয়া দেশলাই ও সূচ-সুতা পর্যন্ত সবই বিজ্ঞানের দান। বিজ্ঞানের কোন দান গ্রহণ না করিয়া মানুষের এক মুহূর্তও চলে না। মানুষ বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। কিন্তু সমাজে এমন একশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা হাতে ঘড়ি ও চক্ষে চশমা আঁটিয়া মাইকে বক্তৃতা করেন আর 'বস্তুবাদ' বলিয়া বিজ্ঞানকে ঘৃণা ও 'বস্তুবাদী' বলিয়া বিজ্ঞানীদের অবজ্ঞা করেন। অথচ তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ভাববাদীরা বস্তুবাদীদের পোষ্য। বিজ্ঞান মানুষকে পালন করে। কিন্তু ধর্ম মানুষকে পালন করে না, বরং মানুষ ধর্মকে পালন করে এবং প্রতিপালনও। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান-বিরোধী কোন শিক্ষাই গ্রহণীয় নয়।

আধুনিককালের অধিকাংশ মানুষ চায় কুসংস্কার হইতে মুক্তি, চায় সত্যের সন্ধান। ধর্মরাজ্যের যত্রতত্র অল্পাধিক কুসংস্কার স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে। আবার সভ্য মানব সমাজে এমন কোন মানুষ নাই, যিনি কোনও না কোন ধর্মের আওতাভুক্ত নহেন। কাজেই এরূপ মানুষও অল্পই আছেন, যাঁহাদের কোনরূপ কুসংস্কার স্পর্শ করে নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৈদিক, পারসিক ও ইহুদী ইত্যাদি আদিম জাতি (ধর্ম)-গুলির কল্পিত দেব-দেবী, দৈত্য-দানব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূত-পিশাচ, ডাকিনী-যোগিনী, শীতলা, ওলা, পেত্নী, ইত্যাদি জীবসমূহের কোন অস্তিত্ব জগতে পাওয়া যায় না। অথচ ঐগুলির সত্যতা ও চরিত্র সম্বন্ধে সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের আস্থা কম নয়। হয়ত কোন এক সময়ে ঐগুলিকে 'সত্য' বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু বর্তমানে উহারা 'মিথ্যা' বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এখন ঐগুলিকে ত্যাগ ও প্রমাণিত 'সত্য'কে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। কোন রকম গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় না দিয়া প্রত্যেক ধর্মকে যথাসম্ভব কুসংস্কারমুক্ত করা উচিত। কুসংস্কার ত্যাগ করার অর্থ 'ধর্মকে ত্যাগ করা' নহে। **যদি কেহ কুসংস্কার ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন এবং বলিতে চাহেন যে, কুসংস্কার ত্যাগ করিলে ধর্ম থাকিবে না, তাহা হইলে মনে আসিতে পারে যে, ধর্মরাজ্যে কি কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নাই?** এ প্রসঙ্গে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। আমাদের অভিযান শুধু অসত্য বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, কোন ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। প্রত্যেকটি ধর্ম থাকিবে মিথ্যার আবর্জনাবর্জিত ও পবিত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

'সত্যের সন্ধান' পুস্তকখানি পাঠ করিয়া স্বাধীন চিন্তাবিদ বন্ধুগণ সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিকভাবে আমাদের মতবাদ অনুধাবন করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস। এ বিষয়ে আমরা স্বাধীন চিন্তাশীল মনীষীদের মূল্যবান মতামতের প্রত্যাশী। আপনারা আপনাদের চিন্তালব্ধ মতামতসমূহ আমাদিগকে জানাইলে এবং অত্র পুস্তকখানির ত্রুটি প্রদর্শনপূর্বক উহা সংশোধনের উপদেশ দান করিলে বাধিত হইব।

আমাদের মনে হয় যে, এমন অনেক চিন্তাশালীও আছেন, যাঁহাদের নিকট এই পুস্তকে লিখিত প্রশ্নগুলি অতিশয় তুচ্ছ। হয়ত তাঁহাদের নিকট প্রশ্নগুলির সমাধান অজ্ঞাত নহে। তাঁহাদের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন এই প্রশ্নগুলির যথাযোগ্য সমাধান ও ব্যাখ্যা সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। করিলে আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

পরিশেষে, এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে সমস্ত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, উহার গ্রন্থকার মহোদয়গণের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

বিনীত

গ্রন্থকার

গ্রাম : লামচরি

ডাকঘর : চরবাড়িয়া

জিলা : বরিশাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টীকা

টীকার নম্বর	পুস্তকের নাম	গ্রন্থকারের নাম	পৃষ্ঠা বা অনুচ্ছেদ
১.	পবিত্র কোরান (সুরা সেজ্‌দা)	—	১ ; ৪
২.	সরল বাংলা অভিধান	সুবলচন্দ্র মিত্র	৩০০
৩.	মানব মনের আযাদি	আবুল হাসানাৎ	৬৭
৪.	পৃথিবীর ঠিকানা	অমল দাসগুপ্ত	৪৪
৫.	পৃথিবীর ঠিকানা	অমল দাসগুপ্ত	১৫০, ১৫১
৬.	সরল বাংলা অভিধান	সুবলচন্দ্র মিত্র	৮৭২
৭.	সরল বাংলা অভিধান	সুবলচন্দ্র মিত্র	২৫১
৮.	আদিপুস্তক (তৌরিত)	—	২ ; ৮—১৪
৯.	পৃথিবীর ঠিকানা	অমল দাসগুপ্ত	১০২
১০.	বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন	মু. আ. হাই	১৪১, ১৪২
১১.	নক্ষত্র পরিচয়	প্রমথনাথ সেনগুপ্ত	১৪,১৬
১২.	মহাকাশের ঠিকানা	অমল দাসগুপ্ত	৯৫
১৩.	পৃথিবীর ঠিকানা	অমল দাসগুপ্ত	১০
১৪.	খগোল পরিচয়	মো. আ. জব্বার	৩০৭
১৫.	খালেদ ইবনে অলীদ	মওলানা আখতার ফারুকী	২২৪, ২২৫
১৬.	গ্রহ-নক্ষত্র	জগদানন্দ রায়	২৫৪, ২৫৫
১৭.	নক্ষত্র পরিচয়	প্রমথনাথ সেনগুপ্ত	১৪, ১৫
১৮.	সরল বাংলা অভিধান	সুবলচন্দ্র মিত্র	৬৯১
১৯.	জীব-জগতের জন্মকথা	আ. হক খোন্দকার	১৩
২০.	আদিপুস্তক (তৌরিত)	—	৫ ; ৩—২৮ ও ৭ ; ৬
২১.	আদিপুস্তক (তৌরিত)	—	৭ ; ১২
২২.	আদিপুস্তক (তৌরিত)	—	৬ ; ১৫ ও ৭ ; ৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩.	ম্যাজিকের খেলা	পি. সি. সরকার	১৬—২২
২৪.	ঐতিহাসিক অভিধান	মো. মতিয়র রহমান	২
২৫.	যাত্রাপুস্তক (তৌরিত)	—	১২ ; ৩০—৩৩ ও ৩৭
২৬.	যাত্রাপুস্তক (তৌরিত)	—	১২ ; ৩১, ৩২ ও ৩৬
২৭.	যাত্রাপুস্তক (তৌরিত)	—	১৪ ; ২১
২৮.	যাত্রাপুস্তক (তৌরিত)	—	১৪ ; ২৭
২৯.	যাত্রাপুস্তক (তৌরিত)	—	১১ ; ১৬—১৯
৩০.	ঐতিহাসিক অভিধান	মো. মতিয়র রহমান	৫
৩১.	সরল বাংলা অভিধান	সুবলচন্দ্র মিত্র	৫০৫
৩২.	ঐতিহাসিক অভিধান	মো. মতিয়র রহমান	১৩
৩৩.	লুক (ইঞ্জিল)	—	১ ; ৫—৭
৩৪.	ঐতিহাসিক অভিধান	মো. মতিয়র রহমান	২৩, ২৪
৩৫.	মথি (ইঞ্জিল)	—	২ ; ১৪—২৩
৩৬.	লেবীয় পুস্তক (ইঞ্জিল)	—	২৪ ; ১৭
	দ্বিতীয় বিবরণ (ইঞ্জিল)	—	২২ ; ২৩, ২৪, ২৮, ২৯
৩৭.	পৃথিবীর ইতিহাস	দেবীপ্রসাদ	১৬২—১৬৪
৩৮.	পবিত্র কোরান (সুরা নেছা)	—	২ ; ১৩
৩৯.	পবিত্র কোরান (সুরা নেছা)	—	২ ; ১৪
৪০.	আল সিরাজী ফিল মিরাস	সিরাজউদ্দিন মুহাম্মদ	২০
৪১.	আদিপুস্তক (তৌরিত)	—	৫ ; ৫
৪২.	ঐতিহাসিক অভিধান	মো. মতিয়র রহমান	২
৪৩.	প্রাচীন মিশর	শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯,১৮৭,১৮৮
৪৪.	পৃথিবীর ইতিহাস	দেবীপ্রসাদ	১৩৫, ১৩৬, ২৮১, ৩০৮, ৩২৮
৪৫.	আদিপুস্তক (তৌরিত)	—	২ ; ৮—১০
৪৬.	আদিপুস্তক (তৌরিত)	—	৩ ; ৮
৪৭.	পৃথিবীর ইতিহাস	দেবীপ্রসাদ	১৩৫—১৩৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুমান

রচনাকাল ১৩. ৪. ১৩৮৮ — ৮. ৩. ১৩৮৯

প্রকাশকাল কার্তিক ১৩৯০

WWW.AMARBOI.COM

প্রচ্ছদশিল্পী গ্রন্থকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

অনুমান করে কথা বললে লোকে তা বিশ্বাস করতে চায় না, চায় যুক্তি ও প্রমাণ। কিন্তু বলবার সাথে সাথে সকল কথা প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। কেননা হাটে-বাজারে ও পথে-ঘাটে লোকে তো কতো কথাই বলে থাকে, সংগে তো কারো কোন প্রমাণপত্র থাকে না। তবে বক্তব্যের যুক্তিটা থাকা দরকার সর্বত্রই। কোনো তত্ত্বমূলক বিষয়ে তো নয়ই, যুক্তিহীন (আন্দাজী) কথা বাজারেও চলে না। তাই আমি যুক্তির সাহায্যে কতিপয় বিষয়ের সত্যের সন্ধান করতে চেয়েছিলাম এবং সে জন্য লিখেছিলাম 'সত্যের সন্ধান' নামীয় একখানা পুস্তিকা ১৩৫৮ (১৯৫১) সালে। আর তার অপর একটি নামও দিয়েছিলাম 'যুক্তিবাদ'। পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই 'যুক্তিবাদ'-এর কঠিন দেয়াল ডিঙিয়ে আমাকে নেয়া হয়েছিলো পবিত্র হাজতখানায়। তাই এবারে 'সত্যের সন্ধান' না করে মিথ্যার সন্ধান করতে চেষ্টা করছি এবং 'যুক্তিবাদ'-এর আশ্রয় না নিয়ে আমি আশ্রয় নিচ্ছি 'অনুমান'-এর। তাই এ পুস্তিকাখানার নামকরণ করা হলো — মিথ্যার সন্ধানে 'অনুমান'। এতে যুক্তিবাদের কঠিন দেয়াল নেই, আছে স্বচ্ছ কাঁচের আবরণ।

মূলত 'অনুমান' তুচ্ছ বিষয় নয়। এর আশ্রয় না নিয়ে মানুষের এক মুহূর্তও চলে না। অনুমান করবার শক্তি ক্ষীণ বলেই ইতর প্রাণী মানুষের চেয়ে এত পিছনে এবং মানুষ এত অগ্রগামী তার অনুমান করবার শক্তি প্রবল বলেই। ভবিষ্যতের চিন্তা মাত্রেই অনুমান, কতক অতীতেরও। আর ভবিষ্যৎ ও অতীত বিষয়ের চিন্তা ও অনুমান করতে পারে বলেই মানুষ 'মানুষ' হতে পেরেছে।

'অনুমান'-এর বাস্তব ও অবাস্তব দু'টি রূপ আছে। তবে 'ভবিষ্যৎ' যাবত 'বর্তমান'-এ পরিণত না হয়, তাবৎ সে 'রূপ' ধরা পড়ে না। আবার এমন অনুমানও আছে, যার বাস্তব রূপ কোনো কালেই ধরা পড়তে চায় না।

'পরমেশ্বর' বলে কেউ আছেন কি-না, এ প্রশ্নটির মীমাংসা অনুমানসাপেক্ষ। প্রশ্নটি অতীতেও ছিলো, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবে ; সুমীমাংসা হয়নি আজও, হয়তো হবেও না কোনোদিন। মীমাংসা হলে — আস্তিক ও নাস্তিক, এ দু'টো সম্প্রদায় থাকতো না বা থাকবে না। কিন্তু সে আশা দুরাশা মাত্র।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু খবর আজ আমরা পাচ্ছি — ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে। আবার কতক খবর জানা যায় কেচ্ছা-কাহিনী ও পৌরাণিক পুঁথি-পত্তরের মাধ্যমে। কিন্তু বহু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রেই কাহিনীকাররা ঘটনার বাস্তব রূপটি পরিবেশন করেননি। পৌরাণিক কতোগুলো কাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বহু ক্ষেত্রে অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন কাহিনীকারগণ তাদের গোষ্ঠীগত স্বার্থের কারণেই। সে সমস্ত কাহিনীর বাস্তবরূপ অনুধাবন করার একমাত্র উপায় 'অনুমান'। আর তারই সামান্য চেষ্টা করা হয়েছে এ পুস্তিকাখানার মাধ্যমে।

এ পুস্তিকাখানায় উল্লিখিত প্রসঙ্গসমূহে আরোপিত আমার অনুমানগুলো যে অন্য কারো অনুমানের সাথে মিলবে, এমন আশা আমি করি না। তবে প্রিয় পাঠকবৃন্দের কাছে আমার অনুরোধ যে, তাঁরা যেনো আমার আলোচ্য বিষয়সমূহ নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন এবং ওগুলোর যাথার্থ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন।

এ পুস্তিকাখানা প্রণয়নে আমাকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা দান করেছে শিক্ষামোদী তরুণ যুবক প্রিয় মো. ফিরোজ সিকদার। আমি তার উন্নত জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

রচনাকালীন আমার এ লেখাগুলোর প্রতিটি শব্দ ধন্য হয়েছে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেবের শুভদৃষ্টির পরশে। কিন্তু সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি না। কেননা আমার লেখার কলমটাই তাঁর।

এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানার মুদ্রণকালে যথারীতি প্রুফ সংশোধনের অভাবে এতে ভুলের পরিমাণ এতই বেশী রয়ে গেলো যে, শুদ্ধিপত্রেও তা শুদ্ধ হবার নয় এবং তা একান্তই লজ্জাকর। প্রিয় পাঠকবৃন্দের বিরক্তিজনক সে সব ভুলের জন্য তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই।

AMARBOI.COM

লামচরি
৭ কার্তিক ১৩৯০

বিনীত
গ্রন্থকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুমান

সূচী

রাবণেরপ্রতিভা	১৪৩
ফেরাউনের কীর্তি	১৫০
ভগবানের মৃত্যু	১৫৫
আধুনিক দেবতত্ত্ব	১৫৯
মে'রাজ	১৬৫
শয়তানের জবানবন্দি	১৭৯
সমাপ্তি	১৯৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাবণের প্রতিভা

রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক রামচন্দ্র রাজপুত্তুর, ধর্মপরায়ণ, বীর, ধীর, সুসভ্য, সুকান্ত, জ্ঞানী, গুণী ইত্যাদি শত শত গুণাত্মক বিশেষণে ভূষিত। পক্ষান্তরে রাবণ — বিকলাঙ্গ (দশমুণ্ড), স্বৈরাচারী, অসভ্য, রাক্ষস, কামুক ইত্যাদি শত শত দোষাত্মক বিশেষণে দুষ্ট। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? হয়তো আর্য-ঋষি বাল্মীকি — আর্যপ্রীতি ও অনার্যবিদ্বেষ বশত শ্রীরামকে প্রদীপ্ত ও রাবণকে হীনপ্রভ করার মানসে একের প্রোজ্জ্বল ও অন্যের মসিময় চিত্র অংকিত করেছেন নিপুণ হস্তে রামায়ণের পাতায়। কিন্তু তাঁর তুলির আঁচড়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ পাচ্ছে রাবণের কৌলিন্য, শৌর্য-বীর্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আর্শি-কান্তির ছিটেফোঁটা ; যার ঔজ্জ্বল্য রামচরিত্রের উজ্জ্বলতার চেয়ে বহুগুণ বেশী।

রামচন্দ্র ছিলেন ক্ষত্রকুলোদ্ভব, চার বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণের মানুষ। সেকালের ক্ষত্রিয়রা ছিলো বংশগত যোদ্ধা, অর্থাৎ নরঘাতক। আর রাবণ ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশীয়। এ কথাটা শুনে রামভক্ত হিন্দু ভাইয়েরা হয়তো আঁতকে উঠতে পারেন। 'ব্রাহ্মণ'-এর সাধারণ সংজ্ঞা হলো — ব্রহ্মাংশে জন্ম যার, অথবা বেদ জানে যে, কিংবা বেদ অধ্যয়ন করে যে, নতুবা ব্রহ্মের উপাসনা করে যে — সে-ই ব্রাহ্মণ। ঋষিগণ সর্বত্রই উক্ত গুণের অধিকারী। তাই ঋষি মাত্রেই ব্রাহ্মণ। রাবণের দাদা পুলস্ত্য ছিলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং স্বনামধন্য ঋষি। কাজেই তিনি ছিলেন বংশে ও গুণে উভয়ত ব্রাহ্মণ। পুলস্ত্য ঋষির পুত্র অর্থাৎ রাবণের পিতা বিশ্রবাও ছিলেন একজন বিশিষ্ট ঋষি। কাজেই তিনিও ছিলেন বংশগত ও গুণগত ব্রাহ্মণ। তাই ব্রাহ্মণ ঋষি বিশ্রবার পুত্র রাবণ গুণগত না হলেও কুলগত ব্রাহ্মণ ছিলেন নিশ্চয়ই। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত আলোচনাসমূহে রাম ও রাবণের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার তুলনামূলক কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে।

১. রাবণের রাজমহলকে (কখনো লঙ্কাকেও) বলা হয়েছে 'স্বর্ণপুরী'। এতে রাবণের ঐশ্বর্য, শিল্প-নিপুণতা, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, রুচিবোধ ইত্যাদি বহু গুণের পরিচয় মেলে। কিন্তু রামচন্দ্রের বাড়িতে এমন কিছুর উল্লেখ দেখা যায় না, যার দ্বারা তাঁর ওসব গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

২. লঙ্কায় সীতাদেবী রক্ষিতা হয়েছিলেন রাবণের তৈরী অশোক কাননে। তা ছিলো রাবণের প্রমোদ উদ্যান, যেমন আধুনিক কালের ইডেন গার্ডেন। সে বাগানটিতে প্রবেশ করলে কারো শোকতাপ থাকতো না। তাই তার নাম ছিলো অশোক কানন। সে বাগানটির দ্বারা রাবণের সুরুচি ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকন্তু তিনি যে একজন উদ্ভিদবিদ্যা বিশারদ ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা–ও জানা যায়। আর তার প্রমাণ মেলে একালের সুপ্রসিদ্ধ খনার বচনে। খনা বলেছেন —

"ডেকে কয় রাবণ,
কলা–কচু না লাগাও শ্রাবণ।"

শত শত জাতের ফল–ফুল ও লতাগুল্মের বৃক্ষরাজির একস্থানে সমাবেশ ঘটিয়ে তা লালন–পালন ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু জানা যায় না রামচন্দ্রের বাড়িতে কোনো ফুল–ফলের গাছ আদৌ ছিলো কি–না।

৩. রামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়েছিলেন কপিকুলের (বানরের) সাহায্যে মাটি–পাথর কেটে বাঁধ নির্মাণ করে, দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায়। কিন্তু লঙ্কা থেকে ভারতের দণ্ডকারণ্য তথা পঞ্চবটী বনে রাবণ যাতায়াত করেছিলেন 'পুষ্পক' নামক বিমানে আরোহণ করে অতি অল্প সময়ে। রাবণ যে একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বা বৈমানিক এবং কারিগরিবিদ্যা–বিশারদ ছিলেন, তা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ ক্ষেত্রে রাবণের সহিত শ্রীরামের তুলনাই হয় না।

৪. রামচন্দ্র যুদ্ধ করেছেন সেই মান্ধাতার আমলের তীর–ধনু নিয়ে। আর রাবণ আবিষ্কার করেছিলেন এক অভিনব যুদ্ধাস্ত্র, যার নাম 'শক্তিশেল'। তা শক্তিতে ছিলো যেনো বন্দুকের যুগের ডিনামাইট। নিঃসন্দেহে এতে রাবণের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় মেলে।

৫. রামচন্দ্রের নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে রাবণের মুমূর্ষু সময়ে তাঁর কাছে গিয়ে রামচন্দ্র রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর উপদেশপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তিনি রামচন্দ্রের সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন ধীর ও শান্তভাবে, সরল মনে। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাবণ সে যুগের একজন রাজনীতি–বিশারদ ছিলেন। অধিকন্তু ছিলেন ধীর, সহন ও ক্ষমাশীল এবং প্রতিহিংসাবিমুখ এক মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

৬. রামায়ণ মহাকাব্যে রাবণকে বলা হয়েছে 'দশানন'। কিন্তু বাস্তবে রাবণের দশটি মুণ্ডু নিশ্চয়ই ছিলো না। তবে তাঁর মাথার মজ্জা অর্থাৎ জ্ঞান ছিলো দশটা মুণ্ডের সমান। তা–ই রূপকে বিদ্রূপে অংকিত হয়েছে 'রাবণ দশমুণ্ডু' রূপে।

৭. রাক্ষস বা নরখাদক বলা হয়েছে রাবণকে। উপরোক্ত আলোচনাসমূহের পরে এ বীভৎস বিশেষণটি সম্বন্ধে আর কিছু সমালোচনা আবশ্যক আছে বলে মনে হয় না। তবুও প্রিয় পাঠকবৃন্দের কাছে একটি প্রশ্ন না রেখে পারছি না। রাবণের দাদা হচ্ছেন পুলস্ত্য, পিতা বিশ্রবা, ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবের এবং পুত্র ইন্দ্রজিৎ (প্রসিদ্ধ বৈমানিক) ; এঁরা সকলেই ছিলেন সভ্য, ভব্য, সুশিক্ষিত, গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি। এঁরা কেউই 'রাক্ষস' বা কাঁচামাংসভোজী মানুষ ছিলেন না। রাবণও তাঁর শৈশবকালাবধি মাতা–পিতার রান্না করা খাবারই খেয়েছেন নিশ্চয়। অতঃপর যৌবনে হঠাৎ করে একদিন তিনি খেতে শুরু করলেন জীবের কাঁচা–মাংস! বিমান বিহার, শক্তিশেল নির্মাণ ও অশোক কানন তৈরী করতে জানলেও তিনি রান্নার পাকপাত্র গড়তে বা রান্না করতে জানেন নি। বেশ ভাল। কিন্তু তিনি কোথায় বসে, কোন দিন, কাকে খেয়েছেন — তার একটিরও নামোল্লেখ নাই কেন?

৮. রাবণের সন্তানাদি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে —

"একলক্ষ পুত্র আর সোয়ালক্ষ নাতি,
একজন না থাকিল বংশে দিতে বাতি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর অপর একটি প্রবাদ আছে —

"যাহা কিছু রটে
তার কিছু বটে।"

প্রবাদবাক্যের লক্ষ পুত্র না হোক তার শতাংশ সত্য হলেও রাবণের পুত্রসংখ্যা হয় এক হাজার এবং তার অর্ধাংশ সত্য হলেও সে সংখ্যাটি হয় পাঁচশ'। আর তা-তো বিস্ময়ের কিছু নয়। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রও ছিলেন একশ' এক পুত্রের জনক। আর রাম? তাঁর পুত্রের সংখ্যা কথিত হয় মাত্র দু'টি, বলা চলে একটি। কেননা তারা ছিল সীতার এক গর্ভজাত, যমজ সন্তান। তদুপরি সে পুত্রযুগল জন্মেছিলো নাকি রামচন্দ্রের বিবাহের তেপ্পান্ন বছর পর (বাস্তব ১২ + ১৪ = ২৬ বছর পর)। বছরের এ হিসেবটা প্রিয় পাঠকদের কাছে একটু বেমানান বোধ হতে পারে। তাই বছরগুলোর একটা হিসাব দিচ্ছি। বিবাহান্তে রামচন্দ্র গৃহবাসী ছিলেন ১২ বছর, বনবাসী ১৪ বছর এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করে রাজাসনে কাটান নাকি ২৭ বছর (ঐ ২৭ বছর উদ্দেশ্যমূলক, কাল্পনিক)। এর পর 'কলঙ্কিনী' বলে প্রাথমিক অন্তঃসত্ত্বা সীতাদেবীকে নির্বাসিত করা হয় বাল্মীকির তপোবনে, সেখানে জন্মে সীতার যুগল সন্তান কুশ ও লব।

সীতাদেবী বন্ধ্যা ছিলেন না এবং উক্ত তেপ্পান্ন বছরের মধ্যে বনবাসকালের দশ মাস (অশোক কাননে রাবণের হাতে সীতা বন্দিনী ছিলেন ১০ মাস) ছাড়া বায়ান্ন বছর দু'মাস সীতা ছিলেন রামচন্দ্রের অঙ্কশায়িনী। তথাপি এ দীর্ঘকাল রতিবিরতি রামচন্দ্রের বীর্যহীনতারই পরিচয়, নয় কি?

৯. রামচন্দ্রের কাহিনীকারের মতে চৌদ্দ বছর বনবাসান্তে রামচন্দ্র দেশে প্রত্যাবর্তন করে নির্বিঘ্নে সংসারধর্ম তথা রাজ্যশাসন করেছিলেন দীর্ঘ ২৭ বছর। অতঃপর প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো। কেননা লঙ্কার অশোক কাননে বন্দিনী থাকাকালে রাবণ সীতাদেবীর সতীত্ব নষ্ট করেছিলেন এবং অসতী সীতাকে গৃহে স্থান দেওয়ায় প্রজাগণ ছিলো অসন্তুষ্ট।

উপরোক্ত বিবরণটি শুনে স্বতই মনে প্রশ্নের উদয় হয় যে, মরার দু'যুগের পরে কান্না কেন? বনবাসান্তে রামচন্দ্র স্ববাসে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর বনবাসের বিবরণ তথা লঙ্কাকাণ্ড দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিলো তাঁর দেশে ফেরার সংগে সংগেই এবং সীতাকলঙ্কের কানাকানিও চলছিলো দেশময় তখন থেকেই। আর গুজবের ভিত্তিতে সীতাদেবীকে নির্বাসিত করতে হলে তা করা তখনই ছিলো সঙ্গত। দীর্ঘ ২৭ বছর পর কেন?

রামচন্দ্র সীতাদেবীকে গৃহত্যাগী করেছিলেন শুধু জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য, স্বয়ং তাঁকে নাকি 'নিষ্কলঙ্কা' বলেই জানতেন। এইরূপ পরের কথায় নিষ্কলঙ্কা স্ত্রী ত্যাগ করার নজির জগতে আছে কি? এই তো সেদিন (১৯৩৬) গ্রেট বৃটেনের সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড মিসেস সিম্পসনকে সহধর্মিনী করতে চাইলে তাতে বাধ সাধলো দেশের জনগণ তথা পার্লামেন্ট 'মিসেস সিম্পসন হীনবংশজাত' বলে। পার্লামেন্ট এডোয়ার্ডকে জানালো যে, হয় মিসেস সিম্পসনকে ত্যাগ করতে হবে, নচেৎ তাঁকে ত্যাগ করতে হবে সিংহাসন। এতে এডোয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ করলেন, কিন্তু তাঁর প্রেয়সীকে ত্যাগ করলেন না। শুধু তা-ই নয়, তাঁর মেঝ ভাই ডিউক-অব-ইয়র্ককে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিংহাসন দিয়ে তিনি সস্ত্রীক রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন বিদেশে। রামচন্দ্রেরও তো মেঝ ভাই ছিলো!

সীতাদেবীর সতীত্ব রক্ষার জন্য রামায়ণের কাহিনীকার চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। যেখানে তিনি লৌকিক অবলম্বন খুঁজে পাননি, সেখানে অলৌকিকের আশ্রয় নিয়েছেন। দু'-একটি উদাহরণ দিচ্ছি —

ক. রাবণের অশোক বনে সীতার সতীত্ব রক্ষার কোনো অবলম্বন তিনি খুঁজে পাননি। তাই সেখানে বলেছেন যে, জোরপূর্বক কোনো রমণীর সতীত্ব নষ্ট করলে রাবণের মৃত্যু হবে, এই বলে কোনো ঋষি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কাজেই মৃত্যুভয়ে রাবণ সীতাকে স্পর্শ করেননি। সুতরাং সেখানে সীতার সতীত্ব বেঁচে আছে।

খ. সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় পৌছুলে সেখানে যখন সীতাকলঙ্কের ঝড় বইছিলো, তখন বলেছেন যে, সীতাদেবীকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে তাঁর সতীত্বের পরীক্ষা করা হয়েছিলো, তাতে তাঁর কেশাগ্রও দগ্ধ হয়নি। সুতরাং সীতার সতীত্ব বেঁচে আছে।

গ. বহুবছর বাল্মীকির তপোবনে কাটিয়ে শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞে কুশ-লবসহ বাল্মীকির সাথে সীতাদেবী রামপুরীতে উপস্থিত হলে পুনঃ যখন তিনি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে থাকেন, তখন কবি বলেছেন যে, সীতাদেবীর অনুরোধে ধরণী দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিলো এবং সীতাদেবী সে গর্তমধ্যে প্রবেশ করে স্বর্গে বা পাতালে গিয়েছেন ইত্যাদি।

উপরোক্ত ঘটনাগুলো হয়তো এরূপও ঘটে থাকতেও পারে। যথা —

ক. রাবণের রূপলাবণ্য ও শৌর্যবীর্য দর্শনে প্রীতা হয়ে সীতাদেবী রাবণকে স্বেচ্ছায় করেছেন দেহদান এবং তাঁকে রাবণ করেছেন বীর্যদান। সীতাদেবীর প্রতি রাবণ বলপ্রয়োগ করেন নি, তাই তিনি মরেননি। হয়তো এমনও হতেও পারে যে, **রাবণ যেদিন সীতার প্রতি বলপ্রয়োগ করেছেন, সেদিন তিনি রামের হাতে মরেছেন। আর সেইদিন সীতাদেবী হয়েছেন অন্তঃসত্ত্বা।**

খ. সীতাদেবীকে নিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় পৌছুলে লঙ্কাকাণ্ড প্রকাশ হওয়ায় সেখানে তখন সীতাকলঙ্কের ঝড় বইছিলো নিশ্চয়ই। হয়তো সীতার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য প্রথমত জেরা-জবানবন্দি, কটূক্তি, ধমকানি-শাসানি ও পরে মারপিট ইত্যাদি শারীরিক নির্যাতন চালানো হচ্ছিলো তাঁর প্রতি। কিন্তু তিনি নীরবে সহ্য করেছিলেন সেসব নির্যাতন, ফাঁস করেননি কভু আসল কথা। আর সেটাই হচ্ছে সীতার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

গ. **শ্রীরামের রাজপ্রাসাদে সীতা প্রসঙ্গে অতঃপর থমথমে ভাব বিরাজ করছিলো কিছুদিন (২৭-২৮ দিন বা এক রজোমাস যাকে বলা হয় ২৭ বছর)। পরে সীতাদেবীর মাসিক পরিক্রমায় রামচন্দ্র যখন আসল খবর পেয়েছিলেন, তখনই তিনি অন্তঃসত্ত্বা সীতাদেবীকে নির্বাসিতা করেছিলেন বাল্মীকির তপোবনে এবং সেখানে জন্মেছিলো তাঁর যুগল সন্তান কুশ-লব।**

সন্তান কামনা করে না, এমন কোনো লোক বা জীব জগতে নেই। কারো সন্তান না থাকলে তার দুঃখের অবধি থাকে না; বিশেষত ধনিক পরিবারে। আর রাজ্যেশ্বর রামচন্দ্রের বৈবাহিক জীবনের দীর্ঘ ২৬ বছর পরে আসন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তান পরিত্যাগ করলেন শুধু কি প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য? নিশ্চয়ই তা নয়। তিনি জানতেন যে, সীতার গর্ভস্থ সন্তান তাঁর ঔরসজাত নয়, ঔরসজাত রাবণের। আর সঙ্গত কারণেই সীতার গর্ভজাত সন্তানের প্রতি তাঁর কোনো মায়ামমতা ছিলো না, বরং ছিলো ঘৃণা ও অবজ্ঞা। তাই তিনি সীতা-সুতের কোনো খোঁজখবর নেননি বহু বছর যাবত। বিশেষত ঋষি বাল্মীকির আশ্রম অযোধ্যা থেকে বেশি দূরেও ছিলো না, সে আশ্রম তিনি চিনতেন।

অতঃপর সীতাসহ কুশ-লব বিনা নিমন্ত্রণে (বাল্মীকির নিমন্ত্রণ ছিলো) ঋষি বাল্মীকির সাথে শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে যেদিন রামায়ণ কীর্তন করে, সেদিন কুশ-লবের মনোরম কান্তি ও স্বরে-সুরে মুগ্ধ হয়ে রামচন্দ্র তাদের 'দত্তক'রূপে গ্রহণ করেন। হয়তো তখন তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, ঘটনাক্রমে ফেলনা হলেও ছেলে দুটো (কুশ-লব) রাজপুত্র তো বটে।

কুশ-লবকে গ্রহণ করলেও সীতাকে গ্রহণ করেননি রামচন্দ্র সেদিনও। সীতাদেবী হয়তো আশা করেছিলেন যে, বহু বছরান্তে পুত্রদ্বয়-সহ রাজপুরীতে এসে এবার তিনি সমাদর পাবেন। কিন্তু তা তিনি পান নি, বিকল্পে পেয়েছিলেন যতো অনাদর-অবজ্ঞা। তাই তিনি ক্ষোভে-দুঃখে হয়তো আত্মহত্যা করেছিলেন। **নারীহত্যার অপবাদ লুকানোর উদ্দেশ্যে এবং ঘটনাটি বাইরে প্রকাশ পাবার ভয়ে শ্মশানে দাহ করা হয়নি সীতার শবদেহটি, হয়তো লুকিয়ে প্রোথিত করা হয়েছিল মাটির গর্তে, পুরীর মধ্যেই। আর তা-ই প্রচারিত হয়েছে 'স্বেচ্ছায় সীতাদেবীর ভূগর্ভে প্রবেশ' বলে।**

সে যা হোক, অযোধ্যেশ্বর রাম ও লঙ্কেশ্বর রাবণের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, রাবণ ছিলেন শত শত সন্তানের জনক, আর রামের ছিলো না একটিও পুত্র। তিনি ছিলেন বন্ধ্য (আঁটকুড়া)।

লঙ্কেশ্বর রাবণের যাবতীয় গুণগরিমা ও সৌরভ-গৌরব গুপ্ত রাখার হীন প্রচেষ্টার মুখ্য কারণ — তিনি আধ্যাত্মবাদী ছিলেন না, ছিলেন জড়বাদী বিজ্ঞানী। বিশেষত তিনি আর্যদলের লোক ছিলেন না, ছিলেন অনার্যদলের লোক। এরূপ 'অনুমান' করা হয়তো অসঙ্গত নয়।

আর একটি কথা। শুধুমাত্র রাম ও রাবণকে নিয়ে রামায়ণ হতে পারে না, হনুমানকে বাদ দিয়ে। তাই এখন হনুমান প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করছি।

ঋষি বাল্মীকি ছিলেন প্রচণ্ড রামভক্ত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কথিত হয়েছে যে, বাল্মীকি যৌবনে রত্নাকর নামে একজন দস্যু ছিলেন। পরে নারদের উপদেশে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে ছয় হাজার বছর একস্থানে উপবিষ্ট থেকে রামনাম জপ করেন। সেই সময় তাঁর সর্বশরীর বল্মীকে সমাচ্ছন্ন হয়। পরে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে বল্মীক হতে উত্থিত হওয়ায় তিনি বাল্মীকি নামে খ্যাত হন।

যিনি আহার-নিদ্রা ও চলাফেরা পরিত্যাগ করে ছয় হাজার বছর বা ছয় বছরও রামনাম জপ করতে পারেন, রামের শৌর্য, বীর্য, গুণ-গরিমা ও ইজ্জৎ বৃদ্ধির জন্য তিনি কি না করতে পারেন? শ্রীরামের প্রাধান্য রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি গুণী, জ্ঞানী ও সুসভ্য রাবণকে রাক্ষস বানিয়েছিলেন, ভাগ্যিস পশু বানান নি। রামায়ণ মহাকাব্যের বনপর্বে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে হনুমান, জাম্ববান, সুগ্রীব ও তার ভ্রাতা বালীরাজ। রামায়ণের কাহিনীকার তাদের সদলে অঙ্কিত করেছেন পশুরূপে। বিশেষত হনুমান, সুগ্রীব ও বালীরাজকে সদলে বানর বানিয়েছেন এবং জাম্ববানকে বানিয়েছেন ভালুক। কিন্তু তারা কি আসলেই পশু ছিলো?

সে যুগে স্বর্গাগত দেবতাদের কেউ কেউ মর্ত্যবাসী কোনো কোনো মানবীর সাথে যৌনাচারে লিপ্ত হতেন এবং তৎফলে কোনো সন্তানের জন্ম হলে সে 'দেবতা' হতো না বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষও হতো না, হতো অসাধারণ মানুষ। যেমন — সূর্যদেবের ঔরসে কুমারী কুন্তির গর্ভে জন্ম নেন কর্ণ। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত যোদ্ধা ও দাতা। দেবতা যমের ঔরসে পাণ্ডুপত্নী কুন্তির গর্ভে জন্মলাভ করেন যুধিষ্ঠির। তিনি ছিলেন ধার্মিক চূড়ামণি, যার ফলে তাঁর নাম হয়েছিল ধর্মরাজ। ইন্দ্রদেবের ঔরসে কুন্তির ক্ষেত্রে জন্ম নেন অর্জুন। তিনি ছিলেন সে যুগের ভারতবিখ্যাত যোদ্ধা ইত্যাদি। কিন্তু কোনো দেবতা কখনো কোনো পশুর সাথে যৌনাচারে লিপ্ত হচ্ছেন এবং তাতে কোনো পশুরূপী সন্তান জন্ম নিচ্ছে, এমন কাহিনী কোথাও কোনো পুরাণশাস্ত্রে দেখা যায় না। পৌরাণিক মতে এখানে হনুমানের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিচ্ছি। এতে দেখা যাবে যে, হনুমানরা সবাই **ছিলো মানুষ। এবং ওদের আভিজাত্যও রামের চেয়ে বহুগুণ বেশি।**

প্রথমত হনুমান — পবনদেবের ঔরসে মানবী অঞ্জনার গর্ভে এর জন্ম। কাজেই হনুমান দেব-মানবের বংশজাত একজন বীর্যবন্ত মানব।

দ্বিতীয়ত জাম্ববান — এ হচ্ছে দেবতা ব্রহ্মার পুত্র। জাম্ববানের কন্যার নাম জাম্ববতী এবং তাকে বিয়ে করেন হিন্দুদের পরম পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং জাম্ববান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর। কাজেই সে ভালুক বা পশু হতে পারে না, সে ব্রহ্মা বংশের মানুষ ; সুতরাং ব্রাহ্মণ।

তৃতীয়ত বালী ও সুগ্রীব — দেবরাজ ইন্দ্রের (মতান্তরে সূর্যের) ঔরসে ও ব্রহ্মার মানসকন্যা রক্ষরজার গর্ভে বালী ও সুগ্রীবের জন্ম হয়। সুতরাং বালী ও সুগ্রীব হচ্ছে ইন্দ্রের বা সূর্যের পুত্র এবং ব্রহ্মার দৌহিত্র (নাতি)। বিশেষত ব্রহ্মার বংশজাত বলে তারা ব্রাহ্মণত্বের দাবীদার।

উপরোক্ত আলোচনাসমূহের দ্বারা অনুমান হয় যে, রামায়ণোক্ত **বানররা পশু ছিলো না, তারা ছিলো ভারতের 'কিষ্কিন্ধ্যা' নামক অঞ্চলের আদিম অধিবাসী এবং আলোচ্য ব্যক্তিরা ছিলো সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তি।** কেননা রামায়ণ মহাকাব্যে অজস্র বানরের আভাস থাকলেও প্রাধান্য পেয়েছে এরাই।

এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী মর্গানের মতবাদ অনুধাবনযোগ্য। মর্গানের মতে — বেঁচে থাকার তাগিদেই মানুষকে জোট বাঁধতে হয়েছে। জোট মানে দল। কিন্তু কোন্ সম্পর্কের ভিত্তিতে দল বাঁধবে? মর্গানের গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে, সে সময় মানুষ দল বেঁধেছিলো জ্ঞাতি সম্পর্কের ভিত্তিতে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জ্ঞাতি, একই পূর্বপুরুষ থেকে তাদের জন্ম। মর্গান এমনি এক একটি দলের নাম দিয়েছিলেন গেনস্ (Gens)। মর্গানের পরের যুগের নৃবিদরা গেনস্ শব্দের বদলে ক্লান (Clan) শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং ক্লান শব্দটিই চলছে।

কয়েকটি ক্লান একসঙ্গে জোট বাঁধলে যে বড়ো দলটি গড়ে ওঠে, তার নাম দেয়া হয়েছে ট্রাইব (Tribe)। আবার অনেকগুলো ট্রাইব মিলে আরো বড়ো একটি সংগঠন, তার নাম কন্‌ফেডারেসি অব ট্রাইবস্।

সাধারণত জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকেই ক্লানের নাম হ'তো। যেমন — ভালুক, নেকড়ে বাঘ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিণ, কাছিম ইত্যাদি। আবার ফুল, ফল, লতাপাতার নাম থেকেও ক্লানের নামকরণ হতো। এধরণের নামকরণের মূলে যে বিশ্বাসটি রয়েছে, তাকে বলা হয় টোটেম বিশ্বাস।

পাক-ভারত উপমহাদেশের সাঁওতাল উপজাতির শতাধিক গোত্র বা টোটেম আছে, হো উপজাতির আছে ৫০টিরও বেশী। এরূপ মুণ্ডা উপজাতির প্রায় ৬৪টি, ভীল উপজাতির ২৪টি, ছোটো নাগপুরের খারিয়া উপজাতির ৮টি এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার 'দৌড়ি' উপজাতির মধ্যে ৪টি গোত্র বা টোটেম রয়েছে। এদের প্রত্যেক গোত্রই — পশু, পাখী, গাছপালা অথবা কোনো বস্তুর নামে পরিচিত। আমাদের দেশেও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐরূপ বহু গোত্রের নাম দৃষ্ট হয়, যদিও এগুলোকে ঠিক টোটেম বলা যায় না। যেমন — সেন (শ্যেন = বাজপাখী), নাগ (সর্প), সিংহ (পশুরাজ) ইত্যাদি। গোত্রের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে তার গোত্রের টোটেমের নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। যেমন — সিংহ গোত্রের সবাই সিংহ, বাঘ গোত্রের সবাই বাঘ, হরিণ গোত্রের সবাই হরিণ ইত্যাদি।

মর্গানের মতে বিশেষত আধুনিক বহু নৃতত্ত্ববিদের মতে — রামায়ণোক্ত জাম্ববান ও হনুমানাদি ভালুক ও বানররা পশু ছিলো না, তারা ছিলো সেকালের কিষ্কিন্ধ্যার (ভারতের দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষ, আধুনিক নাম নাশিক) অনার্য অধিবাসী (মানুষ)। বানরাদি ছিলো তাদের টোটেম বা বংশগত উপাধি মাত্র। অধিকন্তু এ-ও অনুমান হয় যে, হয়তো হনুমান ও সুগ্রীব ছিলো কোনো 'ক্লান' বা 'ট্রাইব'-এর অধিকর্তা এবং বালী ছিলো কোনো 'কনফেডারেসী অব ট্রাইবস্'-এর অধিপতি, অর্থাৎ রাজা।

পরিশেষে — রামভক্ত ভাইদের বিনয়ে বলছি যে, মানুষ ও পশু-পাখীর চেহারা, চরিত্র ও ভাষা — এ তিনে প্রকাশ পেয়ে থাকে তাদের স্বকীয়তা বা ব্যক্তিত্ব। কিন্তু 'ভাষা'র ক্ষেত্রে মানুষের সমকক্ষ অপর কোনো জীব নেই। কেননা মানুষের মতো অন্য কোনো জীবের — দন্ত, ওষ্ঠ, তালু, জিহ্বা ইত্যাদি স্বরযন্ত্র নেই। তাই রামায়ণে কবি কিষ্কিন্ধ্যাবাসীদের চেহারা বদলিয়ে বানরাদি বানিয়েছেন বটে, কিন্তু তাদের ভাষা ও চরিত্র বদলাতে পারেননি, তা রেখেছেন সর্বত্রই মানুষের মতো। রামায়ণ গ্রন্থই তার সাক্ষী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরাউনের কীর্তি

পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে উল্লিখিত মোশি (হজরত মুসা আ.) ও ফরৌণ (ফেরাউন) সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে। ফরৌণ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে হলে প্রথমেই জেনে নেওয়া আবশ্যক — 'ফরৌণ' কি বা কে। কারো কারো মতে 'ফরৌণ' কোনো এক ব্যক্তির নাম। আসলে তা নয়। 'ফরৌণ' মিশররাজদের উপাধিমাত্র। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে, প্রথমত মোশি ও পরে ফরৌণ সম্বন্ধে।

মোশির সর্বোচ্চ গৌরব ও সম্মানজনক উপাধি হলো 'কলীমুল্লাহ' অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত কথোপকথনকারী। মোশি মিশর দেশ থেকে সবংশে কেনান দেশে যাবার পথে সীনয় পর্বতের (তুর পর্বতের) পাদদেশে যখন ছাউনী ফেলছিলেন, তখন নাকি 'জাভে' (ইহুদীদের ঈশ্বর) তাঁর সাথে বাক্যালাপ করার উদ্দেশ্যে উক্ত পর্বতের উপরে নেমেছিলেন এবং তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন নানান প্রসঙ্গে। মোশি সেখানে ঐস্থলে অবস্থান করেছিলেন ১১ মাস ১৯ দিন।* অর্থাৎ প্রায় এক বছর। এ সময় ঈশ্বর একনাগাড়ে ওখানেই ছিলেন, না অন্যত্র যাওয়া-আসা করছিলেন, তা জানি না। তবে মোশির সাথে নাকি তাঁর কথাবার্তা চলছিল প্রতিদিন।

পবিত্র বাইবেল পাঠে বোঝা যায় যে, 'জাভে' নামক ঈশ্বরটির ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি মহাদেশ ও চীন, জাপান, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদির অধিবাসীদের জন্য যেনো কোন মাথাব্যথা নেই, তিনি যেনো ইহুদী জাতি তথা বনি-ইস্রায়েলদের সমাজ ও ঘর-সংসার নিয়েই ব্যস্ত। তিনি যেনো শুধু ইহুদী জাতির ঈশ্বর, অন্য কারো নয়। নিরাকার ও সর্বব্যাপী ঈশ্বর নির্দিষ্ট একটি স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে ও মানুষের মতো কথাবার্তা বলতে পারেন — এ শুনে চিন্তাবিদ দার্শনিকগণ তো বটেই, কোনো বিবেকবান ব্যক্তিও হাসি সামলাতে পারেন না।

মোশির আর একটি বিভূতি হলো — ইহুদী ধর্মের প্রাণকেন্দ্র 'তৌরিত কেতাব' ও 'দশ আদেশ' প্রাপ্তি। ঈশ্বর নাকি তুরপর্বতে বসে দশটি উপদেশবাণী দু'খানা পাথরে লিখে মোশিকে প্রদান করেছিলেন বনিইস্রায়েল সমাজে প্রচার করার জন্য। আদেশ দশটি এই —

---

* যাত্রাপুস্তক ১৯ ; ১ ও গণনাপুস্তক ১০ ; ১১।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য খোদা না থাকুক।

২. তুমি খোদিত প্রতিমা বানাইও না।

৩. তুমি অনর্থক ঈশ্বরের নাম লইও না।

৪. বিশ্রামদিন পালন করিও।

৫. মাতাপিতাকে সমাদর করিও।

৬. নরহত্যা করিও না।

৭. ব্যভিচার করিও না।

৮. চুরি করিও না।

৯. প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

১০. তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না।

উক্ত আদেশগুলোর মর্মবাণী যাই হোক, 'পরমেশ্বরের নিজ হাতের লেখা' বলেই ওগুলোর অতিশয় কদর ইহুদী ধর্মরাজ্যে। **পরমেশ্বরের হাত আছে এবং লেখার জন্য তিনি মানুষের মতোই কালি, কলম, পাত্র ইত্যাদি ব্যবহার করেন — মনে হয় যে, আধুনিক কালের একান্ত ধর্মভীরু কোনো ব্যক্তিও এ কথা মেনে নিতে পারেন না।** কেননা ওরূপ প্রস্তরে লিখিত বা খোদিত শিলালিপি বর্তমানে অসংখ্য পাওয়া যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। মোশির প্রাপ্ত 'দশ আদেশ' সম্বলিত পাথর দু'খানা অতীতের কোনো শিলালিপি হওয়াই স্বাভাবিক, নয় কি?

লক্ষাধিক নবী-আম্বিয়ার মধ্যে মোশি সর্বপ্রধান নবী নন এবং তুর পর্বতও চিরপবিত্র স্থান নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন হজরত মোহাম্মদ (দ.) এবং চিরপবিত্র স্থান হলো মক্কা শহর, হেরা পর্বত, বিশেষত কাবা ঘর। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সাথে আলাপ আলোচনার জন্য মক্কা শহরে, হেরা পর্বতে বা চিরপবিত্র কাবা ঘরে 'জাভে' পদার্পণ করলেন না একদিনও, কথা বললেন দূতের মারফতে। পক্ষান্তরে সাক্ষাত আলোচনার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকেই একদিন যেতে হলো 'জাভে'-এর নিকটে, মে'রাজে। অথচ একজন সাধারণ পয়গম্বরের সাথে বাক্যালাপের জন্য 'জাভে'ই এলেন বনবাদাড় ও শৈলাকীর্ণ তুর পর্বতের শিখরে। এ বিষয়টি সংগতিহীন, নয় কি?

'ফরৌণ' বলতে যাঁরা কোনো একব্যক্তিকে বোঝেন, তাঁদের মতে, **ফরৌণের সর্বোচ্চ কুখ্যাতি হলো যে, তিনি নিজেকে নাকি 'ঈশ্বর' বলে দাবী করেছিলেন এবং তিনি নাকি বেঁচেও ছিলেন হাজার বছর।** এরূপ দাবী যদি কোনো ফরৌণ করেও থাকেন, তবে তিনি কোন্ ফরৌণ, সত্যিই এরূপ দাবী করেছেন কি-না, তা ভালোভাবে জেনে নেওয়া আবশ্যক। কেননা ফরৌণ তো আর দু'-চারজন ছিলেন না।

ঐতিহাসিকদের মতে, খৃ. পূ. ৩২০০ অব্দে সম্রাট মেনেস মিশরে ১ম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং খৃ. পূ. ৩৩২ অব্দে সম্রাট আলেকজাণ্ডার মিশর অধিকার করার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ বছর মিশরে ৩১টি রাজবংশ রাজত্ব করে। এর মধ্যে বহু ব্যক্তি মিশরের রাজ-তক্তে আরোহণ করেন এবং যখনই যিনি আরোহণ করেন, তখন তিনিই 'ফরৌণ' আখ্যায় আখ্যায়িত হন। বলা বাহুল্য যে, এতোধিক ফরৌণগণ যে সবাই একই চরিত্রের মানুষ ছিলেন, নিশ্চয় তা নয় এবং তাঁরা যে সবাই একই গুণে গুণী বা একই দোষে দোষী ছিলেন তাও নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশরে এক জনদরদী ফরৌণ ছিলেন ১ম আহমিস (খৃ. পূ. ১৬১০ অব্দে মৃত্যু)। সেকালে মিশরে দাসপ্রথা ছিলো অত্যন্ত ব্যাপক। মিশরের অধিকাংশ ফরৌণরাই সাধারণ প্রজা ও দাসদের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার ও নানাবিধ জুলুম করে তাদের জীবন বিষময় করে তুলতো। কিন্তু ফরৌণ ১ম আহমিস ছিলেন তার বিপরীত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল রাজা। দুঃস্থ জনগণের সুখ-শান্তি ও মঙ্গল বিধানই ছিলো তাঁর জীবনের ব্রত। তাই মিশরীয়রা তাঁকে দেবতা (ঈশ্বর) জ্ঞানে ভক্তি-অর্ঘ্য দান করতো। এমনকি মৃত্যুর পর তাঁর মূর্তি মিশরবাসীগণ পরবর্তী প্রায় হাজার বছর কাল (অর্থাৎ খৃ. পূ. ৫২৫ অব্দে পারস্য রাজশক্তি মিশর অধিকার করার পূর্ব পর্যন্ত) ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করতো। কোনো ফরৌণই হাজার বছর জীবিত ছিলেন না, ফরৌণ আহমিসও না। তবে তাঁর উপাধি ও মূর্তিপূজা অক্ষুণ্ণ ছিলো প্রায় হাজার বছর। বোধহয় যে, তা থেকেই জন্ম নিয়েছে ফরৌণের খোদায়ী দাবীর ও হাজার বছর বাঁচার প্রবাদবাক্যটি।

মৃত্যুর পরেও যদি কোনো ব্যক্তির নাম, মূর্তি, ছবি, ব্যবহারিক বস্তু, সমাধি ইত্যাদি জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করে, তবে তা কি তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় নয়? রাশিয়ানরা মহামতি লেনিনের শবদেহ সমাধিস্থ করেননি, পরম যত্নে রক্ষা করেছেন 'দর্শনীয়'রূপে। রোজ সেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয় এবং সবাই তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানায়। এটা তাঁর অপরাধ নয়, মহত্ত্ব।

মিশরবাসীগণ আহমিসকে দেবত্ব দিয়েছে এবং শ্রদ্ধাভরে তাঁর পূজা করেছে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই। আহমিস নিজে কখনো দেবত্ব দাবী করেননি এবং বলপূর্বক তাঁর পূজোও চাপিয়ে দেননি কারো মাথার উপর। আর বলপূর্বক চাপিয়ে দিয়ে থাকলে তা তাঁর মৃত্যুর পরেই বন্ধ হয়ে যেতো, প্রচলিত থাকতো না হাজার বছর ক্রমাগতই। তবে কথায় না হলেও ইঙ্গিতে কিছুটা দাবী করেছিলেন অপর একজন। তিনি হলেন ফরৌণ চতুর্থ আমেন হোটেপ (খৃ. পূ. ১৪২৮—১৩৮৮)।

সেকালের মিশরীয়দের মনে আল্লাহ, খোদা, নিরাকার ব্রহ্ম, পরম ঈশ্বর ইত্যাদির মতো একেশ্বর-কল্পনা ছিলো না, ছিলো বহু দেব-দেবী বা বহু ঈশ্বরের কল্পনা ও প্রচলিত ছিলো বহুবিধ পূজা। পুরোহিতরা ছিলেন ঈশ্বরদের প্রতিনিধি। জনসাধারণের বিশ্বাস ছিলো যে, পুরোহিতরা যা বলেন, দেবতারা তা-ই শোনেন, মানেন ও করেন। এরূপ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সুচতুর পুরোহিতরা নির্বোধ জনগণের পক্ষ হয়ে তাদের সার্বিক মঙ্গল সাধন ও অমঙ্গল থেকে রক্ষার জন্য দেবতাদের কাছে (যজমানকে শুনিয়ে শুনিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে) আবেদন-নিবেদন করতেন এবং তার বিনিময়ে প্রচুর অর্থ আদায় করতেন (এরূপ কৌশলে অর্থ আদায়ের প্রথা এ যুগেও আছে)। পুরোহিতরা তাবিজ-কবচ বিক্রি করেও অর্থ আদায় করতেন দেদার। সবচেয়ে বেশী মূল্য ছিলো 'পরকালের তাবিজ'-এর। পুরোহিতরা এমন একটি তাবিজ লিখে দিতেন, যা মৃতের সঙ্গে (গলায় বা অন্য কোন স্থানে বেঁধে) দিলে কবরে বা পরলোকে মৃত ব্যক্তির কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয় না। সহজেই অনুমেয় যে, এরূপ একটি তাবিজ (ঈশ্বরের কাছে চিঠি)-এর মূল্য কতো বেশী। সারাজীবন অসৎকাজ করেও কায়ক্লেশে এরূপ একটি তাবিজ খরিদ করতে পারলেই ব্যস। এভাবে নানা উপায়ে অর্থ উপার্জন করে মিশরীয় পুরোহিতরা এমনই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন যে, তাঁরা শুরু করেন সম্রাটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে, তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করতে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের জনগণের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মীয় অধঃপতন এবং পুরোহিতকুলের ঔদ্ধত্য দর্শনে অতিষ্ঠ হয়ে ফরৌণ আমেন হোটেপ সংস্কারমূলক এক নতুন ফরমান জারি করেন। তাতে তিনি বহু দেবদেবীর পূজা বন্ধ করে দেন এবং একমাত্র সূর্যদেবতা 'এটন'-এর পূজার প্রচলন করেন, সারা দেশে নির্মাণ করেন এটনের নামে মন্দির। তিনি সমস্ত মন্দির থেকে অন্যান্য সব দেবদেবী এবং প্রস্তরফলক থেকে তাদের নাম নষ্ট করে ফেলেন। তিনি সব পুরোহিতকে মন্দির থেকে তাড়িয়ে দেন, নিজেকে 'এটন'-এর প্রতিনিধি বলে দাবী করেন এবং স্বয়ং 'আমেন হোটেপ' নাম পরিবর্তন করে 'ইখনাটন' অর্থাৎ এটনের প্রিয়জন — এই নাম ধারণ করেন। বোধ হয় যে, এখান থেকেও ফরৌণের ঈশ্বরত্বের দাবী বা খোদায়ী দাবী, এ প্রবাদবাক্যটির উৎপত্তি হতে পারে।

ফরৌণ ইখনাটন এটনকে ঈশ্বর বলেছেন, এবং নিজেকে তাঁর 'প্রিয়জন' বলে দাবী করেছেন। আর এরূপ দাবী তো প্রায় সকল ধর্মবেত্তাই করেছেন। তাঁরা নিজেকে কেউ বলেছেন ঈশ্বরের 'প্রতিনিধি', কেউ বলেছেন 'প্রিয়জন', কেউ বলেছেন 'বন্ধু' ('দোস্ত') এবং কেউ তো পুত্রত্বেরও দাবী করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ-ই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের দাবী করেননি. ইখনাটনও তা করেননি।

> ইখনাটন মিশরে একেশ্বরবাদ প্রচার করেছেন, এটনকে (সূর্যকে) ঈশ্বর বলেছেন, দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করেছেন এবং ঈশ্বরের নামে মন্দির গড়েছেন। এ প্রসংগে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর জীবনাখ্যান তুলনা করা যেতে পারে। তিনিও কেনানে একেশ্বরবাদ প্রচার করেছেন, সূর্যদেবকে ঈশ্বর বলেছেন[১] (অবশ্য সে মন্তব্যটি পরে পাল্টেছেন), দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করেছেন এবং ঈশ্বরের নামে মন্দির (কাবা গৃহ) গড়েছেন। উভয়ে একই প্রকার কাজই করেছেন। অথচ তাঁদের একজন পেলেন পয়গম্বরী, আরেকজন হলেন কাফের।

AMARBOI.COM

এ যাবত যে সকল বিষয় আলোচনা করা হলো, তা সবই অতীত কাহিনী। বর্তমান প্রসঙ্গ হলো মোশি ও ফরৌণকে নিয়ে। এ হলো ইখনাটনের শতাধিক বছর পরের ঘটনা। মোশির সময় যিনি মিশরের ফরৌণ ছিলেন, তাঁর নাম দ্বিতীয় রামেসিস (খৃ. পূ. ১৩১৭—১২৫১)। তাঁর চরিত্র ছিলো ইখনাটনের চরিত্রের বিপরীত। ইখনাটনকে ধার্মিক বললে রামেসিসকে বলতে হয় বিধর্মী। নতুবা ইখনাটনকে বিধর্মী বললে রামেসিসকে বলতে হয় ধার্মিক ব্যক্তি। মূলত রামেসিস ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসনকর্তা। তিনি মিশরীয়দের ধর্মকর্মে পুনঃ স্বাধীনতা দান করেছিলেন। জবরদস্তি করে কোনো দেবতার পূজা করতে বলেননি বা নিষেধ করেননি কাউকে তিনি ইখনাটনের মতো। ধর্মের স্বাধীনতা পেয়ে মিশরীয়রা পুনঃ নানা দেবদেবীর পূজা শুরু করলো এবং পুরোহিতরা তাঁদের সাবেক মর্যাদা ও ক্ষমতা ফিরে পেলেন।

রামেসিস কারো ধর্মাধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাননি মোটেও, আধুনিক কালের শাসকদের মতোই। তিনি মনোযোগী ছিলেন দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, অর্থ ও শিল্পোন্নতি বিধানে এবং রাজ্যবিস্তারে। তাঁর প্রধান কীর্তি হলো একটি পিরামিড ও দু'টো মন্দির নির্মাণ।

মিশরের পিরামিডসমূহ পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম। তারই একটি পিরামিডের নির্মাতা

১. পবিত্র কোরান — সূরায়ে আনআম, রু, ৯, ৭৯ আ.।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরৌণ রামেসিস। তাঁর নির্মিত পিরামিডটি আজো অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান আছে, হয় তার গর্ভে আছে প্রায় তিন হাজার বছরের পুরাতন তাঁর মৃতদেহটিও। তিনি যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ঐশ্বর্যে অতি উন্নত ছিলেন, তাঁর নির্মিত একটি পিরামিড ও মন্দির দুটোই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। নিম্নোক্ত বিবরণটি দ্বারা উক্ত মন্দিরদ্বয়ের স্থাপকের যোগ্যতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

রাজা রামেসিস দুটো মন্দির গড়িয়েছিলেন নীলনদের তীরে উত্তর মিশরের আবু-সিম্বিলে। বড়টাতে আছে রাজার চারটে মূর্তি। লম্বায় এক একটা ষাট ফুট। আসোয়ান বাঁধ তৈরী করার সময় নীলনদের জলধারার স্ফীতির হাত থেকে মন্দির দুটোকে বাঁচাবার প্রশ্ন উঠে। আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার ফলে ইউনেসকোর (UNESCO) তত্ত্বাবধানে পাশ্চাত্য প্রকৌশলীদের মিলিত চেষ্টায় মন্দির দুটোকে ঠাঁইনাড়া করে ১৮০ ফুট ওপরে বসানো হয়। কয়েক বছর ধরে মাপজোক, হিসেব-নিকেশ, আঁকা-জোকাতো ছিলোই, তার ওপর ছিলো নানা প্রাযুক্তিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্ন। আধুনিক সব যন্ত্রপাতি এলো, কিন্তু পরিবহনের নানা যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও বিশাল সেই প্রস্তরদানবকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যই তৈরী করতে হলো আরো অনেকগুলো যন্ত্র। মূর্তিগুলোকে কেটে ফেলতে হলো টুকরো টুকরো করে, কেননা পৃথিবীর বৃহত্তম ক্রেনেরও সাধ্য ছিলো না সে দানবদের নড়াবার, ১৮০ ফুট ওপরে টেনে তোলা তো দূরের কথা।

যাই হোক, কাটা টুকরোগুলোকে নম্বর দিয়ে তাদের নতুন জায়গায় নিয়ে আবার জোড়া লাগানো হলো। আধুনিক যন্ত্রপাতির বিরাট সমাবেশ যারা দেখেছিলেন, তাঁরা অবাক মনে প্রশ্ন করেছিলেন, "বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি ছাড়াই সেই প্রাচীন মিশরীয়রা প্রকাণ্ড এ মন্দির কেমন করে খাড়া করেছিলেন?"

ফরৌণ দ্বিতীয় রামেসিস ছিলেন মোশির সমকালীন মিশরের শাসনকর্তা। তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান, শৌর্য-বীর্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গুণ-গরিমা বিসর্জন দিয়ে তাঁকে এক কুৎসিৎ আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছে 'খোদায়ী দাবীদার' বলে। এর কারণ অনুমান করা চলে যে, তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধ ছিলেন না, ছিলেন 'মুক্তমন'-এর অধিকারী। মানব সমাজের বিভিন্ন দেশে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেখানে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তির যাবতীয় গুণগরিমা ও সৌরভ-গৌরবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে বাস্তববাদিতারঅপরাধে।

মোশির সর্বপ্রধান বিভূতি ছিলো নাকি তাঁর হস্তের 'আসা' (লাঠি)। তিনি তাঁর হাতের আসাখানি ভূমিতে ছেড়ে দিলে তা নাকি সর্প হয়ে যেতো এবং জীবন্ত সর্পের ন্যায় চলাফেরা করতে পারতো ও শত্রুকে তাড়া করতো। মোশির জন্ম খৃ. পূ. ১৩৫৯ সালে এবং হযরত ইব্রাহিমের জন্ম খৃ. পূ. ২৩৪০ সালে। সুতরাং **হযরত ইব্রাহিমের জন্ম মোশির জন্মের ৯৮১ বছর পূর্বে। সেই হযরত ইব্রাহিমের হাতে নির্মিত পবিত্র কাবা গৃহখানা আজও বিদ্যমান আছে। কিন্তু মোশির হাতের আসাখানা গেল কই?**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভগবানের মৃত্যু

মাধব — কি বলছেন মশাই আপনি, ভগবান কি নেই?

নবীন — আমি শুনেছি যে, ভগবান নেই।

মাধব — ভগবান কোথায় গেছে?

নবীন — বোধ হয় যে, মারাই গেছে।

মাধব — কে বলেছে যে, ভগবান মারা গেছে, সংবাদদাতারা কেউ কি তার মৃত্যু স্বচক্ষে দেখেছেন?

নবীন — না, তা কেউ দেখেনি, ভগবানের কোনো বন্ধু-বান্ধব এমনকি তার স্ত্রী-পুত্ররাও তার মৃত্যু দেখেনি। সকলেই বলে অনুমান করে, তবে অনুমানটা সত্যি।

মাধব — ঘটনার বিস্তারিত খবর কিছু শুনেছেন কি?

নবীন — শুনেছি বেচারা ডুবিয়ে বায়লা মাছ ধরতে গিয়েছিলো গাঙ্গে, আর ফিরে আসেনি। কতোদিন গত হলো, কেউ তাকে কোথাও দেখেনি এবং শোনেওনি কোথায়ও তাকে দেখেছে বলে। হয়তো ভগবান জগতে নেই।

মাধব — আহা, বেচারা যদি মাছ ধরতে গাঙ্গে না যেতো, তাহলে তাকে এভাবে কুমীরের হাতে প্রাণ দিতে হতো না।

নবীন — না, এভাবে বা এ সময় না হলেও অন্যভাবে বা অন্য সময় ভগবানের মৃত্যু হতো। এইতো ক'মাস আগে ঈশ্বর ধোপা কলেরা ও খোদা বক্‌স বসন্ত রোগে মারা গেলো ঘরে বসেই।

ঘটনাটি বাস্তব, ঘটেছিল ১৩২০ সালের ভাদ্র মাসের ১৩ তারিখে, লামচরি গ্রামের নমঃ পাড়ায়। সেখানে নদীর পাড়ে অনেক নমঃশূদ্রের বাস। ভগবান হালদার ছিলো সে পাড়ার একজন অধিবাসী। পাড়ার লোকে তাকে 'ভগবান' বলে ডাকতো। একদিন ভগবান হালদার নদীতে গিয়ে বায়লা মাছ ধরবার জন্য জলে ডুব দিয়ে আর উপরে উঠলো না। সকলে স্থির করলো যে, নিশ্চয়ই ভগবানকে কুমীরে খেয়েছে। সে আর কখনো ফিরে আসবে না এবং আসেওনি আজ পর্যন্ত। প্রথমোক্ত আলোচনাটি সেই ভগবান হালদারের দূরবর্তী দু'জন আত্মীয়-বন্ধুর মধ্যে তার সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণত হিন্দুরা 'ভগবান' এ নামটিকে 'ঈশ্বর'-এর উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে থাকে। আসলে ভগবান, ঈশ্বর, পরমেশ্বর বা নিরাকার ব্রহ্ম এক কথা নয়। **'ভগবান' হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্রের একটি কুখ্যাত উপাধি মাত্র।**

ইন্দ্র ছিলেন শৌর্য-বীর্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অতি উন্নত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। তাই তাঁর একনাম 'দেবরাজ'। কিন্তু দেবরাজ হলে কি হবে, তাঁর যৌন চরিত্র ছিলো নেহায়েত মন্দ। তিনি তাঁর গুরুপত্নী অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করায় গুরুর অভিশাপে তাঁর সর্বাঙ্গে এক হাজার 'ভগ' (স্ত্রী-যোনি) উৎপন্ন হয় এবং তাতে ইন্দ্রের নাম 'ভগবান' (ভগযুক্ত) হয়। অতঃপর উক্ত 'ভগ' চিহ্নগুলো চক্ষুরূপ লাভ করলে ইন্দ্রের আর এক নাম হয় 'সহস্রলোচন'। 'ভগবান' শব্দটি হচ্ছে ইন্দ্রের ব্যভিচারের একটি স্মারকলিপি, নিন্দনীয় বিশেষণ। কিন্তু কুখ্যাত ভগবান আখ্যাটি পেয়েও তিনি তাঁর ব্যভিচারে ইস্তফা দেননি। কিষ্কিন্ধ্যার (মধ্যভারত) অধিপতি রক্ষরাজের পত্নীর গর্ভে 'বালী' রাজের জন্ম হয়েছিলো ভগবান ইন্দ্রের ব্যভিচারের ফলে।

ভগবান ইন্দ্রের শেষ দেখা পাই আমরা পুরাণের পাতায় — হস্তিনাপুরে (পুরাতন দিল্লীতে) পাণ্ডুপত্নী কুন্তির গৃহে। সেখানে তাঁর অবৈধ যৌনাচারের ফলে কুন্তির গর্ভে জন্মলাভ করেন তৃতীয় পাণ্ডব 'অর্জুন'। এখানে ভগবান ইন্দ্রের আরো কিঞ্চিৎ পরিচয় দিচ্ছি।

ইন্দ্রের মাতার নাম অদিতি, পিতার নাম কশ্যপ এবং দাদা ছিলেন মরীচি। তাঁর ধর্মপত্নী শচীদেবী এবং ঔরসজাত সন্তান জয়ন্ত, ঋষভ ও মীঢ়। বাসস্থান ছিলো সুমেরু পর্বতের অমরাবতী নামক স্থানের এক রম্য বাগানে। স্থানটির নাম ছিলো 'নন্দন কানন' (আলোচ্য সুমেরু পর্বত হচ্ছে হিমালয় পর্বতের অংশবিশেষ)।

AMARBOI.COM

পাণ্ডুপত্নী কুন্তিদেবীর বাসরঘর ছাড়া দীর্ঘ তিন-চার হাজার বছরের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো পুরাণে বা নতুনে কোথায়ও ভগবান ইন্দ্রের আর দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি তাঁর বাপ, দাদা, স্ত্রী-পুত্রেরও না। হয়তো ভগবান ইন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছে সবংশে। নতুবা তেনজিং, হিলারী ইত্যাদি আধুনিক কালের পর্বতারোহীদের সাথে তাঁদের দেখা সাক্ষাৎ হতো। তবে ভগবান ইন্দ্র বা তাঁর বংশাবলীর মৃত্যুও কেউ স্বচক্ষে দেখেনি, ভগবান হালদারের মৃত্যুর মতোই।

সহস্র ভগ অঙ্গে থাকায় ইন্দ্রদেব 'ভগবান' আখ্যা পেয়েছিলেন। কিন্তু মহাদেব শিবকেও 'ভগবান' বলা হয়, অথচ তার দেহে 'ভগ' ছিলো না একটিও। তত্রাচ তিনি 'ভগবান' আখ্যা প্রাপ্তির কারণ হয়তো এই যে, তিনি ছিলেন ভগবতীর স্বামী। স্বয়ং 'ভগযুক্তা' বলেই দুর্গাদেবী হচ্ছেন ভগবতী এবং 'ভগবতী'-এর পুংরূপে হয়তো শিব বনেছেন ভগবান। যদি তা-ই হয় অর্থাৎ **ভগযুক্তা বলে দুর্গাদেবী ভগবতী হন এবং ভগবতীর স্বামী বলে শিব ভগবান হয়ে থাকেন, তাহলে জগতের তাবৎ নারীরাই ভগবতী এবং তাদের স্বামীরা সব ভগবান।** কাজেই মানুষের জন্ম ও মৃত্যু মানে ভগবতী ও ভগবানেরই জন্ম-মৃত্যু। সুতরাং জগতে যতোদিন মানুষ আছে ও থাকবে, ততোদিন ভগবতী ও ভগবান আছেন ও থাকবেন। মানুষ না থাকলে থাকবে না জগতে ভগবতী বা ভগবান এবং ঘটবে তখন জগৎব্যাপী ভগবানের তিরোধান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণ 'ভগবান' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হলো। শব্দের অর্থ ও ব্যক্তি–রূপ যা–ই হোক না কেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'সৃষ্টিকর্তা'কে উদ্দেশ্য ক'রেই 'ভগবান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু পুরাণ-শাস্ত্র ভগবান ইন্দ্রকে সৃষ্টিকর্তা বলে না, বলে ব্রহ্মাকে। আবার পৌরাণিক মতে ব্রহ্মার একজন স্ত্রী ও দু'টি কন্যা ছিলো। স্ত্রীর নাম সাবিত্রী ও কন্যাদ্বয়ের নাম দেবসেনা ও দৈত্যসেনা। সুতরাং এ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও 'নিরাকার ঈশ্বর' নন। এভাবে আদিমকাল থেকে সভ্যাসভ্য মানব সমাজে কতো লোক যে কতোরূপে কতো সৃষ্টিকর্তা বা ভগবান সৃষ্টি করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এখানে কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি।

১. প্রাচীন মিশরীয়দের কারো কারো মতে সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন 'থোথ' অর্থাৎ চন্দ্র এবং কারো মতে সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন 'রা' বা 'রে' অর্থাৎ সূর্য দেবতা।
২. প্রাচীন ফিনিশীয়দের মতে সৃষ্টিকর্তার নাম 'ক্রন্‌স্'। তার সামনে ও পেছনে চক্ষু এবং ছয়টি পক্ষ আছে। তার মধ্যে কয়েকটি সঙ্কুচিত ও কয়েকটি প্রসারিত।
৩. প্রাচীন ব্যাবিলনীয়দের মতে সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন 'অপসু' ও 'তিয়ামত'। তারা হচ্ছেন জলদেবতা।
৪. আফ্রিকা মহাদেশের বন্য জাতিদের এক সম্প্রদায়ের লোকের বিশ্বাস — তাদের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন 'মান্টিস' জাতীয় পতঙ্গ। তারা ঐ জাতীয় 'কাগণ' বা 'ইকাগণ' নামীয় পতঙ্গের পূজা করে থাকে।
৫. অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের ভিক্টোরিয়া প্রদেশের উত্তরাংশের আদিম অধিবাসীদের মতে সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে 'পণ্ডজিল' নামীয় পক্ষী।
৬. আমেরিকার উত্তর–পশ্চিম তীরের থিলিঙ্কিট ইণ্ডিয়ানদের মতে সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন 'জেল' বা 'জেল্‌চ্' নামক দাঁড়কাক।
৭. উত্তর আমেরিকার আল্‌গকিন জাতির মতে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন 'মিকাবো' নামক এক বৃহৎ খরগোস ইত্যাদি। কিন্তু ওদের এই সমস্ত সৃষ্টিকর্তা বা ভগবানগণের মধ্যে একমাত্র সূর্যদেব ছাড়া আর কেউই আজ পর্যন্ত জীবিত আছেন বলে মনে হয় না।

AMARBOI.COM

আদিম মানব সমাজে সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে উক্তরূপ শিশুসুলভ কল্পনা হাস্যকর হলেও ওর উৎপত্তির কারণ এখন আর অজ্ঞাত নয়। কোনো কোনো অবোধ শিশু যখন তার মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করে, "মা আমি এলাম কোত্থেকে?" তখন তার মা একটু বেকায়দায় পড়ে যায়। কেননা শিশুর সৃষ্টি অর্থাৎ তার ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছুই জানে না, একমাত্র যৌনমিলন ছাড়া। আবার যেটুকু জানে, তা–ও প্রকাশ্যে বলতে পারে না। পক্ষান্তরে কিছু একটা না বললেও তার মুরুব্বীয়ানা বজায় থাকে না। তাই আত্মমর্যাদা ও মুরুব্বীয়ানা বজায় রাখার জন্য মা শিশুকে বলে — তুমি আকাশ থেকে পড়েছো, তোমাকে পড়ে পেয়েছি বাগানে, তোমার বাবা তোমাকে কিনে এনেছে বাজার থেকে ইত্যাদি। তখন সরলমনা শিশু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে তার মায়ের বাণী। এভাবেই তৈরী হচ্ছিলো আদিম মানবদের ঐসব ঈশ্বর ও জগত সৃষ্টির উপাখ্যানগুলো মানুষের জাতীয় জীবনের শৈশবে। কিন্তু কোনো শিশু যদি মাতৃভক্তির আতিশয্যে যৌবনেও তার মায়ের ঐসব বাণী বিশ্বাস করে, তবে সে দু'টি খেতাব পেতে পারে ; তার একটি হচ্ছে 'মাতৃভক্ত' অপরটি 'উন্মাদ'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুমান

মানুষের জাতীয় জীবনের শৈশবে তৎকালীন অঞ্চলবিশেষের গোষ্ঠিপতি, মোড়ল বা সমাজপতিরা শিশুর মায়ের মতোই বুঝিয়েছেন অবোধ জনসাধারণকে বিশ্বসৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে নানান কাল্পনিক কাহিনী, যা বিশ্বাস করেছে তারা সরলপ্রাণে শিশুদের মতোই। বিশেষত পরবর্তীরা তা উপভোগ করেছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির মতো।

মানুষের জাতীয় জীবনের কৈশোরে আগেকার মতবাদগুলো আর পুরোপুরি বজায় থাকলো না, কিছুটা মার্জিত রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো ধর্মীয় মতবাদরূপে। তখন সৃষ্টিকর্তা আবির্ভূত হলেন — পরমেশ্বর, পরমপিতা, যিহোভা, অহুরমযদা ইত্যাদি, শেষমেশ নিরাকার ব্রহ্ম। তা হলো যেনো ঝোপ কেটে জঙ্গল রোপণ করা। আর আজও মহান তপস্বীরা সগৌরবে বাস করেন (তাঁদের মনোরম) সেই জঙ্গলে।

মানুষের জাতীয় জীবনের যৌবনে বিংশ শতকের এ বিজ্ঞানের যুগেও বিজ্ঞানীরা যখন পদার্থের পরমাণু ভেঙ্গে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছেন, মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছেন এবং প্রস্তুতি নিচ্ছেন গ্রহান্তরে যাবার জন্য, তখনো তপস্বীরা গবেষণা চালাচ্ছেন 'মার্গ দিয়ে বদবায়ু বেরুলে তাতে ভগবানের আরাধনা চলে কি-না' — এই জাতীয় ব্যাপার নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক দেবতত্ত্ব

প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ এরিক ফন দানিকেনের মতে — 'দেবতা' বলে আমরা যে এক শ্রেণীর অস্তিত্ববিহীন কাল্পনিক জীবের নাম শুনে থাকি, তাঁরা সকলেই অস্তিত্ববিহীন কাল্পনিক জীব নন। বহু দেবতার বাস্তবতার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন দেশের পুরাতত্ত্বের মাধ্যমে। গ্রীস, মিশর, ব্যাবিলন ও ভারতাদির পুরাণ-পুঁথিপত্তরসমূহে দেখা যায় যে, দেবতারা স্বর্গের অধিবাসী। তাঁরা এসেছিলেন স্বর্গদেশ থেকে পৃথিবীতে। বস্তুত তাঁরা ছিলেন মহাকাশের কোনো অজানা গ্রহবাসী সুসভ্য মানুষ। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁরা ছিলেন পৃথিবীবাসী মানুষের চেয়ে বহুগুণে উন্নত। মানুষ যেমন আজ মহাকাশযান তৈরী করে মহাকাশযাত্রা শুরু করেছে, প্রস্তুতি নিচ্ছে গ্রহান্তরে যাত্রার জন্য, এমনভাবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা হাজার হাজার বছর পূর্বে। যার ফলে তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন 'পৃথিবী' নামক আমাদের এ গ্রহটিকে। তাঁরা অবতরণ করেছিলেন ভূপৃষ্ঠে, বসবাসও করেছিলেন কিছুদিন কোনো কোনো দেশে কোনো এক যুগে। সে যুগের মানুষ তাদের অবয়ব, শৌর্য-বীর্য ও জ্ঞান-গরিমা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলো। সেদিনের মানুষের কাছে তাঁরা পেয়েছিলেন ভক্তি, অর্ঘ্য, নৈবেদ্য এবং দেব, প্রভু, ঈশ্বর ইত্যাদি আখ্যা। যেমন পেয়েছিলেন কলম্বাস সাহেব আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের কাছে। দেবতারা রথে (বিমানে) চড়ে আবলীলাক্রমে যাতায়াত করতেন স্বর্গে ও মর্ত্যে। অর্থাৎ বিমানযোগে পৃথিবী ও মহাকাশে তাঁদের নিজ গ্রহে। কোনো কোনো অভিযাত্রীদল একবার অভিযান চালিয়ে স্বগৃহে ফিরে যেতেন, কোনো কোনো দল আস্তানা করতেন, কোনো কোনো দল স্থাপন করতেন উপনিবেশ। যাঁরা আস্তানা-উপনিবেশ স্থাপন করতেন, যে উদ্দেশ্যেই হোক — তাঁরা মানুষের কোনো দলপতি, সমাজপতি বা রাষ্ট্রপতিকে বশবর্তী করে তার মারফতে (মানুষের কল্যাণ কামনায়) স্বমত প্রচার করতেন। তাঁরা তাঁদের একান্ত ভক্তদের বর (আশীর্বাদ), রথ (বিমান) বা অস্ত্রাদি দান করতেন (অধুনা যেমন দান করে থাকে উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশগুলোকে)। আবার অবাধ্য ব্যক্তিদের অভিশাপ দিতেন ; আবশ্যক হলে যুদ্ধ করতেন।

⟹ ভাববাদী যিহিস্কেল (ইজেকিয়েল)-এর ঈশ্বরদর্শন সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবরণ দৃষ্ট হয় পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে। তাতে দেখা যায় যে, একদা (খৃ. পূ. ৫৯২) সদলে ঈশ্বর এসেছিলেন কবার নদীর তীরে যিহিস্কেলের সাথে সাক্ষাৎ করতে। দানিকেনের মতে — তা ছিলো গ্রহান্তরের কোনো এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিমানবিহারী অভিযাত্রীদলের কবার নদীর তীরে অবতরণ। বিবরণটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

"আমি দৃষ্টি করলাম, আর দেখ, উত্তর দিক হইতে ঘূর্ণিবায়ু, বৃহৎ মেঘ ও জাজ্জ্বল্যমান অগ্নি আসিল এবং তাহার চারিদিকে তেজ ও তাহার মধ্যস্থানে অগ্নির মধ্যবর্তী প্রতপ্ত ধাতুর ন্যায় প্রভা ছিল। আর তাহার মধ্য হইতে চারি প্রাণীর মূর্তি প্রকাশ পাইল। তাহাদের আকৃতি এই — তাহাদের রূপ মনুষ্যবৎ। আর প্রত্যেকের চারি চারি মুখ ও চারি চারি পক্ষ। তাহাদের চরণ সোজা, পদতল গো-বৎসের পদতলের ন্যায় এবং তাহারা পরিষ্কৃত পিতলের তেজের ন্যায় চাকচিক্যশালী। তাহাদের চারিপার্শ্বে পক্ষের নীচে মানুষের হস্ত ছিল। চারি প্রাণীরই ঐরূপ মুখ ও পক্ষ ছিল ; তাহাদের পক্ষ পরস্পরসংযুক্ত ; গমনকালে তাহারা ফিরিত না ; প্রত্যেকে সম্মুখ দিকে গমন করিত।"[২] উদ্ধৃতাংশটির স্থূল মর্ম এই — বিদ্যুৎচালিত কোনো আকাশযানযোগে সেখানে অবতরণ করলো একদল অভিযাত্রী, সংখ্যায় তারা চারজন।

পুনশ্চ "আর তাহাদের মস্তকের উপরিস্থ বিতানের ঊর্ধ্বে নীলকান্তমণিবৎ আভাবিশিষ্ট এক সিংহাসনের মূর্তি ছিল ; সেই সিংহাসনের মূর্তির উপরে মনুষ্যের আকৃতিবৎ এক মূর্তি ছিল, তাহা তাহার ঊর্ধ্বে ছিল। তাহার কটির আকৃতি অবধি উপরের দিকে আমি প্রতপ্ত ধাতুর ন্যায় আভা দেখিলাম ; এবং তাহার কটির আকৃতি অবধি নিচের দিকে অগ্নিবৎ আভা দেখিলাম ; এবং তাহার চারিদিকে তেজ ছিল। বৃষ্টির দিনে মেঘে উৎপন্ন ধনুকের যেমন আভা, তাহার চারিদিকে তেজের আভা সেইরূপ ছিল। ইহা সদাপ্রভুর প্রতাপের মূর্তির আভা। আমি তাহা দেখিবামাত্র উপুড় হইয়া পড়িলাম এবং বাক্যবাদী এক ব্যক্তির রব শুনিতে পাইলাম।

"তিনি আমাকে বলিলেন, 'হে মনুষ্যসন্তান, তুমি পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও, আমি তোমার সহিত আলাপ করিব।' যে সময় তিনি আমার সহিত কথা কহিলেন, তখন আত্মা আমাতে প্রবেশ করিয়া আমাকে পায়ে ভর দিয়া দাঁড় করাইলেন, তাহাতে যিনি আমার সহিত কথা কহিলেন, আমি তাঁহার বাক্য শুনিলাম।"[৩]

উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশের সারমর্ম এই — চারজন অভিযাত্রীর উপরে একজন সর্বাধিনায়ক ছিলেন। তাঁর চেহারা ও শান-শওকত দর্শনে যিহিস্কেল বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাঁকে উপুড় হয়ে সেজদা করলেন এবং ভয়বিহ্বল চিত্তে অভিভূত হয়ে তাঁর বাণী শ্রবণ করলেন। অতঃপর তা সাধারণ্যে প্রকাশ করলেন 'ঈশ্বরের বাণী' বলে। সে বাণীগুলো স্থান পেয়েছে পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে। ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের নিকট 'ঈশ্বরের বাণী' বলে তা একান্তই পালনীয় বিষয়। কিন্তু যিহিস্কেল ভাববাদীর ঐরূপ ঈশ্বর — দেব, মহাদেব, জাভে ইত্যাদি আর যা-ই হোন, তিনি নিরঞ্জন, পরমব্রহ্ম বা স্বয়ং আল্লাহ্ নন কিছুতেই।

এ প্রসঙ্গে সীনয় বা তুর পর্বতে হজরত মুসা (আ.)-এর 'জাভে' নামক ঈশ্বর দর্শনের বিবরণটিও অনুধাবনযোগ্য। হযরত মুসার ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেল (তৌরিত) গ্রন্থে লিখিত বিবরণটি এরূপ — "পরে তৃতীয় দিন প্রভাত হইলে মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎ এবং পর্বতের

২. যিহিস্কেল — ১ ; ৪—৯।

৩. যিহিস্কেল — ১ ; ২৬—২৮ এবং ২ ; ২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে নিবিড় মেঘ হইল, আর অতিশয় উচ্চরবে তুরীধ্বনি হইতে লাগিল, তাহাতে শিবিরস্থ সমস্ত লোক কাঁপিতে লাগিল। পরে মোশি (মুসা আ.) ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লোকদিগকে শিবির হইতে বাহির করিলেন, আর তাহারা পর্বতের তলে দণ্ডায়মান হইল। তখন সমস্ত সীনয় পর্বত ধূমময় ছিল ; কেননা সদাপ্রভু অগ্নিসহ তাহার উপর নামিয়া আসিলেন, আর ভাটির ধূমের ন্যায় তাহা হইতে ধূম উঠিতে লাগিল ; এবং সমস্ত পর্বত অতিশয় কাঁপিতে লাগিল ; আর তুরীর শব্দ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন মোশি কথা কহিলেন, এবং ঈশ্বর বাণী দ্বারা তাঁহাকে উত্তর দিলেন। আর সদাপ্রভু সীনয় পর্বতে, পর্বতের শিখরে, নামিয়া আসিলেন এবং সদাপ্রভু মোশিকে সেই পর্বতে ডাকিলেন, তাহাতে মোশি উঠিয়া গেলেন।"[৪]

উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো, তা আধুনিক কালের বিমান অবতরণের সময়েরই অনুরূপ এবং উক্ত বিবরণটিতে যে সমস্ত বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, যথা — মেঘ, বিদ্যুৎ, উচ্চরব, গর্জন, তুরীধ্বনি, ধূম, পর্বতকম্পন, পর্বত শিখরে সদাপ্রভুর নেমে আসা ইত্যাদি, ওর কোনোটিই পরম ঈশ্বরের (আল্লাহর) অবতরণের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং সম্পর্কিত বিমানাবতরণের সঙ্গে। দানিকেনের মতে — কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই ওকে পরমেশ্বরের অবতরণ বলে মনে করতে পারেন না, পারেন জনৈক বৈমানিকের 'বিমানাবতরণ' বলে মনে করতে।

ইরানীয় ঋষি জোরওয়াষ্টার 'জেন্দআভেস্তা' নামক গ্রন্থখানা নাকি পেয়েছিলেন বজ্রবিদ্যুৎ সমাকীর্ণ ঘোর নিনাদ সম্বলিত স্বর্গাগত ইরানীয় দেবতা 'অহুর মজদা'-এর কাছে, কোনো এক পর্বতে বসে। অহুর মজদা নিরাকার ব্রহ্ম নন। কেননা তিনি ব্যক্তিসত্তার অধিকারী স্বর্গবাসী দেবতা।

খৃষ্ট ধর্মগুরু যীশু ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব পেয়েছিলেন স্বর্গাগত একটি কবুতর পাখীর মাধ্যমে। এ বিষয়ে পবিত্র বাইবেল গ্রন্থের নিম্নোক্ত বিবরণটি দ্রষ্টব্য।

"পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া অমনি জল হইতে উঠিলেন, আর দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন। আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত'।"[৫]

উক্ত কবুতরটি স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন না এবং পৃথিবীর সাধারণ কবুতরও ছিলো না, ছিলো স্বর্গীয় কবুতর। কেননা পৃথিবীর সাধারণ কবুতরের কণ্ঠপ্রদেশে এমন কোনো স্বরযন্ত্র নেই, যার দ্বারা সে মানুষের মতো কথা বলতে পারে। আর উক্ত বিবরণটি এমনই সরল-সহজ যে, ওর কোনো রূপকার্থ করার অবসর নেই। আকাশ বিজ্ঞানীদের মতে — আকাশ অনন্ত। আর অনন্ত আকাশে যদি 'স্বর্গ' নামীয় কোনো স্থান থেকে থাকে, তবে তা হবে আকাশের কোনো গ্রহ-উপগ্রহ নিশ্চয়ই।

---

৪. যাত্রাপুস্তক — ১৯ ; ১৬—২০।
৫. মথি — ৩ ; ১৬—১৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ক্ষেত্রে দানিকেনের মতে — যীশুর শ্রুত বাণীটি হয়তো 'কবুতররূপী বিমান'-এ আগত ভিন্ন গ্রহবাসী কোনো মানুষের মুখের বাণী। নতুবা যীশুর ভাবালুতা।

প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্মপুস্তক আমদুয়াত গ্রন্থ, মৃতের গ্রন্থ ও ফটকের গ্রন্থত্রয়কে বলা হয় ঐশ্বরিক বা দৈবগ্রন্থ। ওর প্রণেতা নাকি মিশরীয় জ্ঞানের দেবতা 'থট' এবং হাতের লেখাও নাকি তাঁরই। সম্রাট হাম্বুরাবির হস্তে নাকি 'আইন গ্রন্থ' প্রদান করেছিলেন সূর্যদেবতা 'সামাস'। প্রাচীন গ্রীকদেশের আইন প্রণেতা বলা হয় গ্রীকদেবতা 'ডাইওনিসাস'-কে। হিন্দুদের বেদচতুষ্টয় রচিত হয়েছে নাকি দৈবশক্তিতে।

উক্ত আলোচনাসমূহের দ্বারা 'অনুমান' হয় যে, সেকালের ধর্মীয় বিধিবিধান ও সামাজিক আইন-কানুনসমূহ প্রায় সমস্তই প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছেন স্বর্গবাসী দেবতা বা 'ঈশ্বর' নামীয় ব্যক্তিরাই — মুনি-ঋষি, নবী-আম্বিয়া, কোনো সমাজপতি বা কোনো রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে।

সেকালে দেবতারা স্বর্গ থেকে নেমে আসতেন পৃথিবীতে বলতে গেলে ঘনঘনই। আর বিভিন্ন দেশে তাদের সংখ্যাও ছিলো অগণ্য। আরবের লাত-মানাত, কেনানে বাল্ ইত্যাদি নানারকম ছিলেন দেবতা। আবার বিভিন্ন দেশের কতক দেবতারা ছিলেন একই ধাঁচের। যেমন মিশরে — আসিরিস, আইসিস, হোরাস ; ব্যাবিলনে — আলু, বেল, ইয়া ; ভারতে — ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি। যে যুগে সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বোধহয় যে এক কোটিও ছিলো না, সে যুগে নাকি হিন্দুদের দেব-দেবীর সংখ্যা ছিলো প্রায় তেত্রিশ কোটি। ভারতীয় দেব-দেবীরা তো ঘাঁটিই করেছিলেন হিমালয় পর্বতের কোনো কোনো অঞ্চলে। শিবের ঘাঁটি ছিলো কৈলাস পর্বতে, নাম ছিলো তার কৈলাসপুরী এবং ইন্দ্রের ঘাঁটি ছিলো সুমেরু পর্বতে, নাম ছিলো তার অমরাবতী (এ 'সুমেরু' পৃথিবীর উত্তর মেরু নয়, সে যুগের ভারতবাসীরা ভারতের উত্তরকেই 'পৃথিবীর উত্তর' বলে মনে করত। আলোচ্য 'সুমেরু' ও 'কৈলাস পর্বত' হিমালয়েরই অংশবিশেষ)। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতারা সেখানেই থাকতেন সপরিবারে। ভারতীয় দেবতাদের অধিনায়ক (রাজা) ছিলেন ইন্দ্র, তার রাজপুরীর নাম ছিলো বৈজয়ন্তা। দেবরাজ ইন্দ্রের সে পুরীকেই বলা হতো 'স্বর্গ'। সেখানে ছিলো সুখ সাধনের নানাবিধ সামগ্রী। যথা — নন্দন কানন (এদন উদ্যান?), পারিজাত বৃক্ষ, সুরভি গাভী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী, তৃপ্তিদায়ক আহার্য এবং দেবতাদের মনোরঞ্জনের জন্য ছিলো অপ্সরা, কিন্নরী, গন্ধর্ব ইত্যাদি গীতনৃত্যশীলা অঙ্গনা। এ ছাড়াও ছিলো — রথ (বিমান), সারথি (বিমান চালক), ধনু, বজ্র ইত্যাদি নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র। সে সুরম্য স্থানটি লাভের অভিলাষে এবং অন্যান্য স্বার্থসিদ্ধির মানসে সেকালের ভারতীয় আর্যরা দেব-দেবীগণের তুষ্টির উদ্দেশ্যে করেছিলো নানাবিধ যাগযজ্ঞ, হোম-বলি, স্তবস্তুতি এবং পূজা-অর্চনার প্রবর্তন ও প্রচলন।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, কোনো কোনো সময় কোনো কোনো দেবতা ভক্তের স্তুতিবাক্যে তুষ্ট হয়ে তাকে বর, অস্ত্র ইত্যাদি দান করতেন। হয়তো কাউকে রথ (বিমান) উপহার দিতেন। আবার কেউ বিদ্রোহী হলে তাকে সবংশে নিধন করতেন।

রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের স্তবে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে 'পুষ্পক' নামক একখানা বিমান প্রদান করেন। কিন্তু সে বিমানখানা রাবণ ছিনিয়ে নিয়ে তিনি তার মালিক হন। দেবতারা এতে কোপিত হয়ে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। রাবণের পুত্র মেঘনাদ সেই বিমানখানার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে বিমানযুদ্ধে পরাজিত করে 'ইন্দ্রজিৎ' আখ্যাপ্রাপ্ত হন এবং সেই বিমানখানার সাহায্যেই রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করেন। পরিশেষে রাবণের মৃত্যু হলে রামচন্দ্র সীতাদেবীসহ ঐ বিমানখানা নিয়ে অযোধ্যায় যান। বোধহয় যে, যত্নাভাবে বিমানখানা সেখানেই বিনষ্ট হয়েছে। পক্ষান্তরে সেকালের বীর্যবন্ত রাজা 'দণ্ডক' দেববিরোধী হওয়ায় ব্রহ্মা তার ব্রহ্মাস্ত্র (বোধহয়, এ কালের ডিনামাইট বা পারমাণবিক বোমা জাতীয় কোনো অস্ত্র) দ্বারা প্রজাপুঞ্জসহ রাজা দণ্ডককে সবংশে নিধন ও তার রাজ্যটি বিনষ্ট করেন। বহুকাল জনহীন থাকায় রাজ্যটি অরণ্যে পরিণত হয়। রাজা দণ্ডকের সেই রাজ্যটিকেই বলা হয় 'দণ্ডকারণ্য' (অধুনা আবাদ হচ্ছে)। আবার পাশ্চাত্যে দেবতারা তাদের কোনো কোনো ভক্তকে নিয়ে বিমানবিহার করেছেন। পক্ষান্তরে দেববিরোধী জনগণকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে তাঁরা ধ্বংস করেছেন 'সদোম' ও 'যমোরা' দেশকে।

মুনিঋষি ও দেবদেবীগণ প্রায় একইকালে বর্তমান ছিলেন এবং প্রায় একইকালে ঘটেছে তাঁদের তিরোভাব। এযুগে দেখা যায় না ওঁদের কাউকে। ওঁরা সকলেই এখন কালের কোলে ঘুমিয়ে আছেন। কিন্তু দেবতারা নাকি সবাই অমর এবং গঙ্গা, মনসা, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি বহু দেব-দেবী আজও বেঁচে আছেন। অথচ ভাবে, অত্বর মজদা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেবদেবীগণের কারো সাক্ষাৎ মেলে না। তাঁরা গেলেন কোথায়? উত্তরে বলেছেন দানিকেন — ঐ শ্রেণীর দেবতারা আসলে ছিলেন গ্রহান্তরের মানুষ। তাঁরা ফিরে গেছেন মহাকাশে আপন গৃহে, হয়তো এখন মারা যেতেও পারেন। কেননা দেবতারা দীর্ঘজীবী হলেও অমর নন।

দেবতারা কোথায় গেলেন, তা বলেছেন দানিকেন সাহেব। কিন্তু কেন গেলেন, তা বলেননি তিনি। তবে তার মূল কারণ হয়তো 'যুগের সুযোগ'-এর অভাব। সেকালের মানুষের মন ছিলো সরল, জ্ঞানের পরিধি ছিলো সংকীর্ণ। তাই তাদের গুরু পুরোহিতগণ যা বলতেন, তা তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও মান্য করতো অকাট্য-অভ্রান্ত বলে এবং দেবতাগণও স্বমত প্রচারের সুযোগ পেতেন তাঁদের ভক্তবৃন্দের মাধ্যমে। উত্তরোত্তর জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের গুরুবাদিতা হ্রাস পেতে থাকে। ফলে কমতে থাকে দেবতাগণের মহিমা। অবশেষে বুদ্ধ (জ্ঞানী) দেব যখন আবির্ভূত হয়ে প্রচার করলেন দেব-দেবীর স্তবস্তুতি ও পূজা-অর্চনার অসারতা-অযৌক্তিকতা, তখন থেকেই দেবতাদের পাত্তা গুটাতে হলো চিরতরে। যদিও ভারতীয় দেবতাদের ঔপনিবেশিক স্বর্গধামটি আর্য ভারত থেকে বেশী দূরে নয়, তথাপি আর কোনো দেবদেবীর ভারতের ভূমিতে পদার্পণের কথা শুনা যায় না, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে। কেননা এ যুগে তাঁদের ভক্ত মুনি-ঋষি মেলে না। অভিন্ন কারণেই যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের পরে পশ্চিমাঞ্চলেও দেবতাদের আনা-গোনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

দেবতারা ছিলেন সর্ববিদ্যাবিশারদ, সর্বগুণে গুণী, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অতি উন্নত। ভক্তগণ তাঁদের অনুরক্ত হয়েছেন, ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে অর্চনা আরাধনা করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে অসংখ্য পশুবলি করেছেন (কেউ কেউ এখনো করে থাকেন) এবং নরবলিও দেওয়া হয়েছে কোনো কোনো দেশে। কিন্তু দেবগণের কোনো জ্ঞান-গুণের অনুশীলন করেননি কোনো ভক্তই তা বলা চলে। কেননা অসংখ্য মুনি-ঋষিদের মধ্যে সে সম্বন্ধে নাম করা যায় একমাত্র ঋষি চরকেরই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি নাকি চিকিৎসা তথা আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন দেবতা ব্রহ্মার কাছে। তাঁর প্রণীত 'চরক সংহিতা' নামক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা পুস্তকখানা আজো মানুষের কল্যাণ-সাধন করছে। এতদ্ভিন্ন আর কোনো দেবদত্ত প্রযুক্তিবিদ্যা কোনো মুনি-ঋষি আয়ত্ত করেছেন বলে শোনা যায় না। দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে তাঁর ভক্তগণ প্রার্থনা জানাচ্ছে হাজারো রকম, স্তুতিবাক্য রচনা করেছে অজস্র (ঋকবেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি নাকি ছিলেন বজ্রবিদ্যুৎ সৃষ্টির অধিকর্তা (বিদ্যুৎ দ্বি-জ্ঞানীর)। কিন্তু কোন ঋষিই তাঁর কাছে উক্ত বিদ্যুৎ সৃষ্টির প্রণালীটি শিক্ষা করেননি বা করতে পারেননি। তা সৃষ্টির প্রণালী আবিষ্কার করেছেন ইটালীয় বিজ্ঞানী গ্যালভনি ও ভল্টা (১৭৬১)। দেবতারা **বিমানবিদ্যায়ও ছিলেন সুনিপুণ। তাঁরা বিমানে (রথে) চড়ে আসতেন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে (পৃথিবীতে), ভ্রমণ করতেন যত্রতত্র। হাঁ-করে** চেয়ে দেখতেন মুনি-ঋষিগণ, আর দান **করতেন শ্রদ্ধাঞ্জলি।** কিন্তু দেবতাদের কাছ থেকে বিমান তৈরীর কলা-কৌশল আয়ত্ত করেননি কোনো মুনি-ঋষিই, তা আবিষ্কার করেছেন আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ১৯০৩ সালে।

এখন বিজ্ঞানীদের অসাধ্য কোনো কাজ আছে বলে মনে হয় না। তাঁরা এখন উন্নীত হয়েছেন দেবতার পর্যায়ে। তবে কোনো দেবদেবীর আরাধনায় তা সম্ভব হয়নি, হয়েছে জ্ঞানের সাধনায়। বিজ্ঞানীদের চন্দ্রাভিযান সফল হয়েছে, তাঁরা এখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন গ্রহান্তরে যাবার জন্য। প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন গ্রহান্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে, বাক্যালাপ করতে। যদি তাঁদের গ্রহান্তরে গমন সম্ভব হয় এবং সেখানে থাকে যদি অনুন্নত জাতের মানুষ, তবে তাদের কাছে হয়তো তাঁরাও পাবেন অর্চনা, আরাধনা, পূজা ; পৃথিবীর দেবতাদের মতোই পাবেন 'দেবতা' বলে আখ্যা। কিন্তু তাঁদের সে দেবতাগিরি বজায় থাকবে ততোদিনই, যে পর্যন্ত না তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হয়। উন্নত হলে তাঁদেরও পাত্তা গুটাতে হবে তখন পৃথিবীর দেবতাদের মতোই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মে'রাজ

বিমানবিহারের বাসনা মানুষের সার্বজনীন ও বহুকালের পুরানো এবং তা পূরণও করেছেন কেউ কেউ হাজার হাজার বছর আগেই। প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের ধর্মীয় ও পৌরাণিক পুঁথিপত্তরে তার বহু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই মানুষের উড্ডীন যান ছিলো পাখী। যেমন — লক্ষ্মীদেবীর বাহন পেঁচক, সরস্বতীর বাহন হংস, বিষ্ণুর বাহন গরুড় এবং বাদশাহ নমরূদ নাকি উড়েছিলেন শকুন পাখীর সাহায্যে। আবার কেউ কেউ রথে (গাড়ীতে) চেপে উড়েছেন এবং বাদশাহ সোলায়মান নাকি উড়েছেন তাঁর সিংহাসনে চেপেই। কিন্তু এঁরা সবাই উড়েছেন পৃথিবীর কাছাকাছি, বায়ুমণ্ডলের মধ্যে, এঁদের কেউই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে যা'ননি বা যেতে পারেননি। তবে এঁরা সবাই উড়েছেন আপন আপন প্রচেষ্টায়। এ ছাড়া আর একভাবে মানুষ মহাকাশ (স্বর্গ?) ভ্রমণ করেছে। কিন্তু তা তাদের আপন প্রচেষ্টায় নয়। মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন তাঁরা ঈশ্বর প্রেরিত স্বর্গীয় দূতের আহ্বানে স্বর্গীয় যানে আরোহণ করে। আর সেখানে তাঁরা দেখেছেন অত্যাশ্চর্য ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, সাক্ষাৎ করেছেন ঈশ্বরের সাথে, আবার স্বর্গদূতেরা ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁদের নিজ নিজ ঠিকানায়। এহেন মহাকাশ ভ্রমণকে ইসলামিক ভাষায় বলা হয় 'মে'রাজ' বা 'মেয়ারাজ'।

মুসলমানদের মতে ওভাবে মহাকাশ ভ্রমণ বা মে'রাজ গমন করেছেন একমাত্র শেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (দ.)। বস্তুত তা নয়। মহর্ষি এনক ঐভাবে মে'রাজ গমন করেছিলেন খৃ. পূ. প্রায় ৩০০০ অব্দে এবং মহর্ষি ইজেকিয়েল ও মহর্ষি ইলাইজা মে'রাজ গমন করেছিলেন খৃ. পূ. প্রায় ৬০০ অব্দে। খৃ. পূ. প্রায় ২০০০ অব্দে মহাপ্রবর ইব্রাহীম মে'রাজ গমন করেছিলেন বলেও শোনা যায়। তবে তা তৌরিত তথা পবিত্র বাইবেলে লিখিত নেই, তা জানা যায় অন্যান্য সূত্রে। আর শেষ নবী মেরাজ গমন করেন কোন্ তারিখে, তা তো মুসলমান মাত্রেই জানেন। এ সমস্ত মনীষীগণ প্রত্যেকেই মহাকাশে লক্ষ লক্ষ মাইল পথ ভ্রমণ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে। কিন্তু তখনকার সকল লোকে এবং আজও অনেকে তাঁদের সে মহাকাশ ভ্রমণের বিবৃতি বিশ্বাস করতে চায়নি। এমনকি ভ্রমণকারীদের আপনদলীয় কিছুসংখ্যক লোকও ছিলেন বা আছেন যারা ও বিষয়ে সন্দিহান।

উপরোক্তরূপ মহাকাশভ্রমণ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে সাম্প্রতিককালে, তা প্রকাশ করেছেন জর্জ অ্যাডামস্কি নামে জনৈক আমেরিকাবাসী। তাঁর সে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার আগে সংক্ষেপে তাঁর পরিচয়টা দিয়ে নিই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জর্জ অ্যাডামস্কির জন্ম পোল্যাণ্ডে ১৮৯১ সালের ১৭ এপ্রিল তারিখে। যখন তাঁর বয়স প্রায় দু'বছর, তখন তাঁর বাবা-মা আমেরিকা গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁরা থাকতেন নিউইয়র্কের কাছে ডানকার্ক শহরে।

জর্জ স্কুলে বেশিদিন পড়তে পারেন নি। কিন্তু তাই বলে যে লেখাপড়া শেখেননি তা নয়। বরঞ্চ বাড়িতে পড়ে তাঁর বয়সী বালক-বালিকা অপেক্ষা বেশীই শিখেছিলেন। যখন তিনি একটু বড় হলেন, মানে যখন কিশোর, তখন তিনি ভাবতে শুরু করলেন — মানুষ ঝগড়া-বিবাদ না করে মিলে-মিশে থাকতে পারে না কেন? তখন থেকেই তিনি ভাবুক। আকাশের প্রতি আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তিনি ইতিহাস এবং ভূগোল উত্তমরূপে পড়েছিলেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চান। কিন্তু জানতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার সঙ্গতি তাঁর বাপ-মায়ের নেই। এজন্যে তাঁর কোনো অভিযোগ ছিলো না। তিনি নিজে কাজ করতেন, রোজগার করতেন ; কিন্তু সংসারে দিয়ে এমন উদ্বৃত্ত থাকতো না যা দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারেন।

সারা দেশটাকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ভাবলেন। যেখানে যা বা যার কাছে যা পারলেন তিনি তা-ই শিখতে লাগলেন ; কোনো ব্যক্তিবিশেষের কাছেই হোক, লাইব্রেরীতেই হোক কিংবা মিউজিয়মেই হোক। শিক্ষা তাঁর সম্পূর্ণ হয়েছিলো।

১৯১৩ সালে জর্জ আর্মিতে যোগদান করেন। থার্টিন্থ ক্যাভালরির সঙ্গে তাঁকে ডিউটিতে পাঠানো হয় মেকসিকো সীমান্তে। ১৯১৯ সালে তিনি আর্মি থেকে ছাড়া পান। তাঁর কাজের প্রশংসা করা হয়েছিলো। ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে বড়দিনের দিন মেরি সিমবারস্কির সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। আর্মি থেকে ছাড়া পেয়ে রুজি-রোজগারের চেষ্টায় জর্জ অ্যাডামস্কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। এশহর থেকে ওশহর, ওগ্রাম থেকে এগ্রাম ঘুরে বেড়ান, যেখানে কাজ পান সেখানেই থেকে যান। এতে তাঁর অভিজ্ঞতাও বাড়ে প্রচুর, ভালোও লাগে ঘুরে বেড়াতে।

এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কাটিয়ে দেবার পর অ্যাডামস্কি স্থির করলেন — আর ঘুরে বেড়ানো নয়, এবার থিতু হয়ে বসা যাক। 'লাগুনা বিচ' নামে একটি গ্রাম বেছে নিলেন এবং সেখানে তিনি মাষ্টারী আরম্ভ করে দিলেন।

১৯৪০ সালে অ্যাডামস্কি লাগুনা বিচ থেকে ভ্যালি সেন্টারে উঠে গেলেন। 'ভ্যালি সেন্টার' হলো ক্যালিফোর্নিয়ায় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মানমন্দির মাউন্ট প্যালোমারে যাবার রাস্তায়। তাঁর বাড়ির নাম 'প্যালোমার গার্ডেন'।

অ্যারিজোনার মরু অঞ্চলে ডেজার্ট সেন্টার গ্রাম। ১৯৫২ সালের ২০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সেখানে মহাকাশ (ভেনাস গ্রহ) থেকে ফ্লাইং সসারে আগত জনৈক মহাকাশচারীর সাথে অ্যাডামস্কির সাক্ষাৎ হয়। সে সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখে তিনি প্রকাশ করেন 'ফ্লাইং সসারস্ হ্যাভ ল্যাণ্ডেড' নামে একখানা যুগান্তকারী বই। অতঃপর ১৯৫৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী ফ্লাইং সসারে চেপে দু'জন মহাকাশচারী অ্যাডামস্কিকে তাদের সাথে মহাকাশ ভ্রমণে নিয়ে যায় এবং ভ্রমণান্তে তাঁকে পৃথিবীতে তাঁর নিজালয়ে পৌছে দিয়ে যায়। এবারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে তিনি 'ইনসাইড দি ফ্লাইং সসার' নামে আর একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উক্ত পুস্তকে জর্জ অ্যাডামস্কি তাঁর মহাকাশ ভ্রমণের যে বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, তার সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেকালের মে'রাজের কাহিনীসমূহের মৌলিক পার্থক্য বিশেষ কিছুই নেই।

এখন জর্জ অ্যাডামস্কির সে ভ্রমণকাহিনীর কিছু অংশ তাঁর নিজের কথায়ই বলছি —

১৯৫৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী আমি লসএঞ্জেলস্ শহরে এসে পৌছলুম। আমি বাস করি শান্ত একটি শহরে আর লসএঞ্জেলসে যত মানুষ, তত গাড়ী, তত গোলমাল আর রাত্রিবেলায় চোখ ধাঁধানো আলো। এই শহর আমার ভালো লাগে না। তবুও আমাকে আসতে হয়েছে, কারণ আমি ডাক পেয়েছি। কিসের ডাক? শীঘ্রই জানা যাবে।

শহরের কেন্দ্রস্থলে একটা হোটেলে আমি উঠেছি। নিজের ঘরে ঢুকে জানালা দিয়ে বাইরের আকাশে একবার চেয়ে দেখলুম। কেন? জানিনা। কোনো প্রেরণা লাভের উদ্দেশ্যে? তাও তো বলতে পারছি না।

এখন সবে বিকেল চারটে বেজেছে। নিচে ককটেল বারে কিছু লোক আমাকে চিনে ফেলল। খ্যাতির বিড়ম্বনা। ইতিমধ্যে আমার বই 'ফ্লাইং সসারস্ হ্যাভ ল্যাণ্ডেড' প্রকাশিতও হয়েছে, রেডিও ও টিভিতে বক্তৃতা দিয়েছি। ক্লাবে, কলেজ. হলে, বিজ্ঞান সভাতেও বক্তৃতা দিয়েছি, কাগজেও ছবি ছাপা হয়েছে।

আমাকে ওরা এক জায়গায় বসিয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। আমার খারাপ লাগছিল না। কোথা দিয়ে তিন ঘন্টা কেটে গেল। নিজের ঘরে ফিরে গেলুম। পোশাক পাল্টে বাইরে খেয়ে এলুম।

একজন মহিলার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। তাঁকে টেলিফোন করলুম। তিনি বললেন, আমাকে যেতে হবে না। তিনিই আমার হোটেলে আসছেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত কথা বলে মহিলা চলে গেলেন। আমি তাঁকে ট্যাক্সিকারে তুলে দিয়ে হোটেলের লবিতে বসে একটা সান্ধ্য সংস্করণ পড়তে লাগলুম।

কাগজ পড়তে ভালো লাগছে না। মন ভীষণ চঞ্চল। কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। এমন সময় দু'জন যুবক আমার দিকে এগিয়ে এলো। দু'জনেই আমার অপরিচিত। কিন্তু তারা যেন আমাকে অনেকদিন থেকে চেনে। এইভাবে তারা আমার দিকে এগিয়ে এসে একজন আমাকে ডাকল, মি. অ্যাডামস্কি!

দু'জনকে দেখে মনে হয় উঠতি ব্যবসায়ী। একজন ছ'ফুটের ওপর লম্বা, বয়স আন্দাজ তিরিশ। দেহবর্ণ ইংরেজীতে যাকে বলে 'রাডী'। চোখের তারা ঘোর বাদামী, দৃষ্টিতে বেশ কৌতুক মাখা। মাথার কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা।

অপরজন মাথায় খাটো, বয়স বোধহয় তিরিশ হয়নি, গোল মুখ বালকের মতো। বেশ ফর্সা, চোখের তারা নীলাভ ধূসর। মাথার চুল বাদামী এবং কোঁকড়ানো। কারও মাথায় টুপি নেই। দু'জনে যেনো দুই ভিন্ন দেশের মানুষ।

দ্বিতীয় যুবক মি. অ্যাডামস্কি বলে হ্যাণ্ডশেক করবার জন্যে হাসিমুখে তার হাত বাড়িয়ে দিলো। তখনও আমি জানি না এরা কে? কিন্তু যেই আমি হ্যাণ্ডশেক করলাম, অমনি আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

এইতো ১৯৫২ সালের ২০ নভেম্বর তারিখে অ্যারিজোনার মরু প্রান্তরে ভেনাস গ্রহের সেই যুবক আমার সঙ্গে এইভাবে হ্যাণ্ডশেক করেছিল। এতক্ষণ আমার মনে সন্দেহ উঁকিঝুঁকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারছিল, কিন্তু এবার আমি বুঝলাম এরা ভিন্ন গ্রহের মানুষ। কিন্তু দু'জনের চেহারার এত পার্থক্য কেন? পার্থক্য কেন পরে জানতে পেরেছিলুম।

ওদের মধ্যে যার বয়স কম সে আমাকে বলল, আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনাকে আমরা এখন একটু বাইরে নিয়ে যেতে চাই। আপনার কি সময় হবে?

নিশ্চয় চলুন। আমি কিছু চিন্তা না করেই রাজি হয়ে গেলুম।

হোটেল থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লুম, আমি মাঝখানে, ওরা দু'পাশে দু'জন। এক জায়গায় অনেক গাড়ী রাখা ছিল। একটা গাড়ীতে আমাকে ওরা উঠতে ইশারা করে নিজেরাও উঠল। কমবয়সী যুবকটি ড্রাইভারের সিটে বসল। গাড়ীখানা আমেরিকায় তৈরী, কালো রং, বেশ বড়, পন্টিয়াক সিডান।

আমরা বসার সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়ী ছেড়ে দিল এবং যে কোন সুদক্ষ ড্রাইভারের মতো গাড়ী চালিয়ে নিয়ে চলল। পথ তার উত্তমরূপে চেনা বলে মনে হলো। আমার খুব অবাক লাগছিল, আমি কোনো কথা বলতে পারছিলুম না, মনে নানা প্রশ্ন।

নীরবতা ভঙ্গ করে অপর যুবকটি যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল, আপনার ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়, কারণ এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাদের সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেননি, জিজ্ঞাসাও করেননি আমরা আপনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি।

আমি মৃদু স্বরে বললুম, আমি জানি তোমরা নিজেরাই বলবে।

মৃদু হেসে যুবক বলল, ঐ ছেলেটা যে গাড়ী চালাচ্ছে ও হলো মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা, যাকে তোমরা বল মার্স আর আমি আসছি শনি অর্থাৎ স্যাটার্ণ থেকে।

যুবকের বাচনভঙ্গি স্পষ্ট এবং উচ্চ স্বরে কথা বলে। কথা বলার ধরণ এমন চমৎকার যে, অবিশ্বাস করার কোনো কারণ পাওয়া যায় না।

গাড়ী চালাতে চালাতে দ্বিতীয় যুবক বলল, আমরা হলুম আমাদের গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগকারী ব্যক্তি, যাদের আপনারা বলেন 'কন্ট্যাক্টম্যান' (সেকালের ফেরেস্তা?)। আমরা পৃথিবীতে কয়েক বছর হলো আছি, গোড়ার দিকে আমাদের ইংরেজী উচ্চারণে কিছুটা জড়তা ছিল, কিন্তু এখন তা আমরা কাটিয়ে উঠেছি। আমরা এখন আপনাদের সঙ্গে মিশে গেছি। অন্য গ্রহের মানুষ বলে কেউ আমাদের চিনতে পারে না, অবশ্য আমরাও আমাদের পরিচয় কারো কাছে প্রকাশ করি না।

জ্যেষ্ঠ যুবক বলল, সেটা বিপজ্জনক হবে, তবে দেখুন, পৃথিবীর মানুষ তাদের যতটা না চিনতে পারে, আমরা তার চেয়ে বেশী চিনতে পারি।

আমি বললুম, বুঝেছি, তুমি বলতে চাইছ যে, আমি আমাদের আর একজন মানুষকে যতটা না চিনতে পারি, তার চেয়ে তোমরা আমাদের আরও ভালো করে চিনতে পার, এই তো?

ঠিক তাই, আচ্ছা একটা কথা, আপনি তো বিশ্বাস করেন যে, অন্য গ্রহে আমাদের মতোই মানুষ আছে এবং এজন্য আপনাকে অনেক বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে, কারণ আপনাদের বিজ্ঞানীরা বলেন যে, অন্য কোনো গ্রহে জীবন অসম্ভব। অতএব আপনি যদি এখন গাড়ী থামিয়ে চিৎকার করে রাস্তার মানুষদের বলেন যে, দেখ এই দু'টি মানুষ, এরা পৃথিবীর নয়, একজন মঙ্গল গ্রহের এবং অপরজন শনি গ্রহের — তাহলে অবস্থাটা কি হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে আমাকে তো পাগল বলবেই এবং তোমাদেরও হেনস্থা কম হবে না। কেউ বিশ্বাসই করবে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আমার মনে কিন্তু এক মিনিটের জন্যেও সন্দেহ জাগেনি। আমি ওদের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছি।

জ্যেষ্ঠ যুবক বলল, আমরা অবশ্য মাঝে মাঝে আমাদের গ্রহে ছুটি কাটিয়ে আসি। হ্যাঁ, বলিনি, আমরা দু'জনই এখানে চাকুরী করি এবং আমাদের মতো আরও অন্য গ্রহবাসী আছে।

আমার ইচ্ছে হয়েছিল, একবার জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি বিয়ে করেছ? তোমাদের বৌ-ছেলেমেয়ে কি এখানে থাকে? কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হলো, না ওরা একাই থাকে। কে জানে ওদের গ্রহে বিবাহ করার রীতি আছে, না অন্য কোনোরকম রীতি আছে। টেলিপ্যাথির দ্বারা ওরা যদি আমার মনের কথা বুঝতে পারে, তা হলে ওরা নিজেরাই জবাব দেবে।

আমি আবার মনে মনে ভাবতে লাগলুম, পৃথিবীতে তো আরো অনেক লোক আছে এবং অনেক বিজ্ঞানীও আছেন যারা বিশ্বাস করেন অন্য গ্রহে মানুষ থাকতে পারে না। তা ভিন্ন গ্রহের এই বাসিন্দারা তেমন মানুষ বা বিজ্ঞানীর সঙ্গে যোগাযোগ না করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল কেন? অবশ্য বায়ান্ন সালে বিশে জুন তারিখে ভেনাসের সেই মানুষটি আমাকে বলে গিয়েছিল যে, আমার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবে। কিন্তু এ'দের দু'জনের মধ্যে কেউ তো ভেনাসের মানুষ নয়। কারণ যা-ই হোক, মনে মনে আমি কৃতজ্ঞ।

স্যাটারিয়ান অর্থাৎ শনিবাসী আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল, তোমার সঙ্গে কিন্তু আমরা প্রথম যোগাযোগ করলুম না, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু কেউ আমাদের বিশ্বাস করেনি, কেউ করেছে, সে কথা সে অপরকে বলেছে, তার কথা তো বিশ্বাস করেনি উল্টো প্রচুর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে, এই ভয়ে বাকী ক'জন যারা আমাদের বিশ্বাস করেছে তারা আর মুখ খোলেনি।

প্রায় দেড় ঘন্টা গাড়ী চলল। কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছি না, বাইরে অন্ধকার (মে'রাজের ঘটনা সমস্তই ঘটেছে রাতে), এদিকের পথ-ঘাট আমি ভাল চিনিও না। আমিও জিজ্ঞাসা করিনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, ওরাও বলেনি।

সোজা রাস্তা ছেড়ে এবার গাড়ী ডানদিকে একটা কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল।

মঙ্গলবাসী বলল, তোমাকে আমরা অবাক করে দেব, অপেক্ষা কর।

মনে মনে বলি, অবাক তো করেই দিয়েছ।

যাই হোক, গাড়ী যাচ্ছে। রাস্তা নির্জন, কোনো গাড়ী বা মানুষ চলছে না। পনের মিনিট কাটল। কিন্তু দূরে ওটা কি? ঝিকমিক করছে, আবার অনুজ্জ্বল কি যেন একটা দাঁড়িয়ে আছে মাটির ওপর।

গাড়ী যখন আরও খানিকটা এগিয়ে গেল, তখন চিনতে পারলুম, অ্যারিজোনার ডেজার্ট সেন্টারে তিন মাস আগে দেখা সেই রকম একটা ফ্লাইং সসার। ওরা ওটাকে বলল — স্কাউট (বোরাক?)।

এই সসার বা স্কাউট আমার দেখা সসারের মতো প্রায়, তবে এর কিছু বেশী বোধহয়, কুড়ি ফুট হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়ী থামল। স্কাউটের কাছে গাড়ী থেমেছে। গাড়ীতে বসে দেখতে পেলুম স্কাউটটির সামনে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ কি কাজ করছে। গাড়ী থেকে নেমে আমরা সকলে সেই স্কাউটের কাছে এগিয়ে গেলুম। কাছে আসতে মানুষটি ঘুরে দাঁড়াল, আরে এতো আমার পরিচিত সেই ভেনুশিয়ান।

সে হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করে বলল, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। লক্ষ্য করলুম, সেবার সে কথা বলেনি, আকারে-ইঙ্গিতে ও টেলিপ্যাথির সাহায্যে আমরা ভাববিনিময় করেছিলুম। কিন্তু এবার সে কথা বলল, তবে এদের মতো স্পষ্ট নয়।

সে আরও বলল, স্কাউটটার একটা যন্ত্রাংশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সেটা এই ফাঁকে মেরামত করে নিলুম। কথা বলতে বলতে সে ছোট ধাতব একটা পদার্থ বালির ওপর ফেলে দিলো। আমি সেটা তুলে নিলুম এবং সেটি আমার কাছে এখনো আছে।

রাসায়নিকরা সেই ধাতুখণ্ডটি পরে পরীক্ষা করে রায় দিয়েছিলেন যে, এটি কোনো মৌলিক ধাতু নয়, একাধিক ধাতু মিশ্রিত অ্যালয়, তবে কি কি ধাতু মিশিয়ে অ্যালয় তৈরী হয়েছে তা তাঁরা বলতে পারেননি।

আমি যখন সেই ধাতুখণ্ডটি তুলে নিয়ে পকেটে রাখছিলুম, তখন ভেনুশিয়ান মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল, ওটা নিয়ে কি করবে? আমি বলেছিলুম, পরে কাজে লাগতে পারে, তোমাদের সংস্পর্শে যে এসেছিলুম তার হয়তো প্রমাণ দিতে পারবো।

মৃদু হেসে ভেনুশিয়ান বলেছিল, তোমরা আর্থবাসীরা সুভেনির সংগ্রহ করতে ভালবাস, তাই না?

আমি প্রতিবাদ করিনি। আমিও মৃদু হেসেছিলুম।

এই ভেনুশিয়ানের সঙ্গে পরে আমার মাঝে মাঝে দেখা হয়েছিল, তবে মঙ্গলবাসী ও শনিবাসীর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলুম। ওদের নাম জানিনা, জিজ্ঞাসাও করিনি। কিন্তু তাদের পরিচয়ের সুবিধের জন্য আমি মনে মনে ওদের নাম দিলুম। মঙ্গলবাসীর নাম দিলুম ফিরকন, শনিবাসীর নাম দিলুম রামু আর ভেনুশিয়ানের নাম দিলুম অরথন।

ফিরকন, রামু এবং অরথন এবার থেকে আমার সঙ্গী। পরে আরও সঙ্গী জুটেছিল। অরথন স্কাউটের ভেতর ঢুকবার সময় আমাকেও ভেতরে যেতে ইশারা করল। আমার হৃৎপিণ্ড বুঝি লাফিয়ে উঠলো। আমার আশা পূর্ণ হতে চলেছে। ফ্লাইং সসারের ভেতরে প্রবেশ করতে পারবো, হয়তো ওরা আমাকে মহাকাশে নিয়েও যাবে।

ফিরকন ও রামু আমাকে অনুসরণ করল। ফিরকন মানে সেই মঙ্গলবাসী বলল, কি তোমাকে বলেছিলুম না অবাক করে দেব?

অ্যাডামস্কি বলছেন, প্রথমেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ছোট একটি ঘরে। ঘর ছোট হলে কি হবে, দরজা কিন্তু বেশ উঁচু। ঘরে ঢুকবার সময় শনিবাসী লম্বা রামুকেও মাথা নীচু করতে হলো না। ঘরে ঢুকে রামু মেঝের এক জায়গায় পা দিয়ে টিপতেই দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। মেঝের নিচে এবং স্কাউটের মাথায় কোথাও মৃদু একটা আওয়াজ হচ্ছে।

ঘরে ঢুকে আমি অবাক। কোনদিকে চাইব? ছোট ঘর হলেও দেখবার ও লক্ষ্য করবার মতো কত কি রয়েছে! দরজা বন্ধ, জানালাও দেখা যাচ্ছে না, চারিদিক বন্ধ অথচ নিশ্বাস নিতেও কষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে না। আরও লক্ষ্য করলুম যে, রামু, ফিরকন বা অরথন মহাশূন্যে উঠবার জন্য বিশেষ কোনো পোশাক পরছে না বা আমাকেও পরতে দিচ্ছে না। তবে কি এরা আমাকে নিয়ে উপরে উঠবে না? সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলুম।

আমাকে এরা মহাশূন্যে বা অন্য কোনো গ্রহে নিয়ে যাক বা না যাক, আমি ততক্ষণে এই স্কাউটের গঠনপ্রণালী দেখে নিই।

প্রথমেই নজর করলুম, ঘরের মাঝখানে একটি স্তম্ভ, ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে। এই স্তম্ভটি নাকি মহাশূন্য থেকে চুম্বকশক্তি আহরণ করে আর সেই শক্তি হল এই স্কাউট চালক। স্তম্ভটি মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে বেশ বড় ও পরিষ্কার গোলাকার একটি লেন্সের ওপর। আর সেই লেন্স ঘিরে দুইপ্রান্তে দুটি অর্ধবৃত্তাকার বসবার বেঞ্চি রয়েছে।

লেন্সটির ব্যাস বোধহয় ছ'ফুট হবে। লেন্সটির গঠন নিখুঁত। পরিষ্কার কিন্তু স্বচ্ছ নয়, অর্ধ-স্বচ্ছ।

ফিরকন আমাকে একটি বেঞ্চে বসতে বলল, নিজে আমার পাশে বসে যন্ত্রপাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে লাগল। উল্টোদিকের বেঞ্চে বসল রামু আর অরথন গেল কন্ট্রোল রুমে।

এবার বোধহয় স্কাউট ওপরে উঠবে। আমার সেকি পুলক, কি উত্তেজনা। অরথন কন্ট্রোল রুমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ও রামুর সামনে রবারের মতো কোনো জিনিস দিয়ে তৈরী একটা বার ধীর গতিতে পড়ল। ফিরকন আমাকে ওটা ধরতে বলল। স্কাউট ওপরে উঠবার আগে ঝাকুনি প্রতিরোধ করবার জন্যে এই বার। আমাদের প্লেনের সিটবেল্ট আর কি। আমার কাছে সব অবিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। কিন্তু অবিশ্বাস করি কি করে? সবই তো আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

দেওয়ালে কয়েকটা বড় বড় চার্ট টাঙানো আছে। নানা রং, নানা চিহ্ন, কিছুই বুঝতে পারলাম না, ওরাও বলল না। আমিও জিজ্ঞাসা করলুম না।

ফিরকন বলল, এই স্কাউট চালাবার জন্যে দু'জন লোক দরকার হয়। সাধারণত এগুলিতে দু'জন লোকই থাকে। তবে দু'জনের বেশী লোক এরা বহন করতে পারে ; এই আমরা এখন যেমন চারজন বসে আছি।

অরথনের কন্ট্রোল রুম দেখতে পাচ্ছি। জটিল কোনো যন্ত্রপাতি চোখে পড়ল না। অধিকাংশ কাজই বোতাম টিপে করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে অরথনের সামনে যেন একটা অরগান রয়েছে, তার চাবি টিপে সে স্কাউট চালাচ্ছে।

নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা চোখে পড়ছে না তো? বিপদ ঘটলে এরা কি করে? প্যারাশুট থাকলেই বা কি হবে? প্যারাশুট খুলে মহাশূন্যে নামবে কোথায়? তবে কি মৃত্যুবরণ করে? নাকি আত্মহত্যা করে?

পাইলটের সিটের সামনে একটা পেরিস্কোপ রয়েছে। সেই পেরিস্কোপ দিয়েই পাইলট বাইরে দেখতে পায়। ফিরকন বলল, আমাদের এই স্কাউট ঠিক তোমাদের সাবমেরিনের মতো, নিচে দিয়ে না চলে জলের অনেক ওপর দিয়ে চলছে।

দেওয়ালে যে ম্যাপ ও চার্ট টাঙানো আছে, আমার নজর তখন সেদিকে, যদিও আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ইতিমধ্যে আমাদের স্কাউট ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছে, একবার শুধু একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃদু ঝাঁকুনি অনুভব করেছিলুম। ম্যাপ ও চার্টের দিকে চেয়েছিলুম, কিন্তু হঠাৎ দেখি কি স্থানবিশেষে আলো জ্বলে উঠছে, বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন উজ্জ্বলতার। পাইলট অর্থাৎ অরথন মাঝে মাঝে সেদিকে চেয়ে দেখছে। মনে হলো সেই আলো পাইলটকে নির্দেশ দিচ্ছে।

আমরা যে ঘরে বসে আছি সে ঘরে কিন্তু কোথাও অন্ধকার নেই, এমন কি কোণগুলিও আলোকিত। আলোর রং যে কি, তা আমি বলতে পারব না ; সাদা নয়, নীল নয়, নীলাভ সাদাও নয়, কি রকম তা বলতে পারব না। কিন্তু বেশ মৃদু আলো অথচ ঘরের প্রতিটি সামগ্রী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আমাদের স্কাউট এখন পৃথিবী থেকে অনেক অনেক ওপরে উঠেছে। আমি শারীরিক কোনো অসুবিধা বোধ করছি না, নিশ্বাস নিতেও কোনো কষ্ট হচ্ছে না। স্কাউটের ভেতর নিশ্চয়ই একই বায়ুচাপ রক্ষিত হচ্ছে এবং অনন্তর অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

ফিরকন বলল, নিচের দিকে লেন্সটা দেখছ? এই লেন্সের অনেক গুণ। পৃথিবীর যে কোনো জিনিস স্পষ্ট ও বড় আকারে দেখা যায়। এমনকি বিশেষ একটি বস্তু বা ব্যক্তিকেও পৃথকভাবে নজর করা সম্ভব।

ফিরকন আরও বলল, এই রকম একটি লেন্স স্কাউটের মাথায় আছে। সেটি দূর আকাশ দেখতে সাহায্য করে। মাঝখানে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পোলটি রয়েছে, ওটিই দূরবীনের কাজ করছে, আবার ওটিই এই স্কাউটের শক্তির উৎস।

দু'টি পৃথক পর্দায় নিচের দিক ও ওপরের দিক দেখবার ব্যবস্থা আছে, যেন দু'টি টি, ভি স্ক্রীন। আমি একটিতে আমাদের পৃথিবীর দৃশ্য এবং অপরটিতে নক্ষত্র দেখতে লাগলুম। কয়েকটি চেনা নক্ষত্র দেখলুম। এগুলি আমার নিজের ছ' ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখার চেয়ে আরও ভালভাবে দেখা গেল।

ফিরকন বলল, নিচের দিকে দেখ, লেন্সের ভেতর চারটে মোটা মোটা কেবল দেখতে পাচ্ছ? ওদের কাজ কি? বলছি। এই স্কাউটের নিচে তিনটে বল আছে। স্কাউট যখন নিচে নামে তখন বলগুলিও নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়, তোমাদের প্লেনের চাকার মতো আর ওপরে ওঠবার সময় বল তিনটিকে গুটিয়ে নেওয়া হয়। বলগুলো ফাঁপা, ওগুলো বিদ্যুৎ ভাণ্ডার, মানে ওদের দু'রকম কাজ। স্কাউটের ম্যাগনেটিক পোল থেকে তিনটে কেবল বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে তিনটি বলে প্রবেশ করিয়ে দেয়। আর চতুর্থ কেবল-এর কাজ ভিন্ন, পাইলটের সামনে যে পেরিস্কোপ আছে সেই পেরিস্কোপ আর ম্যাগনেটিক পোলের সঙ্গে ঐ কেবল যুক্ত। কেবলগুলো সবসময় সক্রিয়। কিন্তু দেওয়ালের চার্টে আলো দেখে এদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে বেশিরভাগ যন্ত্রপাতি আছে স্কাউটের নিচে।

স্কাউট বা কোনো যন্ত্র বিকল হলে কি কর? আমি প্রশ্ন করি।

স্কাউট ছাড়বার আগে ভাল করে দেখে নেওয়া হয়, সেজন্যে খারাপ হয় না। কিন্তু তবুও যদি খারাপ হয় সেজন্যে প্রতি স্কাউটে একটা করে ছোট কারখানা ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আছে, ফিরকন বলল।

এরা আমাকে অনেক কিছু দেখাচ্ছে, অনেক কিছুর পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু কোন যন্ত্র কিভাবে কাজ করে তা বলছে না, জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দিচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরথনের গলা শুনলাম, তৈরী হও, এবার আমরা বড় মহাকাশযানে প্রবেশ করব।

সে কি? এইতো পৃথিবীতে ছিলুম! কয়েক মিনিটে এত ওপরে উঠে এলুম? অরথন বলল, হ্যাঁ, বেশী নয়, আমরা চল্লিশ হাজার ফুট ওপরে উঠেছি মাত্র, মাদারশিপ অপেক্ষা করছে, প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিনও এই মাদারশিপ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল, তোমরা সেদিন দেখেছিলে বোধহয়।

কথা বলতে বলতে অরথন পোর্টহোল খুলে দিল। পোর্টহোলের ব্যাস দেড় ফুটের মতো হবে। তার ভেতর দিয়ে নিচে এবং কিছু দূরে আমি মাদারশিপটি দেখতে পেলুম। শূন্যে এমন নিশ্চল হয়ে ভাসছে, যেন শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিরাট সিগারের আকারের সেই ক্যারিয়ারশিপ। ফিরকন বলল, ঐ ক্যারিয়ারশিপের ব্যাস দেড়শ' ফুট এবং লম্বায় দু'হাজার ফুট (ঈশ্বরের সিংহাসন?)।

অনতিবিলম্বে আমাদের স্কাউট সেই ক্যারিয়ারশিপের ওপর এলো, ক্যারিয়ারশিপের পিঠে বিরাট একটা ডানা যেন সরে গেল আর সেই ফাঁক দিয়ে আমাদের স্কাউট তার পেটের ভেতর ঢুকে পড়ল। এত আস্তে অবতরণ করল যে, আমি একটুও ঝাঁকুনি অনুভব করলুম না।

স্কাউট থেকে আমরা বেরিয়ে এলুম। বাইরে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতে একটা কেবল, কেবলের প্রান্তে কিছু একটা আটকানো রয়েছে। লোকটি আমাদের অভিবাদন জানিয়ে সেই কেবলটি স্কাউটের একটি অংশের সঙ্গে জুড়ে দিল।

আমি সেদিকে চাইতে রামু বলল, তোমাদের মটর গাড়ী যেমন পেট্রল পাম্পে দাঁড়ালে পাম্প থেকে নজল লাগানো হোসপাইপ দিয়ে পেট্রল ট্যাংকে পেট্রল ভরে দেওয়া হয়, এটাও সেই রকম করা হচ্ছে। তবে পেট্রলের বদলে আমরা অন্য শক্তি বা 'জ্বালানি' ভরে দিচ্ছি। বাইরে যাবার জন্যে স্কাউট সব সময় প্রস্তুত রাখা হয়, কে জানে কার কখন ডাক পড়বে!

ভেতরটা বিরাট, প্রচুর জায়গা। এই ক্যারিয়ারশিপে ছ'টা স্কাউট থাকে। এর ভেতর যেমন কারখানা ও ল্যাবরেটরি আছে, তেমন সকল রকম আরামের ব্যবস্থাও আছে।

আমি শুধু ভাবছি, এত বড় একটা মহাকাশযান এমন নিশ্চল হয়ে কি করে দাঁড়িয়ে আছে!

একধারে মহাকাশযানটি চালাবার জন্যে বেশ বড় একটি কন্ট্রোল রুম রয়েছে। দেওয়ালে নানা রকম চার্ট, ম্যাপ, গ্রাফ। এর মধ্যে আবার এক জায়গায় একটি শক্তিশালী টেলিস্কোপ বসানো আছে।

সমস্ত মহাকাশযানটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোনো গোলমাল নেই, নেই কোনো তাড়াহুড়োর লক্ষণ। একটা রেডিও রুম তো থাকা দরকার, কিন্তু সেরকম কিছু দেখা গেল না।

আমাকে বসতে বলা হলো। বসবার ব্যবস্থাও বেশ ভালো। সোফা, কৌচ, ডিভান এবং অনুচ্চ টেবিল দ্বারা সুসজ্জিত। সোফাগুলিও বেশ আরামপ্রদ। বেশ সুন্দর কোমল আলোয় মহাকাশযানটি আলোকিত। আমি আরাম করে বসলুম। যা কিছু দেখছি সবেতেই অবাক হচ্ছি। কিন্তু এবার যা দেখলুম তাতে আরও অবাক। দেখলুম দু'টি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী (হুর-গেলমান?) আমার দিকে এগিয়ে আসছে। যুবতী এবং এত সুন্দরী মহাকাশচারী আমি আশা করিনি বলেই অবাক হলুম।

ওরা এসে প্রথমে তাদের হাত দিয়ে আমার হাত স্পর্শ করল এবং পরে অতি আলতোভাবে ওষ্ঠ দিয়ে আমার গাল স্পর্শ করল মাত্র। ওরা যে সুন্দরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্বক প্রায় স্বচ্ছ। ভালো করে তাদের অনাবৃত দেহ দেখলে বোধহয় দেহের অভ্যন্তরের রক্ত চলাচল এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ দেখা যাবে। একজন আমাকে এক গ্লাস পানীয় দিল (শরাবুন তহুর?)। পান করলুম, শুধু জল কিন্তু একটু ঘন। তেষ্টা পেয়েছিল, সব জলটুকু পান করে ফেললুম। জল পান করতে করতে লক্ষ্য করলুম যুবতী দু'টির পরনে গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলওয়ালা এবং কবজি পর্যন্ত হাতওয়ালা একরকম হালকা রঙের গাউন। সেই পোষাক কি কাপড়ের তা বলতে পারব না, তবে দেখে মনে হয় সিল্ক। পায়ে স্যাণ্ডাল।

দু'টি মেয়ের গায়ের রঙে সামান্য পার্থক্য। দুজনেই ফর্সা, তবে একজন ওরই মধ্যে সামান্য মলিন। শুনলুম সে মঙ্গলবাসিনী। আমি তার নাম দিলুম ইলমুখ আর অপরজন শুনলুম ভেনাসবাসিনী। তার নাম ভেনাস দেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আমি তার নাম দিলুম কালনা।

আমরা বসে কথা বলতে আরম্ভ করলুম। জানতে পারলুম যে, ওরা আরও বড় মহাকাশযান এবং দূরপাল্লার মহাকাশযান তৈরী করেছে। প্রতিটি মহাকাশযান স্বয়ংসম্পূর্ণ। ওরা মহাকাশে ঘুরে বেড়ায়। যে গ্রহে জীব আছে এবং তারা মানুষের মতই জীব, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করাই হলো তাদের উদ্দেশ্য। তারাও অনেকে মহাকাশযান তৈরি করেছে এবং তারাও অন্য গ্রহের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সেইসব গ্রহে যাওয়া-আসা করে। ব্যতিক্রম পৃথিবী। পৃথিবীবাসীরা গ্রহান্তরের জীবদের নাকি সুনজরে দেখে না।

আমি প্রশ্ন করলুম, তোমাদের ক্যারিয়ারশিপগুলোর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে কত মাইল? অরথন উত্তর দিল। সে বলল, মহাশূন্যে যে প্রবাহ বইছে আমরা সেই প্রবাহ অনুসরণ করে প্রবাহ স্রোতে ভেসে যাই। সেই প্রবাহ স্রোতের যে গতি, আমাদের গতিও তাই।

অরথন আর ইলমুখ উঠে পড়ল। অরথন বলল, তাদের সময় হয়ে গেছে। আমি মনে মনে ভাবি, কিসের সময়? অরথন বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলো, বলল, দেখতেই পাবে।

একটু পরেই দেখি, ওরা দু'জনে এলো পাইলটের পোশাক পরে। আমাদের পৃথিবীর পাইলটের মতো নয়। এদের পোশাক অনেক হাল্কা। দেখে মনে হয় যেন স্কি করতে যাচ্ছে। কিন্তু যারা স্কি করে তারা পশমের মোটা পোশাক পরে। এদের পোশাকের স্টাইলটা সেই রকম কিন্তু অনেক হাল্কা। ওরা দু'জনে এবার বিরাট স্পেস ক্যারিয়ার চালিয়ে নিয়ে যাবে।

কোথায় নিয়ে যাবে? কোনো একটি গ্রহে? মঙ্গল, ভেনাস, শনি? আমিই কি প্রথম মানুষ হবো এই গ্রহ তিনটির একটিতে অবতরণ করতে, নাকি আমার আগে ওরা অন্য মানুষ নিয়ে গেছে?

আমি বসে ফিরকন, রামু এবং কালনার সঙ্গে কথা বলতে লাগলুম। ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এইটুকু বুঝেছিলুম যে, ওরা আমাদের পৃথিবীর সমস্ত খবরই রাখে।

মাঝে মাঝে কন্ট্রোল রুম থেকে অরথন বা ইলমুখ এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। ওরা আমার ওপর বেশ অনেক দিন থেকে নজর রেখেছিল এবং ঠিকই করে রেখেছিল যে, আমাকে ওরা ওদের মহাকাশযানে নিয়ে আসবে এবং ওদের নিজেদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানাবে, যাতে আমি নাকি সে সব কথা পৃথিবীতে ফিরে এসে মর্ত্যবাসীদের জানাতে পারি। জানাতে তো পারি এবং জানাচ্ছিও। কিন্তু আমার কথা ক'জন বিশ্বাস করবে? অথচ আমি যা বলছি এর প্রতিটি কথা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য — কেউ বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক।

এই তো ১৯৫১ সালে কোরিয়ার পশ্চিমে ইনচন উপসাগরে একটি সি-প্লেন থেকে সমুদ্রের ভেতরে একটি মিসাইল ক্ষেপণ করা হলো। উৎক্ষিপ্ত মিসাইলটি সবেগে সমুদ্রে ডুবে গেল, প্রতিক্রিয়ার ফলে সমুদ্রের জল একশ ফুট পর্যন্ত উচ্চে উঠল এবং একটু পরে দেখা গেল সেই মিসাইলটি সমুদ্রের ভেতর থেকে বেরিয়ে সমান বেগে আকাশে উঠে শূন্যে মিলিয়ে গেল। ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল স্কটল্যাণ্ড থেকে কিছু দূরে সমুদ্রে। এই ঘটনা শুনে কেউ তা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এ দৃশ্য বহু নরনারী প্রত্যক্ষ করেছে।

কন্ট্রোল রুম থেকে ইলমুথ একবার বেরিয়ে এসে বলল, আমরা এখন তোমাদের পৃথিবী থেকে পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে। ইলমুথ একটা পোর্টহোল খুলে দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল, ঐ তোমাদের পৃথিবী।

আমি দেখলুম — আমাদের পৃথিবীর ওপর সূর্যের আলো পড়েছে, পৃথিবী জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু চাঁদের মতো তার আলো স্নিগ্ধ নয়।

অন্ধকার আকাশে আমি দেখলুম কত নক্ষত্র, কেউ জোনাকির মতো ঝিকমিক করছে, কারো দীপ্তি প্রখর, কারো ম্লান। আমি অভিভূত। ও আমাকে সমস্ত ক্যারিয়ার দেখাল। বলল, এটা তো ছোট, এতে মাত্র তিরিশজন মানুষ আছে, কিন্তু আমাদের এমন স্পেসশিপ আছে যা হাজার হাজার মানুষ বহন করতে পারে।

আমি প্রশ্ন করি, সেই বিশাল স্পেসশিপের মালিক কোন্ গ্রহ?

কোনো গ্রহই নয়। যখন যার দরকার সে ব্যবহার করতে পারে। ইলমুথ বলল, তুমি বুঝি কেবল তিনটে গ্রহের কথা ভাবছ? এই মহাশূন্যে অনেক গ্রহ আছে, যেখানে সভ্য ও উন্নত মানুষ বাস করে। তাদের কেউ আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে, আবার অনেকে তোমাদের চেয়েও পিছিয়ে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে এখন কন্ট্রোল রুম থেকে চলে এসেছ, তা তোমার ডিউটি কে করছে?

কেন? রোবট আছে। সে এই স্পেসশিপ চালাচ্ছে। তবে কন্ট্রোল রুমে অরথন আছে, আমি ফিরে গেলে অরথন আসবে, তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

দেওয়ালে কয়েকখানা ছবি টাঙানো রয়েছে। বেশিরভাগ প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু আমার চোখের সামনে একটা দরজার মাথায় বেশ বড় একখানা ছবি টাঙানো রয়েছে। ছবিখানা দেখে আমার মনে হলো এ ছবি নিশ্চয়ই কোনো দেবতার।

সে দেবতার নাম কি? আমি কালনাকে প্রশ্ন করি — এ ছবি কি কোনো দেবতার? তাঁর নাম কি?

তোমরা যাকে দেবতা বল ইনি তা নন, তবে ইনি হলেন আমাদের মহত্তম পুরুষ। আমি এঁকে দেখিনি, এর কত বয়স আমি জানি না, কোন্ গ্রহে থাকেন তা-ও জানি না, তবে শুনেছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এঁরই নির্দেশে আমরা পরিচালিত হই।

তোমাদের ভেতর কেউ দেখেনি? আমি প্রশ্ন করি।

হ্যাঁ দেখেছেন, তাঁকে তুমিও শীঘ্রই দেখতে পারে, তোমাদের ভাষায় তিনি আমাদের প্রভু (ঈশ্বর)। আমরাও ক্বচিৎ তাঁকে দেখতে পাই। এই মহাকাশযানে তিনি আছেন, কিন্তু আজও তাঁর দর্শন পাইনি। তোমাকে কিছু বলবার জন্য তিনি এসেছেন, তোমার সঙ্গে আমরাও তাঁর দর্শন পাব, তাঁর কথা শুনবো, তাঁর দেওয়া উপদেশ পালন করব।

পৃথিবী ছাড়ার পর থেকে আমি বোধহয় মহাশূন্যে একঘন্টাকাল বিচরণ করছি, কিন্তু এর মধ্যে আমার মনের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। বসে বসে এইসব কথাই চিন্তা করছি।

হঠাৎ অনুভব করলুম আমার সামনের চেয়ারে কোনো জ্যোতির্ময় পুরুষ বসে আছেন। মুখ তুলে দেখি ঠিক তাই। তাঁকে দেখে আমার মনে হলো, আমি কি যীশুর সামনে বসে আছি? তাঁকে দেখছি?

না, ইনি যীশু নন, তবে নিঃসন্দেহে একজন মহাপুরুষ। শুনলুম এঁর বয়স হাজার বৎসর। সে কি? দেখে তো মনে হচ্ছে শত বৎসর পূর্ণ হতে এখনও অনেক দেরি।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে রামু বলল, আমরা যেমন পুরনো জামা ত্যাগ করে নতুন জামা পরি, ইনিও তেমনি পুরনো দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহে প্রবেশ করেন।

তিনি (মহাপ্রভু) কিন্তু আমার সঙ্গে খুব সাধারণভাবে কথা আরম্ভ করলেন। বললেন, তোমাকে আমরা আমাদের ছোট ও বড় আকাশযান দেখিয়েছি, নক্ষত্রলোকের সঙ্গে কিছু পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, যাতে তুমি পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে তোমার দেশবাসীকে এসব কথা বলতে পারো। পৃথিবী যে পারমাণবিক শক্তি নিয়ে পরীক্ষা করছে এবং মারণাস্ত্র তৈরী করছে, এজন্য তিনি শংকিত। পার্থিব মানুষের ঐখানেই ত্রুটি, তারা শান্তিতে বাস করতে পারছে না।

তিনি বললেন, আমাদের বিষয়ে তোমাদের কিছুই জানা নেই, আমরা আমাদের বিষয়ে জানাবার জন্যে দীর্ঘদিন থেকে চেষ্টা করছি, কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি না। তিনি অনেক কথা বললেন, যার মূল সুর হলো শান্তি।

তাঁর কাছ থেকে জানলুম যে, তাঁরা পৃথিবীতে মাঝে মাঝে সৎ মানুষ পাঠাচ্ছেন, যাঁরা মানুষকে সৎশিক্ষা দিয়ে উন্নত স্তরে পৌঁছে দিতে পারেন। যীশু হলেন এইরকম একজন মানুষ। যীশুকে তাঁরাই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। পৃথিবী থেকে কিছু মানুষ তাঁরা উঠিয়ে (মে'রাজে) এনে, তাদের শিখিয়ে আবার পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর মানুষ তাদের বুঝতে পারেনি, তাদের শিক্ষা গ্রহণ করেনি ; তাদের তারা পাগলা গারদে নিক্ষেপ করেছে বা হত্যা করেছে।

বিদায় নেবার আগে তিনি বললেন যে, এখনও সময় আছে। তিনি আশা করেন যে, পৃথিবীর মানুষ সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে শান্তিতে বাস করবে। শেষ কথা বললেন, সেই মহত্তম পুরুষ যাকে আমরা মানবশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি, যাঁর ছবি তুমি দেখতে পাচ্ছ, তাঁর আশীর্বাদ তোমার ওপর বর্ষিত হোক। পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে তুমি আমাদের কথা বোলো।

তিনি বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে রামু, ফিরকন, কালনা এবং অরথন এসে আমার সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করতে লাগল। মাঝে মাঝে ইলমুখ এসে যোগ দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ আলোচনা চলছিল এমন সময় রামু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল এবার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি, আজ সময় হয়ে গেছে। স্কাউট রেডি করা হয়েছে। ফিরকন আমাদের সঙ্গে যাবে।

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আমি রামু ও ফিরকনের সঙ্গে স্কাউটে গিয়ে উঠলুম। রামু কন্ট্রোলের সামনে বসল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি চুপ করে বসে আছি। আমি যেন আমার মধ্যে নেই। মনকে কিছুতেই স্থির করতে পারছি না। কি দেখলুম, কি শুনলুম এবং কি করব, নানারকম চিন্তা, সকল চিন্তাধারাকে কিছুতেই একটি ধারায় আনতে পারছি না।

কতক্ষণ যে এই অবস্থায় ছিলুম জানি না, ফিরকনের কথায় চমক ভাঙল, আমরা এসে গেছি, পৃথিবীতে পৌঁছে গেছি। এবার আমরা পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করছি না, মাত্র ছ'ইঞ্চি ওপরে ভাসছি।

কন্ট্রোল থেকে উঠে এসে রামু আমার হাত স্পর্শ করে বলল, তোমাকে ফিরকন তোমার হোটেলে পৌঁছে দেবে। আশা করি তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

ফিরকন ও আমি স্কাউট থেকে বেরিয়ে এলুম। কিছুদূর হেঁটে গিয়ে গাড়ীতে উঠলুম। সেই পন্টিয়াক গাড়ী সেই নির্জন প্রান্তরে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। ফিরকন গাড়ী চালিয়ে আমাকে নিয়ে চলল। পথে একটাও কথা হলো না। আমি অভিভূত, কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছি। জানি না আমার মতো এই বিরল অভিজ্ঞতা আর কারও হয়েছে কি না।

হোটেলের সামনে গাড়ী থামিয়ে ফিরকন আমার হাত স্পর্শ করে বলল, শিগগির আবার দেখা হবে, তোমাকে আমরা জানিয়ে দেব মানে তুমি নিজেই অনুভব করবে — কবে, কখন ও কোথায় আমাদের দেখা হবে (এর পরেও নাকি এ মহাকাশচারীদের সাথে জর্জ অ্যাডামস্কির একাধিকবার যোগাযোগ ঘটেছিল। শেষবারে ঘটেছিল ২৮ মার্চ, ১৯৬২ সালে — লেখক)।

আমি গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে হাত তুলে ফিরকনকে বিদায় জানালুম। রাস্তা তখন নির্জন, একটিও লোক ছিল না। হোটেলে প্রবেশ করে নিজের ঘরে ঢুকলুম। এই প্রথম আমার ঘড়ির কথা মনে পড়ল, দেখলুম শেষরাত্রি, ৫টা বেজে ১০ মিনিট। এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে মহাশূন্যে আমি অন্তত পঞ্চাশ হাজার মাইল ঘুরে এসেছি।

খাটের প্রান্তে বসে পড়লুম। শুতে ভুলে গেলুম। কিন্তু চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল বেলা আটটার সময়।

ব্রেকফাষ্ট সেরে বাসে চেপে আমি প্যালোমারে ভ্যালি সেন্টারে আমার বাড়িতে ফিরে এলুম।[৬]

দূর অতীতের মানুষের কাছে স্বর্গ তথা আকাশ ভ্রমণ করাটা ছিলো একটি অলৌকিক ব্যাপার। তা বিশ্বাস করা শুধুমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিতেই সম্ভব ছিলো — 'ঐশ্বরিক ঘটনা' বলে। অলৌকিকে বিশ্বাস রাখে এবং রাখে না, এমন কিছু মানুষ সেকালেও ছিলো এবং একালেও আছে। কিন্তু লৌকিকে বিশ্বাস রাখে না, এমন মানুষ সব যুগেই বিরল। কেননা বাস্তবকে অবিশ্বাস করার মানে নিজেকেই অবিশ্বাস করা।

মহাকাশ তথা স্বর্গ ভ্রমণ এখন আর অলৌকিক নয়, বর্তমানে তা হচ্ছে একান্তই লৌকিক ঘটনা। মানুষ চাঁদে অবতরণ করেছে, তা এখন গুরুবাদীরাও অস্বীকার করতে পারেন না। শুক্র,

৬. প্ল্যানেট মিসট্রি, চিরঞ্জীব সেন, ১ম প্রকাশ ১৩৮৬, পৃ. ৫৬—৬৪, ৬৬—৭৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঙ্গল ইত্যাদি গ্রহে রকেট পাঠানো হচ্ছে। নিকট ভবিষ্যতে হয়তো সেখানেও মানুষ অবতরণ করবে।

> সৌরজগতের ভিতরে ও তার বাইরে নক্ষত্র-জগতের কোনো গ্রহে কোনোরূপ বুদ্ধিমান জীব আছে কি-না, তার খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে এবং তাদের সাথে বেতার যোগাযোগের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাকি ইংগিতও পাওয়া যাচ্ছে দূর আকাশে বুদ্ধিমান কোনোরূপ জীব থাকার।

জর্জ অ্যাডামস্কির মহাকাশ ভ্রমণের বিবৃতিটি হচ্ছে লৌকিক ঘটনার একটি বাস্তবভিত্তিক বর্ণনা। জানি না আধুনিক সুধীমহল বিশেষত বিজ্ঞানীমহল তা কোন্ পর্যায়ে নিয়ে যাবেন। অ্যাডামস্কির বর্ণনার বাস্তবতা প্রমাণিত হ'লে — দূরাতীতের সকল মহাকাশচারীদের মহাকাশচারণও অনুরূপ সত্য, একথা 'অনুমান' করা অসঙ্গত নয়।

ঈশ্বর নিরাকার ও সর্বব্যাপী, ধর্মজগতে ইহা সর্বত্র স্বীকৃত। ধর্মজগতের বাইরে নাস্তিকমহলে তথাকথিত ঈশ্বরকে মেনে নেয়া হয় না বটে, তবে তাঁরাও এমন একটি মৌলিক শক্তিকে 'বিশ্বনিয়ন্তা' বলে মেনে নিয়ে থাকেন যে, সে শক্তিও নিরাকার এবং সর্বব্যাপী। এ ক্ষেত্রে আস্তিক ও নাস্তিক মতবাদে বিশেষ পার্থক্য নেই। কিন্তু নাস্তিকরা — 'নিরাকার' অথচ 'সাকার', এরূপ দ্বিমুখী ঈশ্বরতত্ত্ব মেনে নিতে রাজী নন। তাই তাঁদের বলা হয় নাস্তিক।

> ধর্মজগতে সাকার ও নিরাকারের — এ দু'ধরণের মতবাদ প্রচলিত থাকলেও নিরাকারবাদীগণও প্রকারান্তরে সাকারবাদীই বটে। যেহেতু বলা হয় যে, ঈশ্বর দেখেন, শোনেন, কথা বলেন, ক্রুদ্ধ হন, খুশি ও বেজার হন, সময়ে হাঁটাচলাও করেন অথচ তিনি বসে আছেন মহাশূন্যের একটি নির্দিষ্ট স্থানে (সিংহাসনে)। সেখানে বসেই নাকি তিনি দূতের মারফতে পৃথিবীর মানুষকে সদুপদেশ দান করেন, যাবতীয় কার্য পরিদর্শন ও পরিচালনা করেন এবং সময় সময় পৃথিবীতেও আসেন ; যেমন এসেছিলেন হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে বাক্যালাপ করার জন্য তুর পর্বতে।

মহাকাশ ভ্রমণকারী মনীষীগণ মহাকাশ ভ্রমণে গিয়ে যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং যাঁর কাছে মানব-কল্যাণের জন্য নানাবিধ আদেশ-উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন — তিনি প্রভু, মহাপ্রভু যিনিই হোন, তিনি সর্বব্যাপী ও নিরাকার ঈশ্বর নন, নির্দ্বিধায় তা 'অনুমান' করা চলে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শয়তানের জবানবন্দি

বোশেখ মাস, আকাশ পরিষ্কার, বায়ু স্তব্ধ। রাতটি ছিল অতি গরমের। বৈঠকঘরের বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি ; ঘুম আসে না গরমে। মনে হয় যেনো জাহাজে বয়লারের কাছে শুয়েছি অন্যত্র জায়গা না পেয়ে। মনটা ছোটাছুটি করছে তাপের লেজ ধরে কল্পনাজগতের নানা পথে। ভাবছি তাপ দু'প্রকার — কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক। কৃত্রিম তাপ কমানো যায়, বাড়ানো যায়, নতুবা তাপের উৎস থেকে দূরে সরে যাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক তাপের বেলায় সবসময় তা পারা যায় না। আজকের এ তাপের উৎস হচ্ছে সূর্য। যার স্থানীয় তাপমাত্র ৬০০০ হাজার ডিগ্রী (সে.) এবং দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। শোনা যায় যে, দোজখের আগুনের তাপ নাকি সে আগুনের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী। অর্থাৎ ৪,২০,০০০ ডিগ্রী (সে.) এবং তা হবে মানুষের কাছে দূরত্বহীন। কেননা সে আগুনের ভিতরেই নাকি থাকতে হবে তাবৎ বিধর্মী বা অধার্মিক মানুষকে। তা-ও আবার দশ-বিশ বছর নয়, অনন্তকাল। মানুষের এহেন কষ্টভোগের কারণ নাকি একমাত্র শয়তান। তাই বিশ্বাসী মানুষ মাত্রেই শয়তানের উপর অত্যন্ত ক্ষ্যাপা।

শয়তান নাকি পূর্বে ছিলো 'মোকরম' নামে একজন প্রথম শ্রেণীর ফেরেস্তা এবং অত্যন্ত মুছল্লি। সে নাকি এতই খোদাভক্ত ছিলো যে, জগতে এতটুকু স্থান বাকি নেই, যেখানে তার সেজদা পড়েনি। কিন্তু আল্লাহতা'লার হুকুম মোতাবেক নাকি বাবা আদমকে সেজদা না করায় তার ফেরেস্তার পদ ও মর্যাদা নষ্ট হয়। তাই সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বাবা আদম ও তার বংশাবলীকে দাগা অর্থাৎ অসৎকাজে প্ররোচনা দিয়ে নাকি দোজখী বানাচ্ছে। সামান্য পদমর্যাদা হানির বিনিময়ে গোটা আদম জাতির অগণিত মানুষের দোজখবাসের কারণ হয়ে থাকলে শয়তান তো মানুষের সাধারণ শত্রু নয় — মহাশত্রু, পরমশত্রু, মহাপরমশত্রুই বটে। শয়তানের স্বভাব-চরিত্র, কার্যকলাপ ও বাসস্থান সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে শেষরাত্রে গরমটা কিছু কমে যাওয়ায় আরাম বোধ করতে লাগলাম এবং মনের ভাবনাগুলোও স্তিমিত হলো। এ সময় শুনতে পেলাম, কে যেন কোমল কণ্ঠে মৃদুস্বরে আমাকে দরজা থেকে ডাকছে।

আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম আগন্তুক আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সে এক সৌম্য মূর্তি। পরনে সাদা পাজামা, গায়ে সাদা জুব্বা, মাথায় (লেজওয়ালা) সাদা পাগড়ী এবং বুক ভরা সাদা দাড়ি, সুঠাম সুডৌল তেজোদীপ্ত চেহারা। তাঁর চোখেমুখে প্রকাশ পাচ্ছে আনন্দ ও বুদ্ধির জ্যোতি। জীবনে এমন মানুষ কখনো দেখিনি, কোনরূপ আবেগ উৎকণ্ঠা নেই, 'নতুন স্থান' বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই কোন কিছু নিরীক্ষণের প্রয়াস। এখানের পথঘাট, গাছপালা ও ঘরবাড়ি যেনো তাঁর সবই চেনা। ভাবলাম, লোকটা আলেম তো হবেনই, মুছল্লিও বটেন। কিছু দূরে থাকতে তিনি আমাকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানালেন, কাছে গেলে করমর্দন করলেন। আমি আমার বৈঠকঘরে প্রবেশ করে একখানা চেয়ার দেখিয়ে সসম্ভ্রমে তাঁকে বললাম — বসুন জনাব।

আগন্তুকটির পরিচয় জানার আগ্রহ নিয়ে আমি তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতে তিনি তা যেনো বুঝে ফেললেন এবং আমাকে বললেন, "আমার পরিচয় জানতে চান? আমার পরিচয় আপনি ভালো করেই জানেন। আর আপনি একাই নন, আমার পরিচয় সকল মানুষই জানে এবং ভালোভাবেই জানে। কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত আমাকে দেখেনি, দেখেননি আপনিও। পৃথিবীর জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সবখানে আমার অবাধ গতি। আমি সকল মানুষের সাথেই মেলামেশা করতে চাই, চাই ভালোবাসা করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার সাথে কেউ মেলামেশা করতে চায় না। আমার মাতাপিতা নেই ; ছিলোও না কোনোদিন। আমি আল্লাহতা'লার নূরে তৈরী, কুদরতে সৃষ্টি, জন্মসূত্রে আমার নাম 'মকরম ফেরেস্তা', পরে 'ইবলিশ' এবং হাল নাম 'শয়তান'।"

আগন্তুকের নামটি শুনে আমি ভড়কে গেলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, তার সাথে আমি কি কথা বলবো এবং কিভাবে বলবো। কোনো বিষয় কিছু ভাবতে সাহস হচ্ছে না। কেননা তিনি যেনো আমার মনের ভাবনাগুলোও দেখতে পাচ্ছেন। স্থির করলাম — কিছু ভাববো না, বলবো না কিছু, নীরব-নিশ্চিন্তে শুনে যাব শুধু, যা বলবার তিনিই বলুন। এখন সমস্যা হলো যে আগন্তুককে সম্মান প্রদর্শন করবো কি করবো না, তবে বেশ-ভূষায় তো সম্মানের পাত্রই বটেন।

AMARBOI.COM

আমার মৌনভাব দেখে আগন্তুক যেনো আমার মনের কথা সমস্তই বুঝতে পারলেন এবং অনর্গল বলে যেতে লাগলেন, "যে কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মুরব্বি বলা হয় এবং সভ্যাসভ্য তাবৎ মানুষ জাতির মধ্যেই 'মুরব্বি ব্যক্তি সম্মানের পাত্র'। মানুষের মধ্যে কারো কোনো মুরব্বি ব্যক্তির বয়সের জ্যেষ্ঠতা সচরাচর দশ-বিশ কিংবা পঞ্চাশ-ষাট বছর, কদাচিৎ একশ'। কিন্তু আপনাদের আদি পিতা আদম যখন সৃষ্ট হন, আমি তখন বেশ সেয়ানা এবং আজো বেঁচে আছি। সুতরাং বয়সের হিসাবে শুধু আপনারই নয়, আমি সমস্ত মানুষ জাতির মুরব্বি।

"আল্লাহ সর্বাগ্রে ফেরেস্তা বানিয়েছেন, পরে জ্বীন বানিয়েছেন এবং সর্বশেষে বানিয়েছেন আদমকে। ইসায়ীরা সৃষ্টিকর্তাকে 'পিতা' বলেই সম্বোধন করে থাকে। কাজেই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে আদমকে আমার ভাইও বলতে পারি, তবে বয়সে কনিষ্ঠ। আপনাদের সমাজে বা মানব সমাজে কারো কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম (সেজদা) করবার রীতি আছে কি? হয়তো নেই। তা হলে আদমকে সেজদা না করে আমি নীতিবহির্ভূত কাজ করিনি, করেছি আল্লাহতা'লার আদেশ লঙ্ঘন। কিন্তু আদেশ যিনি করেছেন, তা লঙ্ঘন করার শক্তিও তিনিই দান করেছেন। জগতে কারো এমন কোনো শক্তি নেই, যার সে শক্তি দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাশক্তিকে পরাস্ত করে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে কার্যকরী করতে পারে। আল্লাহ জানতেন যে, আমি তাঁর হুকুমে আদমকে সেজদা করবো না, আদম তাঁর নিষেধ মেনে গন্ধম খাওয়া ত্যাগ করবে না এবং আদমের আওলাদরা তাঁর আদেশ-নিষেধ কেউ মানবে, কেউ মানবে না। তা না জানলে তিনি আদমকে সৃষ্টি করার পূর্বে, বিশেষত আমাকে শয়তান বানাবার পূর্বে বেহেস্ত-দোজখ নির্মাণ করলেন কি করে, কি জন্য?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি লাখো লাখো বছর আল্লাহকে সেজদা করে এসেছি, এখনো করি। আমি বেঁচে থাকতে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করবো না, এ কথা তিনি জানেন এবং তিনি নিজেও বলেছেন, 'আমাকে ভিন্ন অন্য কাউকে সেজদা করো না'। আল্লাহর আসনে অন্য কাউকে বসালে তাতে তাঁর গৌরব বাড়ে কি-না, তা তিনিই বোঝেন। তথাপি তিনি আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেস্তাদের হুকুম করার কারণ — এটা তাঁর লীলা অর্থাৎ অন্তরের বাণী নয়।

"আল্লাহ সাতটি দোজখ বানিয়েছেন, সবগুলোতে মানুষ থাকার জন্য। তিনি কি চান যে, আমি আমার দাগাকাজ বন্ধ করি, আর তাঁর দোজখগুলো খালি থাক? তা তিনি চান না, চাইতে পারেন না। চাইলে তাঁর দোজখ বানাবার সার্থকতা ক্ষুণ্ন হয়। আল্লাহর ইচ্ছা যে, কিছুসংখ্যক মানুষ দোজখবাসী হোক। আর আমাকে বলেছেন তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণে সহায়তা করতে। এ কাজ আমার পক্ষে করা ফরজ, না করা হারাম।

"আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না, কেউই পারে না। বহু চেষ্টা করেও কোনো নবী-আম্বিয়া, দরবেশকে আমি দোজখবাসী করতে পারিনি। কেননা তাঁরা দোজখবাসী হোন, তা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। পক্ষান্তরে হজরত ইব্রাহিম নমরুদকে, হযরত মুসা ফেরাউনকে এবং শেষ নবী (দ.) আবু জেহেলকে হেদায়েত করে বেহেস্তের তালিকায় নাম লেখাতে পারেননি আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও। কেননা তা আল্লাহর ইচ্ছা নয়।

"আপনারা মনে করেন যে, আল্লাহর যতো সব রহমত মানুষের উপরই বর্ষিত হয়। বস্তুত তা নয়। আল্লাহর রহমত আমার উপর অনেক বেশী মানুষের তুলনায়। আদমকে সৃষ্টি করার কতো লাখ বছর পূর্বে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তা তিনিই জানেন। অথচ আল্লাহর রহমতে আমি আজও বেঁচে আছি। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে মাত্র ৬০, ৭০ কিংবা ১০০ বছর। তদুপরি শিশুমৃত্যু-অপমৃত্যু যথেষ্ট। আমার সুদীর্ঘ জীবনে আজ পর্যন্ত আমি কোনোরূপ রোগ, শোক বা অভাব ভোগ করিনি, আল্লাহর রহমতে। কিন্তু মানুষ অসংখ্য রোগ, শোক ও অভাবে জর্জরিত। ফেরেস্তারা আমাকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়েন আবহমান কাল থেকে। অথচ আল্লাহর রহমতে আমি নিরাপদেই থাকি। কিন্তু তাতে (বজ্রপাতে) ধ্বংস হয় সবকিছু, মরে মানুষ। পবিত্র মক্কায় গিয়ে হাজী সাহেবরা আবহমানকাল আমায় লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়েন। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তা আজ পর্যন্ত আমার গায়ে পড়েনি একটিও। অথচ সমুদ্রে জাহাজ ডুবে অসংখ্য হজযাত্রী মারা যান, আল্লাহর রহমতে।

"আল্লাহর রহমতে আমি নিমেষে বিশ্বভ্রমণ করতে পারি, পারি অদৃশ্যকে দেখতে, শ্রবণাতীতকে শুনতে, নিজে অদৃশ্য থেকে অন্যের মনের খবর জানতে। দু'দিন অনিদ্রা-অনাহারে থাকলে মানুষ ঝিমিয়ে-নেতিয়ে পড়ে। আর আমি লাখ লাখ বছর ধরে অনিদ্রা-অনাহারেও সুস্থ-সবল আছি, সে তো আল্লাহর রহমতেই। বলা যাবে যে, মানুষ তো ওর অনেক কিছুই আয়ত্ত করে ফেলেছে। অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, রেডিও, টেলিভিশন, রকেট ইত্যাদি যন্ত্র দিয়ে মানুষ এখন অদৃশ্যকে দেখছে, শ্রবণাতীতকে শুনছে, আকাশে-পাতালে ভ্রমণ করছে, অনাহারে বেঁচে থাকার গবেষণা চালানো হচ্ছে এবং কেউ তো অন্যের মনের ভাবও জেনে নিচ্ছে টেলিপ্যাথির সাহায্যে। এসব মানুষ আয়ত্ত করছে সত্য, হয়তো আরো অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করবে। কিন্তু সে সমস্ত যাঁরা করেছেন ও করবেন, তাঁরা তো আমারই শিষ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কোনো মানুষের অকল্যাণ আমার কাম্য নয় এবং তা করিও না। পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে এমন কতোগুলো বিধি-নিষেধ রয়েছে, যা মানুষের অকল্যাণই করে এসেছে আবহমান কাল থেকে। তাই মানুষের কল্যাণ কামনায় সে সব বিধি-নিষেধ অমান্য করার জন্য আমি মানুষকে প্রেরণা দিচ্ছি। কেননা সেসব বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করার জন্য মানুষকে প্রেরণা দেওয়াই আমার কাজ। আর তারই ফল আধুনিক জগতে মানব জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ক্রমোন্নতি। তথাকথিত ধর্মগ্রন্থগুলোতে আকাশতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব ইত্যাদি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য যাবতীয় তত্ত্বালোচনাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, ঘোষিত হয়েছে স্বর্গ ও নরক-তত্ত্ব, বিশেষভাবে।

"মানুষ আজ সমুদ্রতলে বিচরণ করে, আকাশে পাড়ি জমায়, পরমাণুগর্ভে প্রবেশ করে এবং কতো অসাধ্য সাধন করে, কিন্তু এর কোনোটাই ধর্ম বা ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মানুষকে শিক্ষা দেয়নি, বরং নিষেধ করেছে বারে বারে। আমার কর্তব্য বিধায় ওসব আমিই শিক্ষার প্রেরণা দিয়েছি ও দিচ্ছি মানুষকে, আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে। কিন্তু তাতে শুধু অধার্মিকরাই লাভবান হয়নি, ধার্মিকরাও ভোগ করছেন তার সুযোগ-সুবিধাগুলো পুণ্যার্জনের জন্য। জল, স্থল ও হাওয়াই যানের সাহায্য ছাড়া শুধু পদব্রজে পবিত্র হজ্জব্রত পালনে হাজীদের সংখ্যা কতোজন হতো, তা হিসেব করে দেখেছেন কি? বর্তমানে ওয়াজে, আজানে, পবিত্র কোরান তেলাওয়াতে, জানাজার নামাজেও মাইক, রেডিও, টেলিভিশন ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে পুণ্যের মাত্রা নিশ্চয়ই বাড়ছে। সুতরাং শুধু পাপকর্মের দ্বারা দোজখে যাবার জন্যই নয়, পুণ্যকর্মের দ্বারা বেহেস্তে যাবার জন্যও আমি মানুষকে সহায়তা করছি না কি? এছাড়া আমি হামেশা আল্লাহকে স্মরণ করি, তাঁর হুকুম পালন করি, তাঁর এবাদত করি, কিন্তু দোজখ থেকে পরিত্রাণ বা বেহেস্ত লাভের প্রত্যাশায় তা করি না। কেননা দোজখের শাস্তি ও বেহেস্তের সুখ আমার কাছে অকেজো। যেহেতু নূরের তৈয়ারী দেহ আমার অগ্নিতে জ্বলবে না এবং আহার-বিহার নিদ্রা ইত্যাদি না থাকায় (বেহেস্তের) সুখাদ্য ফল, সুপেয় পানীয়, স্বর্ণপুরী, সুন্দরী ললনা (হুর-গেলমান) ইত্যাদি আমার কোনো কাজেই আসবে না। পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি জীবমাত্রেই আল্লাহর এবাদত করে থাকে। কিন্তু তারাও দোজখের ভয়ে বা বেহেস্তের লোভে তা করে না। অথচ মানুষ তা-ই করে থাকে। **ধর্মের নিশানধারীদের মধ্যে হাজারে বা লাখে এমন একজন মানুষ মিলবে কি-না সন্দেহ, যিনি নিছক আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই পুণ্যকাজ করেন, যার সাথে বেহেস্ত-দোজখের সম্পর্ক নেই।** যারা দোজখের ভয়ে বা বেহেস্তের লোভে পুণ্যকাজ করে, তারা আমার চেয়ে অধম, পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট।

"এ যুগের মানুষ আপনি, হয়তো কম্পাস দেখেছেন। ওর কাঁটার একটা প্রান্ত সর্বদা পৃথিবীর উত্তরে সুমেরুর দিকে এবং অপর প্রান্ত দক্ষিণে কুমেরুর দিকে স্থির হয়ে থাকে। কেউ ওর ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না। নাড়াচাড়া বা জোরজুলুম করে সাময়িকভাবে ওর কিছু ব্যত্যয় ঘটালেও, ছাড়া পেলে কাঁটা স্থির হয় গিয়ে সাবেক বিন্দুতে। কোনো কম্পাসের কাঁটাদ্বয়ের কোন্ প্রান্ত 'সুমেরু' ও কোন্ প্রান্ত 'কুমেরু' মুখী থাকবে, তা নির্ধারিত হয় তার সৃষ্টিকর্তার (নির্মাতার) দ্বারা তখনই, যখনই তিনি কাঁটাটিকে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ যখন কাঁটাটিকে ধন (পজিটিভ) ও ঋণ (নেগেটিভ) ধর্মী দুটি আলাদা জাতের বিদ্যুতের দ্বারা চুম্বকায়িত করেন। কোনো সাধারণ মানুষের সাধ্য নেই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্পাসের কাঁটার দিকপাতনে ব্যত্যয় ঘটাবার, একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তা (নির্মাতা) ছাড়া। অনুরূপভাবেই মানুষের মানসরাজ্যেরও 'সু' ও 'কু' দু'টি মেরু আছে। তবে তাকে 'মেরু' বলা হয় না, বলা হয় 'প্রবৃত্তি'। অর্থাৎ 'সুপ্রবৃত্তি' এবং 'কুপ্রবৃত্তি'। সুপ্রবৃত্তি থাকে বেহেস্তমুখী এবং কুপ্রবৃত্তি থাকে দোজখমুখী হয়ে। মানবমনের এরূপ বৃত্তিবিভাগ করেছেন আল্লাহতা'লা মানবসৃষ্টির বহু পূর্বে। যে সময়টিতে আল্লাহ্ এ বিভাগ দু'টি নির্ধারণ করেছেন, সে সময়টিকে বলা হয় 'রোজে আজল' বা 'নিয়তি'।

"রোজে আজল-এ নির্ধারিত ফলাফলের বিরুদ্ধে দাগা দিয়ে কোনো মানুষকে আমি দোজখী বানাতে পারি না এবং কোনো ধর্মপ্রচারকও হেদায়েত করে কোনো মানুষকে বেহেস্তবাসী করতে পারেন না। তবে সাময়িক মনের পরিবর্তন ঘটানো যায় মাত্র। কোনো কম্পাসের কাঁটাকে নেড়েচেড়ে বা জোর করে মেরুভ্রষ্ট করা হলে, ছুট পেলে পুনঃ যেমন সাবেক মেরুতে চলে যায়, মানুষের মানসকাঁটাও তদ্রূপই। সুমেরুমুখী কোনো মানুষকে দাগা দিয়ে তার দ্বারা আমি অসৎকাজ করাতে পারি, এমন কি তাকে 'কাফের' নামে আখ্যায়িত করাতেও পারি। কিন্তু পারি না তার জীবনসন্ধ্যায় তওবা পড়ে 'মোমেন' হয়ে বেহেস্তে যাওয়া রোধ করতে। অনুরূপভাবেই কুমেরুমুখী কোনো মানুষকে হেদায়েত-নছিহত করে তার দ্বারা কোনো ধর্মপ্রচারক সৎকাজ করাতে পারেন এবং তাকে আখ্যায়িত করতে পারে 'মোমেন' নামে। কিন্তু তিনি পারেন না তার অন্তিম মুহূর্তে 'বেঈমান' হয়ে দোজখে যাওয়া রোধ করতে। এভাবেই অনেক 'সমাজী কাফের' বেহেস্তে যাবে। যাবে 'সমাজী মোমেন' দোজখে।

"আল্লাহ যাঁকে দোজখবাসী করতে চান না, আমি শত চেষ্টা করেও তাঁকে দোজখী বানাতে পারি না। লক্ষাধিক নবী-আম্বিয়াদের প্রত্যেককেই আমি দাগা দিতে চেষ্টা করেছি এবং কিছু কিছু সফলও হয়েছি। কিন্তু আমি কাউকেই দোজখী বানাতে পারিনি।

"আমার দাগায় পড়ে তারা সামান্য গুনাহ যা করেছেন, আল্লাহ্ তার শাস্তি প্রদান করেছেন এ দুনিয়াতেই, পরকালে তাঁরা সবাই থেকেছেন নিষ্পাপ। যেমন — হযরত আদমের বেহেস্ত থেকে দুনিয়ায় নির্বাসন, হযরত ইউনুসের মৎস্যগর্ভে বাস, হযরত আইউবের বিমার, শেষ নবী (দ.)-এর খান্দান শহিদ ইত্যাদি উক্তরূপ পাপেরই শাস্তি।

"আজ পর্যন্ত আমি আল্লাহতা'লার মাত্র একটি হুকুমই অমান্য করেছি। তাঁর হুকুমে আদমকে সেজদা না করে। আর অন্য ক'জনও তো তাঁর হুকুম অমান্য করেছে প্রায় একই সময়, একই জায়গায় থেকে। কিন্তু সেজন্য তিনি রাগ করেননি বা কাউকে কোনোরূপ শাস্তি দেননি। জেবরাইল, মেকাইল ও এস্রাফিল ফেরেস্তাত্রয়কে আল্লাহ্ হুকুম করেছিলেন পৃথিবী থেকে মাটি নেবার জন্য, আদমকে বানাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু একে একে তিন ফেরেস্তাই আল্লাহর হুকুম খেলাপ করে ফিরে গেলেন তাঁর কাছে খালি হাতে, মাটির অসম্মতির জন্য। অবশেষে আজরাইল ফেরেস্তা আল্লাহর আদেশ মোতাবেক জোরপূর্বক কিছু মাটি নেওয়ায় তদ্দ্বারা আদমকে বানানো হলো। কিন্তু চারবার আদেশ অমান্য সত্ত্বেও আল্লাহ্ মাটিকে (দোজখের) আগুনে পোড়ালেন না, বরং পানি দিয়ে কাদা বানিয়ে মহানন্দে আদমের মূর্তি বানালেন ও তাতে প্রাণদান করলেন। আর তিন ফেরেস্তা যে তাঁর হুকুম অমান্য করলেন তুচ্ছ মাটির কথা মেনে, তা যেনো তাঁর খেয়ালই হলো না। পক্ষান্তরে তাঁর হুকুম অমান্যের দায়ে আমাকে নাকি দিলেন অভিশাপ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার গলায় দিলেন লা'নতের তাওক এবং নির্বাসিত করলেন বেহেস্ত থেকে দুনিয়ায় চিরকালের জন্য। এসব কি তাঁর পক্ষপাতিত্ব বা ন্যায়বিরোধী কাজ নয়? না, এতে তিনি এতটুকু পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায় করেননি। বরং অন্যায় করেছে মানুষ, তাঁর ইচ্ছে ও উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে না পেরে।

"বলা হয় যে, আমি অভিশপ্ত, তিরস্কৃত ও নির্বাসিত হয়েছি। বাস্তবে তার একটিও না। এ বিষয়ে একটু খোলাসা করেই বলি।

"প্রথমত আমি আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন ও অভিশপ্ত হয়ে থাকলে তিনি আমাকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান করতে পারতেন, পারতেন রোগ, শোক, দুঃখ–কষ্ট ও অভাব ভোগ করাতে, যেমন করেছেন হারুৎ-মারুৎ ফেরেস্তাদ্বয়কে। সর্বোপরি পারতেন মৃত্যু ঘটিয়ে জগত থেকে আমাকে নিশ্চিহ্ন করতে। কিন্তু তিনি তার একটিও করেননি। বরং উল্টোই করেছেন। যদি কেউ কাউকে বলে, 'তুমি রোগ, শোক, দুঃখ–কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করো' — তাহলে সেটা কি তার পক্ষে আশীর্বাদ না অভিশাপ? আল্লাহ্ আমাকে কোনো রোগ দেননি, শোক দেননি, অপমৃত্যু দেননি, কোনো অভাব দেননি, বরং দীর্ঘায়ু দান করেছেন। এসবের মধ্যে অভিশাপ কোনটি?

"দ্বিতীয়ত বলা হয়ে থাকে যে, আমি তিরস্কৃত হয়েছি, অর্থাৎ আল্লাহ্ আমার কণ্ঠে লা'নতের তাওক দান করেছেন। এ কথাটিও পুরো ঠিক নয়। আমি 'তাওক' একটি পেয়েছি ঠিকই। তবে সেটা কাঠের না লোহার না স্বর্ণের তৈরী, কেউ তা দেখেননি বা শোনেননি কারো কাছে আজ পর্যন্ত। ওটা কারাবাসীর কণ্ঠে যেমন তিরস্কার (তাওক), তেমন বিজয়ীর কণ্ঠে পুরস্কার (মেডেল) সূচিত করে। তারতম্য শুধু গঠন ও উপকরণে। এ বিষয় পরে বলবো।

"তৃতীয়ত বলা হয় যে, আমি বেহেস্ত থেকে বিতাড়িত হয়েছি, নির্বাসিত হয়েছি পৃথিবীতে। আল্লাহ্‌র আদেশে পৃথিবীতে আসা-যাওয়া অথবা স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাঁর নির্দেশিত কর্তব্য তো অন্যান্য ফেরেস্তাগণও পালন করে থাকে। তারাও কি নির্বাসিত? জেবরাইল ফেরেস্তা সংবাদ বহন ও আজরাইল ফেরেস্তা মানুষের জান কবজ করার উদ্দেশ্যে না হয় পৃথিবীতে আসে ও চলে যায়। কিন্তু মিকাইল ফেরেস্তা পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারে না আবহাওয়া বিভাগের কাজ বন্ধ করে। কেরামান ও কাতেবীন ফেরেস্তাদ্বয় রোজনামচা (ডাইরী) লেখা ছেড়ে দিয়ে মানুষের কাঁধ থেকে এক পা বাইরেই দিতে পারে না এবং মনকির ও নকিরকে তো জীবন কাটাতে হচ্ছে মানুষের কবরে কবরেই পৃথিবীতে। এঁরা যদি নির্বাসিত বলে সাব্যস্ত না হন, তবে আমি নির্বাসিত হই কোন বিচারে? আমিও তো আল্লাহ্‌র আদেশে আমার কর্তব্য পালন করে যাচ্ছি পৃথিবীতে বসে। বরঞ্চ আমি ওদের প্রত্যেকের চেয়ে মুক্ত ও স্বাধীন।

"জেবরাইল ফেরেস্তা সংবাদবাহক। সে আল্লাহ্‌র সকালের আদেশ কারো কাছে বিকেলে পৌঁছাতে পারে না। মেকাইল ফেরেস্তা আবহাওয়া পরিচালক ও খাদ্য পরিবেশক। সে আল্লাহ্‌র সকালের আদেশের বৃষ্টি বিকেলে এবং বাংলাদেশের বৃষ্টি আরবদেশে বর্ষাতে পারে না, পারে না ধনীর খাদ্য গরীবকে দান করতে। এভাবে প্রত্যেক ফেরেস্তাই আছে তাদের নিজ নিজ কর্তব্যের নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু আমার কর্তব্য (পরীক্ষা) কাজ সম্পাদনে আল্লাহ্ আমাকে এরূপ কোনো নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেননি। আমার পরীক্ষাকাজের সকাল-বিকাল নেই বা শীত–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসন্ত নেই, এশিয়া-ইউরোপ নেই ; নেই যুবা-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব পার্থক্যের নির্দেশ। বস্তুত আমি বিতাড়িত বা নির্বাসিত নই, অন্যান্য ফেরেস্তাদের মতোই আমি কর্তব্যের খাতিরে প্রেরিত হয়েছি পৃথিবীতে। আমি আল্লাহর মনোনীত ফেরেস্তা — বিশ্ববাসীর বিশ্বাসের পরীক্ষক (একজামিনার)।

"বলা হয় যে, আদমকে সেজদা না করায় আমি ঘৃণিত ও অধঃপতিত হয়েছি এবং আদমকে গন্ধম ভোজন করিয়ে মানুষের শত্রু হয়েছি। বাস্তবে তা নয়। বরং পুরস্কৃত হয়েছি ও পদোন্নতি লাভ করেছি এবং মানবকূলের বন্ধুর কাজই করেছি। আমার কথা শুনে আপনি একটু তাজ্জব হলেন বুঝি। এ বিষয়ে একটু বুঝিয়ে বলি।

"ফেরেস্তারা নূরের তৈরী। তাই পাক-সাফ বটে, তবে ওদের বুদ্ধি নেহাত কম। নিজেরা কোনো কাজই করতে পারে না আল্লাহর হুকুম তামিল করা ছাড়া। 'হাঁ হুজুর' ছাড়া 'না হুজুর' বলার ওদের অভ্যাস নেই। তবে একদিন 'না হুজুর' বলেছিলো, কিন্তু তা খাটেনি। আল্লাহ পৃথিবীতে মানবজাতি সৃষ্টির পরিকল্পনা ঠিক করে আদমকে বানাবার পূর্বে ফেরেস্তাগণের আক্কেল পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। তাতে তারা আল্লাহকে বলেছিলেন, 'আদমীরা আপনার হুকুম-আহ্কাম মানবে না বা এবাদত করবে না। সুতরাং আদম সৃষ্টি না করাই উত্তম।' মানবজাতির পরম সৌভাগ্য যে, আল্লাহ ফেরেস্তাদের সে উপদেশ অগ্রাহ্য করে আদমকে বানালেন। কিন্তু আল্লাহ যদি ফেরেস্তাদের প্রস্তাব মেনে আদমকে না বানাতেন, তাহলে মানবজাতির এ দুনিয়াপ্রীতির কি দশা হতো?

"আদমকে বানিয়ে আল্লাহ ফেরেস্তাদের ডেকে বললেন — তোমরা আদমকে সেজদা করো। আল্লাহর হুকুম পেয়ে সব ফেরেস্তা একযোগে অর্থাৎ জামাতের সহিত এক রাকাত নামাজ আদায় করলেন আদমকে কেবলা করে। কিন্তু আমি সে নামাজ পড়লাম না। আল্লাহর আসনে আদমকে বসিয়ে তাকে সেজদা করতে আমার বিবেক বাধা দিলো। আমার বিবেক বললো যে, আল্লাহ **পরিস্কার ভাষায় বলেছেন, 'আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা কোরো না।' তবে আজ কেন আদমকে সেজদা করতে বললেন? হয়তো এর কারণ ফেরেস্তাদের আক্কেল পরীক্ষা করা।** আল্লাহ দেখতে চান যে, ওদের তুচ্ছ করা আদমকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ফেরেস্তারা সেজদা করতে আপত্তি করে কি-না।

"মনে করুন — কোনো এক ব্যক্তি তার পাঁচটি ছেলেকে ডেকে জনৈক পথিককে দেখিয়ে বললো, 'তোমরা সবাই ওকে বাবা বলে ডাকো'। পিতার আদেশ পালন করা কর্তব্য, এ নীতিবাক্যটি পালন করে চারটি ছেলেই সেই পথিককে 'বাবা' বলে ডাকলো। কিন্তু একটি ছেলে ডাকলো না। সে ভাবলো, 'পিতা কখনো দু'জন হতে পারে না। পথিককে বাবা বললে তা হবে মিথ্যে কথা বলা। আর পিতা তো আগেই বলেছেন, কখনো মিথ্যে কথা বলবে না। আমার মুখে পথিককে বাবা ডাকার মধুর শব্দটি শুনে পিতা খুশী হবার জন্য নিশ্চয়ই এ কথাটি বলেননি, বলেছেন আমাদের আক্কেল পরীক্ষার জন্য। সুতরাং পিতার এ আদেশটি না মানাই শ্রেয়।' এ ভেবে সে ছেলেটি তার জীবনের মহাকর্তব্য (সত্যকথন) পালন করলো, কপট পিতাকে মিথ্যা 'বাবা' ডাকলো না। ছেলেদের পিতা তাঁর চার ছেলের অজ্ঞতা দেখে মনোক্ষুণ্ন হলেন এবং এক ছেলেকে বিজ্ঞতার পুরস্কার বাবদ তার গলায় দিলেন মেডেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আল্লাহ্ হলেন অন্তর্যামী। মানুষ বা ফেরেস্তা কারো বাহ্যিক আচার-আচরণ দেখে তিনি তুষ্ট হন না, বিচার করেন মনের। আদমকে সেজদা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ ফেরেস্তাগণের আক্কেলের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। আমি তাতে উত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি আমাকে দান করেছেন বিজয়ের একটি নিশানা। কেউ কেউ তাকে বলে আমার পরাজয়ের নিশানা বা লা'নতের তাওক। বস্তুত আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ 'মেডেল'।

"বলা হয় যে, আমি আদমের শত্রু, আদম জাতির শত্রু। কেন না গন্ধম ভক্ষণ করিয়ে আমি আদমকে বেহেস্তছাড়া করেছি। আসলে তা নয়। যৌনক্রিয়ায় নাকি মানুষ নাপাক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বেহেস্ত হলো চিরপবিত্র স্থান। সেখানে ওসব নাপাকীর কোনো স্থান নেই। কাজেই আদম-হাওয়া বেহেস্তে থাকলে তাদের যৌনক্রিয়া আজীবন বন্ধ রাখতে হতো। ফলে আদম থাকতেন নিঃসন্তান ও নির্বংশ। আদমের প্রেমাসক্তি সম্পূরণ ও বংশবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ আদম-হাওয়াকে স্থান দিয়েছেন পৃথিবীতে তাদের বংশবৃদ্ধির গরজে।

"বেহেস্তের মধ্যে তখন তিন জাতীয় ফলের গাছ ছিলো। প্রথমত সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষ, এর ফলগুলো ছিলো সাধারণ খাদ্য। অর্থাৎ জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য। দ্বিতীয়ত জীবন বৃক্ষ। এর ফলগুলো ছিলো অমরত্বের প্রতীক। অর্থাৎ পরমায়ুবর্ধক। তৃতীয়ত জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ। অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক। এই 'জ্ঞানদায়ক' ফলটিরই নামান্তর 'গন্ধম'।

"আদমকে যখন বানানো হলো, তখন তিনি ছিলেন নির্জীব মাটির পুতুল এবং আল্লাহ্ যখন প্রাণদান করলেন, তখন হলেন তিনি সজীব পুতুল। কিন্তু তখনও 'জ্ঞান' বস্তুটি তার মধ্যে ছিলো না মোটেই। এমন কি লজ্জা-জ্ঞানও না। আদম-হাওয়া ছিলেন উলঙ্গ। ইতর প্রাণী ও মানুষের প্রধান পার্থক্য হলো লজ্জাজ্ঞান। আদম-হাওয়ার সেই লজ্জাজ্ঞান জন্মালো গন্ধম ভক্ষণের পর। ক্রমে জন্মালো ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিবিধ জ্ঞান গন্ধম ভক্ষণের ফলে। পক্ষান্তরে বিবি হাওয়া হলেন রজস্বলা গন্ধম ছেঁড়ার ফলে। কাজেই গন্ধম না খেলে হযরত আদম থাকতেন জ্ঞানশূন্য আর বিবি হাওয়া থাকতেন বন্ধ্যা। আদমের জ্ঞান ও বিবি হাওয়ার সন্তানোৎপাদিকা শক্তি জন্মালো গন্ধম খাওয়ার ফলে। সুতরাং গন্ধম খাইয়ে আমি শুধু আদম-হাওয়ারই নয়, তাবৎ মানবজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বংশবিস্তারের সহায়তাই করেছি, যা অন্য কোনো ফেরেস্তা করেননি। কার্যত আমি মানুষের পিতার চেয়ে ভক্তির পাত্র এবং গুরুর চেয়ে মান্যবর। দুঃখের বিষয় এই যে, কতক মানুষ তা বাহ্যত মানতে চান না, তবে কার্যত মেনে চলেন। আর তাতেই আমি সন্তুষ্ট। কেননা **একজন বিশ্বাসী মানুষ দিনেরাতে নানা কারণে যতবার আমার নামটি মুখে উচ্চারণ করেন, মনে হয় যে, ততোবার তার বাবার নামও উচ্চারণ করেন না। বিশেষত আমার নামটি তাদের প্রাতঃস্মরণীয় ও অগ্রপাঠ্য।**

"আপনি ভাবছেন, এ বিরাট পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে দাগা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় কিরূপে। আপনার এ ভাবনাটা অমূলক নয়। আসলে ও কাজটা ততো কঠিন নয় আমার পক্ষে। কেননা আমি দুনিয়ার সকল অঞ্চলের সকল মানুষকে দাগা দেই না, দাগা দেই ঈমানদারদিগকে। অর্থাৎ যারা আমাকে বিশ্বাস করে তাদেরকে। আমার উপর যাদের ঈমান নেই, অর্থাৎ আমি 'আছি' বা আমার অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার করেন, তারা তো কাফের। কেননা পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেছেন, 'শয়তান আছে' এবং পবিত্র হাদিছে নবী বলেছেন, 'শয়তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। এতদসত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি যদি বলে, 'শয়তান নেই', তবে পবিত্র কোরান–হাদিছের বাণী অমান্যকারী সে ব্যক্তি কি কাফের নয়?

"আবার যে ব্যক্তি কাফেরের ঔরসে জন্মলাভ করে, সে তো জন্মসূত্রেই কাফের এবং সে নানাবিধ বেসরা কাজ (মূর্তিপূজা) ইত্যাদি করে থাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমার দাগা দেওয়া ছাড়াই। তাকে তার কৃতকর্মে বাধা দানের অর্থ হয় অসৎকাজে অর্থাৎ পাপকাজে বাধাদান করা। আল্লাহ তো কারো অসৎকাজে আমাকে বাধা দিতে বলেন নি। তাই আল্লাহর আদেশ মেনেই আমি কোনো বিধর্মীকে দাগা দেই না। অর্থাৎ আমার অস্তিত্বের উপর যাদের ঈমান নেই, তাদের আমি দাগা দেই না, এমনকি তাদের কোনো সৎকাজেও না। তাইতো **বর্তমান দুনিয়ায় ঈমানদারদের চেয়ে বেঈমানদারগণই সৎকাজ করেন বেশী।**

"আমাকে যেমন সকল মানুষকে দাগা দিতে হয় না, তেমন সকল জায়গায় আমি সমভাবে অবস্থানও করি না। **বিশ্বাসীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনা মন্দির ও ধর্মধামেই আমাকে সময় কাটাতে হয় বেশী। কেননা ওগুলোই হচ্ছে আমার প্রধান কর্মকেন্দ্র।** তবে মফস্বলেও কিছু কিছু কাজ না করলে চলে না।

"আপনার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে যে, অহরহ মানুষের সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও তারা আমাকে দেখতে বা আমার অস্তিত্বই অনুভব করতে পারে না, এর কারণ কি এবং কোথায় বসে আমি মানুষকে দাগা দিয়ে থাকি? তা বলি শুনুন।

"আল্লাহ আমাকে ক্ষমতা দান করেছেন মানুষের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে এবং শিরায় শিরায় চলতে। যখন আমি কোনো ব্যক্তিকে দাগা দিতে চাই, তখন তাকে বাইরে থেকে ডেকে বলি না যে, তুমি এ কাজটি করো না এবং এ কাজটি করো। আমি তখন প্রবেশ করি তার দেহের কেন্দ্রস্থল মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিন্দু ত্রিতলা মনের একেবারে নীচের তলায়, যে জায়গাটির নাম 'অচেতন মন' বা 'নির্জ্ঞান মন'। সেখানে বসে আমি তার 'অচেতন মন'কে প্রলুব্ধ করি কোনো কাজ করতে বা না করতে। আমার কর্মকেন্দ্র মানুষের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অবস্থিত। তাই দুষ্ট লোকেরা বলে 'টুপির নীচে শয়তান থাকে'। তাদের সে কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। কেননা আমার অধিষ্ঠানটি টুপির নীচেই, উপরে নয়।

"আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না, কেউ পারে না। আমি যা কিছু করি তদ্দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাকেই পূরণ করি এবং অন্যেরাও তা–ই করে থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে, বিশ্বাসীরা তা পুরাপুরি মানেন না। তাঁরা আল্লাহকে বলেন সর্বশক্তিমান, আবার কোনো কাজে আমার উপর দোষ চাপান। শুধু তাই নয়, তাঁরা আরও বলেন, **'শুভ কাজের কর্তা আল্লাহতা'লা এবং অশুভ কাজের কর্তা শয়তান।' যদি তা–ই হয়, তবে 'আল্লাহ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্বশক্তিমান' --** এ কথাটির সার্থকতা কি? এতে কি আমাকে 'আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও দ্বিতীয় শক্তিধর' বলে প্রমাণিত হয় না? বস্তুত তা নয়। আমার সমস্ত কাজেই আছে আল্লাহতা'লার সমর্থন। এখন তাই একটু বলছি।

"বলা হয়, আল্লাহ দুনিয়ার সব কাজ করবার ক্ষমতাই মানুষকে দান করেছেন। কিন্তু হায়াত,মউত, রেজেক ও দৌলত, এ চারটি কাজ রেখেছেন নিজের হাতে। আবার এ কথাও বলা হয় যে, খুন–খারাবী, চুরি–ডাকাতি ও ব্যভিচারের উদ্যোক্তা শয়তান। তাই যদি হয় অর্থাৎ আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাগায় পড়েই যদি কোনো এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে আহত ব্যক্তির জান কবজ করতে আজরাইল ফেরেস্তা সেখানে আসেন কার হুকুমে? সেই দিনটি মৃতব্যক্তির হায়াতের শেষ দিন নয় কি? কলেরা–বসন্তাদি রোগে অসংখ্য মানুষ মরে জীবাণুদের আক্রমনে। সেই জীবাণুদের দাগা দেয় কে?

"সমস্ত জীবের রেজেক (খাদ্য) দান করেন স্বয়ং আল্লাহতা'লা। চোর–ডাকাতের রেজেক দান করেন কে? মানুষ জানে না যে, আল্লাহ কার রেজেক কার ভাণ্ডারে রেখেছেন। আল্লাহ যার রেজেক ও দৌলত যেখানে রেখেছেন, যে কোনও উপায়েই হোক সেখান থেকে এনে সে তা ভোগ করবেই। চোর চুরি করে বটে, কিন্তু আসলে সে তার আল্লাহর বরাদ্দকৃত খাদ্যই খায়। আমি যদি দাগা দিয়ে চুরি–ডাকাতির মাধ্যমে একের রেজেক অন্যকে খাওয়াতে পারি, তাতে আল্লাহর গৌরব বাড়ে কি? অন্যান্য জীবের রেজেকও আল্লাহতা'লাই জোগান। গেরস্ত বাড়ির হাঁস–মোরগ ও খাদ্যাদি চুরি করে শেয়াল–কুকুরে খায়। তাদের দাগা দেয় কে?

"বলা হয় যে, শয়তানের খপ্পরে পড়ে মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাতে আল্লাহর কোনো সমর্থন নেই। যদি তাই হয়, তবে জারজ সন্তানের প্রাণদান করে কে? মানব সৃষ্টোত্তর কালে আল্লাহ যখন মানুষের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই তিনি জানেন যে, কোন্ প্রাণ কখন কোথায় জন্মাবে, কে কি কাজ করবে এবং অন্তিমে কে কোথায় যাবে, অর্থাৎ বেহেস্ত না দোজখে। তিনি এ–ও জানতেন যে, কে কার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। তিনি ইচ্ছা করলে ব্যভিচারীদ্বয়কে দাম্পত্যবন্ধন দান করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে জারজ সন্তানদের জন্য প্রাণ সৃষ্টি করে রেখেছেন। জারজ সন্তানদের প্রাণদান করেন আল্লাহ ইচ্ছা করেই। ব্যভিচার ঘটিয়ে আমি আল্লাহর সেই ইচ্ছাকেই পূরণ করি মাত্র।

"বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, শয়তান না থাকলে মানবজাতির মঙ্গল হতো। তাঁরা ভেবে দেখেননি যে, আমার নির্দেশিত পথে চলেই বর্তমান জগতের মানুষের যতো সব আয়–উন্নতি এবং তারই সাহায্যে চলছে ভালো ধর্মের বাজারে ব্যবসা–বাণিজ্য। আজ যদি আমি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাই বা আমার দাগাকাজ বন্ধ করি, তাহলে মানবসমাজে যে বিপর্যয় দেখা দেবে তা থেকে রক্ষা পাবে না বিশ্বাসীরাও।

"প্রথমত কতিপয় রাষ্ট্রীয় দপ্তর থাকবে না। ফলে মন্ত্রিত্ব হারাবে অনেকে এবং রাজ্যশাসনে বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ হবে কর্মহীন। সুরশিল্পী, চিত্রশিল্পী থাকবে না, থাকবে না মাদকদ্রব্যের ব্যবসা। এছাড়া থাকবে না সুদ, ঘুষ, কালোবাজারী ইত্যাদির পেশা। আর এতে মানবসমাজে যে ভয়াবহ বেকারত্ব ও আর্থিক সংকট দেখা দেবে, তার প্রতিক্রিয়া হবে ধর্মরাজ্যেও। কেননা **ঐসব অসৎবৃত্তির আয় দ্বারাই তো হচ্ছে যতো মসজিদ–মাদ্রাসার ছড়াছড়ি ও হজ্জযাত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধি।**

"কোনো কিছুর অভাব আমার নেই বা অন্য কোনো দুঃখ আমার নেই। একটিমাত্র দুঃখ এই যে, মানুষ আল্লাহকে না জানার ফলে এবং তাঁর কুদরৎ অনুধাবন করতে না পেরে অযথা আমার উপর দোষারোপ করে। আল্লাহ ইচ্ছাময় ও সুমহান।

"এখন আর বেশী কথা বলার সময় নেই। নামাজের সময় হচ্ছে, মসজিদে যাই। আসসালামু আলাইকুম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগন্তুক চলে গেলেন মসজিদের দিকে। কিন্তু নামাজ পড়তে না দাগা দিতে তা বুঝা গেলো না। মাইকের আজানে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো, চেয়ে দেখি পূর্ব আকাশ পরিষ্কার।

বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে আমি ভাবতে লাগলাম — এতদিন আমার মনে হচ্ছিলো যে, হিন্দু পুরাণশাস্ত্রে লিখিত 'নারদ মুনি'ই পরবর্তীকালে 'শয়তান' রূপ লাভ করেছে। উভয়ের পরিচয়পত্র মিলালে তা বেশ বুঝা যায়। হিন্দুশাস্ত্রমতে — 'নারদ'-এর মাতাপিতা নেই। সে ভগবান ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি। তার বাসস্থান ছিলো স্বর্গে এবং সে ছিলো ধার্মিক চূড়ামণি। সে সৃষ্টিকর্তার একটি আদেশ অমান্য করায় অভিশপ্ত হয়ে (মানবরূপে) পতিত হয় মর্ত্যে (পৃথিবীতে)। সে ছিলো সর্ববিদ্যাবিশারদ এবং স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষে ছিলো তার অবাধ গতি।[৭]

সৃষ্টি, বাসস্থান, স্বর্গচ্যুতি ও গুণাবলীর বর্ণনায় 'নারদ' এবং 'শয়তান' — এ দু'জনের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। শয়তান যেনো নারদের একটি অভিনব সংস্করণ। তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় নয়, চতুর্থ সংস্করণ। নারদ-নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের নায়ক পার্সি ধর্মের 'আহরিমান', তৃতীয় সংস্করণে ইহুদী ধর্মের 'সেদিম' বা 'দেয়াবল' এবং চতুর্থ সংস্করণের নায়ক হচ্ছে শেষ জামানার 'শয়তান'।

পূর্বেকার ঐসব 'অনুমান' আমার হঠাৎ যেনো নস্যাৎ হয়ে গেলো। কেননা মূর্তিমান শয়তান যে আজ আমার চোখের সামনেই বসা ছিলো এতক্ষণ।

AMARBOI.COM

---

৭. সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবলচন্দ্র মিত্র, পৃ. ৪৫৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাপ্তি

বর্তমানে আমার বয়স প্রায় ৮৩ বছর। কাজেই আজ আমি যে 'সমাপ্তি' নিবন্ধটি লিখছি, তা বাহ্যত এ পুস্তিকাখানার সমাপ্তি হলেও মূলত আমার জীবনেরও সমাপ্তি। তাই আমার জীবননাট্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।

বরিশাল শহরের অদূরে লামচরি গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম আমার ৩ পৌষ, ১৩০৭ সালে। চার বছর বয়সে আমার বাবা মারা যান (১৩১১)। অতঃপর বাকি করে জমি ও কর্জ-দেনার দায়ে বসতঘরখানা নিলাম করিয়ে নেন সদাশয় জমিদার ও মহাজনরা ১৩১৭ ও ১৮ সালে। তখন স্বামীহারা, বিত্তহারা ও গৃহহারা হয়ে মা আমাকে নিয়ে ভাসতে থাকেন অকূল দুঃখের সাগরে। সে সময় বেঁচে থাকতে হয়েছে আমাকে দেশী দুয়ারের সাহায্যে।

AMARBOI.COM

তখন আমাদের গ্রামে কোনোরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো না। শরীয়তী শিক্ষাদানের জন্য এক মুন্সী সাহেব একখানা মক্তব খোলেন তাঁর বাড়িতে ১৩২০ সালে। এতিম ছেলে বলে আমি তাঁর মক্তবে ভর্তি হলাম অবৈতনিকভাবে। সেখানে প্রথম বছর শিক্ষা করলাম স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ তালপাতায় এবং বানান-ফলা কলাপাতায়। কেননা বই-শ্লেট কেনার সঙ্গতি আমার ছিলো না। অতঃপর এক আত্মীয়ের প্রদত্ত রামসুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা' নামক বইখানা পড়ার সময় ছাত্র-বেতন অনাদায়হেতু মুন্সী সাহেব তাঁর মক্তবটি বন্ধ করে দিলেন ১৩২১ সালে। আর এখানেই হলো আমার আনুষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষার সমাপ্তি বা সমাধি। এরপর কিছুদিন ঘোরাফেরা করে কৃষিকাজ শুরু করি ১৩২৬ সালে।

আমার মা ছিলেন অতিশয় নামাজী-কালামী একজন ধার্মিকা রমণী। তাঁর নামাজ-রোজা বাদ পড়া তো দূরের কথা, 'কাজা' হতেও দেখিনি কোনোদিন আমার জীবনে। মাঘ মাসের দারুণ শীতের রাতেও তাঁর তাহাজ্জুদ নামাজ কখনও বাদ পড়েনি এবং তারই ছোঁয়াচ লেগেছিলো আমার গায়েও কিছুটা। কিন্তু আমার জীবনের গতিপথ বেঁকে যায় মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি দুঃখজনক ঘটনায়।

বিগত ইং ২৭. ১০. ৭৮ তারিখের 'বিচিত্রা' পত্রিকা, ১০. ৬. ৮১ তারিখের 'সংবাদ' পত্রিকা, ১৯. ৭. ৮১ তারিখের 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পত্রিকা, ৪. ৯. ৮১ তারিখের 'বাংলার বাণী' পত্রিকা, ১২. ১২. ৮২ তারিখের 'সন্ধানী' পত্রিকা ও আমার সম্পাদিত 'স্মরণিকা' পুস্তিকাখানা যাঁরা পাঠ করেছেন এবং যাঁরা ১৭. ৪. ৮৩ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'প্রচ্ছদ' অনুষ্ঠানে আমার সাক্ষাৎকারের বাণী শ্রবণ করেছেন — তাঁরা হয়তো জানেন আমার দুঃখজনক ঘটনাটি। তবুও সেই অবিস্মরণীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষাদময় ঘটনাটি সংক্ষেপে এখানে বলছি। সে ঘটনাটি আমাকে করেছে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দ্রোহী।

১৩৩৯ সালে আমার মা মারা গেলে আমি আমার মৃত মায়ের ফটো তুলেছিলাম। আমার মাকে দাফন করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মুন্সী, মৌলভী ও মুছল্লিরা এসেছিলেন, 'ফটো তোলা হারাম' বলে তাঁরা আমার মা'র নামাজে জানাজা ও দাফন করা ত্যাগ করে লাশ ফেলে চলে যান। অগত্যা কতিপয় অমুছল্লি নিয়ে জানাজা ছাড়াই আমার মা'কে সৃষ্টিকর্তার হাতে সোপর্দ করতে হয় কবরে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে ছবি তোলা দূষণীয় হলেও সে দোষে দোষী স্বয়ং আমিই, আমার মা নন। তথাপি কেন যে আমার মায়ের অবমাননা করা হলো, তা ভেবে না পেয়ে আমি বিমূঢ় হয়ে মার শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদেহী আত্মাকে উদ্দেশ্য করে এই বলে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, "মা! আজীবন ছিলে তুমি ধর্মের একনিষ্ঠ সাধিকা। আর আজ সেই ধর্মের নামেই হ'লে তুমি শেয়াল-কুকুরের ভক্ষ্য। সমাজে বিরাজ করছে এখন ধর্মের নামে অসংখ্য অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো — আমার জীবনের ব্রত হয় যেনো কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণ অভিযান। আর সে অভিযান সার্থক করে আমি যেনো তোমার কাছে আসতে পারি।

"তুমি আশীর্বাদ করো মোরে মা,
আমি যেনো বাজাতে পারি
সে অভিযানের দামামা।"

আমি জানতাম যে, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরীকরণ অভিযানে সৈনিকরূপে লড়াই করবার যোগ্যতা আমার নেই। কেননা আমি একজন পঙ্গু (মূর্খ)। তাই সে অভিযানে অংশ নিতে হবে আমাকে 'বাজনদার'রূপে। মাতৃশোকের তারুণ্যের উন্মাদনা কিছুটা লাঘব হলে আমি ভাবতে লাগলাম, শোকোন্মত্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা তো করেছি যে, সে অভিযানে আমি দামামা বাজাবো। কিন্তু তা পাবো কোথায়? দামামা তৈরীর উপকরণ তো আমার আয়ত্তে নেই। তাই কৃষিকাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাকে আত্মনিয়োগ করতে হলো উপকরণ সংগ্রহের কাজে। অর্থাৎ পড়াশুনার কাজে।

আমার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে দীর্ঘ আঠারো বছর কঠোর সাধনা করে ধর্মীয় কতিপয় অন্ধবিশ্বাসকে দর্শনের উত্তাপে গলিয়ে তা বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢেলে তার একটি তালিকা তৈরী করছিলাম প্রশ্নের আকারে ১৩৫৭ সালে। এ সময় স্থানীয় গোঁড়া বন্ধুরা আমাকে 'ধর্মবিরোধী' ও 'নাখোদা' (নাস্তিক) বলে প্রচার করতে থাকে এবং আমার সে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম ছেড়ে শহর পর্যন্ত। **লোক পরম্পরায় আমার নামটি শুনতে পেয়ে তৎকালীন বরিশালের ল-ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও তাবলিগ জামাতের আমীর জনাব এফ. করিম সাহেব সদলে আমার সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন ১৩৫৮ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমার বাড়িতে এসে, এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বরিশালে গিয়ে তিনি আমাকে এক ফৌজদারী মামলায় সোপর্দ করেন 'কম্যুনিষ্ট' আখ্যা দিয়ে।** সে মামলায় আমার জবানবন্দি তলব করা হলে পূর্বোক্ত তালিকার প্রশ্নগুলোর কিছু কিছু ব্যাখ্যা লিখে 'সত্যের সন্ধান' নাম দিয়ে তা আমার জবানবন্দিরূপে কোর্টে দাখিল করি তৎকালীন বরিশালের পুলিশ সুপার জনাব মহিউদ্দিন সাহেবের মাধ্যমে, ২৭ আষাঢ় ১৩৫৮ সালে (ইং তাং ১২. ৭. ৫১)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> 'সত্যের সন্ধান'–এর পাণ্ডুলিপিখানার বদৌলতে সে মামলায় আমি দৈহিক নিষ্কৃতি পেলাম বটে, কিন্তু মানসিক শাস্তি ভোগ করতে হলো বহু বছর। কেননা তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, 'সত্যের সন্ধান' বইখানা আমি প্রকাশ করতে পারবো না ও ধর্মীয় সনাতন মতবাদের সমালোচনামূলক অন্য কোনো বই লিখতে পারবো না এবং পারবো না কোনো সভা–সমিতিতে–বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বমত প্রচার করতে। যদি এর একটি কাজও করি, তবে যে কোনো অজুহাতে আমাকে পুনঃ ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হবে। অগত্যা কলম–কালাম বন্ধ করে আমাকে বসে থাকতে হলো ঘরে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। এভাবে নষ্ট হয়ে গেলো আমার কর্মজীবনের অমূল্য ২০টি বছর।

বাংলাদেশে কুখ্যাত পাকিস্তান সরকারের সমাধি হলে পর 'সত্যের সন্ধান' বইখানা প্রকাশ করা হয় ১৩৮০ সালে, রচনার ২২ বছর পর। এর পরে লিখিত আমার পুস্তক হচ্ছে — সৃষ্টি–রহস্য, মুক্তমন, স্মরণিকা ও অনুমান। আমার প্রণীত বা সম্পাদিত আলোচ্য যাবতীয় পুস্তক–পুস্তিকাই হচ্ছে আমার মায়ের মৃত্যুদিনের বাঞ্ছিত 'দামামা'র অংশবিশেষ। এছাড়া আমার অন্যান্য কৃতকর্মেও রয়েছে ঐ একই প্রেরণা। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'মানবকল্যাণ'।

১৩৫৮ সালে 'সত্যের সন্ধান'–এ আমার যে বাজনা শুরু হয়েছিলো, ১৩৯০ সালে 'অনুমান'–এ তার সন্ধ্যা–বিরতি, হয়তোবা সমাপ্তি। কিন্তু —

এসে জীবনের সন্ধ্যাবেলা,
দেখি এ জেহাদ নয়, খেলা।
যদি আবহাওয়া থাকে ভালো,
তবে নিশীথেও চলবে খেলা,
থাকবে যতোক্ষণ আলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মরণিকা

রচনাকাল ১৩. ১০. ১৩৮৮ — ২৭. ২ ১৩৮৯

প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৮৯

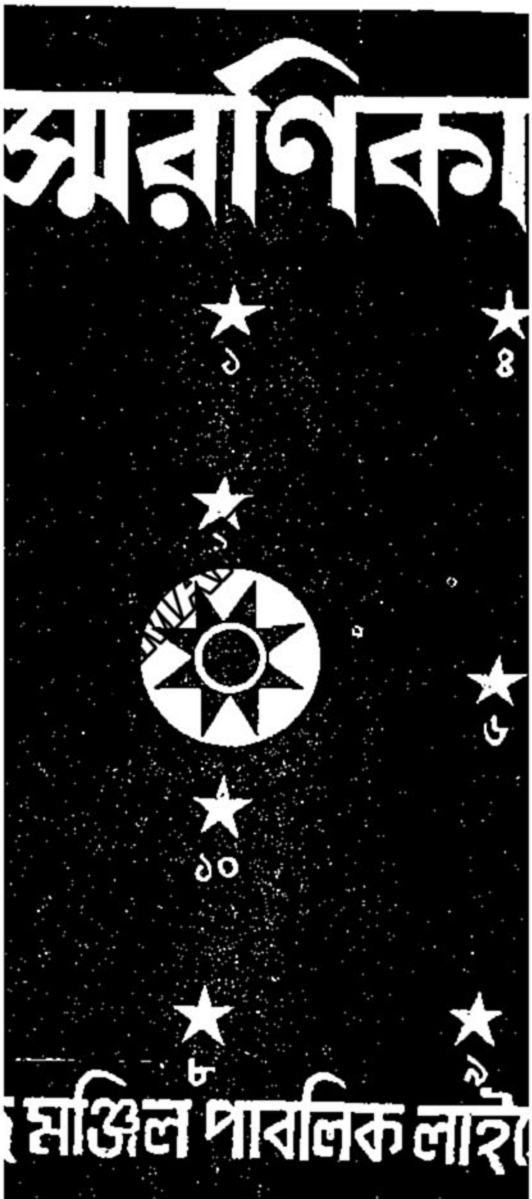

প্রচ্ছদশিল্পী গ্রন্থকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মরণিকা

ক্রমবিন্যাস

আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী

- লামচরি গ্রামের অবস্থান ও পরিবেশ
- লাইব্রেরী ও সমাধি নির্মাণ
- লাইব্রেরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ’৭৯ সালের বৃত্তিদান
- উদ্বোধনী ভাষণ
- ইত্তেফাকের খবর
- ১৯৮০ সালের বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠান
- সংবাদ পত্রিকায় খবর
- পুস্তক প্রদান অনুষ্ঠান
- পুস্তক প্রদান অনুষ্ঠানের ভাষণ
- বাকেরগঞ্জ পরিক্রমার খবর
- বার্ষিক অধিবেশন ও ’৮১ সালের বৃত্তিদান

আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরীর দানপত্র সংক্রান্ত দলিলসমূহের অনুলিপি *

ক. ট্রাস্টনামা

পরিকল্পনাসমূহ —

১. লাইব্রেরী স্থাপন
২. লাইব্রেরীর কার্যক্রম
৩. লাইব্রেরীর পরিচালক ও পরিচারক
৪. লাইব্রেরীস্থানান্তর

---

* অফিসের নিয়মমাফিক রেজিস্ট্রীকৃত দলিলসমূহে লেখ্যভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. বৃত্তিদান

৬. পুরস্কারপ্রদান

৭. সমাধি ভবন

৮. জন্মদিবস উদ্‌যাপন

৯. মৃত্যুদিবস উদ্‌যাপন

১০. অতিথি সেবা

১১. আরজ ফাণ্ড

১২. আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরী কমিটি

১৩. পরিচালক কমিটি গঠন

১৪. অধিবেশন

১৫. লিপিমালা ও স্মৃতিমালা

১৬. ক্ষমতা

তপছিল সম্পত্তি

খ. মৃতদেহ দানপত্র

গ. অছিয়তনামা

স্মৃতিমালা

সংরক্ষিত বস্তুসমূহের তালিকা

ক. কৃষি যন্ত্র

খ. জরিপী যন্ত্র

গ. পোষাক

ঘ. চা সরঞ্জাম

ঙ. দলিলপত্র

চ. বিবিধ

আসবাবপত্র

খাতাপত্র

দেয়াল ফটো

ঋণপত্র

কেন আমার মৃতদেহ মেডিক্যালে দান করছি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী

লামচরি গ্রামের অবস্থান ও পরিবেশ

জেলা বরিশালের অন্তর্গত কোতয়ালী থানাধীন লামচরি একটি অখ্যাত গ্রাম। বরিশাল শহর থেকে এ গ্রামটির পূর্বাংশের দূরত্ব জলপথে প্রায় ছ'মাইল এবং স্থলপথে রাস্তা বিশেষে ৭ ও ৮ মাইল। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ এ গ্রামটিকে তিনভাগে বিভক্ত করেছে — ১. উত্তর লামচরি, ২. দক্ষিণ লামচরি ও ৩. মধ্য লামচরি। শহর থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে গ্রামটির অবস্থান। এর মধ্যে লামচরিতে 'আরজ মঞ্জিল' (আমার নিবাস) এবং এখানেই আমি প্রতিষ্ঠা করেছি ক্ষুদ্র একটি গণপাঠাগার, যার নাম দিয়েছি 'আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী'।

এ গ্রামটি বেশিদিনের পুরানো নয়, নতুন পয়স্তি চরাঞ্চল। এ গ্রামে জনবসতি স্থাপিত হয় মাত্র ১২৭০—৮০ (বাং) সালের মধ্যে। গ্রামের প্রায় চারদিকেই নদী, মাত্র উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে কিছু অংশ পার্শ্ববর্তী মৌজা চরবাড়িয়ার সাথে যুক্ত।

গ্রামের অধিবাসীদের ষোল আনাই কৃষক এবং অধিকাংশ মুসলমান। শিক্ষিতের সংখ্যা নগণ্য। বর্তমানে এ গ্রামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে মাত্র ১টি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ২টি। কিন্তু মাদ্রাসা আছে ৩টি এবং মসজিদ আছে ১১ খানা। ধার্মিকের সংখ্যা বেশি নয়, তবে ধর্মের বাতাস বয় জোরালো। কোন পীর নাই এখানে, তবে মুরীদ আছে যথেষ্ট। আমার প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটি লামচরি গ্রামের বর্তমান পরিবেশ এবং অধিবাসীদের অধিকাংশের পরিতোষের অনুকূল নয়, তা আমি বেশ ভালোভাবেই অনুভব করে আসছি। বিদ্রোহী কবি নজরুল আক্ষেপ করে বলেছেন, "বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখন বসে, বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকাহ-হাদিস চষে"। এ গ্রামটির অবস্থাও তা-ই। কিন্তু তাই বলে কি আমরা নিরাশ হবো? 'বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে', আমরাও এগিয়ে চলবো নিশ্চয়ই। পৃথিবীর সব অঞ্চলে একই মুহূর্তে সূর্যোদয় হয় না, হয় ক্রমানুসারে। অর্থাৎ কোথাও আগে, কোথাও পরে। তদ্রূপ বর্তমান কালে বিশ্ব যে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে, তা কোন দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকবে না, থাকতে পারে না, তা পৌঁছবে বাংলাদেশেও। আর সে আলো বাংলার কোনো অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকবে না, পৌঁছবে বরিশাল তথা এ গণ্ডগ্রাম লামচরিতেও। আর তার আভাসও পাওয়া যাচ্ছে কিছু কিছু বর্তমানে।

এ গ্রামের বাসিন্দারা সবাই ছিলেন নিরক্ষর। এখানে নিয়মিত কোনোরূপ পাঠশালাই ছিলো না ১৩৪১ সালের পূর্বে। সেকালে এ গ্রামের সেরা বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন একমাত্র মরহুম আ. রহিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরীর সরহদ্দের নকশা

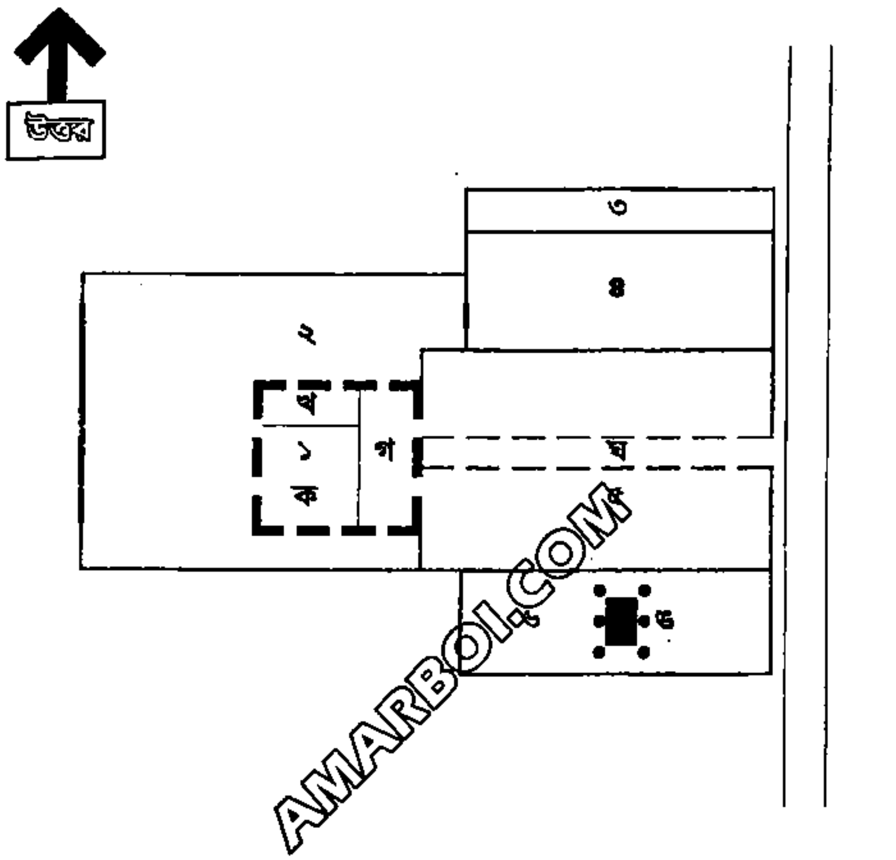

১ = লাইব্রেরী ভবন — ১/২ শতাংশ।
২ = ফল ও শব্জী আবাদী জমি — ১ ১/৪ শতাংশ।
৩ = ঐ — ১/৪ শতাংশ।
৪ = ফুলবাগান — ৩/৪ শতাংশ।
৫ = প্রাঙ্গণ — ১ ১/২ শতাংশ।
৬ = সমাধিস্থান — ৩/৪ শতাংশ।

ক = পুস্তকাগার।
খ = যাদুঘর।
গ = পাঠাগার।
ঘ = পথ।
ঙ = সমাধি ভবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লামচরি গ্রামের অবস্থান

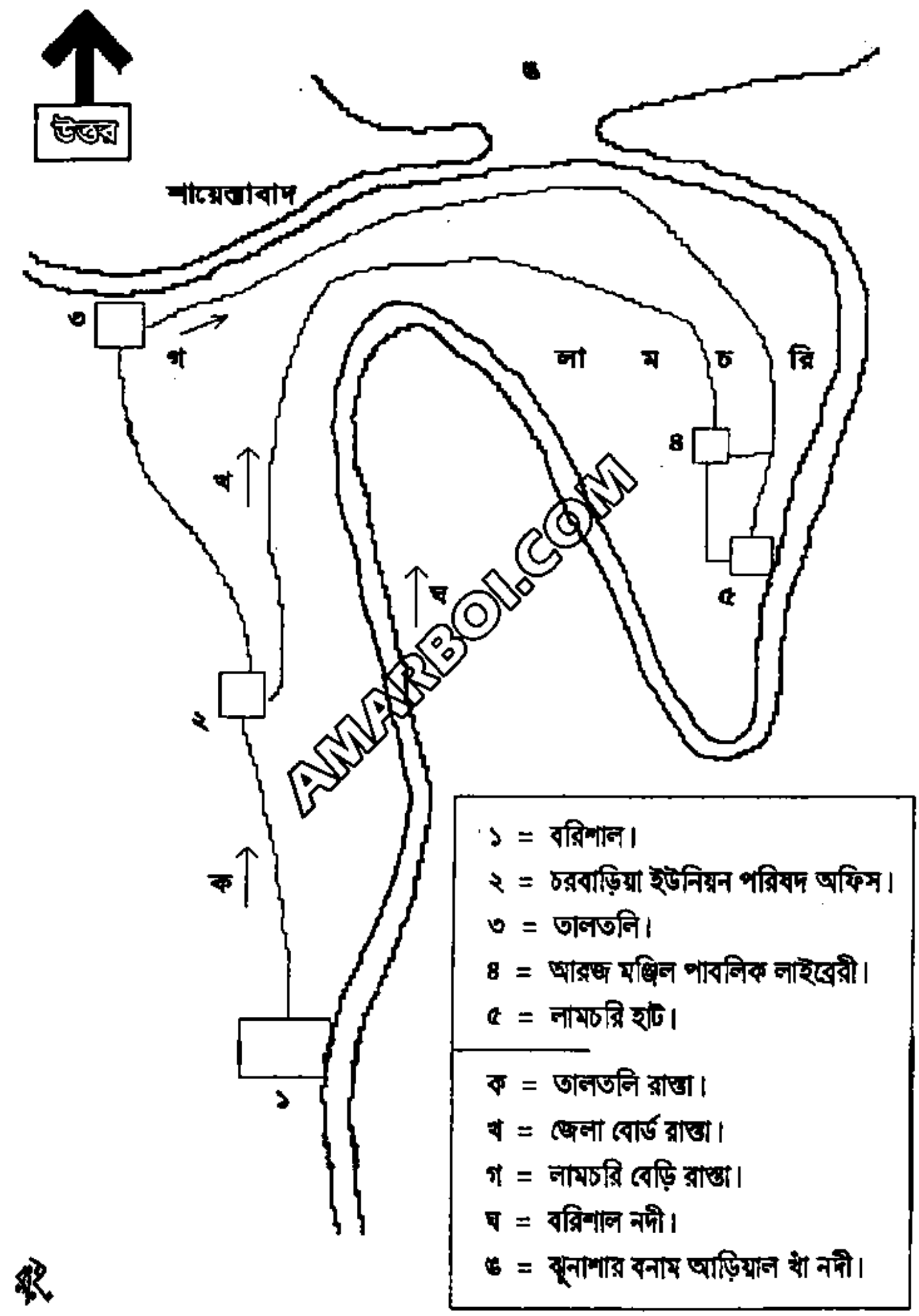

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃধা। তিনি ছিলেন উ. প্রাইমারী পাস (১৩১৬)। এ গ্রামে সর্বপ্রথম ম্যাট্রিক ও বি. এ. ডিগ্রী লাভ করে স্নেহাস্পদ প্রিয় ফজলুর রহমান মৃধা ও মো. ইয়াছিন আলী সিকদার। তারা পাশ করেছিল বরিশালের এ. কে. স্কুল ও ব্রজমোহন কলেজ থেকে, যথাক্রমে ১৯৩৭ ও ১৯৪১ সনে (বর্তমানে তারা চাকুরিজীবনে অবসরপ্রাপ্ত এবং উভয়ে আমার লাইব্রেরীর উভয় কমিটির সদস্য)। আর বর্তমানে এ গ্রামে ম্যাট্রিক পাশ ছেলের সংখ্যা ৩৪, আই. এ. পাশ ১৭ জন এবং বি. এ. ৪ জন। যদিও এ গ্রামের জনসংখ্যার অনুপাতে আলোচ্য সংখ্যাগুলো অতি নগণ্য, তথাপি আশাব্যঞ্জক এ জন্য যে, এ গ্রামের অন্তত স্থবিরতা দূর হচ্ছে।

কেউ কেউ আমাকে বলেছেন যে, লামচরি গ্রামের পরিবেশ লাইব্রেরী স্থাপনের উপযোগী নয়। সুতরাং লাইব্রেরীর চেয়ে একখানা পাকা মসজিদ করলে ভালো হতো। তাদের আমি বলে দিয়েছি যে, এ গ্রামে মসজিদ স্থাপন করা পাপের কাজ। আমি মসজিদ বানিয়ে পাপের কাজ করতে চাই না। কেননা অমনিতেই এ গ্রামে ১১ খানা মসজিদ বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছে। তার কোন কোনটিতে জুম্মার দিনে জামাত পরিমাণ (অন্তত তিনজন) মুসল্লি পাওয়া যায় না। আমি পাকা মসজিদ স্থাপন করলে হয়তো পার্শ্ববর্তী মসজিদ উচ্ছন্নে যাবে, তাতে আমি গুনাহগার হবো। নতুবা 'নাদানের দান' বলে আমার প্রতিষ্ঠিত মসজিদে কেউ নামাজ পড়তেই আসবে না। আর তখন আমি হবো 'বেহুদা খরচাকারী শয়তানের ভাই'। আজ হোক, কাল হোক, আর শত বছর পরে হোক, পরিবেশের পরিবর্তন নিশ্চয়ই হবে — এই আশায় বুক বেঁধেছি, তাই আমি লাইব্রেরীই স্থাপন করবো।

আজকাল প্রচলিত শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিগ্রী লাভ করা, জ্ঞান লাভ করা নয়। কেননা ডিগ্রীবিহীন বিদ্যা দ্বারা কর্মজীবন চলে না। বস্তুত বিদ্যাশিক্ষার ডিগ্রী আছে, কিন্তু জ্ঞানের কোনো ডিগ্রী নেই। জ্ঞান ডিগ্রীবিহীন ও সীমাহীন। সেই অসীম জ্ঞানার্জনের মাধ্যম স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, তা হচ্ছে লাইব্রেরী। তাই আমি লাইব্রেরীকে অধিক শ্রদ্ধার চোখে দেখি অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে। আর সেই শ্রদ্ধার নিদর্শন আমার এ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা। লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় আমার উদ্যম ও উদ্দেশ্যের বিষয় আরও কিছু কিছু জানা যাবে — লাইব্রেরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের পুস্তক প্রদান অনুষ্ঠানে আমার লিখিত ভাষণ পাঠে।

X X X X

লাইব্রেরী ও সমাধি নির্মাণ

স্থানীয় রাজমিস্ত্রী আ. মজিদ মুন্সী কর্তৃক আমার লাইব্রেরীটির ভিত্তি স্থাপন করা হয় বিগত ১৯শে আষাঢ় ১৩৮৬ তারিখে। লাইব্রেরী নির্মাণের যথোপযুক্ত অর্থের সংস্থান আমার ছিল না। তাই ব্যয়হ্রাসের উদ্দেশ্যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সব কাজেই অংশ নিতে হয়েছে আমাকে কুলি-মজুর, রাজমিস্ত্রী ও ছুতোরদের সঙ্গে। কুলিদের সাথে ইট বহন করেছি এবং মজুরদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে ইট ভেঙ্গে খোয়া বানিয়েছি। উদ্দেশ্য — এভাবে কায়িক শ্রমের দ্বারা কিছু অর্থ বাঁচাতে পারলে তা দ্বারা কিছু বই কেনা যাবে। আমি এসব হেয় কাজ করি বলে আমাকে অনেকে উপহাস করতো। শুনে আমি তাদের জিজ্ঞেস করতাম, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন মলত্যাগ করেন তখন তার জলশৌচ করে কে? উত্তর দিত উপহাসকারীরা, রাষ্ট্রপতি নিজেই। আমি বলতাম, নিজের কাজ নিজে করেন বলে যদি জিয়াউর রহমানের বিষ্ঠা ধোয়ায় ঘৃণা ও মানহানি না হয়, তাহলে আমার খোয়া ভাঙ্গায় অপমান কি? উপহাসকারীরা আমার এ প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পায়নি। এভাবে আমি তাদের ঠকিয়েছি। কিন্তু কোনো কোনো সময় নিজেও ঠকেছি। অনভ্যাসবশত হাতুড়ীর আঘাতে বাম হাতের আঙ্গুলগুলো ছিঁড়ে-ফেটে রক্তাক্ত হতো প্রায়ই। একদা বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখটি ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিলো হাতুড়ীর আঘাতে। সে নখটি আমার চুল, দাড়ি ও দাঁতের সঙ্গে কাঁচের বৈয়মে ভরে রেখে দিয়েছি আমার সমাধিগর্ভে।

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে স্থানীয় বিত্তবানদের আমি সহানুভূতি পাইনি। তবে মজুরদের সাহায্য পেয়েছি প্রচুর। তারা সকলেই লাইব্রেরীর কাজে মজুরী কম নিয়েছে, হয়তোবা কেহ মজুরী ছাড়াই কাজ করেছে। কিন্তু আমার বিত্তবান এক প্রতিবেশীর কাছে বাঁশ খরিদ করতে গিয়ে তাঁর দাবীকৃত ৫০ টাকার স্থলে ৪৯ টাকা মূল্য বলায় তিনি আমাকে বাঁশ দেননি। রাজমিস্ত্রী আ. মজিদ মুন্সী ও ছুতোর মিস্ত্রী রাধাচরণের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। যেহেতু তাঁরা তাঁদের কাজের মজুরীর অর্ধেক নিয়ে আমার লাইব্রেরীর নির্মাণকাজ সমাধা করেছেন। **কাজেই এ গ্রামের মজুরদের কাছে আমি ঋণী, হুজুরদের কাছে নয়।**

কায়ক্লেশে আমার লাইব্রেরীর নির্মাণকাজ সমাধা হয় ৩১শে ভাদ্র ১৩৮৬ তারিখে। অতঃপর ৬.৬.৮৬ তারিখে আরম্ভ করে আমার সমাধিটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয় ১১.৬.৮৬ তারিখে। কিন্তু পুরোপুরি নয়। **সমাধির নিম্নভাগটা পাকা করতে সম্মত হলেন না রাজমিস্ত্রীরা কিছুতেই। কেননা, গ্রামের মুসল্লিরা নাকি 'শরিয়ত-বিরোধী' বলে ও কাজটি করতে তাঁদের বিশেষভাবে নিষেধ করেছেন। আমার রাজমিস্ত্রীর বাবা ছিলেন একজন নামকরা মুন্সী এবং তিনি নিজেও মুন্সী মানুষ। তিনি হয়তো ভাবলেন যে, চারপাশের সাথে নিম্নদিকটাও পাকা করা হলে কবরে মনকির ও নকির ফেরেস্তাদ্বয়ের প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।** আর এভাবে ফেরেস্তাদের যাতায়াতের অসুবিধা ঘটালে নিশ্চয়ই তাঁর গুনাহগার হতে হবে। তাই আমার সমাধির নিম্নভাগটা সিমেন্ট করাতে মুন্সী সাহেবকে রাজী করান গেলো না। অগত্যা সে কাজটি আমার করতে হলো নিজেকেই।

আমার সমাধির বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট নেই। মাত্র সমতল স্লাবের উপর আর একখানা চৌচালা স্লাব এবং তদুপরি স্লাবটি নাড়াচাড়া ও নামফলক স্থাপন করার জন্য একটি বাঁকানো রড বসানো। কিন্তু একটি গুজব ছড়িয়ে পড়লো এই বলে যে, আমার সমাধিটিতে গ্লাস এবং টেলিফোন বসানো হয়েছে — মনকির-নকির ফেরেস্তাদ্বয়ের কাণ্ডকারখানা দেখার ও তাঁদের কথাবার্তা শোনার জন্য। তখন আমি যেখানেই যেতাম, লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করতো ঐ কথাই। আমি তো হতবাক। কৌতূহলী জনগণকে আমি বুঝাতে পারতাম না যে, ওগুলো মিথ্যে গুজব। সে মিথ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুজবের উপর ভিত্তি করে অসংখ্য লোকের সমাগম হতে লাগলো আমার সাদামাটা সমাধিটি স্বচক্ষে দেখার জন্য। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য-প্রমাণের বদৌলতে দর্শকদের সমাগম বর্তমানে কমেছে। তবে দূরাঞ্চলের কিছু কিছু লোক এখনো এসে থাকে আমার সমাধিটি দর্শনে।

X X X X

লাইব্রেরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও '৭৯ সালের বৃত্তিদান

লাইব্রেরী ও সমাধি নির্মাণের পর আত্মনিয়োগ করি আমি লাইব্রেরীটির শুভ উদ্বোধন ও উৎসর্গ পর্ব সমাধার কাজে। এ কাজে আমাকে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেন ব্রজমোহন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় কাজী গোলাম কাদির সাহেব ও সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মো. হানিফ সাহেব।

অধ্যক্ষ মো. হানিফ সাহেবের প্রচেষ্টায় বিগত ২৩. ৮. ৮৬ (বাং) তারিখ সৈয়দ হাতেম আলী কলেজের ফুটবল খেলার বিজয়োৎসব অনুষ্ঠানে বসে তৎকালীন বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক মাননীয় আ. আউয়াল সাহেবের সাথে আমার পরিচয়লাভ হয়। পরিচয়ান্তে জেলা প্রশাসক সাহেব আমার কাছে লাইব্রেরী সংক্রান্ত পরিকল্পনার একটি লিখিত খসড়া তলব করেন এবং আমি তা তাঁর কাছে পেশ করি অধ্যক্ষ মো. হানিফ সাহেবের মারফতে বিগত ১৭. ১১. ৮৬ তারিখে। আমার সে পরিকল্পনাটি দেখতে পাওয়া যাবে 'স্মরণিকা'-এর শেষের দিকে 'ট্রাস্টনামা' (দানপত্র) দলিলখানিতে। সেই পরিকল্পনা দেখতে পেয়ে আমার ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির প্রতি বিদ্যোৎসাহী জেলা প্রশাসক সাহেবের শুভদৃষ্টি নিপতিত হয়। তাই তিনি লামচরির মতো নোংরা পরিবেশে অবস্থিত আমার ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটির শুভ উদ্বোধন পর্বে পৌরহিত্য করতে সম্মত হন এবং বিগত ২৫. ১. ৮১ (ইং) তারিখে তিনি নিম্নলিখিত সুধীবৃন্দ সমাবেশে আমার লাইব্রেরীটির শুভ উদ্বোধন পর্বে আতিথ্য গ্রহণ করেন, যাঁদের শুভাগমনে আমার অনুষ্ঠানটি হয় গৌরবোজ্জ্বল এবং ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটি হয় মহিমান্বিত।

সুধীবৃন্দের নাম

১. মাননীয় আ. আউয়াল, জেলা প্রশাসক, বাকেরগঞ্জ।
২. জনাব আ. কাইয়ুম ঠাকুর, সহকারী জেলা প্রশাসক (শিক্ষা)।
৩. জনাব সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, নাজীর কালেক্টরী, বরিশাল।
৪. জনাব আবদুল কাইয়ুম, সাংবাদিক ও জি. পি. বরিশাল।
৫. জনাব কাজী গোলাম কাদির, অধ্যাপক, বি. এম. কলেজ, বরিশাল।
৬. জনাব মো. হানিফ, অধ্যক্ষ, সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল।
৭. জনাব মো. সিরাজুল হক, অধ্যক্ষ, বরিশাল কলেজ, বরিশাল।
৮. জনাব বদিউর রহমান, অধ্যাপক, সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল।

সর্বাগ্রে মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব লাইব্রেরীর দারোদ্ঘাটনপূর্বক শুভ উদ্বোধন পর্ব সমাধা করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠানে মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবকে প্রধান অতিথি এবং অধ্যাপক জনাব সিরাজুল হককে সভাপতি পদে বরণ করা হয়। শুরুতে আমি একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করি। ভাষণটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

উদ্বোধনী ভাষণ

আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরী, লামচরি
২৫ জানুয়ারী ১৯৮১

মাননীয় বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক সাহেব, উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও আমার পল্লীবাসী আত্মীয়-বন্ধুগণ! আজ আমার জীবন ধন্য হলো, তা দু'টি কারণে। প্রথমটি হলো, জেলা প্রশাসক সাহেবের হাতে আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটির দারোদঘাটন দেখতে পেরে ; দ্বিতীয়টি হলো আমার চিরপ্রিয় পাঠশালার প্রাণপ্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের সুকোমল হস্তে সর্বপ্রথমবার বৃত্তিপ্রদান করতে পেরে।

আজ আমার ৮০ বৎসর দীর্ঘ জীবনের মধ্যে পরম ও চরম আনন্দের একটি দিন। 'পরম' ও 'চরম' এই জন্য যে, এ লামচরি গ্রামের মতো একটি গণ্ডগ্রামে ভাঁটিগাছ, গুড়িকচু ও কচুরীপানায় আচ্ছাদিত জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে অবস্থিত আমার এ নগণ্য প্রতিষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে যে সমস্ত মনীষীবৃন্দের চরণদর্শন লাভের সৌভাগ্য আজ আমার হলো, এ জীবনে তা আর কখনো হয়নি, হয়তো ভবিষ্যতে আর হবেও না কোনদিন। কেননা আমি এখন খরস্রোতা নদীতীরের ফাটলধরা মাটির উপর দাঁড়ানো বৃক্ষের মতোই দাঁড়িয়ে আছি। যে কোন মুহূর্তে ডুবে যেতে পারি অতল সলিলে।

হয়তো কেউ জানতে চাইতে পারেন যে, বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে 'অভাব'-এর তো অভাব নেই। তবে কেন আমার মনে লাইব্রেরী করার প্রবণতা জাগলো? এর জবাবে আমি আপনাদের কাছে এই জানাতে চাই যে, এটা আমার আজীবনকালের ভিক্ষাবৃত্তি ও চুরিকর্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সে কি রকম সংক্ষেপে তা বলছি।

জন্ম আমার ৩রা পৌষ ১৩০৭ সালে। আমার শৈশবকালে এ গ্রামে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো না। মাত্র চার বছর বয়সে পিতৃহারা ও আট বছর বয়সে বিত্তনিলামে সর্বহারা হয়ে বিধবা মায়ের আঁচল ধরে দশ দুয়ারের সাহায্যেই বেঁচে থাকতে হয়েছে আমাকে আমার শৈশবে। স্থানীয় মুন্সী মরহুম আ. করিম সাহেব একখানি মক্তব খোলেন তাঁর বাড়ীতে ১৩২০ সালে। আমি অবৈতনিকভাবে তাঁর কাছে শিক্ষা করলাম স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ ও বানান-ফলা পর্যন্ত। কিন্তু ছাত্রবেতন অনাদায় হেতু তিনি মক্তবটি বন্ধ করে দিলেন ১৩২১ সালে। আর এখানেই হলো আমার বিদ্যাশিক্ষার সমাপ্তি বা সমাধি।

শৈশবে লেখাপড়া শেখার প্রবল আগ্রহ আমার ছিলো, কিন্তু কোনো উপায় ছিলো না। আমি আমার উক্ত সামান্য বিদ্যার জোরেই চুরি করে পড়েছি জয়গুন্-সোনাবান, জঙ্গনামা, মোক্তল হোসেন ইত্যাদি পুঁথি এবং ভিক্ষা করে পড়েছি তৎকালে বরিশালে পড়ুয়া ছাত্রদের পুরানো পাঠ্য বইগুলো। সে সব ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রিয় ফজলুর রহমান (গ্র্যাজুয়েট)। তিনি অবসরপ্রাপ্ত এল. এ. ও.। বর্তমানে এখানেই আছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরিশাল পাব্‌লিক লাইব্রেরী থেকে বই চুরি করে বাড়িতে এনে পড়তে শুরু করি আমি বাং ১৩৪৪ সাল থেকে। মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরের কোনো পাঠককে তার বাড়িতে বই দেবার নিয়ম নেই বলে আমার বাড়িতে এনে বই পড়তে হয়েছে তৎকালীন বরিশালের টুপীর ব্যবসায়ী জনাব ওয়াজেদ আলী তালুকদারের বেনামীতে। আমি তাঁর কাছে ঋণী। **বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরীর বই আমি সময় সময় এখনো বাড়িতে এনে পড়ি, তা-ও বেনামীতে আনতে হয়। এ সমস্ত আমার পক্ষে চুরিই বটে।** আমার এ চুরিকাজে যথাসম্ভব সাহায্যদান করেছেন মাননীয় লাইব্রেরীয়ান জনাব এয়াকুব আলী (মোক্তার) সাহেব। আমি তাঁর কাছেও ঋণী। এরমধ্যে বরিশাল শঙ্কর লাইব্রেরী থেকে বইপুস্তকও এনে পড়েছি দুই-তিন বৎসর, তা-ও অনুরূপভাবেই।

বাংলা ১৩৫৪-৫৫ সাল থেকে কিছু কিছু বই চুরি করে এনে পড়তে থাকি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ লাইব্রেরী থেকে। সে চুরি কাজে আমাকে সাহায্যদান করেছেন ও করেন মাননীয় অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেব। তিনি শুধু আমার চুরি কাজের সহযোগীই নন, আমার জীবনের সাধনার যাবতীয় ফলাফলের তিনি সম-অংশীদার। হয়তোবা তার চেয়েও বেশী। তিনি আমার জীবনের সাথে এতোই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যে, কারো সাহায্য না নিয়ে তিনি আমার জীবনী লিখতে পারেন। মাননীয় অধ্যাপক শামসুল হক সাহেব এবং মাননীয় অধ্যাপক শামসুল ইসলাম সাহেবও সাহায্য করেছেন আমাকে কলেজ লাইব্রেরী থেকে বই চুরির কাজে। ১৩৫৭-৬২ সাল পর্যন্ত চুরি করে এনে কিছু কিছু বই পড়েছি বরিশালের ব্যাপটিস্ট মিশন লাইব্রেরী থেকে এবং ভিক্ষাও পেয়েছি কিছু পুস্তক-পুস্তিকা সেখান থেকে। আর এ কাজে আমাকে সাহায্যদান করেছেন তৎকালীন লাইব্রেরীয়ান মি. মরিস সাহেব। তিনি ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী, তবে বাংলাভাষা জানতেন ভালো। আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

যে সমস্ত মনীষীগণ আমার জন্য চুরি করেছেন বা আমার চুরি কাজের সাহায্য করেছেন, আমার মনে হয় যে, আইনের কাছে তাঁরা অন্যায় করে থাকলেও সমাজের কাছে তাঁরা মহৎ কাজই করেছেন। কেননা তাঁরা একটি 'জানোয়ার'কে মানুষ বানিয়েছেন। আর সেই মানুষটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ আপনারা এই জংলাভূমে পদধূলি দিচ্ছেন।

প্রবাদ আছে — 'চোরের বাড়িতে দালান নেই' এবং 'ভিক্ষার চালে ভরে না গোলা'। তাই ভেবে আমি আমার আজীবনকালের ভিক্ষা ও চুরি করা সম্পদটুকু মজুদ করে রাখা নিষ্ফল মনে করে জনগণের কল্যাণ কামনায় তা সাধারণ্যে দান করে দেবার প্রয়াসী হয়ে তা দান করলাম — 'সত্যের সন্ধান' ও 'সৃষ্টি-রহস্য' নামক দু'খানা ক্ষুদ্র পুস্তকের মাধ্যমে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, **রাজধানীর বুদ্ধিজীবী মহলের অনেকেই বই দু'খানা আমার দান বলে স্বীকার করতে চাননি। তাঁরা অনেকেই বলেছেন যে, পল্লীবাসী কৃষকরা নিরক্ষর হলেও সাধারণত ভালোমানুষ এবং বেশীরভাগই ঈমান-ধনে ধনী। তাদের মধ্যে এমন আনাড়ি লোক ও এ সমস্ত দানসামগ্রী থাকা অসম্ভব। এই বই নিশ্চয়ই কোনো বুদ্ধিজীবী লোকের লেখা। হয়তো তিনি ধুরন্ধরী করে নাম দিয়েছেন একজন কৃষকের।** বই দু'খানা লেখা আমার পক্ষে সম্ভব কি-না, তা যাচাই করবার জন্য প্রাক্তন ডি. পি. আই. জনাব ফেরদাউস খান তো তাঁর ধানমণ্ডির বাসায় আমাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে রীতিমতো পরীক্ষাই নিলেন ৩. ১. ৭৬ তারিখে। সে পরীক্ষাকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন জনাব আ.ন.ম. এনামুল হক এবং চিত্রশিল্পী কাজী আবুল কাসেম সাহেব। সেদিন কাসেম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবের হাতের পেন্সিলে আঁকা আমার একটি ছবি এখানেই আমার লাইব্রেরীতে আছে।

কিন্তু বুদ্ধিজীবী মহলের সে কথার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাজধানীর বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ প্রধান ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ও তাঁর প্রণীত 'আরণ্যক দৃশ্যাবলী' নামক বইখানিতে। তিনি অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, কল্পিত নাম নয়, ছদ্মনাম নয় কারো, আরজ আলী মাতুব্বরের নিবাস বরিশাল। তাঁর সে বইখানা এখানেই (আমার লাইব্রেরীতে) আছে।

ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা এবং চুরি করে করে আমি যে পাপ অর্জন করেছি, তারই প্রায়শ্চিত্ত অথবা যে অপরাধ করেছি, তারই জরিমানা দিচ্ছি আমি এখন প্রায় ৬০ হাজার টাকা। যার দ্বারা স্থাপিত হচ্ছে এই ক্ষুদ্র পাঠাগারটি, মজুত হচ্ছে জনতা ব্যাংকে ১০ হাজার টাকা এবং করা হচ্ছে ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা। এ সমস্ত অর্থ আমার দান নয়, এগুলো আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা অপরাধের জরিমানা। কেননা, ঐ সমস্ত পাপ বা অপকর্ম না করলে হয়ত আমি এই সমস্ত জরিমানা দিতাম না কখনো।

দারিদ্র নিবন্ধন কোনো স্কুল-কলেজে গিয়ে পয়সা দিয়ে বিদ্যা কিনতে পারিনি আমি দেশের অন্যসব ছাত্র-ছাত্রীদের মতো। তাই কোনো স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা আমার শিক্ষাপীঠ নয়, আমার শিক্ষাপীঠ হলো 'লাইব্রেরী'। আশৈশব আমি লাইব্রেরীকে ভালোবেসে এসেছি এবং এখনো ভালোবাসি। লাইব্রেরীই আমার তীর্থস্থান। আমার মতে — মন্দির, মসজিদ, গীর্জা থেকে লাইব্রেরী বহুগুণ শ্রেষ্ঠ।

AMARBOI.COM

তাই আমি যখন কোনোরূপ একটি জনকল্যাণমূলক কাজ করবার জন্য মনস্থির করেছি, তখন আমার সেই লাইব্রেরীপ্রীতিই জাগিয়ে তুলেছে আমার মনে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার প্রবণতা। আর তারই ফল আমার এ ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটি। যেহেতু আমি লাইব্রেরীর কাছে ঋণী। আমি লাইব্রেরীর ভক্ত।

লাইব্রেরী ছাড়া আমার আরো একটি তীর্থস্থান ছিলো। তা হলো প্রায় ৬৭ বছরের পুরানো একখানা দোচালা খড়ের ঘর। অর্থাৎ মরহুম মুন্সী আবদুল করিম সাহেবের ক্ষুদ্র পাঠশালাটি। সেটা ছিলো আমার শৈশবকালের তীর্থস্থান। সেখানে গিয়ে লিখতে হয়েছে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ তালপাতায় এবং বানান-ফলা কলাপাতায়, লেমের কালি ও টনির কলম দিয়ে। সে পাঠশালায় আমার সমপাঠী বা সহপাঠী যারা ছিলো, তারা সবাই কালে বা অকালে এ জগত ছেড়ে চলে গেছে। জীবিত আছে মাত্র দু'জন আরজ আলী।

সেকালের সেই পরলোকগত সহপাঠীদের কচিমনের সাথে আমার তখনকার কচিমনের যে ভালোবাসা জন্মেছিলো, তা ভুলতে পারিনি আমি আজো। তাই সময় সময় আমার এ বৃদ্ধ মনটি যেন কচি হয়ে যায় এবং স্মৃতিপটে আঁকা সেইসব বাল্যবন্ধুদের সাথে মেলামেশা ও খেলা করে। কিন্তু সে খেলায় মন-মানস তৃপ্ত হয় না। তাই আমার শৈশবের সেই কচি মনটি বন্ধুত্ব পাতাতে চায় আধুনিক কালের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিমনা শিশুদের সাথে। কিন্তু আমি জানি যে, অধুনা কোনো শিশু ছাত্রই আমার মতো চুল-দাড়ি পাকা, দন্তহীন বৃদ্ধের সাথে বন্ধুত্ব পাতাবে না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে ভালোবাসবে না। মনের সরলতায় আমি যে আজো একজন শিশু তা কেউ বুঝবে না, বোঝবার কথাও নয়। তাই আমি স্থির করেছি যে, ছাত্ররা আমাকে ভালোবাসুক আর না-ই বাসুক, আমি তাদের ভালবাসবো। শৈশবকাল থেকেই আমার মনে বাসা বেঁধেছে পাঠশালাপ্রীতি ও ছাত্রপ্রীতি। আমি কামনা করি যে, আমার মরআত্মা যেন অনন্তকাল ধরে পাঠশালার শিশু ছাত্রদের সাথেই খেলা করে। আর তাই হবে আমার স্বর্গ-সুখ। এছাড়া অন্য কোনোরূপ স্বর্গ আমার কাম্য নয়। আর আমার সেই পাঠশালা ও ছাত্রপ্রীতির নিদর্শন হলো 'ছাত্রদের বৃত্তিদান'। অর্থাৎ আরজ ফাণ্ড থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অনন্তকাল স্থায়ী প্রতিযোগিতামূলক বার্ষিক বৃত্তি প্রদান।

অর্থ আমার নেই। কেননা জীবনে অর্থের জন্য আমি সাধনা করিনি বেঁচে থাকার অতিরিক্ত। আমার কর্মজীবনের শেষ অধ্যায়ে ১৩৬৭ সালে আমার স্থাবরাস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি আমার ওয়ারিশদের দান ও বণ্টন করে দিয়ে রিক্তহস্তে সংসারত্যাগী হয়ে সে সময় থেকে আমি আমার পুত্রগণের পোষ্য হয়ে জীবনযাপন করছি। তবে ছেলেদের বলে দিয়েছি যে, অতঃপর এ বৃদ্ধবয়সে আমার দেহটি খাটিয়ে যদি কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারি, তবে তার প্রতি তোমাদের কারো কোনো দাবী থাকবে না, আমি তা আমার ইচ্ছামতো কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করবো। আমার ওয়ারিশগণ তাতে সম্মত ছিলো এবং এখনো আছে। বিশেষত আমার প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণে তারা যথাসম্ভব সহযোগিতাও করছে। তবে তারা এতে কোনোরূপ আর্থিক সাহায্যদানে অক্ষম।

সংসারত্যাগী হয়েও নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকিনি আমি, দিনমজুরী করেছি মাঠে মাঠে আমিন-রূপে। সেই মজুরীলব্ধ অর্থ দ্বারা কিছু ভূ-সম্পত্তি খরিদ করেছিলাম আমি ইতিপূর্বেই। গত বছর তা সমস্তই বিক্রয় করেছি। ক্রেতারাও প্রায় সবাই এখানেই আছেন। আমার সেই সম্পত্তি-বিক্রয়লব্ধ সামান্য পুঁজি নিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের বিরাট কাজে হাত দিয়েছি। সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও অন্যান্য বাবদ আমার তহবিল ছিলো মাত্র ৪৫ হাজার টাকা এবং আমার পরিকল্পিত কাজের ব্যয় বরাদ্দ ছিলো ৬০ হাজার টাকা। আমি জানি যে, এর ঘাটতির ১৫ হাজার টাকা পূরণ করতে হবে আমাকে দিনমজুরী করে। মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবকে প্রদত্ত পরিকল্পনায় এ ঘাটতির বা তা পূরণের উপায় সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ আমি করিনি। কেননা আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, যদি আমি মজুরীগিরিতে অক্ষম হই, তাহলে ভিক্ষা করবো। ভিক্ষায় আমার লজ্জা নেই। লোকে আমাকে 'ভিখারী' বলুক, তা আমি চাই। আর সেই কারণেই আমি আমার একখানি জীবনী লিখে নাম দিয়েছি তার 'ভিখারীর আত্মকাহিনী'। ভিক্ষা করা সম্প্রতি আমি শুরুও করেছি। এবারে ঢাকায় গিয়ে কতিপয় বিদ্যোৎসাহী বন্ধুর কাছে বই ভিক্ষা পেয়েছি ১০৮ খানা, যার মোট মূল্য ৯৮৩.৭৫ পয়সা। সে বইগুলো আমার লাইব্রেরীতে আছে।

টাকা আমার নেই। আর জীবিকা নির্বাহের জন্য আমার টাকার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু আমার প্রতিষ্ঠানটির যাবতীয় কাজ সমাধা করতে টাকার অভাব আছে, তা তো আগেই বলেছি। অভাব আছে কিছু বইপত্রের ও আসবাবপত্রের। কিন্তু তা পূরণ করা আমার ক্ষমতার বাইরে নয়। সুধী মহোদয়গণ! আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে, এখন আমার জন্য কোন ভবিষ্যৎ নেই। 'ভবিষ্যৎ' আমার হাতে থাকলে কোনো অভাবকেই আমি 'অভাব' বলে মনে করতাম না। তাই

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাদের কাছে আমার অভাবের একটি তালিকা পেশ করছি —

১. গরু-ছাগলের কবল থেকে ফুল-ফলের গাছ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে লাইব্রেরীর সরহদ্দের সীমানা বরাবর একটি দেয়াল নির্মাণ করা।

২. আগন্তুকদের পানীয় জলের জন্য একটি নলকূপ বসানো।

৩. বয়স্কদের শিক্ষার জন্য নৈশবিদ্যালয়রূপে লাইব্রেরী সংলগ্ন একটি বারান্দা নির্মাণ করা।

৪. 'দানপত্র' রেজিস্ট্রীকরণের ব্যয় নির্বাহ করা (এটাই আমার সর্বপ্রধান সমস্যা এবং আশু প্রয়োজন)।

একবার আমি আমার ৬০ বছর বয়সের সময় ঘোষণা করেছিলাম যে, অতঃপর আমি যা কিছু উপার্জন করবো, তা সমস্তই দেশের জনকল্যাণে ব্যয় করবো। আপনারা দেখেছেন যে, তা আমি করেছি। আজ আমার ৮০ বৎসর বয়সে আবার ঘোষণা করছি যে, অতঃপর আমি যদি কোনো কাজের মজুরী পাই, কিংবা পুরস্কার বা উপহারপ্রাপ্ত হই, বা মহামান্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত হই তবে তা সমস্তই আমার এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়ন ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক বৃত্তিদানে ব্যয় করবো। আর এজন্য উপস্থিত সুধীবৃন্দের, বিশেষ করে মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের শুভদৃষ্টি প্রার্থনা করছি।

শ্রদ্ধেয় অতিথিবৃন্দ, আপনাদের আর আমি অধিক কষ্ট দিতে চাই না। এখন আমি মৃত্যুপথের যাত্রী। অনেকের সাথেই হয়তো এই আমার শেষ দেখা। আপনাদের মতো যে সমস্ত সুধীজনের সাথে সৌভাগ্যক্রমে আমার পরিচয়লাভের সুযোগ ঘটেছে, তাঁরা সবাই হচ্ছেন বিদ্যায়, জ্ঞানে, গুণে, ধনে, মানে, পরিবেশ ও আভিজাত্যে আমার সাথে এতই অসমান যে, তা পরিমাপ করা যায় না। আর আমি হলাম একজন অশিক্ষিত, পল্লীবাসী কৃষক। তাই আমি অনেক সময় আপনাদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও ব্যবহারে সৌজন্য রক্ষা করে চলতে পারিনি। হয়তো আমার ত্রুটি হয়েছে, হয়েছে বেয়াদবী। কিন্তু তা আমার অহঙ্কার নয় ; তা হচ্ছে আমার স্বকীয় অজ্ঞতা, মূর্খতা বা বার্দ্ধক্য হেতু জ্ঞানের খর্বতা। সেজন্য আমি আজ আপনাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি।

আমার পল্লীবাসী ভাই ও বোনেরা, যাঁরা এখানে আছেন বা না আছেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই এইজন্য যে, আমি আপনাদের গ্রাম্য সমাজের একজন আনাড়ি মানুষ। কেননা প্রচলিত সমাজবিধির বিরুদ্ধে আমি অনেক কাজ করে যাচ্ছি। আর সেজন্য আপনারা আমাকে সমাজচ্যুত করতে পারতেন, আমাকে পারতেন একঘরে করতে, বর্জন করতে। কিন্তু তা আপনারা করেননি। বরং আমাকে সাথে নিয়েই কাজ করেছেন সকলে সব সময়, মর্যাদা দান করেছেন। কোনো কোনো কারণে আমি আপনাদের অবহেলার পাত্র হলেও অবহেলা করেননি আমাকে কেউ কোনোদিন। তাই আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জীবনের শেষ প্রহরে বিদায় নিচ্ছি।

পরিশেষে — হে আমার মহান অতিথিবৃন্দ। সময়, শক্তি, অর্থ নষ্ট করে এবং শ্রম স্বীকার করে আপনারা আমার এ ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটির সামান্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমার অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করেছেন, আমাকে করেছেন গৌরবান্বিত। বিশেষত মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব উদ্বোধনপর্বে পৌরহিত্য করায় অনুষ্ঠানটি হচ্ছে গৌরবোজ্জ্বল এবং তাঁর পদস্পর্শে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার লাইব্রেরীটি হয়েছে ধন্য এবং ধন্য হচ্ছে লামচরি গ্রামখানি। আমি আমার নিজের ও লামচরিবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাদের সকৃতজ্ঞ মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ — শুভ হোক।

মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব তাঁর ভাষণে লাইব্রেরীর উন্নয়নকল্পে ১০০ খানা মূল্যবান পুস্তক, একটি গভীর নলকূপ ও আমার দানপত্র রেজিষ্ট্রি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ের অর্থ দান করার কথা ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব আমার পরিকল্পনা মোতাবেক উত্তর লামচরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দক্ষিণ লামচরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯৭৯ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের 'আরজ ফাণ্ড' থেকে মং ২০০.০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করেন। এ সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের ১৯৮০ সালের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলেও তার ফলাফল প্রকাশিত না হওয়ায় উক্ত সালের বৃত্তিদান স্থগিত থাকে।

এ অনুষ্ঠানে সমাগত অতিথি জনাব কাইয়ুম চৌধুরী (সাংবাদিক)-এর লিখিত সচিত্র একটি খবর প্রকাশিত হয় বিগত ৩০. ১১. ৮৭ (বাং) তারিখে 'ইত্তেফাক' পত্রিকায়। খবরটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

AMARBOI.COM

ইত্তেফাকের খবর
৩০. ১১. ৮৭

মানব কল্যাণের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

বরিশাল, ১২ মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা) — গ্রামের কৃষক আরজ আলী মাতুব্বর জনকল্যাণে নিজের যাবতীয় সম্পত্তি ত বটেই, অধিকন্তু জীবনসায়াহ্নে নিজের চক্ষু দুইটি এবং মরদেহ দানের কথা ঘোষণা করিয়া এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

বরিশাল হইতে ৭/৮ মাইল দূরে লামচরি গ্রামে তাঁহার বাড়ী। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ তাঁহার না থাকায়, ছেলেবেলা হইতে তিনি বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরীতে নিয়মিত হাজির হইতেন জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য। ফলশ্রুতিতে যথাক্রমে ১৯৭৪ ও ১৯৭৮-এ প্রকাশিত হয় তাঁহার রচিত 'সত্যের সন্ধান' ও 'সৃষ্টি-রহস্য' নামক গ্রন্থ দুইটি। এজন্য তিনি গত বৎসর হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

জীবনের ৬০ বৎসর পর্যন্ত অর্জিত সম্পত্তি তিনি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। পরবর্তী ২১ বছরে অর্জিত সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি উইল করিয়া জনকল্যাণমূলক কাজে দান করেন। তাঁহার দানের অর্থে ইতিমধ্যেই একটি পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

একাশি বছরের বৃদ্ধ আরজ আলী মাতুব্বর এক দলিল সম্পাদন করিয়া মৃত্যুর পর চক্ষু ব্যাংকে তাঁহার চক্ষু দুইটি দান এবং বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের জন্য তাঁহার মরদেহ দানের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করিয়া ব্যতিক্রমধর্মী ও সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়াছেন। X X X X

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮০ সালের বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠান

১৯৮০ সালের বৃত্তিপ্রদান করা হয় ২০শে বৈশাখ ১৩৮৮ মোতাবেক ৩. ৫. ৮১ (ইং) তারিখে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মি. অরবিন্দ কর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন) এবং তৎসঙ্গে আতিথ্য গ্রহণ করেন —

১. শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির, বরিশাল।

২ বাবু সুধীর সেন, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও সাংবাদিক, বরিশাল।

৩. বাবু অরূপ তালুকদার, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, বরিশাল।

১৯৭৯ সালের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছিলো দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং এবারের (১৯৮০) বৃত্তি প্রদান করা হলো তিনটিতে। অতিরিক্ত বিদ্যালয়টি হচ্ছে চরমোনাই (মাদ্রাসা) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাননীয় সভাপতি সাহেব স্বহস্তে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদান করেন।

X X X X

সাংবাদিক বাবু অরূপ তালুকদারের লিখিত একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে ২৭. ২. ৮৮ (বাং) তারিখে 'সংবাদ' পত্রিকায়। খবরটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

সংবাদ পত্রিকার খবর

২৭. ২. ৮৮

বেশ কিছুদিন থেকেই অনেকের মুখে শুনেছি এই মানুষটির কথা। আর যতবারই তাঁর কথা শুনেছি ততবারই আশ্চর্য সব কাজ-কারবার আর ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। বারবার ভেবেছি এই আশ্চর্য মানুষটির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়া দরকার।

না, বেশীদিন অপেক্ষা করতে হলো না। একদিন অকস্মাৎ তিনি নিজেই এসে উপস্থিত হলেন আমার কাছে, কী কাজে।

সকালের দিকে আমি যখন আমার কর্মস্থলে আসি, ঠিক সেই সময়টাতেই তিনি এলেন। তাঁকে দেখেই মনে হলো, এই মানুষটি আমার চেনা, আগে যেন কোথায় দেখেছি। পরিচয় দেওয়ার আর দরকার হলো না। বললাম, বসুন। তিনি বসলেন। বেশ দীর্ঘ চেহারা। মুখের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় বয়েস হয়েছে। শরীরেও তার ছাপ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। অথচ চোখ দু'টো বেশ উজ্জ্বল। অতি আস্তে আস্তে কথা বলেন। কোন ব্যাপারেই উত্তেজিত হন না।

এই আরজ আলী মাতুব্বর। সাং লামচরি। বলার মত শিক্ষা-দীক্ষা নেই। তিনি নিজেই বলেছেন, স্কুলে পড়ার তেমন সৌভাগ্য আমার হয়নি। ক্ষেতের কাজ করেই জীবনের অধিকাংশ সময় পার হয়ে গিয়েছে।

বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা আছে মাতুব্বর সাহেবের জীবনে। অন্তরের জ্ঞান-পিপাসা বারবার তাঁকে বহু মানুষের দ্বারে নিয়ে গেছে। তিনি বলেছেন, যার কাছেই গিয়েছেন তিনি কেউ তাঁকে বিমুখ করেন নি। নিজের সীমিত শিক্ষা দিয়ে যতটা সম্ভব বিভিন্ন জায়গা থেকে বই সংগ্রহ করে তিনি দিনের পর দিন পড়াশুনা চালিয়েছেন। সবার চোখের আড়ালে নিজেকে তিনি তৈরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন। নিজেকে প্রস্তুত করে গড়ে তুলেছেন সাধারণ মানুষের কল্যাণের ক্ষেত্রে কিছু করার জন্য। সেদিন তাঁরই আমন্ত্রণে ক'জন গিয়েছিলাম বরিশাল শহরের অদূরে তাঁর আবাসভূমি লামচরি গ্রামে 'আরজ মঞ্জিল'-এ। স্পষ্ট বলা ভালো, জনাব মাতুব্বরের বহু কষ্টে বহু সাধনায় গড়ে তোলা আরজ মঞ্জিলে আমাদের মতো শহুরে মানুষের দেখার মতো তেমন কিছু নেই। কিন্তু একটু লক্ষ্য করে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, যতটুকু হোক, যত সাধারণই হোক না কেন — একটি সাধারণ মানুষের মানুষ-কল্যাণমুখী অসাধারণ মনের ছাপ ফুটে রয়েছে সর্বত্র। এটুকু অস্বীকার করার উপায় নেই। সেদিন মাতুব্বর সাহেব প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কয়েকটি বৃত্তিপ্রদানের অনুষ্ঠানে ডেকেছিলেন আমাদেরকে। স্থানীয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন) শ্রী অরবিন্দ কর, শ্রী সুধীর সেন, অধ্যাপক গোলাম কাদির আর আমি — এই চারজন সেদিন মাতুব্বর সাহেবের আতিথেয়তায় একেবারে মুগ্ধ হয়ে ফিরেছিলাম শহরে। মাতুব্বর সাহেবের সাধ অনেক, কিন্তু সাধ্য সীমিত। তাই বলে তিনি থেমে থাকার মানুষ নন। 'আরজ মঞ্জিলে' তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি সাধারণ পাঠাগার, গ্রামের সাধারণ মানুষ এখানে এসে পড়াশুনা করবে। আরজ আলী মাতুব্বর বলেছেন, তাঁর এই পাঠাগারটি হবে আলোকস্তম্ভ — এর আলো সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। কোন দেশকালের ভেদ তিনি মানেন না। মানুষ মানুষ হিসাবেই স্বীকৃতি পাবে। মানুষকে মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার, মানুষ হিসাবে সেবা করার মানসিকতা আসবে জ্ঞানের মধ্য দিয়েই। শুধু অন্তহীন জ্ঞানই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে চরম অজ্ঞানতা থেকে। মাতুব্বর সাহেবের জীবনে ছোট ছোট অনেক ঘটনা রয়েছে, তাঁর এই পর্যন্ত আসার মাঝে রয়েছে অনেক দুঃখজনক ইতিহাস। আমরাও জানি — যে মানুষটি দশজন সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠেন, তাঁকে অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে হয়।

আরজ আলী মাতুব্বর সম্প্রতি একটি উইল করে তাঁর যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি যা আছে সব সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে দান করে গেছেন। এমনকি তাঁর শরীরটি ও চোখ দু'টো মৃত্যুর পরে দান করা হবে বরিশালের শেরে-বাংলা মেডিক্যাল কলেজে। মাতুব্বর সাহেব এ পর্যন্ত দু'খানা বই লিখেছেন, প্রথমটি 'সত্যের সন্ধান', দ্বিতীয়টি 'সৃষ্টি-রহস্য'। এই দু'টি বইয়েই আশ্চর্য আশ্চর্য সব প্রশ্ন রেখেছেন তিনি। 'সৃষ্টি-রহস্য' পড়ে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, "তাঁর এই সদিচ্ছা, দ্রোহ, জিজ্ঞাসা ও সন্ধিৎসাই আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। তাঁকে করেছে অনন্য। সমাজে এমন কল্যাণকামী মুক্তবুদ্ধির মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমাদের মানসিক, জাগতিক ও বৈষয়িক জীবনের অনেক সমস্যার ও যন্ত্রণার অবসান ত্বরান্বিত হবে। জয়তু আরজ আলী মাতুব্বর . . .।" মাতুব্বর সাহেব সম্প্রতি আরেকটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন। নাম রেখেছেন 'মুক্তমন'। আশা করছি তাঁর 'মুক্তমন' প্রকাশিত হলে আরো কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যাবে — প্রসারিত হবে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত। সত্যের জন্য, জ্ঞানের দিগন্তকে আরো প্রসারিত করতে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আরজ আলী মাতুব্বর এখনো আবার নতুন করে যুদ্ধে নামতে চান। কিন্তু তাঁর ভাষায়, "বয়সের ভারে এখন অবনত। তত শক্তি পাই না, কিন্তু মনের শক্তি তো ফুরোয় না।" এই মনের শক্তির জোরেই তিনি চলেছেন। চলছেন। 'সত্যের সন্ধান' বই লেখার পেছনে একটি ছোট ঘটনা আছে। যে ঘটনার মধ্যে থেকেই তাঁর মনের মধ্যে অনেক প্রশ্নের জন্মলাভ ঘটেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বলেছেন, ১৩৩৯ সালে যখন আমার মা মারা যান, তখন আমি বরিশাল থেকে ফটোগ্রাফার আনিয়ে আমার মৃত মায়ের ছবি তুলি। এই ছবি তোলার কথা শুনে মায়ের জানাজা দিতে যারা এসেছিলেন তারা লাশ ফেলে রেখে চলে যান। তাদের বক্তব্য, ছবি তোলা হারাম। এই ঘটনা আমার মনের মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, সেই সঙ্গে জন্ম দেয় অনেকগুলি প্রশ্নের। মায়ের জানাজা দেয়া কেন হলো না? আমার মায়ের দোষ কি? ছবি তোলা যদি হারাম হয়, তবে তার দায়ভাগী তো আমি, মা কি দোষ করেছে? বলা বাহুল্য, এমনি ধরণের অনেকগুলি প্রশ্নের ভিড় এসে মাতুব্বর সাহেবকে উতলা করে তোলে। যার ফলশ্রুতিতে তিনি কলম ধরেছেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি 'সত্যের সন্ধান' আর 'সৃষ্টি-রহস্য'। আরজ আলী মাতুব্বর সম্পর্কে কোন তত্ত্বকথায় যেতে চাইনা, শুধু এইটুকু বলতে চাই, আমাদের এই সমাজে এখন আরজ আলী মাতুব্বরের মতো মানুষের বড় প্রয়োজন।

X X

পুস্তক প্রদানের অনুষ্ঠান

বিগত ২৫. ১. ৮১ তারিখে লাইব্রেরীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় জেলা প্রশাসক তাঁর ঘোষিত ১০০ খানা পুস্তক প্রদানের উদ্দেশ্যে এক মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বিগত ৯. ৬. ৮১ তারিখে বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদের সভাকক্ষে। অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত সুধীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন —

১. মাননীয় আব্দুল আউয়াল, জেলা প্রশাসক, বাকেরগঞ্জ (সভাপতি)।
২. মিসেস ফেরদৌসী বেগম, মহিলা সংসদ সদস্যা, বরিশাল।
৩. মি. অরবিন্দ কর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, বাকেরগঞ্জ।
৪. মি. তারাচরণ চাকমা, মহকুমা প্রশাসক (সদর উত্তর), বরিশাল।
৫. জনাব আবুল বাহার, সম্পাদক, বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ।
৬. অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির, বরিশাল।
৭. বি. ডি. হাবিবুল্লাহ, এডভোকেট, বরিশাল।
৮. বাবু সুধীর সেন, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, বরিশাল।
৯. মৌ. এছাহাক আলী মাতুব্বর, বরিশাল।
১০. মৌ. মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর, বরিশাল।
১১. মৌ. নজরুল ইসলাম গাজী, বরিশাল।
১২. মৌ. খালেকুজ্জামান, চেয়ারম্যান, চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ।
১৩. মৌ. সৈয়দ আহম্মদ, উলালঘূর্ণী।
১৪. মৌ. মোহাম্মদ হোসেন চাপ্রাসী, লামচরি।
১৫. মৌ. আ. গণি আকন, লামচরি।
১৬. মৌ. মো. ইয়াছিন আলী সিকদার, লামচরি।
১৭. মৌ. ডা. আ. আলী সিকদার, লামচরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮. মৌ. গোলাম রসুল মোল্লা, লামচরি।
১৯. মৌ. আ. মালেক মাতুব্বর, লামচরি।
২০. মৌ. আ. বারেক মাতুব্বর, লামচরি।
২১. মৌ. ফরিদ উদ্দিন মাতুব্বর, লামচরি।
২২. নজরুল ইসলাম মাতুব্বর, লামচরি।
২৩. শামীম আলী মাতুব্বর, লামচরি।
২৪. হারুন-উর-রশিদ মাতুব্বর, লামচরি প্রমুখ ছাড়াও শহরের বহু শিক্ষামোদী ব্যক্তি।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করি। ভাষণটির কিয়দংশ প্রকাশিত হয়েছে 'বাকেরগঞ্জ পরিক্রমা' পত্রিকায়, বিগত ১৬. ৬. ৮১ ও ১. ৭. ৮১ তারিখে। এখানে পুরো ভাষণটি উদ্ধৃত করা হলো।

পুস্তক প্রদান অনুষ্ঠানের ভাষণ

৯. ৬. ৮১ ইং
২৬. ২. ৮৮ বাং
স্থান — জেলা পরিষদ সভাকক্ষ।

AMARBOI.COM

মাননীয় বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক সাহেব ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ।

আজ আমার অতীব সৌভাগ্য ও পরম আনন্দের একটি দিন। তা এইজন্য যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নগণ্য একটি লাইব্রেরীতে মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব একশত মূল্যবান পুস্তক দানের সিদ্ধান্ত করেছেন এবং তা প্রদান উপলক্ষ্যে আজ একটি মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। বিশেষত এ অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে আজ এখানে সমবেত হয়েছেন। কিন্তু এ আনন্দোজ্জ্বল দিনটিতে আমার মানসগগনে দেখা দিচ্ছে এক বিষাদময় স্মৃতির কালোমেঘ। যার বর্ষণে সিক্ত হয় শুধু আমার বক্ষদেশ। এ বিষয়ে সংক্ষেপে দু'-একটি কথা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই।

জন্ম আমার ১৩০৭ সালে, লামচরি গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে। ১৩১১ সালে আমার বাবা মারা যান। আমার বাবার বিঘা পাঁচেক কৃষিজমি ছিলো। তা বাকি খাজনায় নিলাম করিয়ে নেন লাখুটিয়ার রায় বাবুরা ১৩১৭ সালে এবং কর্জ-দেনার দায়ে টিনের বসতঘরখানা নিলাম করিয়ে নেন বরিশালের কুখ্যাত কুসীদজীবী জনার্দন সেন ১৩১৮ সালে। স্বামীহারা, বিত্তহারা ও গৃহহারা হয়ে মা আমাকে নিয়ে ভাসতে থাকেন অকূল দুঃখের সাগরে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, রায় বাবুরা কৃষিজমিটুকু দখল করে নিলেন বটে, কিন্তু মা'কে বাড়ি থেকে তাড়ালেন না। মা সাবেক ঘরের ভিটির উপর থাকার জন্য যে নতুন একখানা ঘর বানালেন, তা ঘর নয়, বাসা। সে বাসাখানা ছিলো দৈর্ঘ্যে পাঁচ হাত ও প্রস্থে চার হাত। ঘরখানা তৈরির সরঞ্জাম ছিলো ধৈঞ্চার চাল, গুয়াপাতার ছাউনী, মাদারের খাম, খেজুরপাতার বেড়া ও ঢেঁকিলতার বাঁধ। আর তারই মধ্যে ছিলো ভাতের হাঁড়ি, পানির কলসী, পাকের চুলো, কাঁথা-বালিশ সবই। রাতে শুতে হতো পা গুটিয়ে। ঘুমের ঘোরে কখনো পা মেলে ফেললে হয়তো ভাতের হাঁড়ি কাত হয়ে পড়তো বা জলের কলসী পড়ে গিয়ে কাঁথা-বালিশ ভিজে যেতো। একটি এঁটেকলা দ্বারা তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা মায়ে-পুতে পান্তাভাত খেতাম দু'বেলা।

সে সময় আমাদের গ্রামে কোনোরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো না। স্থানীয় জনৈক মুন্সি একখানা মক্তব খোলেন তাঁর বাড়ীতে ১৩২০ সালে। এতিম ছেলে বলে আমি তাঁর সে মক্তবে ভর্তি হলাম অবৈতনিকভাবে। অন্যান্য সকল ছেলেরই পড়ার জন্য বই ও লেখার জন্য শ্লেট-পেন্সিল ছিলো। কিন্তু আমার ছিলো না ওসব কিছুই। আমাকে পড়তে ও লিখতে হতো তালপাতা ও কলাপাতায়। অন্যদের বই পড়া দেখে মনে দুঃখ হতো। আফসোস করে মনে মনে বলতাম, আমার যদি ওরূপ একখানা পড়বার বই থাকতো, তবে তা আনন্দের সাথে পড়তাম। মার কাছে বই-শ্লেটের কথা জানালে তিনি বলতেন, "বাবা পয়সা কই?"

পড়ালেখার আগ্রহ দেখে আমার এক জ্ঞাতি চাচা একদিন আমাকে ভিক্ষা দিলেন সীতানাথ বসাক কৃত দু'আনা দামের একখানা 'আদর্শলিপি' বই ১৩২১ সালে। মনে পড়ে তখন পৌষ মাস। বইখানা ভিক্ষা পেয়ে সেদিন আমি যে কতটুকু আনন্দ লাভ করেছিলাম, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। সেদিনটি ছিলো আমার জীবনের সর্বপ্রথম বই হাতে ছোঁয়ার দিন। তাই আনন্দ-স্ফূর্তিতে আমার মনটা যেনো ফেটে যাচ্ছিলো। আমি বইখানা হাতে নিয়ে নৃত্য করতে করতে গিয়েছিলাম প্রতিবেশীর বাড়িতে সহপাঠীদের বইখানা দেখাতে। সে বইখানা ছিলো আমার ক্ষুধার্ত মনের খাদ্য। চিবিয়ে, চুষে নানাভাবে অক্ষর ও শব্দগুলোকে উদরস্থ করতে লাগলাম। সে বইখানা পড়বার জন্য আমার নির্দিষ্ট কোনো সময় বা অসময় ছিলো না। সারাক্ষণ পড়তাম ও সাথে সাথে রাখতাম। বইখানা সাথে নিয়ে মার সাথে মামাবাড়ি বেড়াতে যেতাম। সেই বইখানা ছিলো আমার অতি সাধের সম্পত্তি। কিন্তু আমার সে সাধের সম্পত্তিটুকু রক্ষা করতে বিষাদ দেখা দিলো বর্ষাকালে।

আমাদের তখনকার ঘরখানার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছি অল্প আগেই। এ সময় সে ঘরখানার বয়স প্রায় তিন বছর। চালে বৃষ্টির পানি মানায় না। বৃষ্টির সময় বইখানা রাখবার স্থান পেতাম না কোথাও। অল্প বৃষ্টির সময় যেখানে রাখতাম, বৃষ্টি বেশী হলে সেখান থেকে সরাতে হতো, অত্যধিক বৃষ্টি হলে কোথাও স্থান পেতাম না, তখন উপুড় হয়ে বইখানা রাখতাম বুকের নীচে। সে বইখানা এখন আর আমার বুকের নীচে নেই, হয়তো তার অস্তিত্বই নেই। কিন্তু আজো আমার বুকের মধ্যে রয়ে গেছে তার সেই 'অসৎসঙ্গ ত্যাগ কর, আলস্য দোষের আকর' ইত্যাদি নীতিবাক্যগুলো এবং 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুমকলি সকলই ফুটিল' — এই প্রভাতবর্ণনার সুখপাঠ্য কবিতাটি।

আমার সেই শৈশবকালের পুস্তকপ্রীতি হ্রাস পাচ্ছিলোনা যৌবনেও। বরং বেড়েই যাচ্ছিলো তা ক্রমশ। সাংসারিক নানাবিধ অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও আমি কিছু কিছু পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ করতে শুরু করি ১৩৩০ সাল থেকে, একটি ব্যক্তিগত পাঠাগার গড়ে তোলবার জন্য। দীর্ঘ ১৮ বছর সাধনার ফলে আমার সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা হলো প্রায় ৯০০। আলমারী ছিলো না বলে সে পুস্তকগুলো রাখা হচ্ছিলো আমার বৈঠকঘরে তাকে তাকে সাজিয়ে। প্রকৃতি আমার সপক্ষে ছিলো না। ১৩৪৮ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়ে উড়িয়ে নিলো আমার বৈঠকঘরখানা এবং তৎসঙ্গে উড়িয়ে নিলো অতি সাধের বই-পুঁথিগুলোও। পরের দিন পথে-প্রান্তরে পেয়েছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'-চারখানা ছেঁড়া পাতা। মাতৃশোকে আমি কাঁদিনি, কিন্তু বইগুলোর দুঃখে সেদিন আমার যে কান্নার বান ডেকেছিলো, তা আমি রোধ করতে পারিনি।

ভগ্নোৎসাহ নিয়ে আবার আমি সচেষ্ট হলাম কিছু কিছু বই-পুস্তক সংগ্রহের কাজে। এবারে ১৭ বছরের প্রচেষ্টায় আমার সংগৃহীত বইয়ের সংখ্যা হলো প্রায় ৪০০। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে ১৩৬৫ সালের ৬ই কার্ত্তিক তারিখে ঘটলো ১৩৪৮ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এবারেও আমার বৈঠকখানাসহ উড়িয়ে নিলো আমার প্রাণ-প্রিয় পুস্তকগুলো। সেদিন আমি ক্ষোভে ও দুঃখে মুহ্যমান হয়ে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, 'পুস্তক সংগ্রহ করবো না কখনো আর, যদি উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ করতে না পারি।'

উক্ত প্রতিজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ ২১ বছরের কায়িক শ্রমে অর্জিত অর্থের দ্বারা আমি ক্ষুদ্র একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছি বিগত ১৩৮৬ সালে এবং তা উৎসর্গ করেছি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে, যার শুভ-উদ্বোধন পর্বে পৌরহিত্য করেছেন মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব বিগত ২৫ জানুয়ারী তারিখে।

মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব ও শ্রদ্ধেয় সভাসদবৃন্দ।

আপনারা এখন হয়তো উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, নবনির্মিত ক্ষুদ্র লাইব্রেরীটি আমার সুদীর্ঘ ৫৬ বছরের বিফল-সফল সাধনা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ফল। আমার এ লিখিত বাণীগুলো উপন্যাস নয় — ইতিহাস। এর কিছু পরিচয়-পত্র এখানেও আছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেব এখানে আছেন। তিনি আমাকে ভালোভাবে জানেন। তাঁকে 'বন্ধু' বলে পরিচয় দেবার মতো যোগ্যতা আমার নেই, বলতে পারি আমি তাঁর 'অনুগামী' ১৯৪৪ সাল থেকে। তিনি জানেন না বা শোনেননি — আমার জীবনে এমন ঘটনা বিরল। তিনি আমার মানসগগনের ধ্রুবতারা, চলার পথে দিগ্‌দর্শন।

আমার বর্তমান লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে আমি কোনোরূপ পুস্তকাদি সংগ্রহে মনোযোগী হইনি কখনো প্রতিজ্ঞা রক্ষার কারণেই এবং এখন পারছি না আর্থিক অনটনের কারণে। কেননা লাইব্রেরী নির্মাণ ও কিছু আসবাবপত্র তৈরিতে নিঃশেষ হয়ে গেছে আমার সামান্য পুঁজি প্রায় সবই। আমার কেনা বইয়ের সংখ্যা এখনো নগণ্য। তবে বাংলাদেশ লেখক শিবির থেকে প্রাপ্ত পুরস্কার এবং ঢাকাস্থ কতিপয় বিদ্যোৎসাহী বন্ধুর প্রদত্ত দান ও উপহার সমেত আমার লাইব্রেরীটির বর্তমান মজুত বইয়ের সংখ্যা মাত্র ৪০০।

নিয়তির নির্মমতায় আমি কোন শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইনি প্রচলিত নিয়মমাফিক। তাই কোন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা আমার শিক্ষায়তন নয়, আমার শিক্ষায়তন হচ্ছে লাইব্রেরী। **দীর্ঘকাল বিভিন্ন লাইব্রেরীর সংস্পর্শে থেকে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে, লাইব্রেরী হচ্ছে জ্ঞানালোক বিতরণের কেন্দ্র, বলা যায় 'আলোকস্তম্ভ'। লাইব্রেরী অমানুষকে মানুষ বানাতে পারে, পারে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করতে।** হোক না কেন তারা সংখ্যায় শত বা হাজার-এ দু'-এক জন। আমার সে বিশ্বাসের বলেই আমি প্রতিষ্ঠিত করেছি পল্লী অঞ্চলে পাবলিক লাইব্রেরী। আর ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে করেছি আমি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা। হয়তো প্রশ্ন হবে যে, লামচরির মতো একটি নিভৃত পল্লীতে এরূপ একটি ক্ষুদ্র মশাল জ্বালিয়ে দেশের কতটুকু স্থান আলোকিত করা যাবে? এর উত্তর দিচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের আদেশ মোতাবেক আমি আমার লাইব্রেরী সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম তাঁর কাছে বিগত ১. ৩. ৮০ (ইং) তারিখে। তাতে এক জায়গায় আমি বলেছিলাম, "আমি আশা করি যে, এতে আমাদের পল্লী অঞ্চলের জ্ঞানপিপাসু জনগণের জ্ঞানপিপাসা মেটাবার কিঞ্চিৎ সুবিধে হবে এবং এ লাইব্রেরীটির অনুকরণে হয়তো দেশের সর্বত্র পল্লী অঞ্চলে পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে উঠবে। তবে আমার এ পরিকল্পনাটিকে সফল করতে আবশ্যক হবে এর ব্যাপক প্রচারের। তাই আমি আপনাদের কাছে বিশেষভাবে মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি আমার এ পরিকল্পনাটির ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য, যদি এতে দেশের কোনরূপ মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে বলে মনে করেন।"

আজ মনে পড়ে আমরা শৈশবকালের সেই 'আদর্শলিপি' বইখানা প্রাপ্তির আনন্দের দিনটিকে। সে দিনটি ছিল আমরা শৈশবকালের এবং আজকের দিনটি হচ্ছে আমার অন্তিমকালের পুস্তকপ্রাপ্তির আনন্দের দিন। এ দু'টি দিন যেন আমার জীবনের দু'দিকের দু'টি মেরুবিন্দু। যদিও আমার সে দিনটিতে ও এ দিনটিতে সামঞ্জস্য রয়েছে অনেক, তবুও বিবিধ কারণে আমার জীবনে আজকের এ দিনটিই গৌরবোজ্জ্বল, সুমহান। এ বিষয়ে আমি তুলনামূলক কিঞ্চিৎ আলোচনা করে আমার বক্তব্য শেষ করবো।

১. সেদিনে আমার দানপ্রাপ্ত পুস্তকের সংখ্যা ছিলো মাত্র একখানা। আর এদিনের সংখ্যা একশত।
২. সেদিনের পুস্তকখানার দাম ছিলো মাত্র দু'আনা। আর এদিনের মূল্য দু'হাজার টাকা বা তারো বেশী, বলা যায় — অমূল্য।
৩. সেদিনের পুস্তকখানা ছিলো মাত্র একজন লোকের পাঠ্য। আর এদিনের পাঠক অসংখ্য।
৪. সেদিনের বইখানা করেছে শুধু পড়া ও লেখার শক্তি দান। আর এদিনের পুস্তকমালা মেটাবে মানুষের বহুমুখী জ্ঞানের পিপাসা।
৫. সেদিনের পুস্তকখানাতে ছিলো আমার মালিকানা স্বত্ব। আর এদিনের পুস্তকমালার আমি বাহক মাত্র। কেননা আমার লাইব্রেরীটি জনকল্যাণে উৎসর্গিত।
৬. সেদিনের পুস্তকখানা ছিলো মাত্র এক বা দু'বছরের পাঠ্য। আর এদিনের পুস্তক হবে মানুষের যুগ-যুগান্তের সাথী।
৭. সেদিনের পুস্তকখানা গ্রহণে আমার যে আনন্দ ছিলো, তা ছিলো — চরম দুঃখের ঘোর দুর্দিনে বালসুলভ আনন্দ। আর এদিনের আনন্দ হচ্ছে আমার পরিণত বয়সের গৌরবোজ্জ্বল দিনের অনাবিল আনন্দ। তাই এ মহানন্দ নিয়ে আজ গ্রহণ করবো আমি — মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের ঔদার্য্যের নিদর্শনস্বরূপ তাঁর প্রদত্ত অমূল্য গ্রন্থাবলী।

পরিশেষে — আমি মনে করি যে, আমার চরিত্রের প্রশংসা করেন, কাজের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করেন — এমন মানুষের সংখ্যা এদেশে এতোই অল্প যে, তাঁদের অঙ্গুলি সংকেতে গণনা করা যায়। আমার মনে হয় যে, মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব সেই অল্পসংখ্যকের একজন। আমি তাঁর সৌরভময় জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ — শুভ হোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রখ্যাত বাগ্মী ও আইনজীবী জনাব বি. ডি. হাবিবুল্লাহ, বাবু সুধীর সেন, অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ সভায় ভাষণ দান করেন। শেষপর্বে মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেব আমার হস্তে একখানা পুস্তক প্রদান করেন এবং বরিশালের সুখ্যাতা মহিলা এম. পি. মিসেস ফেরদৌসী বেগমকে আমার হস্তে একখানা পুস্তক প্রদানের জন্য অনুরোধ জানালে তিনি আমার হস্তে একখানা পুস্তক অর্পণ করে তাঁর সৌজন্য রক্ষা করেন। মাননীয় জেলা প্রশাসক সাহেবের প্রদত্ত ১০০ পুস্তকের মূল্য ৩৩৯৩.৫০ টাকা। কিন্তু তার বিষয়গত মূল্য সীমাহীন।

আলোচ্য লাইব্রেরীটির উন্নয়নকল্পে সর্বসমক্ষে আমার প্রিয় স্বজন মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর আমার হস্তে একখানি ২৫০০.০০ টাকার চেক প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসক সাহেবের পুস্তক প্রদান অনুষ্ঠানের একটি সংক্ষিপ্ত খবর প্রকাশিত হয়েছে বিগত ১৬.৬.৮১ তারিখে, 'বাকেরগঞ্জ পরিক্রমা' পত্রিকায়। খবরটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

বাকেরগঞ্জ পরিক্রমার খবর
১৬. ৬. ৮১

অবহেলিত একটি প্রতিভার স্বীকৃতি
বাকেরগঞ্জ জিলা পরিষদ কর্তৃক বিশেষ পুরস্কার দান

AMARBOI.COM

বরিশাল, ৯ জুন। আজ পূর্বাহ্নে বাকেরগঞ্জ জিলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত পরিষদ মিলনায়তনের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সাধারণ কৃষক সমাজের অনন্যসাধারণ এক প্রতিভা, দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকার জনাব আরজ আলী মাতুব্বর প্রতিষ্ঠিত গণপাঠাগারের জন্য পরিষদ কর্তৃক একশত মূল্যবান পুস্তক দান করা হয়। উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর মধ্যে জনাব মোশাররফ হোসেন উক্ত পাঠাগারের জন্য ২৫০০.০০ টাকা দান করেন। জিলা প্রশাসক জনাব আবদুল আউয়াল সহ সরকারী-বেসরকারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জনাব আরজ আলীর শ্রম, শিক্ষানুরাগ ও প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবেই তাঁহাকে এ পুস্তক ও অর্থ দান করা হয়। পুস্তক হস্তান্তরকালে অনুষ্ঠানের সভাপতি জিলা প্রশাসক জনাব আবদুল আউয়াল বলেন যে, জনাব আরজ আলী বরিশাল তথা বাংলাদেশের এক কৃতী সন্তান। তিনি এই দেশপ্রেমিক শিক্ষানুরাগীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন) মি. অরবিন্দ কর, অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির ও মি. সুধীর সেন প্রমুখও সেখানে বক্তব্য রাখেন।

X X X X

বার্ষিক অধিবেশন
ও '৮১ সালের বৃত্তিদান

১০ জানুয়ারী ১৯৮২

পরিকল্পনা মোতাবেক আমার লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনের দিন ধার্য আছে প্রতিবছর ৩রা পৌষ অর্থাৎ আমার জন্মদিনে, আর অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বৃত্তিদানের দিন ধার্য আছে প্রতিবছর পৌষ মাসের শেষ রবিবার অর্থাৎ আমার জন্মমাসে। কিন্তু দানপত্র সম্পাদনপূর্বক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিটি গঠনের পূর্বে 'অধিবেশন'-এর প্রশ্ন আসেনি। বিগত ৫. ১২. ৮১ মোতাবেক ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ তারিখে 'ট্রাস্টনামা' (দানপত্র) সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত হলে পরিকল্পনা মোতাবেক বার্ষিক অধিবেশন বসার কথা ৩রা পৌষ ১৩৮৮ তারিখে। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে আমি উক্ত তারিখ রক্ষা করতে পারিনি। তাই অধিবেশন বসাতে হলো বৃত্তিদানের নির্ধারিত তারিখে। অর্থাৎ পৌষমাসের শেষ রবিবার বনাম ১০. ১. ৮২ তারিখে।

আজকের অধিবেশনটিকে বলা হচ্ছে বার্ষিক অধিবেশন। বস্তুত ইহা লাইব্রেরী পরিচালক কমিটি-এর প্রাথমিক অধিবেশনও বটে। পরিকল্পনা মোতাবেক পরিচালক কমিটির বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১২ জন। তন্মধ্যে পদাধিকার বলে মাননীয় বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক সাহেব হচ্ছেন কমিটির স্থায়ী সভাপতি।

আজকের অধিবেশনে ভারপ্রাপ্ত বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক মাননীয় সিরাজুল ইসলাম সাহেব নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং তাঁর সহগামী হয়ে আসেন নিম্নলিখিত সুধীবৃন্দ —

১. জনাব সিরাজউদ্দীন আহমেদ, পরিচালক, উপকূলীয় উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল (অতিথি)।
২. জনাব মো. মতিউর রহমান, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, বরিশাল (অতিথি)।
৩. জনাব মো. মোজাফফর হোসেন, পরিচালক, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা (অতিথি)।
৪. জনাব কাজী গোলাম কাদির, প্রাক্তন অধ্যাপক, ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল (সদস্য)।
৫. জনাব মো. হানিফ, অধ্যক্ষ, সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল (সদস্য)।

রেজিষ্ট্রীকৃত দলিল অনুসারে আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালক কমিটির প্রথম সভা অদ্য ১০. ১. ৮২ তারিখ বেলা ১টায় লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে কমিটির সভাপতি বাকেরগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক জনাব মো. সিরাজুল ইসলাম সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়, এবং পরিচালক কমিটির ১২ জন সদস্যের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ৯ জন সদস্য উপস্থিত হলে সভার কাজ শুরু করা হয়।

উপস্থিত সদস্য

১. মো. সিরাজুল ইসলাম।
২. কাজী গোলাম কাদির।
৩. মো. হানিফ।
৪. ফজলুর রহমান।
৫. মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর।
৬. মোসলেম উদ্দিন মাতুব্বর।
৭. ডা. আবদুল আলী সিকদার।
৮. মো. গোলাম রছুল মোল্লা।
৯. আরজ আলী মাতুব্বর।

সভার আরম্ভে 'ট্রাস্টনামা' নামীয় রেজিষ্ট্রীকৃত দানপত্র দলিলখানা মাননীয় সভাপতি ও সদস্যগণকে পড়িয়ে শোনানো হয় এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধান্তসমূহ

১. সর্বসম্মতিক্রমে পরিচালক কমিটির নিম্নলিখিত সদস্যগণকে তাঁদের পাশের বর্ণিত পদে নির্বাচিত করা হয়।

ক.	অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির	সহ-সভাপতি।
খ.	জনাব মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর	কোষাধ্যক্ষ।
গ.	জনাব আরজ আলী মাতুব্বর	সম্পাদক।

২. সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়ে আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরীর 'কার্যনির্বাহী কমিটি' গঠিত হয়।

ক.	জনাব ইয়াছিন আলী সিকদার	সভাপতি।
খ.	জনাব আরজ আলী মাতুব্বর	সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ।
গ.	জনাব মোসলেম উদ্দীন মাতুব্বর	সদস্য।
ঘ.	জনাব ডা. আ. আলী সিকদার	সদস্য।
ঙ.	জনাব গোলাম রছুল মোল্লা	সদস্য।

৩. লাইব্রেরীর আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনান্তে অনুমোদিত হয়।

৪. স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি বিনামূল্যে লাইব্রেরীর নামে পাঠাবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় সভাপতি সাহেবকে অনুরোধ জানান হয়।

৫. রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলসমূহ ব্যবহারের সুবিধার জন্য ছাপানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

লাইব্রেরীর উন্নয়নের জন্য মাননীয় সভাপতি সাহেব ৩০০০.০০ টাকা আর্থিক দান ঘোষণায় উপস্থিত সকলে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

AMARBOI.COM

সভায় উপস্থিত মাননীয় অতিথিবৃন্দ

১. সিরাজউদ্দীন আহমেদ, পরিচালক, উপকূলীয় উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।
২. মো. মতিউর রহমান, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর, বরিশাল।
৩. মো. মোজাফফর হোসেন, পরিচালক, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।
৪. আ. গনি আকন (সদস্য, চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ)।
৫. সফিউদ্দিন হাং (সদস্য, চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ)।
৬. মো. হোসেন (সদস্য, চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ)।
৭. আবদুল মান্নান মৃধা।
৮. মো. আব্দুল মজিদ হাং।
৯. মো. রত্তন আলী খান।
১০. মো. আ. রশীদ খান।
১১. আ. ছত্তার মিয়া।
১২. আ. গফুর সিকদার।
১৩. বন্দে আলী গোলদার।
১৪. আক্কেল আলী হাওলাদার।

অধিবেশনের শেষপর্বে রে. 'ট্রাস্টনামা' দলিল মোতাবেক চারিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯৮১ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে মং ৪০০.০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরীর দানপত্র সংক্রান্ত দলিলসমূহের অনুলিপি

ক. ট্রাস্টনামা

রে. তাং .... দলিল নং ....

১। লিখিতং ১। আরজ আলী মাতুব্বর, পিতা মৃত এন্তাজ আলী মাতুব্বর, সাকিন লামচরি, ষ্টেশন কোতয়ালী, জিলা বরিশাল, ধর্ম ইসলাম, পেশা জমা-জমি ইত্যাদি।

কস্য ট্রাস্টনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে জিলা বরিশালের কোতয়ালী থানাধীন লামচরি গ্রাম নিবাসী আমি একজন সামান্য কৃষক। জন্ম আমার ৩রা পৌষ, ১৩০৭ সালে। আমার তিন পুত্র, চারি কন্যা ও এক স্ত্রী বর্তমান।

আমার ঊর্ধ্বতন ৫ (পাঁচ) পুরুষের দশ ব্যক্তির বয়সের গড় হিসাব করিয়া আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের গড় পরমায়ু ছিল ৬০ (ষাট) বৎসর, তাই আমার বংশের রেওয়াজ মোতাবেক আমিও আমার পরমায়ু ৬০ (ষাট) বৎসর বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলাম। উক্ত কল্পনার ভিত্তিতে ১৩৬৭ সালে আমার বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হইলে আমি আমার কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘোষণাপূর্বক আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমার ওয়ারিসগণের মধ্যে (ফরায়েজ বিধান মতে) দান-বণ্টন করিয়া দিয়া কৃষিকাজ তথা সংসারী কাজ পরিত্যাগপূর্বক আমি আমার পুত্রদের পোষ্য হইয়া জীবন যাপন করিতেছি।

সম্পত্তিদান ও বণ্টনকালে আমি আমার ওয়ারিসগণকে বলিয়া রাখিয়াছি, "এখন ১৩৬৭ সাল হইতে আমি মৃত্যুপথের যাত্রী। নিজ দেহটি ভিন্ন এখন আমার হাতে কোন সম্পদই নাই। সুতরাং ইহার পরবর্তী জীবনে শুধু আমার এই দেহটি খাটাইয়া যদি কিছু অর্থ উপার্জন করিতে পারি, তবে তাহা সমস্তই দেশের জনকল্যাণমূলক কোন কাজে দান করিব। তাহাতে তোমাদের কাহারো কোন দাবী-দাওয়া থাকিবে না।"

দারিদ্র্যনিবন্ধন আমি শৈশবে কোন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পাই নাই। পেটের দায়ে আমাকে কৃষিকাজ শুরু করিতে হইয়াছে অল্প বয়সেই। মাঠের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সামান্য পাঠের কাজও করিয়াছি আমি ঘরে বসিয়াই। ইদানিং কৃষিকাজে ইস্তফা দিলেও মাঠের কাজে লিপ্ত আছি আমি আজও। কেননা কৃষিকাজের সাথে সাথে জরিপ কাজেরও সামান্য চর্চা করিয়াছিলাম ১৩৩২ সাল হইতে। সেই জরিপ কাজের মাধ্যমে আমার অবসর জীবনে অদ্যাবধি যে বিত্ত ও অর্থ উপার্জন করিতে পারিয়াছি, তাহার আনুমানিক মূল্য মং ৬০,০০০.০০ ষাট হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা। মৃত্যুকে আসন্ন জানিয়া আমার পূর্বঘোষণা মোতাবেক এখন আমি তাহা সমস্তই দেশের জনকল্যাণমূলক কাজে দান করিবার জন্য অভিলাষী হইয়াছি, তাই ক—ঝ নং তফসীলে লিখিত যাবতীয় সম্পত্তি নিম্নে বর্ণিত পরিকল্পনা সাপেক্ষে অত্র ট্রাস্টনামা দলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩৮৮ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ, ইং তাং ৫. ১২. ৮১ (পাঁচ, বার, একাশি)।

পরিকল্পনাসমূহ

১. লাইব্রেরী স্থাপন

শহরে বন্দরে থাকিলেও এই দেশের পল্লী অঞ্চলে বিশেষত আমাদের অঞ্চলে 'পাবলিক লাইব্রেরী' দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই আমি আমার নিজ গ্রামে একটি 'পাবলিক লাইব্রেরী' স্থাপনে প্রয়াসী হইয়া একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছি বিগত ১৩৮৬ সালে। আমি আশা করি যে, ইহাতে আমাদের পল্লী অঞ্চলের জ্ঞানপিপাসু জনগণের জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার কিঞ্চিৎ সুবিধা হইবে এবং এই লাইব্রেরীটির অনুকরণে হয়ত দেশের সর্বত্র পল্লী অঞ্চলে পাবলিক লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিবে। লাইব্রেরীটির পরিকল্পনাকালে ইহার নাম রাখা হইয়াছিল 'আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরী', অতঃপর ইহাকে আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী বলা যাইবে।

লাইব্রেরী ভবনটি পাকা, ইহার পরিসর ১৬´ × ১৪´ ফুট, ইহার মধ্যে ১৪´ × ৬´ ফুট একটি বারান্দা, এইখানে বসিয়া পাঠকবৃন্দ পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। ১০´ × ৪´ ফুট একটি প্রকোষ্ঠ, এইখানে আমার ব্যবহার্য কিছু কিছু জিনিসপত্র (স্মৃতিমালা) রক্ষিত থাকিবে। অবশিষ্ট অংশ ১০´ × ১০´ ফুট পুস্তকাগার।

AMARBOI.COM

লাইব্রেরী ভবনটি যে জমির উপর অবস্থিত তাহার পরিমাণ .০৫ শতাংশ। ইহার মধ্যে $\frac{১}{২}$ শতাংশ লাইব্রেরী ভবন, $\frac{৩}{৪}$ শতাংশ সমাধিস্থান, $\frac{৩}{৪}$ শতাংশ ফুলবাগান, $১\frac{১}{২}$ শতাংশ প্রাঙ্গণ এবং $১\frac{১}{২}$ শতাংশ ফল ও সব্জি আবাদী জমি।

২. লাইব্রেরীর কার্যক্রম

কৃষক ও শ্রমিক অধ্যুষিত এই লামচরি গ্রামের অধিবাসীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্থিক সংগতির যেমন অভাব, তেমন অভাব সময়েরও। এইসবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিপ্রেত অনুসারে স্থির করা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র রবিবার বেলা ২টা হইতে রাত ১০টা পর্যন্ত লাইব্রেরীটি খোলা রাখিতে হইবে। লাইব্রেরীতে সাধারণত দুই শ্রেণীর পাঠক থাকিবে — সাধারণ পাঠক ও সদস্য পাঠক। সাধারণ পাঠকগণ বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত লাইব্রেরী ভবনে বসিয়া পুস্তকাদি পড়িতে পারিবেন। ইহাদের কোন চাঁদা দিতে হইবে না। সদস্য পাঠকগণ পুস্তকাদি নিজ বাড়িতে নিয়া পড়িতে পারিবেন। এবং লাইব্রেরীর পরিচালক কমিটির নির্ধারিত হারে মাসিক চাঁদা দিতে হইবে। (বর্তমানে ইহাদের মাসিক চাঁদা তিন টাকা হারে ধার্য আছে।)

প্রকাশ থাকে যে —

ক. যদি কোনও মহৎ ব্যক্তি এই লাইব্রেরীর তহবিলে এককালীন অন্যূন পাঁচশত নগদ টাকা বা তাহার সমমূল্যের কোন বস্তু দান করেন, তবে তিনি এই লাইব্রেরীর একজন 'সদস্য পাঠক'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার মাসিক চাঁদা দিতে হইবে না। তবে লিখিত আবেদন করিতে হইবে।

খ. যদি কোনও ব্যক্তি 'আমার স্ববংশ' বলিয়া পরিচিত হয়, বা সুদূর ভবিষ্যতে আমার বংশের পরিচয়পত্র অর্থাৎ 'বংশতালিকা' দেখাইতে সক্ষম হয়, তবে সে এই লাইব্রেরীর একজন 'সদস্য পাঠক' হইতে পারিবে। কিন্তু তাহার কোন চাঁদা দিতে হইবে না। তবে উভয়ত আবেদনপত্রসহ যথারীতি 'সদস্য তালিকা' ভুক্ত হইতে হইবে।

গ. কোন বিদ্যালয়ের স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীগণ সদস্য পাঠকদের অনুরূপ নিজ বাড়িতে নিয়া বই পড়িতে পারিবে, অথচ তাহাদের মাসিক চাঁদা দিতে হইবে না। কিন্তু তাহাদের অভিভাবকদের লিখিত আবেদনপত্র দ্বারা পুস্তকাদির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

লাইব্রেরী ভবনটির সামনে একটি বারান্দা নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। তাহা নির্মিত হইলে সেখানে একটি নৈশ বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা আছে।

৩. লাইব্রেরীর পরিচালক ও পরিচারক

আমার অবর্তমানে লাইব্রেরীটির একজন পরিচালক ও একজন পরিচারক আবশ্যক হইবে, পরিচালক লাইব্রেরীর পুস্তকাদি রক্ষণাবেক্ষণ, আদান-প্রদান, শৃঙ্খলারক্ষা ও আয়-ব্যয়ের হিসাবপত্র রক্ষা করিবেন, এবং পরিচারক লাইব্রেরীর সরহদ্দের প্রত্যেকটি অংশের সৌন্দর্য রক্ষণ ও তাহা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকিবেন। তাহারা উভয়ে একযোগে লাইব্রেরী সংলগ্ন যে $১\frac{১}{২}$ শতাংশ ফল ও সব্জি আবাদী জমি আছে, তাহাতে কোন ফল বা সব্জি জন্মাইয়া তাহা ভোগ করিতে পারিবেন। ইহা ছাড়া আপাতত আমি তাহাদের উভয়ের জন্য বার্ষিক মং ৪৫০.০০ চারিশত পঞ্চাশ টাকা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেছি, তবে আমি কর্মক্ষম থাকা পর্যন্ত উক্ত পরিচালক ও পরিচারকের কাজ আমিই করিব।

এখানে উল্লেখ্য, লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ভাতা গ্রহণে কাজ করিতে ইচ্ছুক, এইরূপ সম-যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীগণের মধ্যে আমার বংশের লোকের দাবী অগ্রগণ্য হইবে।

৪. লাইব্রেরী স্থানান্তর

এইরূপ কোন ঘটনা না ঘটুক — যদি কোন নৈসর্গিক কারণে (নদী সিকস্তী বা অন্য কিছু) আমার প্রতিষ্ঠানটি স্থানান্তর করিবার আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে তাহা পার্শ্ববর্তী মৌজা বা এই (চরবাড়িয়া) ইউনিয়নের অন্য কোন সুবিধামত স্থানে স্থানান্তরিত করিবার জন্য স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে (হয়ত তখন ইউনিয়ন পরিষদের স্থলে মিউনিসিপ্যাল কমিটিও হইতে পারে)। কিন্তু সেই কাজে ইউনিয়ন পরিষদ বা মিউনিসিপ্যাল কমিটি যদি অপারগ হয় বা অসম্মতি জানায়, তবে আমার লাইব্রেরীর পুস্তকাদি বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরীর অধিকারে ছাড়িয়া দিতে হইবে। কেননা বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরী আমার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লাইব্রেরীর পরিচালক ও সেরেস্তাদি না থাকার দরুন সাধারণ তহবিলের ব্যয় সাশ্রয়ের ফলে 'উদ্বৃত তহবিল'-এ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। তখন উদ্বৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তহবিলের সেই অর্থ দ্বারা নির্ধারিত নিয়মে বৃত্তিদানযোগ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে এবং তখন 'সংরক্ষিত তহবিল'-এর লভ্যাংশের টাকাও এই কাজে ব্যয়িত হইবে।

আলোচ্য অবস্থায় লাইব্রেরীর 'পরিচালক কমিটি' ভুক্ত একমাত্র সভাপতি (জেলা প্রশাসক) ভিন্ন অন্য কোনো সদস্য বহাল থাকিবেন না। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা মিউনিসিপ্যাল কমিটি তখন জেলা প্রশাসকের কর্তৃত্বাধীনে বিদ্যালয়সমূহে যথানিয়মে বৃত্তিদান করিবেন।

পরিশেষে উক্ত অবস্থায় আমার সমাধিস্থ মৃত-অঙ্গপূর্ণ কাঁচের বৈয়মটি এবং লাইব্রেরীর প্রকোষ্ঠে রক্ষিত 'বস্তুমালা' (যথাসম্ভব) দেশের কোনও যাদুঘরে রক্ষা করা কাম্য।

৫. বৃত্তিদান

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধনের উদ্দেশ্যে 'প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি' প্রদানের একটি নিয়ম প্রবর্তন ও প্রদান করিয়াছিলাম আমি ১৩৮৬ সালে, দুইটি বিদ্যালয়ের জন্য। কিন্তু ১৩৮৭ সালের বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে তিনটিতে। যথা — ক. উত্তর লামচরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, খ. দক্ষিণ লামচরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ. চরমোনাই (মাদ্রাসা) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইহা ছাড়া বর্তমান (১৩৮৮) সালে অন্য আর একটি বিদ্যালয়ে বৃত্তিদানের আশা পোষণ করি এবং সেইটি হইবে চরবাড়িয়া লামচরি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। সুতরাং বর্তমানে আমার স্বীকৃত বৃত্তিদানযোগ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা চারটি।

প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে ছাত্র বা ছাত্রীটি বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবে, সে-ই উক্ত পুরস্কার পাইবে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে বার্ষিক এককালীন বৃত্তি প্রদানের অর্থের পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ —

প্রথম	শ্রেণী	—	১০.০০	টাকা
দ্বিতীয়	শ্রেণী	—	১৫.০০	টাকা
তৃতীয়	শ্রেণী	—	২০.০০	টাকা
চতুর্থ	শ্রেণী	—	২৫.০০	টাকা
পঞ্চম	শ্রেণী	—	৩০.০০	টাকা
		একুন —	১০০.০০	টাকা

(চারি বিদ্যালয়ে মোট ৪০০.০০ টাকা)

বৃত্তিদানের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে তাঁহার বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র বা ছাত্রীদের নামের তালিকা পাঠাইতে অনুরোধ জানাইতে হইবে।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার অব্যবহিত পরেই বৃত্তিদান করা সমীচীন। কিন্তু অনিবার্য কারণে ১৩৮৬-১৩৮৭ সালের বৃত্তিদান করা হইয়াছে যথাক্রমে ১১ই মাঘ ১৩৮৭ ও ২০শে বৈশাখ ১৩৮৮ তারিখে। ভবিষ্যত বৎসরগুলিতে প্রত্যেক 'পৌষ মাসের শেষ রবিবার'-এ বৃত্তিপ্রদানের তারিখ ধার্য হওয়া কাম্য, কেননা 'জন্মদিন' না হইলেও পৌষ আমার 'জন্মমাস' বটে। পরিচালক কর্তৃপক্ষ সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমানে বৃত্তিদানযোগ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র চারিটি। কিন্তু অনুকূল অবস্থার দরুন আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দিলে ভবিষ্যতে বৃত্তিদানযোগ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে আরও বাড়ানো যাইবে এবং তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে এই লাইব্রেরীটি হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প দূরত্বের বিদ্যালয়সমূহকে অগ্রে নির্বাচিত করিতে হইবে, পরে যথাক্রমে দূর হইতে দূরতর বিদ্যালয় নির্বাচিত হইতে পারিবে। বৃত্তিটির নাম হইবে 'আরজ বৃত্তি'।

[এতদ্ভিন্ন ট্রাস্টনামা সম্পাদনের পরের পরিকল্পনা মোতাবেক ঘোষণা করছি যে, লামচরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র বা ছাত্রীকে এককালীন মং ১৫০.০০ টাকা বৃত্তিদান করতে হবে। বৃত্তিদানের তারিখ থাকবে প্রতিবছর পৌষ মাসের শেষ রবিবারে অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তিদানের একই দিনে। বৃত্তিদানের তারিখের পূর্বে যথাযোগ্য ছাত্র বা ছাত্রীর পরিচয়পত্রসহ (নির্ধারিত তারিখে বৃত্তি গ্রহণের উদ্দেশ্যে) লাইব্রেরী ভবনে তাদেরকে পাঠানোর জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অনুরোধ জানাতে হবে। বৃত্তিদানের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ —

৬ষ্ঠ শ্রেণী	—	২০.০০ টাকা
৭ম শ্রেণী	—	২৫.০০ টাকা
৮ম শ্রেণী	—	৩০.০০ টাকা
৯ম শ্রেণী	—	৩৫.০০ টাকা
১০ম শ্রেণী	—	৪০.০০ টাকা
		মোট ১৫০.০০ টাকা

AMARBOI.COM

এমন না হোক, যদি কোনো কারণে উক্ত বিদ্যালয়টি বর্তমান বা চালু না থাকে, তবে অপেক্ষাকৃত নিকটতম কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নির্ধারিত নিয়মে বৃত্তিদান করতে হবে এবং তা অনন্তকাল চলবে।]

৬. পুরস্কার প্রদান

মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে 'বিশ্বমানবতা' বনাম 'মানবধর্ম'-এর উৎকর্ষজনক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য রচয়িতাকে বার্ষিক মং ১০০.০০ টাকা (প্রতিযোগিতামূলক) পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে এই পুরস্কার বিতরণ করা যাইবে। এই মর্মে প্রবন্ধ সংগ্রহ ও পুরস্কার প্রদানানুষ্ঠান সম্পাদনার জন্য উক্ত বিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাইতে হইবে। আমি আশা করি যে, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ আমার এই কাজে সহযোগিতা দান করিবেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত তারিখে বা তৎপূর্বে বিভাগীয় প্রধানের কাছে উক্ত টাকা পাঠাইতে হইবে এবং এই পুরস্কার আবহমানকাল চলিতে থাকিবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদি আমার প্রদত্ত অর্থের ন্যূনতা বা এই কাজটিকে 'বাহুল্য ঝামেলা' মনে করিয়া অথবা অন্য কোন কারণে আমার ঈপ্সিত পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি সম্পাদনায় অসম্মতি জানান, তবে উক্ত টাকার দ্বারা অতিরিক্ত একটি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথানিয়মে বৃত্তি প্রদান করিতে হইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. সমাধি ভবন

লাইব্রেরী ভবনের সরহদ্দের মধ্যে আমি আমার জন্য একটি পাকা সমাধি ভবন নির্মাণ করিয়াছি এবং আমার ৮০তম জন্মদিনে (৩রা পৌষ ১৩৮৬) আমার দেহের মৃত অংশসমূহ যথা — চুল, দাড়ি, নখ ও কিছুসংখ্যক দাঁত আনুষ্ঠানিকভাবে তন্মধ্যে সমাধিস্থ করিয়াছি। আমার মনে হয় যে, আমার শবদেহটি সমাধিস্থ করিবার চরম অনুষ্ঠান ইহাই। কেননা লঞ্চডুবি, ট্রেন দুর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে এমনভাবে আমার মৃত্যু ঘটিতে পারে, যাহাতে ওয়ারিসগণ আমার মৃতদেহ দাফন করিবার জন্য সুযোগ নাও পাইতে পারে ; সর্বোপরি — কোনরূপ বাধার সম্মুখীন না হইলে, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মঙ্গল ও দেশের তথা জাতির মঙ্গল কামনায় আমি আমার শবদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে দান করিবার জন্য আশা পোষণ করি।

আমার সমাধি ভবনটি আমি পরম আনন্দের সহিত লাইব্রেরী ভবনটির সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়া নির্মাণ করিয়াছি এবং আশা করিতেছি যে, ঐটি সুরক্ষিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত রাখিবার দায়িত্বভার লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ বহন করিবেন। উহার মেরামতাদি কাজের ব্যয়ভার বহন করা হইবে আমার 'সংরক্ষিত তহবিল'-এর মুনাফার টাকা হইতে।

৮. জন্মদিবস উদ্‌যাপন

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, জন্ম আমার ৩রা পৌষ ১৩০৭ সালে। সুতরাং আমার বর্তমান (১৩৮৮) বয়স প্রায় ৮১ বৎসর। আমি আমার ৬০ বৎসর বয়স হইতে 'জন্মদিবস' অনুষ্ঠান পালন করিয়া আসিতেছি। এবং আমি আশা করি যে, তাহা আমরণ পালন করিব। আর ইহাও আশা করি যে, মৃত্যুর পরেও আমার 'জন্মদিবসটি' যথারীতি প্রতিপালিত হইবে। তবে সে জন্য বিশেষ কোনও আড়ম্বর আবশ্যক হইবে না। শুধু ঐ দিনটির সার্থকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে লাইব্রেরীর পরিচালক কমিটির বার্ষিক অধিবেশন প্রতি বৎসর ৩রা পৌষ তারিখে (আমার জন্মদিনটিতে) হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৯. মৃত্যুদিবস উদ্‌যাপন

আমি আশা করি যে, জন্মদিনটির মত আমার মৃত্যুদিনটিও প্রতিপালিত হইবে। সেই দিনটিতে থাকিবে স্থানীয় এতিম, মিসকিন ও দীন-দুঃখীদের কিঞ্চিৎ দান-খয়রাতের ব্যবস্থা। সে উদ্দেশ্যে আমি বার্ষিক মং ১০০.০০ টাকা করিয়া ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছি। এবং দানের নিয়মাবলী আমার 'অছিয়তনামা'-এ (আমার ওয়ারিসগণের প্রতি) লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমার মৃত্যুর পূর্বে উক্ত ১০০.০০ টাকা আমার জন্মদিনে দান করা হইবে।

১০. অতিথি সেবা

বার্ষিক অধিবেশন কিংবা আমার প্রতিষ্ঠানসমূহ দর্শনাভিলাষে যদি কোন দূরাঞ্চলের পর্যটক অতিথি আসেন, তবে তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য বার্ষিক মং ৩০০.০০ টাকা করিয়া ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছি। আবশ্যক ও সম্ভব হইলে কার্যকরী কমিটি ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১. আরজ ফাণ্ড

আমার প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয়ভার বহনের উদ্দেশ্যে 'আরজ • ফাণ্ড' নামে একটি ফাণ্ড গঠন করিয়াছি এবং তাহাতে চার শ্রেণীর তহবিল থাকিবে। যথা — ক. বিশেষ তহবিল, খ. সাধারণ তহবিল, গ. উদ্বৃত্ত তহবিল এবং ঘ. সংরক্ষিত তহবিল। উল্লেখ্য যে, উদ্বৃত্ত তহবিলের টাকা বিশেষ তহবিলের সঙ্গে একত্রে ব্যাংকে মজুত থাকিবে।

ক. **বিশেষ তহবিল** — এই তহবিলটি গঠনের উদ্দেশ্যে আপাতত মং ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা বরিশাল জনতা ব্যাংকে (চেক নং এফ. ডি. ৩৬৬১১২/১০৮ তাং ৩. ৪. ৭৯) মজুত রাখা হইয়াছে। বর্তমান রেওয়াজ মোতাবেক উক্ত টাকার সুদ বাবদ বার্ষিক মং ১৫০০.০০ টাকা মুনাফা পাওয়া যাইবে। উক্ত মুনাফার টাকা হইতে বার্ষিক মং ১৪৫০.০০ টাকা সাধারণ তহবিলে জমা হইবে। অবশিষ্ট ৫০.০০ টাকা (সুদ ও তস্য সুদ সমস্তই) ব্যাংকের তহবিলে মজুত থাকিবে। সেই মজুত তহবিলের টাকাকে (প্রাথমিক মজুত দশ হাজার বাদে) উদ্বৃত্ত তহবিল বলা যাইবে। 'বিশেষ তহবিল' ভুক্ত টাকা কখনও তোলা যাইবে না।

[এতদ্ভিন্ন ট্রাস্টনামা সম্পাদনের পরের পরিকল্পনা মোতাবেক ঘোষিত হচ্ছে যে, লামচরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র বা ছাত্রীকে বৃত্তিদানের উদ্দেশ্যে জনতা ব্যাংকে (বরিশাল চকবাজার শাখা, হিং নং এফ. ডি. ০৬২০২৪/২১৪, তাং ২৮. ৬. ৮২) মং ৩৩৫.০০ টাকা স্থায়ী আমানত রাখা হয়েছে এবং অচিরেই আরও ৬৬৫.০০ টাকা আমানত রাখা হবে। তখন এর মোট তহবিল দাঁড়াবে মং ১০০০.০০ টাকা এবং বর্তমান রেওয়াজে (শতকরা ১৫ টাকা) মোতাবেক তাতে বার্ষিক মং ১৫০.০০ টাকা সুদ পাওয়া যাবে। সেই সুদের টাকা দ্বারা সম্পাদিত ট্রাস্টনামার ৫নং দফের শেষভাগে বন্ধনীর মধ্যে লিখিত নিয়ম মতে বৃত্তিপ্রদান করতে হবে। সুদের হার বৃদ্ধির দরুন ভবিষ্যতে কখনও বিশেষ তহবিলের টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা সাধারণ তহবিলে (১১-খ নং দফে) ভুক্ত হবে।

মূল তহবিলের ১০০০.০০ টাকা কখনও তোলা যাবে না।]

খ. **সাধারণ তহবিল** — সাধারণ তহবিলের আয়ের প্রধান উৎস হইবে বিশেষ তহবিল হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক মং ১৪৫০.০০ টাকা করিয়া। ইহা ছাড়া অন্যান্য বাবদ প্রাপ্ত টাকা, যথা — সরকারী বা আধা সরকারী, অথবা অন্য কোন মহৎ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দান-অনুদান, এবং আমার লেখা 'সত্যের সন্ধান' বই (২০০ কপি)-এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ, সাধারণ তহবিলের এই সমস্ত টাকা বর্তমানে নিম্নলিখিত রূপ ব্যয় করা যাইবে এবং অবশিষ্ট টাকা যথাযোগ্য স্থানে ব্যয়িত হইবে।

ক.	বিদ্যালয়সমূহে বৃত্তিদান		৪০০.০০ টাকা
খ.	পুরস্কার প্রদান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের মারফতে)		১০০.০০ টাকা
গ.	অতিথি সেবা	... ...	৩০০.০০ টাকা
ঘ.	পরিচালক ও পরিচারক ভাতা	... ...	৪৫০.০০ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঙ.	মৃত্যুদিনে দান	১০০.০০ টাকা
চ.	সেরেস্তা খরচ	১০০.০০ টাকা
		১৪৫০.০০ টাকা

প্রকাশ থাকে যে, আমার অবর্তমানে সাধারণ তহবিলের তাবৎ টাকাই লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের অধিকারে থাকিবে, তবে ১০০.০০ টাকার অধিক হাতে রাখা যাইবে না, হইলে তাহা কোনও ব্যাংকে মজুত রাখিতে হইবে এবং লাইব্রেরী পরিচালক কমিটির মঞ্জুরী অথবা কমিটির সভাপতি সাহেবের অনুমোদন ছাড়া ৫০.০০ টাকার অধিক কোন কাজে ব্যয় করা যাইবে না।

গ. **উদ্বৃত্ত তহবিল** — উদ্বৃত্ত তহবিলের টাকার পরিমাণ আপাতত বার্ষিক মাত্র ৫০.০০ টাকা। এই তহবিলের টাকার পরিমাণ (মায় সুদ ও আসল) যখনই কিঞ্চিতাধিক ৭০০.০০ টাকা হইবে, তখনই তাহা হইতে মং ৭০০.০০ টাকা বিশেষ তহবিলে ভুক্ত হইবে এবং বিশেষ তহবিলের টাকার পরিমাণ তখন ১০,০০০.০০ টাকার স্থলে ১০,৭০০.০০ টাকা হইবে। তাই ইহার পরের বৎসর বিশেষ তহবিল হইতে মং ১৪৫০.০০ টাকার স্থলে ১৫৫০.০০ টাকা সাধারণ তহবিলে ভুক্ত হইবে। তখন সাধারণ তহবিলের এই বর্ধিত মং ১০০.০০ টাকা দ্বারা নিয়মমাফিক একটি নূতন বিদ্যালয় মনোনীত করিয়া তাহাতে যথারীতি বৃত্তিদান করা যাইবে।

উদ্বৃত্ত তহবিলের টাকার দ্বারা উপরোক্ত নিয়মে আবহমানকাল বৃত্তিদানযোগ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ঘ. **সংরক্ষিত তহবিল** — এই তহবিলটি গঠনের উদ্দেশ্যে জনতা ব্যাংকে (বরিশাল চকবাজার শাখা এফ. ডি. নং ৩৬৬১৬৭/৬৬, তাং ১৪. ৭. ৮১) মবলগ ৫০০.০০ টাকা স্থায়ী আমানত রাখা হইয়াছে।

কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনা বা স্বাভাবিক ক্ষয়ের দরুন লাইব্রেরী ভবন বা আমার সমাধি ভবনটি মেরামত করিবার আবশ্যক হইলে তাহাতে এই তহবিলের লভ্যাংশের টাকা ব্যয় করা হইবে, অন্য কোন কাজে কখনও ব্যয় করা যাইবে না এবং উহার আসল টাকা কখনও তোলা যাইবে না।

১২. আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরী কমিটি

আমার উৎসর্গিত প্রতিষ্ঠানটির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত সার্বিক ক্ষমতা, অধিকার ও কর্তব্য দুইটি কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে। তাহার নাম হইবে — ১. পরিচালন কমিটি ও ২. কার্য নির্বাহক কমিটি, সংক্ষেপে 'নিবহী কমিটি'।

১. **পরিচালন কমিটি** — প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সার্বিক ক্ষমতা ও অধিকার এই কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তিন শ্রেণীর ১১ জন সদস্য লইয়া পরিচালন কমিটি গঠিত হইবে।

ক. সরকারী পর্যায়ে সদস্য ৩ জন — ইহার মধ্যে (পদাধিকার বলে সভাপতি) জেলা প্রশাসক বা তাঁহার মনোনীত সদস্য ১ জন, শিক্ষাবিদ (জেলা প্রশাসক মনোনীত) ১ জন এবং ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি (পদাধিকার বলে) ১ জন, মোট ৩ জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. লাইব্রেরীর পাঠকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত সদস্য ৪ জন।

গ. লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা বা তাঁহার স্ববংশীয়দের মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্য ৪ জন । মোট ১১ জন।

প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো মহৎ ব্যক্তি এই লাইব্রেরীটির উন্নয়নকল্পে এককালীন নগদ মং ১০০০.০০ টাকা বা তাহার সমমূল্যের কোন বস্তু দান করেন, তবে তিনি এই লাইব্রেরীর পরিচালন কমিটির একজন স্থায়ী সদস্য হইতে পারিবেন (নং 'ঘ') এবং তাঁহাকে 'সহযোগী সদস্য' বলা যাইবে। সে ক্ষেত্রে পরিচালন কমিটির সদস্য সংখ্যা ১১ জনের অধিক হইতে পারিবে।

কমিটির সদস্যগণের মধ্যে জেলা প্রশাসক, ইউনিয়ন পরিষদের সভাপতি ও সহযোগী সদস্যের কার্যকালের কোন মেয়াদ থাকিবে না, অন্যান্য সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ থাকিবে। লাইব্রেরী স্থাপনের বছর (১৩৮৬ সাল) সহ পাঁচ বছর এবং তৎপরে প্রত্যেক কমিটি গঠনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর করিয়া অতঃপর নির্ধারিত নিয়মে কমিটি পুনর্গঠিত হইবে। তবে নিম্নোক্ত যে কোন সময়ে নিয়ম মাফিক উপনির্বাচন বা মনোনয়ন হইতে পারিবে।

কারণসমূহ

ক. কোন সদস্য মারা গেলে বা কার্যে অক্ষম হইলে।

খ. কোন সদস্য তাঁহার কর্তব্য পালনে অযোগ্য হইলে।

গ. কোন সদস্য তাঁহার কর্তব্যকর্মে অবহেলা কিংবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিজনক কোন কাজ করিবার দরুন কমিটি কর্তৃক 'সদস্য থাকার অযোগ্য' বলিয়া ঘোষিত হইলে ইত্যাদি।

উক্ত কারণসমূহে কোন সদস্যের কোন 'বিশেষ পদ' শূন্য হইলে তাহা কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। একই ব্যক্তি সদস্যপদে পুনঃ নির্বাচিত বা মনোনীত হইতে পারিবেন।

২. **নির্বাহী কমিটি** — পরিচালন কমিটির সদস্যগণের মধ্য হইতে অন্যূন ৫ জন সদস্য লইয়া 'নির্বাহী কমিটি' গঠিত হইবে এবং পরিচালন কমিটি কর্তৃক এই কমিটির সদস্যগণ মনোনীত বা নির্বাচিত হইবেন। তবে নির্বাহী কমিটির সম্পাদক ও লাইব্রেরী পরিচালক (লাইব্রেরীয়ান) একই ব্যক্তি থাকা সমীচীন বলিয়া মনে করি। নির্বাহী কমিটির যাবতীয় কর্তব্য পরিচালন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং এই কমিটির সদস্যগণ আমার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

১৩. পরিচালন কমিটি গঠন

১২/১ নং দফের নির্দেশ মোতাবেক নিম্নলিখিত রূপ নবগঠিত 'পরিচালন কমিটি' গঠিত হইতে পারে।

ক. সরকারী পর্যায়ে সদস্য ৩ জন

১. মাননীয় বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক (পদাধিকার বলে) — সভাপতি।

২ শিক্ষাবিদ (মাননীয় জেলা প্রশাসক মনোনীত)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনাব মোহাম্মদ হানিফ
অধ্যক্ষ, সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ , বরিশাল — সদস্য।
৩. মাননীয় সভাপতি, ৩ নং চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, পদাধিকার বলে সদস্য।

খ. পাঠকদের নির্বাচিত সদস্য ৪ জন
৪. মৌ. ফজলুর রহমান বি. এ., লামচরি — সদস্য।
৫. মৌ. মোসলেম উদ্দিন মাতুব্বর বি. এ., লামচরি — সদস্য।
৬. মৌ. ইয়াছিন আলী সিকদার, লামচরি — সদস্য।
৭. ডা. আবদুল আলী সিকদার, লামচরি — সদস্য।

গ. প্রতিষ্ঠাতা বা তাঁহার মনোনীত বা নির্বাচিত সদস্য ৪ জন।
৮. অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির
প্রাক্তন অধ্যাপক, সরকারী ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল — সদস্য।
৯. আরজ আলী মাতুব্বর (প্রতিষ্ঠাতা), লামচরি — লাইব্রেরীয়ান।
১০. মৌ. গোলাম রসুল মোল্লা, লামচরি — সদস্য।
১১. আবদুল খালেক মাতুব্বর আই. এ., লামচরি — সদস্য।

ঘ. সহযোগী সদস্য ১ জন
১২. মৌ. মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর আই. এ., বরিশাল — সদস্য।

AMARBOI.COM

১৪. অধিবেশন

প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা ও উন্নয়ন বিধানকল্পে উহার পরিচালক কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ সাধারণত তিন ধরণের অধিবেশনে মিলিত হইবেন। যথা — ক. সাপ্তাহিক, খ. মাসিক ও গ. বার্ষিক অধিবেশন।

ক. **সাপ্তাহিক অধিবেশন** — লাইব্রেরীর পাঠকগণ তাঁহাদের পাঠোন্নতি ও জ্ঞানোন্নয়নমূলক নানাবিধ আলোচনার উদ্দেশ্যে লাইব্রেরী ভবনে প্রতি রবিবার (সন্ধ্যা ৬টা হইতে অনূর্ধ রাত ১০টা) সাপ্তাহিক অধিবেশনে মিলিত হইবেন। জ্ঞাতব্য যে, পাঠক-পাঠিকা ছাড়া যে কোন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি এই অধিবেশনে যোগদান করিতে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া বিবিধ বিষয় আলোচনা করিতে পারিবেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন লাইব্রেরীয়ান, তদভাবে প্রস্তাবে সমর্থিত কোন সুযোগ্য ব্যক্তি।

খ. **মাসিক অধিবেশন** — নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ সাধারণত প্রতিমাসে একবার লাইব্রেরী ভবনে অধিবেশনে মিলিত হইবেন এবং আবশ্যকীয় সবরকম আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, তবে জরুরী অধিবেশন যে কোন সময় হইতে পারিবে।

গ. **বার্ষিক অধিবেশন** — পরিচালন কমিটির সদস্যবৃন্দ, সদস্য পাঠক ও সাধারণ পাঠকগণ অন্তত বৎসরে একবার (লাইব্রেরী ভবনে) অধিবেশনে মিলিত হইবেন। তবে জরুরী অধিবেশন যে কোন সময় ও যে কোন স্থানে হইতে পারিবে। উক্ত সভা প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ, পরিচালনা পদ্ধতি ও উন্নয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করিবে। উক্ত অধিবেশনের নির্ধারিত তারিখ থাকিবে (প্রতি বৎসর) ৩রা পৌষ। উক্ত তারিখটি আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জন্মদিন'। তাই আলোচ্য সভায় আমার জীবনের বিভিন্ন দিক ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। উক্ত অধিবেশনের খরচ বাবদ (১০ নং দফের 'অতিথি সেবা' খাতে) আমি আপাতত বার্ষিক মং ৩০০.০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছি। কিন্তু প্রয়োজন ও আয়োজন বোধে উহার ব্যতিক্রম হইতে পারিবে।

১৫. লিপিমালা ও স্মৃতিমালা

ক. **লিপিমালা** — আমার লিখিত অপ্রকাশিত পুস্তক ও অন্যান্য হস্তলিপি (খাতা) সমূহকে কালের স্বাভাবিক ক্ষয় হইতে রক্ষা করিতে হইবে। হস্তলিপি খাতাসমূহের লেখা, কাগজ ও বাঁধাই নষ্ট হইবার পূর্বে তাহা নকল (Copy) করাইতে হইবে। সেজন্য যে কাগজপত্র ও নকলকারকের মজুরী ইত্যাদি বাবদ অর্থের আবশ্যক হইবে, তাহা আমার 'সাধারণ তহবিল' হইতে বহন করা হইবে। হস্তলিপিসমূহের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

১.	সীজের ফুল (কবিতা পুস্তক)	১ খানা
২.	সরল ক্ষেত্রফল (গণিত পুস্তক)	১ খানা
৩.	জীবন বাণী (সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী)	১ খানা
৪.	ভিখারীর আত্মকাহিনী (আত্মজীবনী)	১ খানা
৫.	কৃষকের ভাগ্য 'গ্রহ' (প্রবন্ধ)	১ খানা
৬.	বেদের অবদান (প্রবন্ধ)	১ খানা
৭.	ঘটনাবলী (খাতা) (১ম ও ২য় খণ্ড)	২ খানা
৮.	জন্ম-মৃত্যু (খাতা)	১ খানা
৯.	বংশাবলী (খাতা)	১ খানা
১০.	বংশ পরিচয় (খাতা)	১ খানা
১১.	অধ্যয়ন সার (খাতা) (১—৪ নম্বর)	৪ খানা
১২.	ডাইরী (খাতা) (১৩৪৪ ও ১৩৫৮—১৩৮৭ সাল)	৩১ খানা
১৩.	জমা-খরচ (খাতা) (১৩৩২—১৩৪১ সাল)	১০ খানা
১৪.	জমা-খরচ (খাতা) (১৩৪৩—১৩৪৭ সাল)	৫ খানা
১৫.	জমা-খরচ (খাতা) (১৩৫০—১৩৫১ সাল)	২ খানা
১৬.	জমা-খরচ (খাতা) (১৩৫৮—১৩৮৭ সাল)	৩০ খানা

খ. **স্মৃতিমালা** — লাইব্রেরী ভবনটির উত্তরাংশে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হইয়াছে। আমার জীবনের বিভিন্ন স্তরের নির্মিত ও ব্যবহার্য কিছু কিছু বস্তু সেখানে আমার 'স্মৃতিচিহ্ন'স্বরূপ মজুত থাকিবে। তবে কোন্ কোন্ বস্তু মজুত থাকিবে, তাহা এখনও বলা যাইতেছে না, পরে রক্ষিত বস্তুসমূহের একটি তালিকা তৎসঙ্গে রাখা হইবে। 'স্মৃতিমালা' রক্ষার জন্য বিশেষ কোনও অর্থব্যয়ের আবশ্যক হইবে না, কিন্তু আবশ্যক হইবে লাইব্রেরী পরিচালক মহোদয় ও সদস্যবৃন্দের আন্তরিকতাপূর্ণ সহানুভূতির।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ থাকে যে, 'স্মৃতিমালা'-এর তালিকাভুক্ত কোনও বস্তু কোনও কাজে কাহাকেও ব্যবহার করিতে বা কোনও বস্তু প্রকোষ্ঠের বাহিরে নিতে দেওয়া যাইবে না। 'স্মৃতিমালা'র বস্তুসমূহ জনগণের শুধু দর্শনীয় মাত্র, স্পর্শযোগ্য নহে।

১৬. ক্ষমতা

এতদ্বারা আমার প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা লাইব্রেরীর পরিচালন কমিটির উপর সোপর্দ করা হইল। কিন্তু অতঃপর লাইব্রেরী পরিচালনা সংক্রান্ত কোন 'নিয়মাবলী' প্রণয়নের ক্ষমতা আমার অধিকারে থাকিল।

তপছিল সম্পত্তি

ক. জিলা বরিশাল সাবরেজিষ্টার কোতয়ালী থানা ২৫ নং তৌজির মালিক বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে C. O. (Rev.) কোতয়ালী অধীন জে. এল. ৯৪ নং চরবাড়িয়া লামচরি মৌজায় S. A.— ২৭৭ (দুইশত সাতাত্তর) নং খতিয়ানে কর্সা বার্ষিক জমা মং ১৯/৩১ পয়সা। মোট জমি ৩—১৮ শতাংশ। ইহার হিং ৩ (তিন) গণ্ডা অংশ অত্র দলিলের স্বত্ব। রসদ জমা .১০ পয়সা জমির হাল ১৫৯৩ (পনর শত তিরানব্বই) নং দাগের জমি হইতে রসদীয় জমি — .৩ (তিন) শতাংশ দলিলের স্বত্ব। মূল্য ১৫০০.০০ টাকা।

খ. জিলা থানা সাবরেজিষ্টার তৌজি মৌজা ঐ মধ্যে S.A.—২৮০ (দুইশত আশি) নং খতিয়ানে কর্সা বার্ষিক জমা মং ১২/৯৪ পয়সা। মোট জমি ২—৪৪ শতাংশ। ইহার হিং ২.৭৫ (পৌণে তিন) গণ্ডা অংশ দলিলের স্বত্ব। জমির হাল ১৭২৪ (সতের শত চব্বিশ) নং দাগের জমি হইতে — .২ দুই শতাংশ অত্র দলিলের স্বত্ব। মূল্য মং ১০০০.০০ টাকা। উল্লিখিত ১৭২৪ নং দাগের উপরে পাকা লাইব্রেরী ভবনটি অবস্থিত।

গ.	লাইব্রেরী ভবনময় আসবাবপত্র		মং	৩০,০০০.০০	টাকা
ঘ.	দেওয়াল নির্মাণ		মং	১,০০০.০০	টাকা
ঙ.	সমাধি ভবন		মং	১,৫০০.০০	টাকা
চ.	কপিরাইট	১. সত্যের সন্ধান	মং	২,০০০.০০	টাকা
		২. সৃষ্টি-রহস্য	মং	৩,০০০.০০	টাকা
ছ.	সত্যের সন্ধান পুস্তক দুইশত কপি		মং	৩,০০০.০০	টাকা
জ.	পুস্তকাদি		মং	৭,০০০.০০	টাকা
ঝ.	স্থায়ী আমানত		মং	১০,০০০.০০	টাকা
			মং	৬০,০০০.০০	টাকা

কৈফিয়ত — অত্র দলিলের ১৩ পাতায় ১০ ছত্রে 'সরকারী' শব্দ তোলা লিখা এবং ২৮ পাতায় ১৩ ছত্রে 'বা মনোনীত' শব্দ তোলা লিখা ও ৩২ পাতায় ২য় ছত্রে 'করিবেন' শব্দ তোলা লিখা ও ৩৩ পাতায় ২য় ছত্রে 'আমার' শব্দ ছাপ কাটা।

স্ট্যাম্প মোট – ৪০ ফর্দ।

লিখকসহ ইসাদি ৪ জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখক

(স্বা. আরজ আলী মাতুব্বর) মোহাম্মদ হোসেন

সাং — চরবাড়িয়া ম — ১৩৫০

রে. নং – ৩১৭

ইসাদি	ইসাদি ও পরিচিত	ইসাদি
মো. ইয়াছিন আলী সিকদার	আ. মালেক মাতুব্বর	মো. গোলাম রসুল মোল্লা
সাং লামচরি।	পিং আরজ আলী মাতুব্বর সাং লামচরি।	সাং লামচরি।

X X X X

খ. মৃতদেহ দানপত্র

রে. তাং .... দলিল নং ....

গ্রহীতা —

১। বাংলাদেশ সরকার পক্ষে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ।

দাতা —

১। আরজ আলী মাতুব্বর, পিতা মৃত এন্তাজ আলী মাতুব্বর, সাকিন লামচরি, থানা — কোতয়ালী, জিলা — বরিশাল, জাতি — মুসলমান, পেশা — গৃহস্থী।

কস্য মৃতদেহ দান পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে আমি মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে দান করিলাম। কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার মৃতদেহটি দ্বারা উক্ত কলেজের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক যে কোন কাজ করিতে পারিবেন। আমার মৃত্যুর পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমার ওয়ারিসগণ আমার মৃতদেহটি কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। কিন্তু কোন কারণে যদি এমন কোন স্থানে আমার মৃত্যু ঘটে, যাহাতে আমার মৃতদেহটি আমার ওয়ারিসগণের আয়ত্তে না থাকে, তবে তাহারা আমার মৃত্যুর সঠিক তারিখ ও মৃত্যুর নির্দিষ্ট স্থানের নাম অবিলম্বে কলেজ কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাত করাইবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে এবং সম্ভব হইলে তাহাদের দায়িত্বে কলেজের কাজে ব্যবহারের জন্য আমার মৃতদেহটি আনাইয়া লইতে পারিবেন। তাহাতে আমার ওয়ারিসদের কোন ওজরাপত্তি থাকিবেনা।

প্রকাশ থাকে যে, আমার চক্ষুদ্বয় চক্ষু ব্যাংকে দান করা বাঞ্ছনীয়।

এতদার্থে আমি আমার সরল মনে, সুস্থ শরীরে, স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে অত্র দানপত্র দলিল লিখিয়া সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩৮৮ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ, ইং তাং ৫. ১২. ৮১।

কৈফিয়ত — অত্র দলিলের প্রথম পাতায় আট ছত্রে 'মেডিক্যাল' শব্দ তোলা লিখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেফ – ২ ফর্দ।
লিখকসহ ইসাদি ৪ জন।

লিখক
মোহাম্মদ হোসেন
সাং চরবাড়িয়া L. 1350

(স্বাঃ আরজ আলী মাতুব্বর)

ইসাদি	ইসাদি ও পরিচিত	ইসাদি
মো. ইয়াছিন আলী সিকদার	**আ. মালেক মাতুব্বর**	**মো. গোলাম রসুল মোল্লা**
সাং লামচরি।	পিং আরজ আলী মাতুব্বর সাং লামচরি।	সাং লামচরি।

✗ ✗ ✗ ✗

গ. অছিয়তনামা

AMARBOI.COM

রে. তাং .... দলিল নং ....

লিখিতাং আরজ আলী মাতুব্বর, পিতা মৃত এন্তাজ আলী মাতুব্বর, সাং — লামচরি, থানা — কোতয়ালী, জিলা — বরিশাল, জাতি — মুসলমান, পেশা — হালুটী।

কস্য অছিয়তনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে ১. আবদুল মালেক মাতুব্বর (পুত্র), ২. আবদুল খালেক মাতুব্বর (পুত্র), ৩. আবদুল বারেক মাতুব্বর (পুত্র), ৪. মোসাম্মৎ ফয়জরন নেছা (কন্যা), ৫. মোসাম্মৎ নুরজাহান বেগম (কন্যা), ৬. মোসাম্মৎ মনোয়ারা বেগম (কন্যা), ৭. মোসাম্মৎ বিয়াম্মা বেগম (কন্যা), ৮. মোসাম্মৎ সুফিয়া খাতুন (স্ত্রী) ; সাকিন — লামচরি, থানা — কোতয়ালী, জিলা — বরিশাল, জাতি — মুসলমান, পেশা — হালুটী। এতদ্বারা তোমাদিগকে অছিয়ত করা যাইতেছে যে, তোমরা আমার উত্তরাধিকারী বটে। আমার স্থাবরাস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির ন্যায় আমার মৃতদেহটিরও উত্তরাধিকারী তোমরাই। তোমরা জান যে, মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে আমার মৃতদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে দান করিয়া যাইতেছি, তাই আমার মৃত্যুর পর তোমাদের এই বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত অছিয়ত করিয়া যাইতেছি। আমি আশা করি, তোমরা আমার অছিয়তসমূহ পালন করিবা, কিন্তু যদি আমি এমন কোন স্থানে মারা যাই যাহাতে আমার মৃতদেহ তোমাদের আওতাধীনে না থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রে আমার এই বিষয়ের অছিয়ত পালনের কোন দায়িত্ব তোমাদের থাকিবে না। তবে অন্যান্য সম্বন্ধে থাকিবে।

অছিয়তসমূহ

১. মৃত্যুর পর আমার শবদেহটি জলে ধৌত পূর্বক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া (নতুন বা পুরাতন) বস্ত্রাবৃত করিবা। হয়ত খোশবু ব্যবহার করিবা। ইহা ছাড়া অন্য কোনরূপ চিরাচরিত প্রথা রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইবা না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. আমার বিদেহী আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার জন্য কাহাকেও পীড়াপীড়ি বা সেই জন্য অর্থ ব্যয় করিবা না। তবে কাহারও স্বেচ্ছাকৃত প্রার্থনা বা আশীর্বাদ আমার অবাঞ্ছিত নহে।

৩. কোনরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঘটিলে ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমার মরদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবের কাছে পৌঁছাইয়া দিবা।

৪. মেডিক্যাল কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে সোপর্দ করিবার পূর্বে তোমাদের সুবিধামত সময়ে আমার মৃতদেহটির ফটো তুলিবা, এবং তাহার কপি এনলার্জ ও বাঁধাই করিয়া আমার লাইব্রেরী ভবনে রাখিবা।

৫. মৃত্যুর পরে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে আমার শবদেহটি পৌঁছাইবার ও অন্যান্য খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যে আমি বরিশাল জনতা ব্যাংকে (চকবাজার শাখা একাউন্ট নং ৪১৫৮ তাং ২০. ৭. ৮২)-এ একটি সেভিংস একাউন্ট ফাণ্ড করিয়াছি এবং এতদুদ্দেশ্যে সেই ফাণ্ডে অন্যূন ৫০০.০০ টাকা সতত মজুত থাকিবে। আমার মৃতদেহটি লইয়া তোমাদের মেডিক্যাল কলেজে যাতায়াত খরচ ও ফটো তোলা ইত্যাদি যাবতীয় খরচ তোমরা সেই ফাণ্ড হইতে বহন করিবা এবং তোমাদের ইচ্ছা হইলে কাফন, সমাগতদের অভ্যর্থনা ইত্যাদি খরচও সেই ফাণ্ড হইতে বহন করিতে পারিবা।

আমার মৃত্যুদিনটির স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে পরবর্তী বৎসরগুলিতে আমার 'মৃত্যুদিবস' অনুষ্ঠান পালনের জন্য আমি বার্ষিক মং ১০০.০০ টাকা করিয়া ব্যয় বরাদ্দ করিয়া যাইতেছি এবং তাহা বহন করিতে হইবে লাইব্রেরীর সাধারণ তহবিলের টাকা হইতে, কিন্তু আমার মৃত দিনটিতে মং ১০০.০০ টাকা দান করিতে হইবে উপরোক্ত সেভিংস ফাণ্ডের টাকা হইতে।

৬. উপরোক্ত যাবতীয় খরচ বহনের পর যদি আমার সেভিংস একাউন্টে অর্থ মজুত থাকে, তবে তাহা হইতে তোমাদের মধ্যে যেই যেই ব্যক্তি মেডিক্যালে আমার দেহদান ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিবা, সেই সেই ব্যক্তি তাহাদের পারিশ্রমিক বাবদ মোট মং ৫০.০০ টাকা গ্রহণ করিতে পারিবা। তদ্বাদে যদি উক্ত ফাণ্ডে কোন টাকা মজুত থাকে, তবে তাহা উক্ত ব্যাংকে আমার স্থায়ী আমানত তহবিলে (একাউন্ট নং ৩৬৬১১২/১০৮ তাং ৩. ৪. ৭৯) জমা হইবে এবং সেই টাকার মুনাফার দ্বারা আমার মৃত্যু অনুষ্ঠানে কাঙ্গালের সংখ্যা বাড়াইয়া তাহাদের যথানিয়মে সাহায্যদান করা যাইবে। এমতাবস্থায় তখন আমার সেভিংস তহবিলে টাকা থাকিবে না।

৭. প্রতি বৎসর আমার মৃত্যু অনুষ্ঠান দিনটির পূর্বে লাইব্রেরীর নির্বাহী কমিটির স্থানীয় সদস্যদের যে কোন তিনজনের পরামর্শ লইয়া আমার নিকটতম প্রতিবেশী কাঙ্গাল হইতে ক্রমশ দূরবর্তী ২০ জন কাঙ্গাল-কাঙ্গালীকে মনোনীত ও আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে মং ৫.০০ টাকা করিয়া (মোট ১০০ টাকা) সাহায্যদান করিতে হইবে। তবে সেভিংসে একাউন্টের টাকার দ্বারা তহবিল বৃদ্ধি পাইলে তদ্বারা কাঙ্গাল-কাঙ্গালীর সংখ্যা বাড়াইতে পারা যাইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. আমার বংশাবলীর মধ্যে (পুরুষ বা নারী) বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা কাঙ্গাল–কাঙ্গালীদের হাতে সাহায্যদান করিতে হইবে। তদভাবে নির্বাহী কমিটির সম্পাদক উক্ত সাহায্যদান করিবেন।

৯. এমন কখনো না হউক — যদি আমার বংশাবলীর মধ্যে (পুরুষ বা নারী) কেহ জীবিত না থাকে, তখনও লাইব্রেরীর নির্বাহী কমিটির সম্পাদকের দ্বারা যথানিয়মে আমার মৃত্যুদিনে নির্ধারিত মং ১০০.০০ টাকা সাহায্যদান করিতে হইবে।

১০. তোমরা আমার (পুত্রগণ) লাইব্রেরীতে রক্ষিত $\frac{১৩/ক}{৫}$ নং খাতাটির (বংশাবলী বা বংশলতা নামীয়) অনুকরণে আমার উর্ধতন পুরুষ হইতে তোমাদের নিজ নিজ 'বংশাবলী' বা 'বংশলতা' লিখিয়া রাখিবা এবং তোমাদের অধস্তন পুরুষগণকে পুরুষানুক্রমে তাহাদের নিজ নিজ বংশাবলী বা বংশলতা রাখিতে উপদেশ দিয়া যাইবা। যেহেতু আমার বংশপরিচয় না থাকিলে লাইব্রেরী সংক্রান্ত কোনো বিশেষ সুবিধা ভোগ করা যাইবে না।

প্রকাশ থাকে যে, আমার বংশাবলীর মধ্যে যেই ব্যক্তি আমার অছিয়তের বাক্য পালন করিবে না, সেই ব্যক্তি আমার ত্যাজ্য স্থাবরাস্থাবর কোন সম্পত্তির 'উত্তরাধিকারী' বলিয়া দাবী করিতে পারিবে না। দাবী করিলে তাহা সর্বাদালতে বাতিল হইবে।

এতদ্বারা আমি আমার সরল মনে, সুস্থ শরীরে, সজ্ঞানে অত্র অছিয়তনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩৮৮ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ, ইং তাং ৫. ১২. ৮১।

কৈফিয়ত — অত্র দলিলের ৩য় পাতায় ১২ ছত্রে 'আমার' শব্দ তোলা লিখা।
রেফ মোট ৬ ফর্দ।
লিখকসহ ইসাদি ৪ জন।

AMARBOI.COM

লিখক
মো. হোসেন
সাং চরবাড়িয়া
L. 1350.

(স্বা. আরজ আলী মাতুব্বর)

ইসাদি
মো. ইয়াছিন আলী সিকদার
সাং লামচরি।

ইসাদি ও পরিচিত
আ. মালেক মাতুব্বর
পিং আরজ আলী মাতুব্বর
সাং লামচরি।

ইসাদি
মো. গোলাম রছুল মোল্লা
সাং লামচরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিমালা

আমার সম্পাদিত 'ট্রাস্টনামা' দলিলের '১৫(খ) স্মৃতিমালা' দফের বিবরণে বলা হয়েছে — "লাইব্রেরী ভবনটির উত্তরাংশে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (জাদুঘর) নির্মাণ করা হইয়াছে। আমার জীবনের বিভিন্ন স্তরের নির্মিত ও ব্যবহার্য কিছু কিছু বস্তু সেখানে আমার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মজুত থাকিবে। তবে কোন্ কোন্ বস্তু মজুত থাকিবে তাহা এখনও বলা যাইতেছে না। তবে রক্ষিত বস্তুসমূহের একটি তালিকা তৎসঙ্গে রাখা হইবে।"

উক্ত ওয়াদার পরিপ্রেক্ষিতে এখন নিম্নলিখিত তালিকার বস্তুগুলো যথাস্থানে সজ্জিত করে রাখা হলো।

AMARBOI.COM

সংরক্ষিত বস্তুসমূহের তালিকা

ক. কৃষি যন্ত্র

১. 'হ্যাণ্ডহো'-এর (যন্ত্রাংশ) লোহার ফলা ৩টি। খরিদ মূল্য (পুরো যন্ত্রটি) আট টাকা, বরিশাল, ১৩৪৪।

২. কোদাল ১ খানা। খরিদ মূল্য পাঁচ টাকা, বরিশাল, ১৩৮৬।

৩. কাস্তে ১ খানা। খরিদ মূল্য ছয় টাকা, বরিশাল, ১৩৮৬।

খ. জরিপী যন্ত্র

১. গ্যাণ্ডারের চেইন (১১ গজ) ১ ছড়া। মরহুম রহম আলী মাতুব্বরের দান, লামচরি ১৩৪২।

২. গ্যাণ্ডারের চেইন (২২ গজ) ১ ছড়া। খরিদ মূল্য আটত্রিশ টাকা, বরিশাল ১৩৭৫।

৩. প্লেন টেবিল একটি, সেগুন কাঠ (তেপায়াসহ) এবং

৪. সাইড ভ্যান ১টি, সেগুন কাঠ। মরহুম আমিন তোরাপ আলী আকনের দান। দক্ষিণ লামচরি, ১৩৪৩।

৫. প্রিজমেটিক কম্পাস ২টি। লাখুটিয়ার জমিদার মি. পরেশ লাল রায় (ঘুঘু বাবু)-এর স্টেট ম্যানেজার বাবু অনন্ত কুমার বসুর নিকট থেকে খরিদ, মূল্য ২০০.০০ টাকা, বরিশাল ১৩৬৩।

৬. রাইট এ্যাংগেল ৩টি, পিতল। মূল্য ৬০.০০ টাকা, বরিশাল ১৩৬৩।

৭. একর কুম্ব ১টি। এনামেলের পাত দ্বারা নিজ হাতে তৈরী, লামচরি, ১৩৬৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. গ্যাণ্ডারের স্কেল ১টি (পিতল)। পরলোকগত আমিন ফুল খাঁয়ের দান। চরবাড়িয়া ১৩৭২।

৯. ডিভাইডার ১টি (পিতল)। আলহাজ্ব মৌ. আ. রশীদ খানের দান। দ. লামচরি, ১৩৮২। X X X X

গ. পোষাক

১. জামা ১টি (টেট্রন)। পুত্র আ. মালেকের দান। লামচরি, ১৩৮৯।

২. পাজামা ১টি (সুতী)। ঐ

৩. ছাতা ১টি। পুত্র আ. খালেকের দান। ঢাকা, ১৩৮৯।

৪. জুতা ১ জোড়া (প্লাস্টিক)। ঐ

৫. গেঞ্জি ১টি। পুত্র আ. বারেকের দান। লামচরি, ১৩৮৯।

৬. মোজা ১ জোড়া। ঐ

৭. জামা একটি (পলিয়েস্টার)। জামাতা ইউনুস মীরের দান। আশুগঞ্জ, ১৩৮৭।

৮. লুঙ্গী ১ খানা। জামাতা মোতাহার আলীর দান। লামচরি, ১৩৮৭।

৯. হাতমোজা ১ জোড়া। মো. ইয়াছিন আলী শিকদারের দান (তার মরহুম পিতার ব্যবহার্য)। লামচরি, ১৩৮৭।

১০. চশমা ১ জোড়া (প্লাস্টিকের ফ্রেম)। খরিদ মূল্য দশ টাকা। বরিশাল, ১৩৮০। X X

ঘ. চা সরঞ্জাম

১. কাপ ৬টি (চীনামাটি)। পুত্র আবদুল খালেকের দান। ঢাকা, ১৩৮৬।

২. পিরিচ ৬টি (ঐ)। ঐ

৩. কেত্লী একটি (এনামেল)। মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা বাজারে খরিদ। ওজন ১৪$\frac{১}{২}$ তোলা, মূল্য দশ আনা, ১৩৫৪।

৪. সসপ্যান ১টি (ঢাকনিসহ, এনামেল)। ওজন ১৩$\frac{৩}{৪}$ তোলা। খরিদ মূল্য চোদ্দ টাকা। বরিশাল, ১৩৮৮।

৫. দুধ রাখার পাতিল একটি (এনামেল)। ওজন ১৭ তোলা, খরিদ মূল্য বার টাকা। বরিশাল, ১৩৮৬।

৬. মগ ১টি (এনামেল)। ওজন ৬ তোলা, খরিদ মূল্য দুই টাকা। ঢাকা, ১৩৮৪। X X

ঙ. দলিলপত্র

আমার জীবনের বৈষয়িক ও অন্যান্য সংক্রান্ত দলিলসমূহের মধ্যে অনেক দলিল বন্যা ও উইপোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে গেছে। যে ক'খানা এখনও অক্ষত আছে, তা আমার জাদুঘরে রেখে তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো।

ক্রম নং	গ্রহীতা	দাতা	দলিলের রকম	তাং বাং	তাং ইং
১.	শ্রীযুক্ত বাবু দেবকুমার রায়চৌধুরী	রবেজান বিবি গং	কিস্তিবন্দী	৭. ৬. ২০	২৩. ৯. ১৩

শৈশবে আমার পৈতৃক সম্পত্তি বাকী করে নিলাম হওয়ায় তা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে জমিদারের দাবীর টাকা ক্রমিক পরিশোধের জন্য আমার পক্ষে অত্র কিস্তিবন্দী দলিলখানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পাদন করেন আমার মা। লাখুটিয়ার জমিদারদের তিন স্টেটে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন তিনখানা দলিল সম্পাদিত হয়। কিন্তু সম্পাদনার পর তিনি কিস্তি মতো কখনো টাকা শোধ করতে পারেন নি। সমস্ত টাকা শোধ করতে হয়েছে আমাকে কৃষিকাজ শুরু করে ১৩২৮ সালে। কিস্তিবন্দীর টাকা পরিশোধ করে আমি তিনখানা দলিলই ফেরত এনেছিলাম। কিন্তু অপর দু'খানা দলিল বর্তমানে আমার কাছে নেই।

২.	শ্রীযুক্ত প্যারীলাল রায়চৌধুরী	রবেজান বিবি গং	কবুলিয়ত	৭. ৬. ২০	২৩. ৯. ১৩

লাখুটিয়ার জমিদারদের তিন স্টেটে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন তিনখানা কবুলিয়ত সম্পাদিত হয়। জমিদারী উচ্ছেদের পর পি. এল. রায়ের স্টেট ম্যানেজার অনন্ত কুমার বসু এ দলিলখানা আমাকে ফেরত দেন, অন্য দু'স্টেট দেয়নি।

আমার পৈত্রিক ভূসম্পত্তিটুকু নিলাম হলে আমি নাবালক বিধায় আমার পক্ষে কবুলিয়ত প্রদান করে $\frac{১}{২}$ অংশ সম্পত্তি উজাড় করেন আমার মা। অপর $\frac{১}{২}$ অংশ আমার ভগ্নিপতি আবদুল হামেদ মোল্লা তাঁর মাতা মেহেরজান বিবির বেনামীতে কবুলিয়ত প্রদানে তার স্বত্ব দখল করে নেন। তবে বিভিন্ন সময়ে খরিদমূলে সে অংশ সবই আমার স্বত্বদখলে এসেছে।

৩.	শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীলাল রায়চৌধুরী	হামজে আলী গং	কবুলিয়ত	২. ৩. ২২	১৮. ৬. ১৫

একই খতিয়ানভুক্ত জমি বলে আমার জমির সঙ্গে আমার চাচাতো ভাইদের জমিও নিলাম হয় ১৩১৭ সালে। তাই তারা এ কবুলিয়াত দ্বারা তাদের সম্পত্তি রক্ষা করে।

৪.	আবদুর রহিম মৃধা	আবদুল হামিদ মোল্লা	কবালা	১১. ২. ৪৯	২৫. ৫. ৪২

অত্র দলিলের জমি আমারই খরিদ বটে, দলিলের লিখিত গ্রহীতা আমার বেনামদার।

ক্রম নং	গ্রহীতা	দাতা	দলিলের রকম	তাং বাং	তাং ইং
৫.	জাফর আলী চাপ্রাসী	আরজ আলী মাতুব্বর	অগ্রিম খা. পা.	২২. ১. ৫১	৫. ৫. ৪৭
৬.	নরেন্দ্র নাথ সাহা, ও	আরজ আলী মাতুব্বর	কবুলিয়ত	২৩. ৫. ৫১	৮. ৯. ৪৪
৭.	আ. রহমান মল্লিক	হোসেন শরীফ গং	কবালা	২১. ৬. ৫২	৮. ১০. ৪৫
৮.	আ. রহমান মল্লিক	হোসেন শরীফ গং	কবালা	২৬. ৯. ৫২	১০. ১. ৪৬
৯.	জবান আলী চাপ্রাসী	আরজ আলী মাতুব্বর	অগ্রিম খা. পা.	২৬. ১০. ৫২	৯. ২. ৪৬
১০.	আ. রহমান মল্লিক	খবরদ্দি ফরাজী	কবালা	১৪. ১. ৫৩	২৭. ৪. ৪৬
১১.	আরজ আলী মাতুব্বর	আ. রহিম মৃধা	কবালা	৩১. ৫. ৫৩	১৭. ৯. ৪৬
	এ দলিলখানা (৪) নং বেনাম দলিলখানার স্বনামা।				
১২.	আরজ আলী মাতুব্বর	সৈয়দ আলী মাল	কবালা	২৬. ৮. ৫৩	১২. ১২. ৪৬
১৩.	আরজ আলী মাতুব্বর	রেকাত আলী	কবুলিয়ত	২৬. ৮. ৫৩	১২. ১২. ৪৬
১৪.	ললিত মোহন সাহা	আরজ আলী মাতুব্বর	কবালা	১৯. ১. ৫৪	৩. ৫. ৪৭
১৫.	আরজ আলী মাতুব্বর	আ. রহমান মল্লিক	কবালা	১৩. ৩. ৫৪	২৮. ৬. ৪৭
১৬.	হাতেম আলী সরদার	আরজ আলী মাতুব্বর	অগ্রিম খা. পা.	২. ৩. ৫৪	১৭. ৬. ৪৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭.	আরজ আলী মাতুব্বর	আ. রহমান মল্লিক	কবালা	২১. ১. ৫৪	৫. ৫. ৪৭
১৮.	নরেন্দ্র নাথ লাহা	আরজ আলী মাতুব্বর	কবুলিয়ত (নকল)	১৪. ৪. ৫৪	৩১. ৭. ৪৭
১৯.	মি. পরেশ লাল রায়	আরজ আলী মাতুব্বর	ঐ (আসল)	২৮. ১১. ৫৭	১১. ৪. ৫১
২০.	আরজ আলী মাতুব্বর	ললিত মোহন সাহা	কবালা	২৬. ১. ৬২	১০. ৫. ৫৫
২১.	আরজ আলী মাতুব্বর	আদম আলী গোলদার	এগ্রিমেন্টনামা	১৩. ২. ৬৪	৩০. ৫. ৫৭
২২.	কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	আরজ আলী মাতুব্বর	বন্ধকী দলিল	৮. ৯. ৬৫	২৪. ১২. ৫৮
২৩.	মোবারেক আলী	আরজ আলী মাতুব্বর	অগ্রিম খা. পা.	২. ৬. ৬৬	১৯. ৯. ৫৯
২৪.	আফেজউদ্দিন হাং	আরজ আলী মাতুব্বর	অগ্রিম খা. পা.	২৩. ৭. ৬৬	১০. ১১. ৫৯
২৫.	আরজ আলী মাতুব্বর	আ. রহমান শরীফ	কবালা	৫. ৮. ৬৬	২২. ১১. ৫৯
২৬.	মনোয়ারা বেগম (লেখকের কন্যা)	আ. মজিদ খলিফা	কাবিননামা	৮. ২. ৬৯	২২. ৫. ৬২
২৭.	আরজ আলী মাতুব্বর	ছফেদ আলী হাং	এগ্রিমেন্ট	৭. ১. ৭২	২০. ৪. ৬৫
২৮.	সুলতান আহমদ ফ.	আরজ আলী মাতুব্বর	অ. খা. পা.	২৫. ৬. ৭২	১২. ১০. ৬৫
২৯.	আরজ আলী মাতুব্বর	আদম আলী গোলদার	কবালা	৩০. ১১. ৭৪	১৪. ৩. ৬৮
৩০.	আরজ আলী মাতুব্বর	আনোয়ারা বেগম গং	কবালা	৮. ১১. ৭৭	২১. ২. ৭১
৩১.	আরজ আলী মাতুব্বর	আক্কেল আলী গং	কবালা	১৫. ১২. ৭৮	২৯. ৩. ৭২
৩২.	আরজ আলী মাতুব্বর	আমিনা [illegible] গং	কবালা	১৩. ৮. ৭৯	২৯. ১১. ৭২
৩৩.	বি-আম্মা বেগম (লেখকের কন্যা)	ইউনুছ মীর	কাবিননামা	২৬. ১২. ৮১	৯. ৪. ৭৫
৩৪.	আরজ আলী মাতুব্বর	আ. রহমান আকন	কবালা	২৯. ১. ৮৫	১৩. ৫. ৭৮

চ. বিবিধ

১. রেকাবী ১ খানা (চীনামাটি)। খরিদ মূল্য আট আনা, বরিশাল, ১৩৩০।

২. পানপাত্র ১টি (পিতল)। ওজন $৩৪\frac{৩}{৪}$ তোলা, খরিদ মূল্য আট আনা। মকরম প্রতাপ, ১৩৫৬।

৩. ঘটি ১টি (এনামেল)। ওজন ১২ তোলা। কন্যা মুকুলের দান। আশুগঞ্জ, ১৩৮৮।

৪. কলসী ১টি (এনামেল)। ওজন $১৭\frac{১}{২}$ তোলা, খরিদ মূল্য ষোলো টাকা। বরিশাল, ১৩৮৬।

৫. চৌকি বাক্স ১টি। দৈ. ২৮ ইঞ্চি, প্র. $৯\frac{১}{২}$ ইঞ্চি, বেধ ৬ ইঞ্চি। নিজ হাতে তৈরী, ১৩৭০ (পোষাক রক্ষিত)।

৬. পিজবোর্ড কাগজে তৈরী বাক্স ১টি। দৈ. ১৫ ইঞ্চি, প্র. $১০\frac{১}{২}$ ইঞ্চি, বেধ ৭ ইঞ্চি। নিজ হাতে তৈরী, ১৩৬৪। দ. লামচরি নিবাসী মরহুম আ. রহিম মৃধার শ্রাদ্ধ-ভোজে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকগণনা কাজে নিশানরূপে উক্ত পিজবোর্ড কাগজের টুকরোগুলো ব্যবহৃত হয়েছিলো ৯ই ফাল্গুন, ১৩৬০ সালে (জরিপ যত্র রক্ষিত)।

৭. বিভিন্ন রোগের ঔষধের ও লেখায় ব্যবহৃত কালির খালি শিশি —

ক. ঔষধের শিশি

১২	আউন্স শিশি	১ টি
৪	আউন্স শিশি	৩০ টি
৩	আউন্স শিশি	১ টি
১	আউন্স শিশি	৮ টি
১/২	আউন্স শিশি	৫ টি

খ. কালির শিশি ২১ টি

৮. বৈয়ম ১টি (কাঁচের, টিনের মুখোস)। পুত্র আ. খালেকের দান। ঢাকা ১৩৮৬।

৯. বৈয়ম ১টি (কাঁচ, কাঁচের মুখোস)। খরিদ মূল্য ছয় টাকা। বরিশাল, ১৩৮৯।
এ বৈয়মটিতে আমার চুল, দাড়ি, নখ ও দাঁত রক্ষিত।

১০. আলমারি ১টি (দেওয়ালের সঙ্গে যুক্ত)।

১১. সুটকেস ১টি (টিন)। দৈ. ১৫ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি, প্র. ১০ ইঞ্চি, বেধ ৫ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। খরিদ মূল্য ত্রিশ টাকা। বরিশাল, ১৩৮৯ (দলিলপত্র রক্ষিত)।

১২. তালা (চাবিসহ) ৪টি (সুটকেসসহ তিনটি বাক্সে তিনটি ও কবাটে একটি — মোট ৪টি)।

AMARBOI.COM

আসবাবপত্র

১.	চেয়ার	৬ খানা	
২.	টেবিল	২ খানা	
৩.	টুল	১ খানা	
৪.	সীল		
	ক. 'আরজ মঞ্জিল'	১ টি	
	খ. 'আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরী'	১ টি	
	গ. 'আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী'	১ টি	
	ঘ. 'সম্পাদক ও লাইব্রেরীয়ান'	১ টি	
৫.	ষ্ট্যাম্প প্যাড	১ টি	
৬.	পাঞ্চার মেশিন	১ টি	আ. খালেক মাতুব্বরের দান, ১৩৮৬।
৭.	পেপার ওয়েট		
	ক. কাঁচ নির্মিত	১০ টি	
	খ. পাথর নির্মিত	৪ টি	
৮.	গামপট	১ টি	

৯. ঝর্ণা কলম ১টি (ইওথ)। খরিদ মূল্য সতেরো টাকা। বরিশাল, ১৩৮৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০. তালা (চাবিসহ) ২টি (সদর দরজা ১টি ও লাইব্রেরী কক্ষ ১টি)। খরিদ মূল্য উনত্রিশ টাকা। বরিশাল, ১৩৮৬।

খাতাপত্র

১.	সংগৃহীত পুস্তকের তালিকা	১ খানা
২.	দফেওয়ারী পুস্তকের তালিকা	১ খানা
৩.	পুস্তক আদান-প্রদান	১ খানা
৪.	সদস্য পাঠকের তালিকা	১ খানা
৫.	চাঁদা আদায়ের রসিদ বই	১ খানা
৬.	চাঁদা আদায়ের হিসাব	১ খানা
৭.	ক্যাশ বহি	২ খানা
৮.	ভাউচার ফাইল	১ খানা
৯.	নোটিশ বহি	১ খানা
১০.	মন্তব্য বহি	১ খানা
১১.	বৃত্তি প্রদান হিসাব	১ খানা
১২.	রাইটিং প্যাড (ছোট–বড়)	২ খানা
১৩.	পরিদর্শন মন্তব্য	১ খানা
১৪.	রেজি. ট্রাস্টনামা (মূল দলিল)	১ খানা

AMARBOI.COM

দেয়াল ফটো

১. **'দুই কাঠুরে রমণী'।**
'সত্যের সন্ধান' ও 'সৃষ্টি-রহস্য' পুস্তকদ্বয়ের লেখককে বাংলাদেশ লেখক শিবির থেকে প্রদত্ত পুরস্কার। ২৪ চৈত্র, ১৩৮৫।

২. **'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ'**
৩. **'বিদ্রোহী কবি নজরুল'**
} আ. খালেক মাতুব্বরের দান। ২৫ পৌষ, ১৩৮৮।

৪. **'বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক জনাব আ. আউয়াল ও আরজ আলী মাতুব্বর'।**
পুস্তক প্রদান অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসকের দান। ৯ জুন, ১৯৮১।

৫. **'আরজ আলী মাতুব্বর'।**
হাতে আঁকা ছবি। শিল্পী কাজী আবুল কাসেম, লেক সাকার্স (কলাবাগান) ঢাকা। ৩ জানুয়ারী, ১৯৭৬।

৬. **'আরজ আলী মাতুব্বর'।**
'সত্যের সন্ধান' পুস্তকে প্রকাশের উদ্দেশ্যে মুদ্রিত ছবি। ঢাকা, ১৩৮০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. 'আরজ আলী মাতুব্বর'।
মো. আলী নূর সাহেবের গৃহীত রঙ্গিন ফটো (দান) । ধানমণ্ডি, ঢাকা। ১৭ ভাদ্র, ১৩৮৮।

৮. ভিউকার্ড ৯৪ খানা। উপহারদাতা এম. এ. হক, ধানমণ্ডি, ঢাকা। ১৩৮৬।

XXXX

ঋণপত্র

আমার উৎসর্গিত ক্ষুদ্র এ লাইব্রেরীটির উন্নয়নকল্পে যাঁদের নিকট থেকে কোনো বস্তু বা নগদ অর্থ দানসূত্রে এযাবত পেয়েছি ও ভবিষ্যতে পাবো, সে সমস্ত মহৎ ব্যক্তিগণের কাছে আমি চিরঋণে আবদ্ধ আছি ও থাকবো। এতদার্থে দাতাগণের নাম-ধাম ও তাঁদের দানের পরিচয়সহ অত্র ঋণপত্রখানা লিখে দিচ্ছি।

দাতাদের নাম-ধাম	দানের বস্তু	মূল্য
বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক মাননীয় আবদুল আউয়াল সাহেবের বদান্যতায় লাইব্রেরীর দানপত্র সংক্রান্ত দলিলাদি সম্পাদনার খরচ বাবদ বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত দান।	নগদ টাকা	১৪৬০.৭৫
মৌ. মো. মোশাররফ হোসেন মাতুব্বর (আজাদ অয়েল মিল, হাটখোলা, বরিশাল)-এর স্বেচ্ছাকৃত দান।	নগদ টাকা	২৫০০.০০
মৌ. মোছলেম উদ্দীন মাতুব্বর (লামচরি)-এর স্বেচ্ছাকৃত দান।	নগদ টাকা	৫০০.০০
ভারপ্রাপ্ত বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক মাননীয় মো. সিরাজুল ইসলাম সাহেবের বদান্যতায় লাইব্রেরীর উন্নয়নকল্পে বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত দান।	নগদ টাকা	৩০০০.০০
ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মাননীয় মো. সিরাজুল ইসলাম সাহেবের বদান্যতায় লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত দান।	নগদ টাকা	৫৮৯০.০০
আলহাজ্জ মৌ. এম. এ. মোতাহের (নিউ বেলী রোড, ঢাকা)-এর স্বেচ্ছাকৃত দান।	নগদ টাকা	১০০০.০০
চরবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মৌ. খালেকুজ্জামান সাহেবের বদান্যতায় লাইব্রেরীর উন্নয়নকল্পে পুকুর খননের জন্যে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রাপ্ত দান।	ধান ৬ মণ	৭৩৮.০০
বাকেরগঞ্জ জেলা প্রশাসক মাননীয় আবদুল আউয়াল সাহেবের বদান্যতায় বাকেরগঞ্জ জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত দান।	বই ১০০ খানা	৩৩৯৩.৫০
জনাব মো. হানিফ, অধ্যক্ষ, সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল।	বই ১৯ খানা	৫৯.০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আ. খালেক মাতুব্বর, পিং আরজ আলী মাতুব্বর, লামচরি।	বই ৫৩ খানা	৪০৫.০০
মো. আনোয়ার হোসেন (লিটন), পিং মো. ইদ্রিস খান, বুখাই নগর।	বই ৪৭ খানা	৪০৩.০০
জনাব মো. তাজুল ইসলাম, বর্ণমিছিল, ঢাকা।	বই ৩৬ খানা	৩৩৯.০০
জনাব মো. আলী নূর, ধানমণ্ডি, ঢাকা।	বই ২২ খানা	২৬৩.০০
জনাব মো. আলী ইমাম, ঠাঁটারী বাজার, ঢাকা।	বই ৩২ খানা	২৬০.০০
জনাব মো. সিরাজুল হক, অধ্যক্ষ, বরিশাল কলেজ, বরিশাল।	বই ৭ খানা	২০১.০০
জনাব মো. আলতাব হোসেন, পিং সফিউদ্দীন হাং, উত্তর লামচরি।	বই ১৭ খানা	৫৮.০০
কমরেড অনিল মুখার্জী, ওয়ারী, ঢাকা।	বই ৪ খানা	৪৫.০০
জনাব মো. ফিরোজ সিকদার, পিং মো. ইয়াছিন আলী সিকদার, লামচরি।	বই ৫ খানা	৪৪.০০
জনাব মো. আবদুল জলিল, পিং আরজ আলী হাং, লামচরি।	বই ৭ খানা	৪১.৫০
জনাব মো. মফিজুর রহমান, পিং মরহুম মাষ্টার আবুল আলী, চরবাড়িয়া (তালতলি)।	বই ৩ খানা	২৭.০০
অধ্যাপক আ. হালিম, ওয়ারী, ঢাকা।	বই ৩ খানা	১৮.০০
মো. মোস্তফা খান, পিং আলহাজ্জ মো. আ. রশীদ খান, দক্ষিণ লামচরি।	বই ২ খানা	৬.০০
মো. শাহীন, পিং আ. খালেক মাতুব্বর, লামচরি।	বই ১ খানা	২.০০
মো. ফরিদ উদ্দীন, পিং আ. মালেক মাতুব্বর, লামচরি।	বই ১ খানা	২.০০
মো. কামাল উদ্দিন, পিং মৃত আ. রাজ্জাক হাং, সাং পশুরীকাঠি, পো. চরমোনাই, বরিশাল।	বই ১ খানা	১৫.০০

মোট — ২১,৩০৩.৭৫

আমার এ ঋণপত্র দলিলখানায় গ্রহীতারূপে এযাবত যেসব মহাজনদের নামোল্লেখ করা হলো, তাঁরা হচ্ছেন আমার লাইব্রেরীটির সহিত সংশ্লিষ্ট এবং লাইব্রেরীর কল্যাণকামী। এছাড়া আমার ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং আমার ব্যক্তিত্বের কল্যাণকামী এমন ক'জন সুধীমহাজন আছেন, এ দলিলখানার গ্রহীতার তালিকায় তাঁদের নামোল্লেখ না থাকলে আমার নিজের নাম লিখতে হয় 'অকৃতজ্ঞ' তালিকায়। তাই তাঁদের নাম-ধাম ও দানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিচ্ছি।

১. জনাব সরফুদ্দীন রেজা হাই, অধ্যাপক, গণিত বিজ্ঞান, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।
   আমার দারুণ অর্থকষ্টের সময় জনাব হাই সাহেব আমাকে ৫০০.০০ টাকা দান করেন, যদ্দ্বারা আমার 'সত্যের সন্ধান' বইখানা ছাপাতে দেওয়া হয় বরিশাল আল-আমিন প্রেসে (১৩৭৯)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার আল-আমিন প্রেস কর্তৃপক্ষ যখন আমার উক্ত বইখানার মাত্র একটি ফরমা বাকী রেখে (মুসল্লিদের চাপে পড়ে) ছাপার কাজ বন্ধ করে দেন, তখন ঢাকাস্থ বর্ণমিছিল প্রেসে নিয়ে বইখানার মুদ্রণকাজ সমাধা করা হয় তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে (১৩৮০)। এছাড়া বিশেষ মহলের ধিকৃত আমার 'সত্যের সন্ধান' বইয়ের পাণ্ডুলিপিখানা তিনিই সুধীজনের গোচরে নেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রাপ্ত হই আমি (উক্ত বইয়ের পাণ্ডুলিপির উপর) বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক মাননীয় কবির চৌধুরী সাহেবের সপ্রশংস অভিমত (১৩৭৯)। এ ভিন্ন আমার প্রণীত 'সৃষ্টি-রহস্য' বইখানার 'কৃত্রিম উপগ্রহ' অধ্যায়টি রচনা সম্ভব হতো না তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টা ছাড়া। তিনি একাধিকবার আমার সাথে ঢাকাস্থ ইউসিস ভবনে গিয়ে সংগ্রহ করে দিয়েছেন আমাকে উক্ত অধ্যায়টি ও চন্দ্রাভিযান সংক্রান্ত রচনার বিবিধ তথ্যাবলী।

২. জনাব মো. আলী নূর, এডভোকেট, ৮১-এ কাকরাইল, ঢাকা।

মাননীয় নূর সাহেব লাইব্রেরীটিতে যে ২৬৩.০০ টাকা মূল্যের ২২ খানা পুস্তক দান করেছেন (১৩৮৭), তা-তো আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া আমার 'সত্যের সন্ধান' পুস্তকখানার মুদ্রণকাজ সমাধা হওয়ার পরও তা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিলো না উক্ত পুস্তকখানা সম্বন্ধে সুধী ও বুদ্ধিজীবী মহলের কতিপয় অভিমত মুদ্রণের অর্থাভাবের দরুন, তখন আমার সে অভাবের সময় তিনি আমাকে ৫০০.০০ টাকা দান করেন (১৩৮০)। এতদ্ব্যতীত আমার প্রণীত 'সৃষ্টি-রহস্য' পুস্তকখানা প্রকাশের যাবতীয় খরচই তিনি আমাকে দান করেন, যার পরিমাণ হচ্ছে ১০,৫০০.০০ টাকা (১৩৮৪)। তাঁর এ মহান দানের জন্য আমি তাঁকে সামান্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলাম আমার উক্ত পুস্তকখানার ভূমিকায়। কিন্তু কৃতজ্ঞতা চান না বলে নিজ হাতে তাঁর নামটা কেটে দিয়েছেন। অগত্যা আমার উক্ত বইখানা তাঁর নামে উৎসর্গ করলাম এবং ছাপিয়ে প্রকাশ করলাম তাঁকে না জানিয়েই। কিন্তু তা দেখতে পেয়েও তিনি আমার কাছে এই বলে কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন যে, তাঁকে না জানিয়ে বইখানা তাঁর নামে উৎসর্গ করলাম কেন? জানি না, তিনি এ ঋণপত্রে তাঁর নাম দেখতে পেয়ে আবার আমার কৈফিয়ৎ তলব করবেন কিনা। দেখা যাক।

AMARBOI.COM

এ ভিন্ন আমার আরও ক'জন সুধীমহাজন আছেন, তাঁদের কা'রো কা'রো নাম এই স্মরণিকায় স্থানবিশেষে উল্লিখিত হয়েছে। তবুও আমার এ ঋণপত্রে তাঁদের নাম থাকার দাবীদার তাঁরা এবং অধিকারীও বটেন। যে সমস্ত মনীষী আমাকে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা দান করে আসছেন বহুবছর থেকে, আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি ও জীবনের মানোন্নয়নের জন্যে, নিম্নে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

১. জনাব কাজী গোলাম কাদির, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত)।

২. জনাব মো. হানিফ, অধ্যক্ষ, সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল।

৩. জনাব মো. শামসুল হক, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. জনাব মো. শামসুল ইসলাম, সম্পাদক, বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ড, যশোর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. জনাব মাওলানা মো. মুসা আনসারী, অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৬. ড. কাজী নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭. শ্রদ্ধেয় আবুল হাসানাৎ, সচিত্র যৌন বিজ্ঞানাদি বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও সুসাহিত্যিক ; তোপখানা রোড, ঢাকা।

৮. জনাব কাজী আবুল কাসেম, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সুসাহিত্যিক ; ৪৯, লেক সার্কাস, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

৯. প্রিয় মো. শফিকুর রহমান, জ্ঞানতপস্বী ও সাহিত্যসেবী ; বাসাবো, ঢাকা।

AMARBOI.COM

অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ আমি,
তবুও জানি না আশা পূরবে কবে।
আজও লাইব্রেরীর পুস্তকাদির সংখ্যা

মাত্র —
৮২৩

✕✕✕✕

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন আমার মৃতদেহ মেডিক্যালে দান করছি

বিগত ৩০শে ফাল্গুন ১৩৮৭ তারিখের 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে 'মানব কল্যাণের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত' শীর্ষক নাম দিয়ে। তাতে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে আমার মৃতদেহ দানের প্রসঙ্গটির উল্লেখ আছে। সংবাদটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথে বহু লোকে আমাকে প্রশ্ন করতে থাকে — কেন আমার মৃতদেহ মেডিক্যালে দান করছি, তার কারণ জানার জন্যে। অনেকে আবার ওর কারণ আবিষ্কার করেও ফেলেছেন, আমার কাছে ও বিষয়ে কিছু শোনবার আগেই। তাঁদের মতে ওর কারণ নাকি — কবরে মনকির ও নকির নামক ফেরেস্তাদ্বয়ের দৌরাত্ম্য এড়ানো। এরূপ মনোভাব যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের কাছে আমি সবিনয়ে বলছি, কারণ ওটি নয়, অন্য রকম দু'টি।

AMARBOI.COM

প্রথম কারণ

চার বছর বয়সে আমার বাবা মারা যান। কায়িক শ্রমের দ্বারা বহুকষ্টে আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন স্বামী ও বিত্তহীনা আমার মা। বিশেষত আমি আমার মার একটিমাত্র সন্তান। তাই আমার উপর তাঁর স্নেহটা ছিলো অন্যান্য মাদের চেয়ে অনেক বেশী। পক্ষান্তরে বাবা জীবিত না থাকায় আমার পিতৃস্নেহটুকুও পতিত হচ্ছিলো মায়ের উপরেই। তাই আমার মাতৃস্নেহ ছিলো অন্যান্যদের চেয়ে কিছু বেশীই।

বিগত (ইং) ২৭. ১০. ৭৮ তারিখের 'বিচিত্রা' পত্রিকা, ১০. ৬. ৮১ তারিখের 'সংবাদ' পত্রিকা, ১৯. ৭. ৮১ তারিখের 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পত্রিকা এবং ৪. ৯. ৮১ তারিখে প্রকাশিত 'বাংলার বাণী' পত্রিকা যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা হয়তো জানেন আমার দুঃখজনক একটি ঘটনা। তবুও সেই অবিস্মরণীয় বিষাদময় ঘটনাটি সংক্ষেপে এখানে বলছি। যে ঘটনা করেছে আমাকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দ্রোহী।

১৩৩৯ সালে আমার মা মারা গেলে আমি আমার মৃত মায়ের ফটো তুলি। তা দেখে আমার মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করতে যে সমস্ত আলেম ও মুসল্লিরা এসেছিলেন, তাঁরা আমার মার নামাজে জানাজা ও দাফন করা ত্যাগ করে লাশ ফেলে চলে যান, যেহেতু ফটো তোলা নাকি হারাম। অগত্যা কতিপয় অমুসল্লি নিয়ে জানাজা ছাড়াই আমার মায়ের মরদেহটি সৃষ্টিকর্তার হাতে সোপর্দ করতে হলো কবরে। আমার মা ছিলেন অতিশয় ধার্মিকা নারী। তাঁর নামাজ–রোজা বাদ পড়া তো দূরের কথা, 'কাজা' হতেও দেখিনি কোনোদিন আমার জীবনে, বাদ পড়েনি কখনো তাঁর তাহাজ্জোদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামাজ মাঘ মাসের দারুণ শীতের রাতেও। এহেন পুণ্যবতী মায়ের জানাজা হলো না আমার একটি দুষ্কর্মের ফলে। হায়রে পবিত্র ধর্ম। (আজকাল ওসব হারামের তম্বি নেই বললেই চলে।)

ইসলামের দৃষ্টিতে ছবি তোলা দূষণীয় হলেও এ ক্ষেত্রে সে দোষে দোষী হয়তো স্বয়ং আমিই, আমার মা নন। কেননা এতে আমার মার সম্মতি ছিলো না। আমার অপরাধে কেন যে আমার মার মরদেহের অবমাননা করা হলো, তা আজও আমি খুঁজে পাচ্ছি না। পক্ষান্তরে নানা কারণে আমার নিজের বহু ফটো তোলা হয়েছে ও হচ্ছে। বিশেষত আমার ছেলেরা আমার মৃতদেহের ফটো তুলে রাখারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমতাবস্থায় আমার মৃতদেহটি গোঁড়া মুসল্লিদের কাছে আনুষ্ঠানিক সংকারের মর্যাদা না পাওয়াই সম্ভব। যদিও পায় তবে আমার মায়ের মরদেহের অমর্যাদা ও আমার মরদেহের মর্যাদা দেখে তাতে আমার বিদেহী আত্মা তুষ্ট হবার কথা নয়। তাই আমি আমার মৃতদেহটিকে বিশ্বাসীদের অবহেলার বস্তু ও কবরে গলিত পদার্থে পরিণত না করে, তা মানবকল্যাণে সোপর্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

দ্বিতীয় কারণ

AMARBOI.COM

এককালে মানব সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকলেও বর্তমানে শিক্ষিত সমাজ বিশেষত বৈজ্ঞানিক সমাজ ভূত-প্রেত, দেও-দানব, জ্বীন-পরী, শয়তান-ফেরেশতা ইত্যাদি কাল্পনিক জীবগণকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করে অযথা সময় নষ্ট করেন না। এমনকি আধুনিক কালের কোনো ঔপন্যাসিকও ওসব অতিজীবকে নিয়ে বা ওদের সমন্বয়ে কোনো উপন্যাস রচনা করেন না। কেননা এখন আর ওসব উপন্যাস বাজারে বিকায় না। তাই আমিও ওসব অতিজীবকে নিয়ে কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা করি না, করি মানবকল্যাণের চেষ্টা যতোটুকু পারি। মানবকল্যাণ আমার ব্রত।

কোনো অট্টালিকা ধ্বংস হলে তা পরিণত হয় রাবিশে এবং মানুষের যথোপযুক্ত কাজে লাগে। অনুরূপভাবে জীবের মৃতদেহগুলো পচে-গলে নষ্ট হলে তা পরিণত হয় কতোগুলো জৈবাজৈব পদার্থে এবং তা মানুষের কল্যাণ সাধন করে নানাভাবে। কৃষক হিসেবে আমি আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছি। মাঠের কোথায়ও কোনো জীবদেহ পঁচে-গলে নষ্ট হলে সেখানের মাটিতে কয়েক বছর যাবত যে কোনো ফসল জন্মে ভালো। ওতে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। তবে ওর একটি অকল্যাণেরও আশংকা রয়েছে। সেটি হচ্ছে — শবদেহ পচে-গলে নষ্ট হবার প্রাক্কালে দুর্গন্ধে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হবার আশংকা। বোধ হয় যে, সে কারণেই সেমিটিক জাতিরা মানুষের শবদেহ মাটিতে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এতে মানুষের অকল্যাণের পথ রুদ্ধ হলেও কল্যাণের পথ ততো প্রশস্ত হয়নি। কেননা যতোটুকু গভীরে শবদেহ রাখা হয়, কোনো ওষধি জাতীয় ফসলের শিকড় ততোটুকু গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। তাই তাতে কোনো ফসল বাড়ে না। তবে আম, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছের শিকড় ততোধিক গভীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই দেখা যায় যে, কবরের উপর কোনো ফলের গাছ জন্মালে তাতে ফল ধরে প্রচুর। বিশেষত জীবের অস্থিতে থাকে 'ফসফরাস' নামীয় একটি পদার্থের আধিক্য এবং তা হচ্ছে ফলের স্বাদ ও ফলন বৃদ্ধির সহায়ক। পক্ষান্তরে শবদেহ জলভাগে পতিত হলে তা জলজীবের ভক্ষ্য হয় এবং জলজীবগুলো নানাভাবে মানুষের কাজে লাগে। এ সবে দেখা যায় যে, জীবের মৃতদেহগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মরণিকা

মানুষের কল্যাণ সাধন করে নানারূপে — প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে, মুখ্য বা গৌণভাবে। কিন্তু এতে কারো ইহকালের মনমানসের সম্পর্ক থাকে না। সম্পর্ক যদি থাকতো, তবে তাদের নিজেদের দেহের এরূপ মানবকল্যাণের ভূমিকা দেখে তারা নিশ্চয়ই আনন্দলাভ করতো।

মেডিক্যালে আমার দেহদানের কারণ মায়ের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আমার মরদেহটি দ্বারা মানবকল্যাণের সম্ভাবনা বিধানে আমার সজীব মনের পরিতোষ ও আনন্দলাভের প্রয়াসমাত্র। আমার মরদেহটির সাহায্যে মেডিক্যাল কলেজের শল্যবিদ্যা শিক্ষার্থীগণ শল্যবিদ্যা আয়ত্ত করবে, আবার তাদের সাহায্যে রুগ্ন মানুষ রোগমুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করবে। আর এসব প্রত্যক্ষ অনুভূতিই আমাকে দিয়েছে মেডিক্যালে শবদেহ দানের মাধ্যমে মানবকল্যাণের আনন্দলাভের প্রেরণা। এতে আমার পরিজনের বা অন্য কারো উদ্বিগ্ন হওয়া সমীচীন নয়।

৫ ৫ ৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদ-এর অবদান

অপ্রকাশিত

রচনাকাল ২১. ৬. ১৩৮৩.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদ-এর অবদান

সভ্য মানব সমাজে ধর্ম বহু এবং ধর্মগ্রন্থও অনেক। এগুলির মধ্যে কয়েকখানাকে দাবী করা হয় ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলে। অর্থাৎ এ কোনো মানুষের রচিত নয়, স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী। যথা — হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ', পারসিকদের 'জেন্দ আভেস্তা', ইহুদীদের 'তৌরিত', খৃষ্টানদের 'ইঞ্জিল' (বাইবেল), মুসলমানদের পবিত্র 'কোরান' ইত্যাদি।

ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে যে কয়খানা সুপ্রসিদ্ধ, তা কোনো এক সময়ে বা কোনো এক দেশে রচিত বা প্রত্যাদিষ্ট নয়, উহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে রচিত বা প্রত্যাদিষ্ট। তবে এর প্রকাশকরূপে এক একজন পুরুষকে দেখা যায় সব ক্ষেত্রেই। কিন্তু 'বেদ-এর বেলায় দেখা যায় কিছুটা ব্যতিক্রম।

'ঋগ্বেদ'-এ ২১৪ জন ঋষির নাম পাওয়া যায় এবং ঐগুলির মধ্যে স্ত্রীলোকের নামও আছে ১২টি। মনে হয় যে, তাঁরা সকলেই বেদের কোনো না কোনো অংশের রচয়িতা। বস্তুত বেদ কোনো এক ব্যক্তির রচিত নয়, এর শ্লোকগুলো (ঋকসমূহ) তৎকালীন বহু আর্য ঋষির ধ্যান-ধারণা, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সৃষ্টি।

ঐতিহাসিকদের মতে ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে 'ঋগ্বেদ' সর্বাপেক্ষা পুরাতন। এর বর্তমান বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বছর। পক্ষান্তরে জেন্দ-আভেস্তার বয়স প্রায় পৌনে চার হাজার বছর। তৌরিতের প্রায় সোয়া তিন হাজার বছর, ইঞ্জিলের প্রায় দু'হাজার বছর এবং পবিত্র কোরানের বয়স প্রায় চোদ্দ শত বছর মাত্র।

বেদ চার ভাগে বিভক্ত। যথা — ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। এদেশের আর্য হিন্দুদের একান্ত বিশ্বাস যে, পরমপিতা ভগবান অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা — এই চারজন ঋষিকে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধচিত্ত দেখে এঁদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে, এই চারজনের মুখ দিয়ে ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব — এই চারটি বেদ প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, 'বেদ' সেই অনাদি, অনন্ত ঈশ্বরের নিঃশ্বাসে সৃষ্টি ; কোনো মনুষ্য এর রচয়িতা নয়। বেদ অপৌরুষেয়।

বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্বেদ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও মূল্যবান। আমরা নিম্নে এই বেদ থেকে কতিপয় শ্লোক বা ঋক উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করছি। এতে অতি সহজেই বোধগম্য হবে যে, শ্লোকগুলোর রচনাকারী কোনো মনুষ্য, না পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান। শ্লোকগুলোর অধিকাংশই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম মণ্ডলের সূক্তসকল হতে উদ্ধৃত হচ্ছে।

'আমাদিগকে সম্যকরূপে গাভী প্রেরণ কর।' (১০ ; ৮)

'শোভনীয় সহস্র গো ও অশ্ব দ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর।' (২৯ ; ৩)

'হে প্রকৃষ্ট বুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্র! আমাদিগকে প্রভূত ধন দান করিয়া আমাদিগের নিকট ব্যাপারীর মত হইও না।' অর্থাৎ দানের প্রতিদান চেয়োনা। (৩৩ ; ৩)

'হে উষে! আমি যেন যশোযুক্ত, বীরযুক্ত, দাসবিশিষ্ট এবং অশ্বযুক্ত ধনপ্রাপ্ত হই।' (৯২ ; ৮)

'হে ইন্দ্র! যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করে, বজ্র দ্বারা তাহাকে বিনাশ কর।' (১৩১ ; ৭)

'হে বায়ু, তুমি শত সহস্র সংখ্যক নিযুতে (ঘোড়াতে) আরোহণ করিয়া অভিমত সিদ্ধির জন্য এবং হবি ভক্ষণের জন্য আমাদিগের যজ্ঞে উপস্থিত হও।' (১৩৫ ; ৩)

'যে গৃহে মৃত গমন করিতেছে, সেই অশ্বত্থ স্থানে গমন কর, ইন্দ্র! সেই স্থানে গমন কর।' (১৩৫ ; ৭)

'হে স্বাদু পিতু (অন্ন), হে মধুর পিতু! আমরা তোমার সেবা করি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।' (১৮৭ ; ২)

'আমরা প্রভূত জল ও (যবাদি) ওষধি ভক্ষণ করি ; অতএব হে শরীর! তুমি স্থূল হও।' (১৮৭ ; ৮)

দস্যু ও অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের প্রতি আর্যদের বিদ্বেষভাব ছিল অত্যধিক। তাঁরা ওদের শত শত অভিশাপ দিয়েছেন। নিম্নে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

'হিংসক-শত্রুনাশক বরুণকে আমি আহ্বান করি।' (২য় সূক্ত, ৪ ঋক)

'হে অগ্নি! আমাদিগের বিদ্বেষীগণ রাক্ষসের সহিত যুক্ত হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে দহন কর।' (১২ ; ৫)

'সমস্ত আক্রমণকারীকে হনন কর, হিংসাকারীকে বিনাশ কর।' (২৯ ; ৭)

'তোমার প্রতপ্ত বজ্র তাহাদের উপরে নিক্ষেপ কর, তাহাদিগকে উন্মূলিত কর, তাহাদিগকে বিদীর্ণ কর, এই রাক্ষসকে শক্তিহীন, বধ ও পরাস্ত কর।' (ঋগ্বেদ ৩য়, ৩০ ; ১৬–১৭)

বৈদিক যুগে প্রতিমা পূজার প্রচলন ছিল না, ছিল যজ্ঞ প্রথা। ঋষিগণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঘৃত বা সোমরস (মদ্যবিশেষ) আহুতি (ছিটিয়ে) দিতেন এবং উপরোক্তরূপ কোনো না কোনো মন্ত্র (শ্লোক বা ঋক) আওড়াতেন। এটাই ছিল সাধারণ যজ্ঞ। এ ছাড়া গোমেধ, অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যজ্ঞানুষ্ঠান মহা ধুমধামের সাথে পালন করা হ'ত। ঋষিদের ধারণা ছিল যে, যজ্ঞাহুতি দানকালে ইষ্টদেবের কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করা হলে, ইষ্টদেব প্রার্থীর সে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাকেন। তাই ঋষিগণ রচনা করেছেন নানা দেব-দেবীকে উদ্দেশ্য করে নানাবিধ ছন্দোবদ্ধ স্তুতিবাক্য বা প্রার্থনা। প্রার্থনাগুলোকে বলা হয় 'ঋক' এবং ওর রচনাকারীকে বলা হয় 'ঋষি', আর শত শত বছরের শত শত ঋষির রচিত ঋকগুলোর সংকলিত গ্রন্থকে বলা হয় 'ঋগ্বেদ'। অন্য বেদত্রয় ঋগ্বেদেরই শাখাবিশেষ। 'বেদ' যে মনুষ্য কর্তৃক রচিত, সে বিষয়ে আর বেশী বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, পূর্বোক্ত ঋকগুলোই তার প্রমাণ।

বৈদিকোত্তর ধর্মসমূহের প্রায় প্রত্যেক ধর্মেই এক একজন ধর্মগুরু বা ধর্মবেত্তা ছিলেন। যেমন — পার্শি ধর্মে জোরওয়াস্টার, ইহুদী ধর্মে মূসা (আ.), খ্রীষ্টান ধর্মে ঈসা (আ.), ইসলাম ধর্মে হজরত মোহাম্মদ (দ.), জৈন ধর্মে ঋষভদেব, শিখ ধর্মে নানক, ব্রাহ্ম ধর্মে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইত্যাদি। কিন্তু বৈদিক ধর্মে সেরূপ বিশেষ কোনো 'একজন' ধর্মগুরু ছিলেন না। বৈদিক ধর্মের উপদেশকরা ছিলেন সংখ্যায় বহু। কাজেই উপাস্য দেবতা, উপাসনা পদ্ধতি এবং ধর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতবাদও বহু। আর শুধু বহু দেব-দেবীর উপাসনাই নয়, আর্যরা উপাসনা বা স্তুতিগান করেছেন কোনো কোনো পশু, পাখী, গাছ-পালা এবং জল, বায়ু, মাটি, পাথর ইত্যাদি জড় পদার্থেরও। তাই প্রবাদ হচ্ছে — 'নানা মুনির নানা মত'।

মরণান্তে 'পরকাল', পরকালে 'বিচার', বিচারান্তে 'স্বর্গ-নরক', স্বর্গ-নরকের 'শ্রেণীবিভাগ' (সংখ্যা) ইত্যাদি বিষয়গুলোও বৈদিক ও পৌরাণিক ঋষিদের কল্পনার সৃষ্টি। এখানে ঋগ্বেদের কয়েকটি ঋক উদ্ধৃত করা হ'ল।

মৃত ব্যক্তির অগ্নি-সংকার শেষ হয়েছে, তারপর তার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে — "যখন ইনি সজীবত্বপ্রাপ্ত হইবেন, তখন দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন" (দশম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের দ্বিতীয় ঋক)। এখানে বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনর্জীবিত হবে এবং তারা দেবগণের (ফেরেস্তার?) অধীন হবে।

ঐ মণ্ডলের ৫৬তম সূক্তের তৃতীয় ঋকে লিখিত আছে — "যেরূপ উত্তম স্তব করিয়াছিলে তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও।" এই ঋকে দেখা যায় যে, পুণ্যের তারতম্যের জন্য 'উত্তম' ও 'অধম', ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গ আছে (সর্বোত্তম ফেরদাউস?)।

নবম মণ্ডলের ১১৩তম সূক্তের অষ্টম ঋকে বলা হয়েছে — "এই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিব্যলোক, যাহা নভোমণ্ডলের ঊর্ধ্বে আছে, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্বদাই আলোময় — তথায় আমাকে অমর কর।" ঋষি এখানে মনে করেছেন যে, স্বর্গরাজ্যটি আকাশমণ্ডলের ঊর্ধ্বভাগে অবস্থিত, সেখানে অবাধে চলাফেরা করা যায়, ওখানে দিন-রাত্রের বালাই নাই, এ স্বতঃস্ফূর্ত আলোকে শোভিত। ওখানে বাস করা যেন তাঁর অনন্তকাল স্থায়ী হয়।

ঐ নবম ঋকে ঋষি প্রার্থনা করছেন — **"যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় প্রধ্ন নামক দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তিলাভ হয় — তথায় আমাকে অমর কর।"** ঋষি এখানে এমন একটি দেশ কল্পনা করেছেন, যে দেশে নৈরাশ্যের কোন স্থান নেই এবং যে দেশ প্রচুর তৃপ্তিদায়ক খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ। ঋষি আশা করেন সেদেশে অমর হয়ে থাকতে।

ঐ দশম ঋকে ঋষি বলেন, **"যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ-আহ্লাদ ও আনন্দ বিরাজ করছে,**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে অভিলাষী ব্যক্তির তাবত কামনা পূর্ণ হয় — তথায় আমাকে অমর কর।" এই ঋকে ঋষি কল্পনা করেছেন যে, স্বর্গে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ যথা — গান, বাজনা এবং অপ্সরা, কিন্নরী নাম্নী নর্তকী ইত্যাদিও আছে। ঋষি সেখানে অমর হয়ে থাকতে চান।

স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে বহু মত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে এখানে আমরা আর একটি মতের আলোচনা করব। এ মতে জগত তিনটি। যথা — স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। অর্থাৎ উর্ধ্বলোক, মধ্যলোক ও অধঃলোক। আমাদের এই পৃথিবীটাই 'মধ্যলোক' বা 'মর্ত্যলোক'। এখান হতে উর্ধ্বদিকে উর্ধ্বলোক বা স্বর্গ। উহা সাত ভাগে বিভক্ত। যথা — ভূর্লোক, ভূবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। একে সপ্তস্বর্গও (সাত বেহেস্ত?) বলা হয়। মর্ত্যলোকের নিম্নভাগে অধঃলোক বা পাতাল। তাও সাত ভাগে বিভক্ত। যথা — অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল। একে বলা হয় সপ্তনরক (সাত দোজখ?)। এই সপ্ত নরকের আবার অন্য নামও আছে। যথা — অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, তামিস্র, অন্ধতামিস্র ও অবীচি। **সপ্ত নরকের নিম্নতম নরক অবীচি (বোধ হয় যে, অবীচি-এর নামান্তর 'হাবীয়া')**। মানুষ পুণ্যের তারতম্যানুসারে ক্রমান্বয়ে উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বতন স্বর্গের অধিকারী হন এবং পাপের তারতম্যানুসারে নিম্ন হতে নিম্নতম নরকে নিপতিত হন। এই হল এই মতের সিদ্ধান্ত।

হিন্দুশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, স্বর্গরাজ্যে যাবার পথে 'বৈতরণী' নামক একটি নদী পার হতে হয় (বোধহয় যে, পুল আছে)। ঐ নদীটির জল অগ্নিবৎ গরম, রক্ত-মাংস ও হাড়গোড়ে পরিপূর্ণ, দুর্গন্ধময় ও কুমীরে ভরা। ঐ নদীটি নিরাপদে পার হবার আশায় হিন্দুগণ মৃত্যুর পূর্বে বা পরে গো-দান করে থাকেন।

AMARBOI.COM

হিন্দুদের কোনো কোনো শাস্ত্রে পাপ ও পুণ্যকে তুলাদণ্ডে পরিমাপ করার বিষয় বর্ণিত আছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বের পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ে মহর্ষি ভীষ্ম বলেছেন — "সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং একমাত্র সত্য তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা হইয়াছিল, কিন্তু সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে সত্যই ভারি হইল।"

> আর্য ঋষিদের রচিত বৈদিক ও পৌরাণিক বহু কাহিনী (স্বর্গ, নরক ও বৈতরণী-নদী পার হওয়া ইত্যাদি) ধর্মান্তরে গৃহীত হয়েছে। তবে তা বেদ বা পুরাণের বাণীরূপে নয়, গৃহীত হয়েছে 'ঈশ্বরের (আল্লাহর?) বাণী'রূপে। স্বর্গ ও নরক আর্য ঋষিদের স্বকল্পিত হলেও নরকযন্ত্রণা হতে অব্যাহতি ও স্বর্গীয় সুখলাভের প্রত্যাশায় অগণিত মানুষ তাদের আরাধ্য দেবতার সমীপে মাথা কুটে মরছে।

আর্যঋষিদের কল্পিত স্বর্গ, নরক ও ভীষণ নদী বা সেতু পার হওয়া ইত্যাদি কাহিনীগুলোর পারলৌকিক সত্যতা থাক আর না থাক, এ দ্বারা আমরা এই শিক্ষাই পেয়ে থাকি যে, যাবতীয় সৎকাজের পরিণাম 'সুখময়' এবং অসৎকাজের পরিণাম 'দুঃখময়'। আর যে কোনো মহৎ কাজের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হতে হলে তার যাত্রাপথে বহু বাধাবিঘ্নের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবেই সাফল্যলাভ করা সম্ভব।

ধর্মগ্রন্থের বাণীসমূহ লৌকিক বা অলৌকিক যা-ই হোক, তাতে মানব জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বহু মূল্যবান তথ্যও আছে। তাই যাবতীয় ধর্মগ্রন্থই আমাদের পরম শ্রদ্ধার্হ ও সমান আদরণীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসমাপ্ত

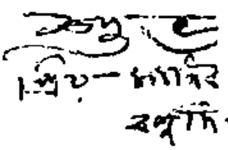

পাণ্ডুলিপি

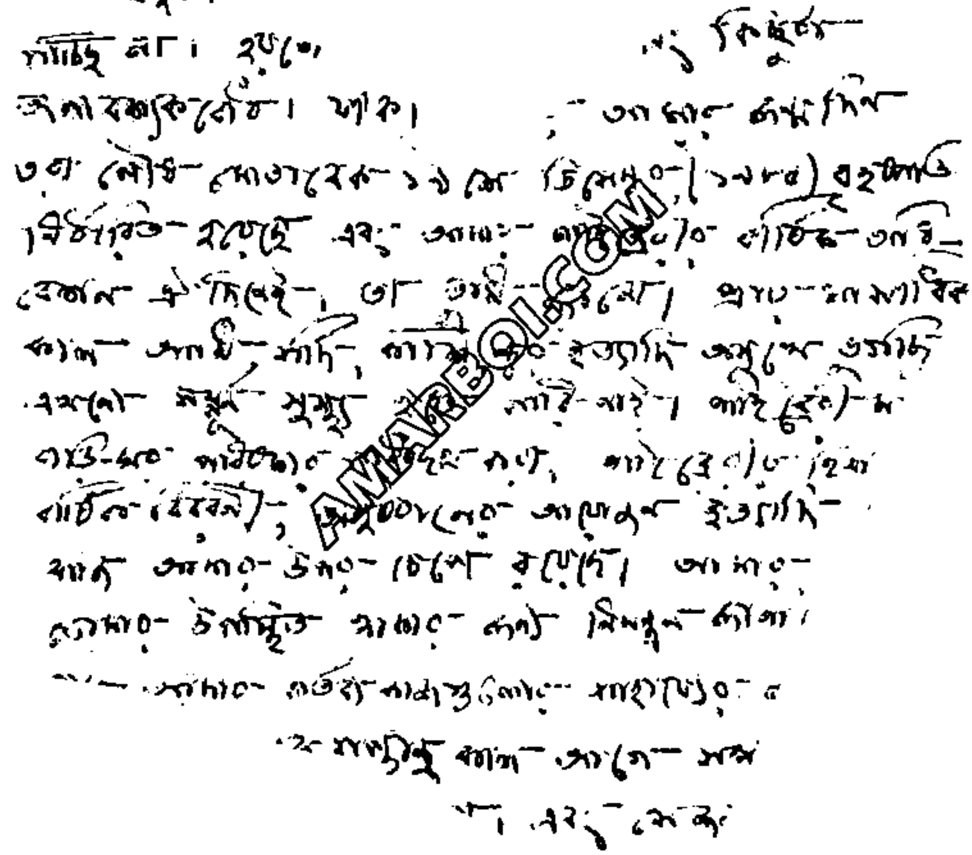

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবি প্রশ্ন

[সত্যের সন্ধানে]

AMARBOI.COM

অপ্রকাশিত

রচনাকাল ১. ৭. ১৩৭৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবি প্রশ্ন

১. ঈশ্বর 'দয়াময়' কি সকলের?

২. মৃত ব্যক্তির পাপ-পুণ্য কি?

৩. স্বর্গ—নরক কিসের তৈয়ারী?

৪. সূর্য চলে কোন্ পথে?

৫. উপাসনায় দিগ্‌নির্ণয় কেন? (বর্ধিত)

৬. গুপ্ত প্রচারের কারণ কি?

৭. ধর্মের সন্ধান কেন?

৮. ইহারা কোথায়?

ক. হারুৎ-মারুৎ।

খ. ইয়াজুজ-মাজুজ।

গ. খোয়াজ-খেজের।

ঘ. আবাবিল পাখী, না চাতক পাখী?

৯. বিশ্ব-জীবের আত্মার স্বাতন্ত্র্য কি?

১০. আল্লাহর প্রিয়তর কে?
(মুসা না মোহাম্মদ?)

১১. শয়তানের পরকাল কিরূপ?

১২. নারীর লুজ্জায় নিষেধ কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাবুঝের প্রশ্ন

[সত্যের সন্ধান]

অপ্রকাশিত

AMARBOI.COM

ভূমিকা ও ব্যাখ্যাবিহীন প্রশ্ন

সংকলন ১৬. ১. ১৩৫৮ — ২৯. ৫. ১৩৫৯ বাং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না বুঝের প্রশ্ন

১. আধ্যাত্মিক

১. আমি কে?
২. প্রাণ কি?
৩. প্রাণের সঙ্গে শরীরের ও মনের সম্বন্ধ কি?
৪. মন ও প্রাণ কি এক?
৫. আত্মা কিভাবে, কখন দেহে প্রবেশ করে?
৬. বিভিন্ন জীবের আত্মা কি বিভিন্নরূপ?
৭. 'আমি' কি মরিব?
৮. মন কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত?
৯. মন কি স্বাধীন?
১০. অশরীরী আত্মা কি জ্ঞানবিশিষ্ট?
১১. পাপের জন্য দায়ী . . . . ?

২. ঐশ্বরিক

১. আল্লাহর রূপ কি?
২. স্রষ্টা কি সৃষ্টি হইতে ভিন্ন?
৩. খোদা কি মনুষ্যভাবাপন্ন? কেন তাঁহাকে ধর্মযাজকগণ পার্থিব মানুষের ও তাদের কার্যকলাপের সাথে তুলনা করিয়া জনসাধারণকে বুঝ দেওয়ার প্রয়াস পান?
৪. নিরাকারের সাথে নিরাকারের পার্থক্য কি? আত্মাও নিরাকার এবং খোদাও নিরাকার। তাই আত্মা ও খোদাতে তফাৎ কি?
৫. ঈশ্বর কি স্বেচ্ছাচারী না নিয়মতান্ত্রিক?
৬. খোদার অনিচ্ছায় কোন ঘটনা ঘটিতে পারে কি?

লেখা ঝাপসা, পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. খোদা কি ন্যায়বান না দয়ালু?

৮. নিরাকার পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় কিভাবে?

৯. পাপ-পুণ্যের ডায়রী কেন?

১০. মানব ও বিভিন্ন জীব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

১১. আল্লাহর দূত জেব্রাইল তাঁহার আদেশানুসারে পয়গম্বরদের কাছে 'অহি' লইয়া আসিত ও তাহা নাজেল করিয়া চলিয়া যাইত। যাওয়া-আসা শব্দ দুইটি গতিবাচক। আবার গতির প্রথম ও শেষ স্থানের মধ্যে দূরত্ব থাকিতে বাধ্য। আল্লাহ নিশ্চয়ই পয়গম্বরদের নিকট হইতে দূরে ছিলেন না। তবে জেব্রাইলের যাতায়াত কি দূরত্বহীন?

১২. আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। মাত্র তাঁহার ইচ্ছাশক্তিতেই বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা ঘটিতে পারে। তবে ফেরেস্তার আবশ্যক কি?

১৩. স্বর্গ-নরকের সুখ-দুঃখ বা . . . . . . কি শারীরিক না আধ্যাত্মিক?

১৪. বেহেস্ত ও দোজখের মধ্যে পার্থক্য কি?

১৫. বেহেস্তে কি দিন-রাত্রি থাকিবে? যদি দিন থাকে তবে উহা কিসের দ্বারা আলোকিত?

১৬. আল্লাহ মানুষের মন পরিবর্তন না করিয়া হেদায়েতের ঝক্কাট পোহান কেন?

১৭. ভাগ্যলিপি কি পরিবর্তনীয়?

১৮. বলির পশুর আত্মোৎসর্গ না মাংসোৎসর্গ? মাংস ত আহার করি এবং আত্মা ত ঐশ্বরিক দান। উৎসর্গ করা হইল কি?

১৯. উপাসনার সময় নির্দিষ্ট কেন?

২০. প্রাতঃ, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নে উপাসনা নিষিদ্ধ কেন? পৃথিবী আবর্তনের ফলে যে কোন স্থির মুহূর্তে বিভিন্ন দ্রাঘিমার উপর বিভিন্ন সময় সূচিত হয় এবং প্রতি মুহূর্তেই কোন না কোন স্থানে নির্দেশিত উপাসনা চলিতে থাকে। নিষিদ্ধ সময়ের তাৎপর্য কি?

২১. ফেরেস্তার শরীরের উপাদান কি?

২২. আদমের পাপ কি?

২৩. মে'রাজ সত্য না স্বপ্ন?

২৪. 'নাপাক' বস্তু কি আল্লাহর কাছেও 'নাপাক'?

২৫. নিরাকার-উপাসনায় কেবলার আবশ্যক কি?

২৬. মক্কার হরমের শিবমূর্তিটি কি সজীব? যদি না-ই হয় তবে শুধু পাথরকে হিংসা করার কারণ কি?

২৭. হাত তুলিয়া মোনাজাত কেন? বেহেস্ত পাইবার উপায় কি? রছুলের পায়রবী, খোদার বন্দেগী, খোদার দয়া, রোজে আজল বা তকদীর — এর কোন প্রকারে বেহেস্ত লাভ হইবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. প্রাকৃতিক

১. পদার্থশূন্য স্থান আছে কি?

২. অপরিবর্তনীয় কি?

৩. মানুষ ও পশুতে সাদৃশ্য কেন?

৪. আকাশ কি?

৫. দিবা-রাত্রির কারণ কি?

৬. পৃথিবীর নীচে কি আছে?

৭. ভূমিকম্পের কারণ কি?

৭ক. বজ্রপাত হয় কেন?

৮. রাত্রে সূর্য কোথায় থাকে?

৯. ঋতুভেদের কারণ কি?

১০. জোয়ার-ভাটা হয় কেন?

১১. মেরু অঞ্চলে নামাজ-রোজার উপায় কি?

১২. প্রতি ঘন্টায় ১০৪১$\frac{২}{৩}$ মাইল বেগে পশ্চিম দিকে বিমান চালাইলে আরোহীগণের রোজা-নামাজের উপায় কি?

৪. ঐতিহাসিক

১. আদম কি আদি মানব? তবে জীবতাত্ত্বিকদের বিবর্তনবাদ কি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক?

২. নূহ নবীর সময়ের মহাপ্লাবন কি পৃথিবীর সর্বত্র হইয়াছিল? পৃথিবীর কোন এক স্থানে মহাপ্লাবন হইলে সেখান হইতে পূর্ব বা পশ্চিমে ৮০° দ্রাঘিমাংশে প্লাবন ঘটা অসম্ভব। তবে নূহ নবীর বেলায় সম্ভব হইল কিরূপে?

৩. শোনা যায়, ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপিত হইয়াও দগ্ধ হন নাই। তখন কি প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া অগ্নির দাহিকাশক্তি লোপ পাইয়াছিল, না ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অক্সিজেনের অভাবে উহার কিয়দংশের দহন রহিত হইয়াছিল?

৪. হজরত মুসার আসার আঘাতে নীল নদীতে জলের স্বাভাবিক ধর্ম কি নষ্ট হইয়াছিল, না ঘটনার দিনের পূর্ব রাত্রিতে পূর্ব দিক হইতে প্রবল ঝড়ের ফলে নীল নদীর মোহনার জল শুকাইয়াছিল?

৫. বিবিধ

১. সৃষ্টির পূর্বে ছিল কি?

২. বিশ্বের উপাদান কি?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. কারণবিহীন কর্ম কি সম্ভব?
৪. অলৌকিক ঘটনা কি বর্তমানেও ঘটে?
৫. অন্ধ, খঞ্জ, বধির, রুগ্ন ও চিরদরিদ্র হয় কেন?
৬. নাবুঝের পাপ কি?
৭. সত্যের রূপান্তর আছে কি?
৮. নাপাক কি ......?
৯. মলদ্বার দিয়া বদবায়ু নির্গত হইলে শৌচ না করিয়া শুধু ওজু করার কারণ কি?
১০. কতগুলি খাদ্য হারাম হইল কেন?
১১. দোয়ার কি ক্রিয়া আছে?
১২. জীবকুল চায় কি?
১৩. ধর্ম কি যুক্তিবিরোধী?
১৪. নীতি কি ধর্মবিরোধী?
১৫. ত্যাজ্যা স্ত্রী পুনঃ গ্রহণে হিলা প্রথার তাৎপর্য কি?
১৬. ইসলামের সাথে পৌত্তলিকতার সাদৃশ্য কেন?
১৭. জ্বিন জাতি কোথায়?
১৮. দার্শনিকের দোষ কি? যুক্তিপূর্ণ কথা বলাই কি দূষণীয়?
১৯. বিজ্ঞান কি মিথ্যা?
২০. ধর্মের সঙ্গে দর্শন ও বিজ্ঞানের কলহ কেন?
২১. শয়তান কি?
২২. এক নেকি কতটুকু?
২৩. পাপের কি ওজন আছে?
২৪. সূর্যবিহীন দিন কিরূপ?
২৫. ইহলোকে ও পরলোকে সাদৃশ্য কেন?
২৬. আরবের বৈশিষ্ট্য কি?
২৭. চন্দ্র একটি না বারোটি?
২৮. সাত বারের মহত্ত্ব কি?
২৯. সোলায়মানের হেকমত না কেরামত?

অন্ধ বিশ্বাস দূর হোক
সত্য ধর্মের জয় হোক।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুকিটাকি

অপ্রকাশিত

AMARBOI.COM

রচনাকাল ১৮. ২. ১৩৮১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মরণিকা

অত্র তালিকায় লিখিত বাজী তৈয়ারের ব্যবস্থাসমূহ জনৈক চীনা আতস্‌করের ব্যবস্থা। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে জনৈক চীনা আতস্‌কর বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন এবং বাখরগঞ্জ ভ্রমণের সময় বরিশালের তৎকালিক ইউরোপীয় জমিদার মি. ব্রাউনের কুটিরে কিছুদিন অবস্থান করেন (মি. ব্রাউনকে এদেশের লোকে বরান সাইব বলিত)। এই সময় মহিউদ্দিন খানসামা নামে মি. ব্রাউনের একজন বাঙ্গালী বাবুর্চি ছিলেন। তিনি চীনা আতস্‌করের নিকট কয়েক প্রকার বাজী তৈয়ার শিখিয়া রাখেন এবং তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করেন মকরম প্রতাপ নিবাসী যোগেশচন্দ্র দাস। আমি ১৩৫৬ সালের ১০ চৈত্র দাস মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার নিকট হইতে অত্র তালিকায় লিখিত ১—১০ নং দফে পর্যন্ত বাজী তৈয়ারের ব্যবস্থা লিখিয়া লই। কিন্তু এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি কখনও বাজী তৈয়ার করি নাই। তাহার কারণ এই যে, স্থানীয় ভুলু ডাক্তারের সহযোগিতায় একদা বোমা তৈয়ার পরীক্ষাকালীন আকস্মিক বিপদে পড়ায় সেই দিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, জীবনে আর কখনও স্বহস্তে বাজী তৈয়ার করিব না।

১১—১৪ নং দফের লিখিত 'অগ্নি উৎপাদক' ব্যবস্থাসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছি বিগত ৯. ১১. ৫০ (ইং) তারিখে প্রকাশিত 'আনন্দবাজার' পত্রিকায়।

কোন অভিজ্ঞ আতস্‌করের সহযোগিতা ছাড়া কোন ব্যক্তির বাজী তৈয়ারে হাত না দেওয়াই ভাল। বিশেষত বোমাদি মারাত্মক বাজী তৈয়ারে হাত দেওয়া গুরুতর অন্যায়।

আরজ আলী মাতুব্বর

লামচরি, ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজী তৈয়ারের ব্যবস্থা

উপকরণ	পরিমাণ সের	পরিমাণ তোলা
শোরা	১	
গন্ধক		১০
কয়লা (কেদম)		২০
পটাশ ক্লোরাস	১	
গন্ধক		১০
কয়লা (বড়ই)		২০
শোরা		
গন্ধক		২৫
কয়লা (বড়ই)		১২॥
লোহা চূর্ণ		২০
শোরা	১	
গন্ধক		৪০
মনশীলা		২০
অথবা		
বাহ্যরী		২০
পটাশ ক্লোরাস	১	
গন্ধক		৪০
স্ট্যানসিয়া		২০
পটাশ ক্লোরাস	১	
গন্ধক		৪০
তুঁতিয়া		২০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ল্যাল মাতাম	বেরাটিয়া	১		
	পটাশ ক্লোরাস		২০	
	ভূষা কালি		১০	
হাওইর বোম	পটাশ ক্লোরাস		২০	
	মনশীলা		২২	
চকরী	শোরা	১		
	গন্ধক		১৫	
	কয়লা (বড়ই)		১৫	
	লোহা চূর্ণ		২০	
বন্দুকের বারুদ	শোরা		১৫	
	অঙ্গার		৩	
	গন্ধক		২	
অগ্নি উৎপাদক	পটাশ ক্লোরাস		১	
	চিনি		১	
	সালফিউরিক এসিড		১	
অগ্নি উৎপাদক	আইওডিন		১	
	এ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ		১	
	জল			১ ফোঁটা
অগ্নি উৎপাদক	সোডিয়াম		১	
	পটাশিয়াম		১	
	জল		১	
অগ্নি উৎপাদক	কাগজের মোড়কে সোডিয়াম রাখিয়া মোড়কের গায়ে আস্তে আস্তে জল ঢালিতে হয়।			

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার জীবন দর্শন

অপ্রকাশিত

AMARBOI.COM

রচনাকাল ১২. ৭. ১৩৯১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার জীবন দর্শন

AMARBOI.COM

সূচী

প্রস্তাবনা

জগত সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা

জীবন সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা

সমাজ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তাবনা

শৈশবে দেখতে পেয়েছি যে, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সবদিকেই গ্রামগুলোর ওধারে আকাশ যেনো মাটির সাথে মিশে গেছে। তখন মনে হয়েছে যে, আকাশ আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নয়। হয়তো গ্রামের ওধারে গেলেই আকাশটাকে ধরা যাবে। তখন বড়োদের কাছে জানতে চেয়েছি আকাশ কি, গ্রামের ওধারে গেলে আকাশটাকে ধরা যায় কি-না, আকাশের উপরে ও মাটির নীচে কি আছে ইত্যাদি বিষয়গুলো এবং মুরুব্বিদের কাছে ওসবের জবাবও পেয়েছি। তাঁরা বলেছেন যে, আকাশ সাতটি। প্রথমটি জলের, দ্বিতীয়টি লৌহের, তৃতীয়টি তাম্রের, চতুর্থটি স্বর্ণের ইত্যাদি। তাঁরা আরো বলেছেন যে, পৃথিবীর উপরে ওগুলো স্থাপিত আছে উপুড় করা ডিশের মতো এবং ওগুলোর গায়ে লটকানো আছে চন্দ্র, সূর্য ও তারকারা মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য। তাঁরা আরও বলেছেন যে, পৃথিবী থেকে প্রথম আকাশ ও তৎপরে প্রত্যেক আকাশ থেকে প্রত্যেক আকাশ পাঁচশত বছরের পথ দূরে দূরে অবস্থিত আছে। পৃথিবীটা থালার মতো গোল এবং এর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দূরত্ব (মাশরেক-মাগরেব) পাঁচশ' বছরের পথ। আর পৃথিবীর নীচে আছে মস্তবড়ো একটা গরু ও তার শিং-এর উপরে অবস্থিত এই পৃথিবী ইত্যাদি। নিঃসঙ্কোচে তখন উক্ত কথাগুলো বিশ্বাস করেছি। কিন্তু তা হজম করতে পারিনি, ভুগেছি অজীর্ণ রোগে।

জীবনের প্রথম স্তরের চিন্তা-চেতনা সম্বন্ধে মুরুব্বিদের দেয়া ঐ সমস্ত সমাধানে বিশেষভাবে দ্বন্দ্ব জেগেছে আমার যৌবনে এবং তখন মনে জেগেছে বিবিধ প্রশ্ন। সে সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ সমাধান আমার মুরুব্বিরা তথা পুরানপন্থীরা প্রদান করতে পারেননি।

জাগতিক নানা বিষয়ের বাস্তবভিত্তিক খুঁটিনাটি তথ্য জানার আগ্রহ আমার প্রবল থাকলেও তা জানার কোনো উপায় ছিলোনা। কেননা আধুনিক শিক্ষার কোনো সুযোগ মেলেনি আমার শৈশবে, মাত্র বাংলা বর্ণবোধ ছাড়া। যৌবনে কৃষিকাজের ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের পুঁথিপাঠকদের সাথে পুঁথি পড়ে পড়ে আমাকে বাংলা ভাষা পড়বার ক্ষমতা অর্জন করতে হয় এবং তাতে প্রায় পাঁচ বছর কেটে যায়। পুঁথি সাহিত্যের অনেক আজগুবী কেচ্ছা-কাহিনীও আমাকে চমৎকৃত করে এবং ওগুলোর যাথার্থ্য সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জাগে। ২৫-৩০ বছর বয়সের সময় বাংলা ভাষা স্বচ্ছন্দে পড়বার ক্ষমতা অর্জিত হলে আমি স্থানীয় যুবকদের, যারা তখন শহরের স্কুল-কলেজে পড়তো, তাদের পুরোনো পাঠ্যবই এনে পড়তে শুরু করি।

কেন তা জানি না, তখন অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্য ও প্রবন্ধগুলোই আমার মনকে আকর্ষণ করতো সবচেয়ে বেশী। তবে ভূগোল, ইতিহাস, ভ্রমণ, জীবনী ইত্যাদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়গুলোও আমার কম প্রিয় ছিলো না। এ যাবৎ যে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা আমাকে প্রশ্নমুখী করে রেখেছিলো, তার অনেকগুলো প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান প্রাপ্ত হই আমি এ সময়ে স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইগুলোতে। তার মধ্যে কতিপয় প্রশ্ন ও সমাধান এখানে উল্লেখ করছি।

১. আকাশ কি ? — মুরুব্বীদের নিকট এতোকাল শুনে এসেছি যে, **আকাশ সাতটি এবং তা কোনো না কোনো পদার্থের তৈরী।** আরও শুনেছি যে, ছাতে লটকানো আলোর মতো চন্দ্র, সূর্য ও তারকারা আকাশে লটকানো আছে। কিন্তু এ সময় জানতে পেলাম যে, 'আকাশ' কোনো পদার্থ নয়, তা হচ্ছে নিছক শূন্যস্থান। আর 'শূন্যস্থান'-এর কোনো স্তরভেদ বা সংখ্যা থাকতে পারে না।

২. দিন ও রাতের কারণ কি ? — মুরুব্বীদের কাছে শোনা যেতো যে, **একখানা সোনার নৌকায় সূর্যকে রেখে স্বর্গদূতেরা টেনে নেয় পূর্ব থেকে অস্তাচলে।** সূর্য সেখানে সারারাত ঈশ্বরের আরাধনায় মগ্ন থাকে এবং ভোরের দিকে স্বর্গদূতেরা পুনঃ নৌকাসমেত সূর্যকে টেনে নিয়ে পূর্ববৎ উদয় ও অস্ত ঘটায়। কিন্তু আমি এ সময় জানতে পারি যে, দিন ও রাত হয় পৃথিবীর আবর্তনে অর্থাৎ আহ্নিক গতির ফলে।

৩. পৃথিবী কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত ? — বলা হতো যে, **পৃথিবী একটি বলদের শৃঙ্গের উপর অবস্থিত, কেউ বলতেন জলের উপর অবস্থিত, আবার কেউ বলতেন মাছের উপর অবস্থিত** ইত্যাদি। কিন্তু এ সময় জানতে পেলাম যে, পৃথিবী অবস্থিত শূন্যের উপর, এর কোনো অবলম্বন নেই একমাত্র সূর্যের আকর্ষণ ছাড়া। পৃথিবী সূর্যের আকর্ষণে বাঁধা থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে প্রায় গোলাকার কক্ষপথে ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে এবং নিজে ২৪ ঘন্টায় একবার ঘুরপাক খাচ্ছে। পৃথিবীর স্বীয় আবর্তনে দিন-রাত হয় এবং কক্ষাবর্তনে হয় বছর।

৪. ভূমিকম্প হয় কেন ? — ছেলেবেলায় শুনেছি যে, **পৃথিবীর ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পৃথিবীধারী বলদের শৃঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টার ফলে ভূমিকম্প হয়।** কিন্তু এখন জানতে পেলাম যে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূগর্ভস্থ অতিশয় উষ্ণ গলিত পদার্থের হঠাৎ শীতল স্পর্শে বাষ্পীয় রূপ ধারণে তা বিস্ফোরণের চেষ্টা বা অকস্মাৎ ভূস্তর ধ্বসে যাওয়া ইত্যাদি কারণে ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

৫. বজ্রপাত হয় কেন ? — এ প্রশ্নটির জবাবে মুরুব্বিরা বলতেন যে, **স্বর্গবাসী ফেরেস্তারা সময় সময় শয়তানের গায়ে তীর ছোঁড়ে, তাকেই 'বজ্রপাত' বলা হয়।** এখন জানা যাচ্ছে যে, আকাশে মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হলে তন্নিম্ন ভূমিতে আরেক দফা বিদ্যুৎ আপনিই সৃষ্টি হয় এবং তাকে আবিষ্ট বিদ্যুৎ বলে। মেঘস্থিত বিদ্যুৎ ও মাটিস্থ আবিষ্ট বিদ্যুৎ একে অন্যকে আকর্ষণ করতে থাকে। এমতাবস্থায় আকাশের বিদ্যুতের চেয়ে মাটিস্থ আবিষ্ট বিদ্যুতের আকর্ষণশক্তি বেশী হলে তা মেঘের বিদ্যুৎকে টেনে ভূপাতিত করে এবং তাকেই 'বজ্রপাত' বলে। বিদ্যুৎ পতনের তীব্র গতির পথে যে সকল বায়বীয় পদার্থ ও ধূলিকণা থাকে, তা জ্বলে তীব্র আলোর সৃষ্টি হয় এবং বায়ুর ঘর্ষণে হয় শব্দ।

৬. শীত-গ্রীষ্ম হয় কেন ? — মুরুব্বিরা বলতেন যে, **নরকের দ্বার যখন বন্ধ থাকে, তখন শীত ঋতু হয় এবং যখন খোলা থাকে, তখন হয় গ্রীষ্ম ঋতু।** কিন্তু এ সময় জানতে পেলাম যে, সূর্যকে কেন্দ্র করে এক বর্তুলাকার কক্ষে ঈষৎ হেলান অবস্থায় (২৩$\frac{১}{২}$ ডি.) থেকে পৃথিবী বারো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাসে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এতে সূর্যরশ্মি পৃথিবীর উপর কখনো খাড়াভাবে এবং কখনো তেরছাভাবে পড়ে। যখন খাড়াভাবে পড়ে, তখন গ্রীষ্ম ঋতু হয় এবং যখন তেরছাভাবে পড়ে, তখন হয় শীত ঋতু।

৭. জোয়ার-ভাটা হয় কেন ? — এ প্রশ্নটির জবাবে মুরুব্বিরা বলতেন যে, পৃথিবীধারী বলদ যখন শ্বাসত্যাগ করে, তখন জোয়ার হয় এবং যখন শ্বাস টেনে নেয়, তখন হয় ভাটা। কিন্তু এ সময় জানতে পেলাম যে, জোয়ার-ভাটার একমাত্র কারণ হচ্ছে চন্দ্রের আকর্ষণ। পৃথিবীর যে কোনো স্থানে হোক, চন্দ্র যখন মধ্য আকাশে থাকে, তখন সেখানে জোয়ার হয় এবং দিগন্তে থাকলে তখন হয় সেখানে ভাটা।

৮. পৃথিবীর আকার কি ও আয়তন কত ? — এ প্রশ্নটির জবাবে মুরুব্বিগণ বলতেন যে, পৃথিবীর আকার থালার মতো গোল এবং তার চতুর্দিক 'কোহেক্কাফ' নামে এক পর্বতে ঘেরা। তার বহির্ভাগে কি আছে, কোনো মানুষ তা জানে না। কিন্তু এ সময় জানতে পেলাম যে, পৃথিবী গোল বটে, তবে থালার মতো গোল নয়, ফুটবলের মতো গোল (উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা)। গোলত্ব হেতু পৃথিবীর কোনো সীমান্ত নেই এবং কোহেক্কাফ বা 'সীমান্ত পর্বত' বলে কোনো পর্বত নেই। বলা হতো যে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। বোধহয় যে, হিসাবটি হাঁটাপথের। কিন্তু এ সময় জানতে পেলাম যে, পৃথিবীর পরিধি মাত্র পঁচিশ হাজার মাইল। আধুনিক যুগের জল, স্থল ও হাওয়াই যানে ভ্রমণের কথা বাদ দিলেও, সাগর পাহাড়ের বাধা না থাকলে এ দূরত্ব অতিক্রম করতে একজন লোকের (দৈনিক ২০ মাইল করে হেঁটে) সময় লাগে কিঞ্চিতাধিক ৩ বছর মাত্র।

AMARBOI.COM

আশৈশব প্রবল ছিলো আমার অজানাকে জানার স্পৃহা। তাই আমার মুরুব্বিদের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করেছি। কিন্তু জবাব যা পেয়েছি, তা মনঃপূত হয়নি। আধুনিক শিক্ষার্থিদের পুস্তকাদি পাঠ করে উপরোক্তরূপ কতিপয় বিষয়ের মনঃপূত সমাধান পেয়ে আমার পুস্তকপাঠের স্পৃহা আরও বেড়ে যায়। কিন্তু আর্থিক অভাবের দরুন যথেচ্ছ পুস্তকাদি খরিদ করতে না পেরে বরিশালের পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্য হয়ে সেখানে পুস্তকাদি পাঠ শুরু করি আমি ১৩৪৪ (বাং) সাল থেকে।

আমার বাসস্থান (লামচরি গ্রাম) থেকে বরিশাল শহরের দূরত্ব প্রায় সাত মাইল। কোনোরূপ যানবাহন বা রাস্তা না থাকায় এক একখানা পুস্তক পড়বার জন্য আমাকে পথ হাঁটতে হয়েছে প্রায় চোদ্দ মাইল। তথাপি যথাসম্ভব পুস্তকাদি আদান-প্রদান ও অধ্যয়ন করেছি। লাইব্রেরীর সকল বিভাগের বই আমি সমভাবে অধ্যয়ন করিনি। গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সামান্যই পড়েছি এবং বিশেষভাবে পড়েছি ভূগোল, ইতিহাস, ভ্রমণ, জীবনী, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ের বই। কিন্তু সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ ছিলো আমার বিজ্ঞান ও দর্শনে। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার বই ওখানে যতো পেয়েছি, তা পড়বার চেষ্টা করেছি।

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের দর্শন বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেবের সহায়তায় উক্ত কলেজ লাইব্রেরীর দর্শন ও বিজ্ঞানের বহু পুস্তক-পুস্তিকা অধ্যয়নের সুযোগ আমি লাভ করেছি এবং আমার বহু তৃষ্ণা মিটাচ্ছেন তিনি তাঁর বাচনিক জ্ঞানদানের মাধ্যমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান ইত্যাদি জাতিসমূহের ধর্মতত্ত্ব জানার আগ্রহ নিয়ে বরিশালের শংকর লাইব্রেরী ও ব্যাপ্টিস্ট মিশন লাইব্রেরীর কিছু কিছু পুস্তক অধ্যয়ন করেছি এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে তত্ত্বালোচনায় সাহায্য নিয়েছি আমার পরিচিত কতিপয় বিশিষ্ট আলেমের।

উপরোক্তরূপে বিবিধ চেষ্টার ফলে এযাবত জগত, জীবন, সমাজ, দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মেছে, এখন আমি স্থূলভাবে তার কিছু আলোচনা করবো — প্রথমত জগত ও ক্রমে অন্য ক'টি সম্বন্ধে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা

সনাতন ধর্মীয় মতে — পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে বৃহত্তম বস্তুপিণ্ড। বস্তুত সাধারণ বা স্থূল দৃষ্টিতে তা-ই মনে হয়ে থাকে। মূলত পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত নয় এবং পার্থিব জগতের বৃহত্তম বস্তুপিণ্ডও নয়।

কোনো স্থানের কেন্দ্রবিন্দু স্থির করতে হলে তার পরিধি জানা আবশ্যক। 'পরিধি' নির্ধারণ না করে 'কেন্দ্র' নির্ধারণ করা অসম্ভব। ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বের পরিধি নির্ধারণ না করেই পৃথিবীকে বিশ্বের 'কেন্দ্র' বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় ৯৩০ লক্ষ মাইল দূরে থেকে এক গোলাকার (দুইদিকে ঈষৎ চাপা) কক্ষপথে ভ্রমণ করছে এবং প্রায় একই সমতলে থেকে কম-বেশী দূরে থেকে আরো ....টি গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। গ্রহদের এই আবর্তনক্ষেত্রকে বলা হয় সৌরজগত। সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত আছে সূর্য এবং সীমান্তে আছে .... গ্রহ। পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্রেও নয় এবং সীমান্তেও নয়। অধিকন্তু সৌরজগতে পৃথিবীর আয়তনও উল্লেখযোগ্য নয়। নেপচুন গ্রহটি পৃথিবী থেকে আয়তনে ৬০ গুণ বড়, শনি গ্রহটি বড় ৭৩৪ গুণ। বৃহস্পতি বড় ১৩১২ গুণ এবং আয়তনে সূর্য পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড়।

সৌরজগতের বাইরে যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, তাদের দূরত্ব এতো বেশী যে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে হলে মাইল বা ক্রোশে কুলোয় না। তাই তা হিসাব করতে হয় আলোক বছরে। প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬ হাজার মাইল বেগে চলে আলো এক বছরে যতোটা পথ অতিক্রম করতে পারে, তাকে বলা হয় এক আলোক বছর। সৌরজগতের বাইরের যে কোনা জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নির্ণয় করতে হলে 'আলোক বছর' ব্যবহার করতে হয়। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ৯৩০ লক্ষ মাইল এবং সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌছুতে সময় লাগে প্রায় ৮ মিনিট। কিন্তু মহাকাশে কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে কাছে যে নক্ষত্রটি আছে, তার আলো পৃথিবীতে আসতেও সময় লাগে প্রায় ৪ বছর। মহাকাশে ৪ আলোক বছরের কম দূরত্বে কোনো দিকে কোনো নক্ষত্র নেই।

এ পর্যন্ত মহাকাশে প্রায় ১০,০০০ কোটি নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। উক্তরূপ দূরে দূরে থেকে ঐ সমস্ত নক্ষত্র যে বিশাল স্থান জুড়ে আছে, তাকে বলা হয় 'নক্ষত্রজগত'। নক্ষত্ররা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলেই এক একটা সূর্য, কোনো কোনোটি মহাসূর্যও বটে। মহাকাশে এমন নক্ষত্রও আছে, যারা আমাদের সূর্য অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ বড়।

আমাদের সূর্য যে নক্ষত্রজগতে অবস্থিত আছে, সেই নক্ষত্রজগতটা আবর্তিত হচ্ছে। আমাদের সৌরজগতটা এই নক্ষত্রজগতের কেন্দ্র হতে প্রায় ৩০ হাজার আলোক বছর দূরে থেকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৭৫ মাইল বেগে নক্ষত্রজগতের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে। একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে প্রায় ২২$\frac{১}{২}$ কোটি বছর। আমাদের এই সৌরজগতটাও নক্ষত্রজগতের কেন্দ্রে নয়।

নক্ষত্রজগতকে সুদূর হতে দেখলে তার নক্ষত্রগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায় না, সমস্ত নক্ষত্র মিলে একটা ঝাপ্‌সা আলো বা মেঘের মতো দেখায়। ঐরূপ মেঘকে 'নীহারিকা' বলা হয় (এ ভিন্ন আর এক জাতের নীহারিকা আছে, তারা শুধু বাষ্পময়)। এ পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটি নীহারিকা বা নক্ষত্রজগতের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং সবগুলো নীহারিকা মিলে যে পরিমাণ স্থান জুড়ে আছে, তাকে বলা হয় নীহারিকাজগত বা বিশ্ব। আমাদের নক্ষত্রজগত বা নীহারিকাজগতটাও যে বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত, এমন কথাও বলা চলে না। এই বিশ্ব এতোই বিশাল যে, এর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের দূরত্ব প্রায় ৪,০০০ কোটি আলোক বছর।

বিশ্বের আয়তনের বিশালতা আমরা শুধু কথায় ও লেখায়ই প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু ধারণায় আনতে পারি না। এই কল্পনাতীত বিশ্ব এমনই বিশাল যে, জীবসমাকুল পৃথিবী, গ্রহসমাকুল সৌরজগত, এমন কি সৌরসমাকুল নক্ষত্রজগত পর্যন্ত এর মধ্যে হারিয়ে যায়। অর্থাৎ বিশ্বে এমনও স্থান আছে, যেখান থেকে চাইলে আমাদের পৃথিবী, সূর্য, এমনকি নক্ষত্রজগতও অদৃশ্য হয়ে পড়ে।

AMARBOI.COM

আমরা যে নক্ষত্রজগতে বাস করছি, এই নক্ষত্রজগতটির আকৃতি গোল অথচ চ্যাপটা, কতকটা ডাক্তারদের 'ট্যাবলেট'-এর মতো। আমাদের পৃথিবীটাও গোল, তবে উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। অর্থাৎ এর বিষুবীয় অঞ্চলের ব্যাস ৭,৯২৬ মাইল ও মেরু অঞ্চলের ব্যাস ৭,৯০০ মাইল ; ব্যবধান ২৬ মাইল মাত্র। আর আমাদের নক্ষত্রজগতটার বড় ব্যাস ১২০ হাজার আলোক বছর এবং ছোটো ব্যাস ২০ হাজার আলোক বছর ; ব্যবধান ১ লক্ষ আলোক বছর।

প্রত্যেকটি নক্ষত্রজগত বা নীহারিকার মাঝখানের দূরত্ব লক্ষ লক্ষ আলোক বছর। যে কোনো দুইটি নীহারিকার মাঝখানে যে স্থান — সেখানে তাপ নেই, চাপ নেই, আলো নেই ; তা চির অন্ধকার, চিরশীতল, বিশাল মহাশূন্য বা ঈথর।

নীহারিকাগুলো পরস্পর দূরে সরে যাচ্ছে এবং নীহারিকা-বিশ্বটি ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে। আমাদের নক্ষত্রজগত থেকে যেই নীহারিকার দূরত্ব যতো বেশী, সেই নীহারিকার দূরে সরে যাওয়ার বেগও ততো বেশী। প্রতি এক লক্ষ আলোক বছর দূরত্ব বৃদ্ধিতে প্রতি সেকেণ্ডে ১০০ মাইল বেগ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে সব চেয়ে দূরের নীহারিকার দূরে সরে যাওয়ার বেগ আলোর বেগের $\frac{৯}{১০}$; অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৬৭,৪০০ মাইল।

নীহারিকাগুলো কতো যুগযুগান্ত হতে এইরূপ প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে, তার ইয়ত্তা নেই এবং কোনো কালেও যে তারা কোনো সীমান্তে পৌছুবে, আজ পর্যন্ত তারও কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও একটি কথা। আমরা যে পৃথিবীটায় আছি, তারই চতুষ্পার্শে যে নক্ষত্র নীহারিকাগুলো ভীড় জমিয়ে আছে, এরূপ মনে করবার কোনো কারণ নেই। হয়তো এই বিশ্বের অনুরূপ কোটি কোটি বিশ্ব নিয়ে 'মহাবিশ্ব' গঠিত হয়ে থাকবে। আবার কোটি কোটি মহাবিশ্ব নিয়ে 'পরমবিশ্ব', 'চরমবিশ্ব' ইত্যাদি অনন্ত বিশ্ব থাকা বিচিত্র নয়। তাই আমার মনে হয় যে, 'বিশ্ব অসীম'।

এ যাবৎ যে সমস্ত আলোচনা করা হলো, তা সমস্তই পার্থিব জগতের স্থিতি সম্বন্ধে, আদি ও অন্ত অর্থাৎ সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে নয়। সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমি আমার 'সৃষ্টি-রহস্য' নামক পুস্তকখানাতে। তাই এখানে আলোচনা বৃদ্ধি না করে সে বিষয়ে সামান্য আলোচনা করে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো।

মহাবিশ্বের যাবতীয় জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ সূর্য, নক্ষত্র, নীহারিকা ইত্যাদি সকলেই অতিশয় উষ্ণ পদার্থ এবং সকলেই নিয়ত তাপ বিকিরণ করছে। বিকিরিত তাপ বা আলো কখনো কেন্দ্রে ফিরে যায় না। জ্যোতিষ্কপুঞ্জ হতে তাপ বিকিরণ হতে হতে এককালে এমন অবস্থা আসতে পারে, যখন মহাবিশ্বের কোথায়ও কোনো জ্যোতিষ্কের তাপের সঞ্চয় থাকবে না। হয়তো তখন ঘটবে বিশ্বজোড়া মহাপ্রলয়। কিন্তু ঐরূপ মহাপ্রলয় ঘটলে তা কতোকাল পরে ঘটবে, কেউ তার নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না।

উপরোক্ত মতে — বিশ্বের যাবতীয় নীহারিকা বা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতিটি নক্ষত্র বা সূর্য একদিন না একদিন নিভে যাবে। তখন বিশ্বের কোথায়ও উত্তাপ বা আলোকের নামগন্ধও থাকবে না, সর্বত্র বিরাজ করবে কল্পনাতীত শৈত্য ও অন্ধকার। সেই অন্ধকার ব্যোমসমুদ্রে ভাসতে থাকবে নক্ষত্র ও গ্রহাদির মৃতদেহগুলো।

শৈত্যে সঙ্কুচিত ও উত্তাপে প্রসারিত হওয়া বস্তুজগতের একটি সাধারণ নিয়ম। সেই কালান্তকালের মহাশৈত্যে তখনকার বস্তুপিণ্ডগুলো সম্ভবত অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হবে এবং তার ফলে বস্তুপিণ্ডের মধ্যে প্রবল চাপ সৃষ্টি হবে, যার ফলে পদার্থের পরমাণু ভেঙ্গে তা তেজ বা শক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

'শক্তি' কখনো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। তাই শক্তির সক্রিয়তার ফলে আবার শুরু হবে ধাপে ধাপে নতুন সৃষ্টির প্রবাহ। অর্থাৎ আবার সৃষ্টি হতে থাকবে ইলেক্ট্রন, প্রোটন, পরমাণু, নীহারিকা, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহাদি বস্তুসমূহ, অবশেষে প্রাণ ও প্রাণী। কালান্তে আবার প্রলয়, আবার সৃষ্টি, আবার প্রলয়। এভাবে অনাদিকাল থেকে চলছে ও চলবে 'সৃষ্টি' ও 'প্রলয়'-এর প্রবাহ। সুতরাং 'সৃষ্টি ও প্রলয়' একবার-দু'বার নয়, অসংখ্যবার। অর্থাৎ 'সৃষ্টি ও প্রলয়'-এর আরম্ভ বা শেষ কল্পনাতীত। কেননা এ প্রবাহ চক্রবৎ ঘুরছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা

‘জীবন’–এর সৃষ্টি ও স্থিতি সম্বন্ধে আমি আমার শৈশব ও কৈশোরে কোনোরূপ চিন্তাভাবনা করিনি এবং বিশেষভাবে করিনি যৌবনেও। পরিণত বয়সে এসে জানতে পেরেছি যে, আদিমানব আদমের দেহে ঈশ্বর নাকি প্রাণদান করেছিলেন ফুঁ দিয়ে। পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে লিখিত আছে — “আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুষ্যকে) নির্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন ; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল” (আদিপুস্তক ২; ৭)।

উপরোক্ত মতটি পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে, বায়ুই হচ্ছে প্রাণের উপাদান এবং তা আদমের দেহে প্রবেশ করানো হয়েছিলো ‘ফুৎকার’ প্রক্রিয়া দ্বারা। অর্থাৎ কতকটা ফুটবল পাম্প করবার মতো। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী যথা — পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ, জীবাণু ইত্যাদি প্রাণীরা প্রাণবন্ত হলো কিভাবে, ওতে তার কোনো হদিস মেলে না। ঈশ্বরের একটি মাত্র ফুঁয়ে জগতের যাবতীয় জীবের দেহে প্রাণসঞ্চার হতে পারেনি। কেননা বাইবেলীয় মতে, অন্যান্য প্রাণী ও আদম একই কালে সৃষ্ট হয়নি। সৃষ্টির ৫ম দিনে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন জলচর ও খেচর প্রাণী, ৬ষ্ঠ দিন সকাল বেলা পশু, সরীসৃপ ও ভূচর প্রাণী এবং আদমকে সৃষ্টি করেছেন বিকেলে। পক্ষান্তরে — **প্রত্যেকটি প্রাণীর দেহে প্রাণ সঞ্চারের জন্য ঈশ্বরকে যদি ভিন্ন ভিন্ন ফুঁ দিতে হয়, তবে তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কিছু থাকে কি?**

কেউ কেউ বলেন — আদিমানব আদম সৃষ্টির প্রাক্কালে তাঁর জীবনদান যেভাবেই হয়ে থাকুক না কেন, পরের বিধান হলো যে, রমণীদের গর্ভসঞ্চারের পর কোনো এক সময়ে জনৈক ফেরেস্তা প্রাণকে নিয়ে এসে ভ্রূণদেহে ভরে দিয়ে যায় এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এক বিশেষ ফেরেস্তা এসে প্রাণকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। **মানুষের জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরে ‘ইল্লিন’ ও ‘সিজ্জিন’ নামক স্থানে প্রাণ মজুত থাকে।**

‘প্রাণ’ কোনো পদার্থ নয়, তা হচ্ছে নিরাকার এক শক্তিবিশেষ। নিরাকারকে একস্থানে আবদ্ধ রাখা বা স্থানান্তর করা, অর্থাৎ আমদানী–রপ্তানী ও গুদামজাত করা সম্ভব হয় কিরূপে, তা আমার জ্ঞানের অতীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাণের উদ্ভব, স্থিতি ও চালচলন সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করায় আমার মনে কতগুলো প্রশ্নের উদয় হয়েছে ও হচ্ছে। তার কিছুসংখ্যক প্রশ্ন বিবৃত করেছি আমি আমার লিখিত 'সত্যের সন্ধান' নামক বইখানিতে। এখানে তার গুটিকতক প্রশ্ন সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি —

১. 'আমি' কে?
২. প্রাণ কি অরূপ না সরূপ?
৩. মন ও প্রাণ কি এক?
৪. প্রাণের সহিত দেহ ও মনের সম্পর্ক কি?
৫. প্রাণ চেনা যায় কি?
৬. 'আমি' কি স্বাধীন?
৭. অশরীরী আত্মার কি জ্ঞান থাকবে?
৮. 'প্রাণ' কিভাবে দেহে আসা-যাওয়া করে? ইত্যাদি।

উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর যথাযথ সমাধান না পেয়ে ধর্মরাজ্যের সীমানা পেরিয়ে আমার মন বিচরণ করতে থাকে বিজ্ঞান জগতের আনাচে-কানাচে।

বিশ্বব্যাপী বিরাজ করছে এক মহাশক্তি। সেই মহাশক্তিই আমাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে। যথা — তাপশক্তি, আলোকশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, চুম্বকশক্তি ইত্যাদি এবং সর্বোপরি প্রাণশক্তি। শক্তির সংহতিতে পদার্থ উৎপাদিত হয় এবং পদার্থ ধ্বংসের ফলে পুনঃ শক্তির উৎপত্তি হয়ে থাকে। অন্যান্য শক্তির ন্যায় 'প্রাণ' শক্তিটিও মহাশক্তির কোটি কোটি বছরের আবর্তন, বিবর্তন ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল।

শক্তি সংহত হয়ে 'পদার্থ' এবং পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে 'প্রাণ'-এর উৎপত্তি হয়ে থাকলেও তা হঠাৎ করে হয়নি, হয়েছে ধাপে ধাপে ও পর্যায়ক্রমে এবং কোটি কোটি বছর সময়ে। এখানে কয়েকটি বিশেষ ধাপের উল্লেখ করছি।

১ম ধাপ : ইলেক্ট্রন-প্রোটন বা শক্তিকণিকা

শক্তি কখনো নিষ্ক্রিয় থাকে না। যদি বলা হয়, 'কেন থাকে না?' ধরে লওয়া হয় যে, এটা হচ্ছে শক্তির চরিত্র বা ধর্ম। সক্রিয়তার ফলে শক্তি ঘনীভূত হয়ে উৎপন্ন হয় ইলেক্ট্রন-প্রোটনাদি শক্তিকণিকা। পদার্থ সৃষ্টির এটাই প্রাথমিক ধাপ। এরা পদার্থ এবং অপদার্থ, এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থার বস্তু। এরা সতত চঞ্চল ও গতিশীল।

২য় ধাপ : পরমাণু

উক্ত শক্তিকণিকাগুলো বিভিন্ন সংখ্যায় ও বিভিন্ন ধরণে জোট বাঁধার ফলে কালক্রমে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন রকম মৌলিক পদার্থের পরমাণু। এই পরমাণুরাই হচ্ছে পার্থিব জগত সৃষ্টির মৌলিক উপাদান।

৩য় ধাপ : অণু

পরমাণুগুলোর বিভিন্ন সংখ্যায় ও বিভিন্ন ভঙ্গিতে সংযুক্তির ফলে উৎপন্ন হয় বিভিন্ন জাতের অণু। এদের বলা হয় যৌগিক পদার্থ। যৌগিক পদার্থ দুই জাতের, যথা — জৈব ও অজৈব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জৈব ও অজৈব পদার্থের মধ্যে আসল পার্থক্য এই যে, জৈব পদার্থের প্রত্যেকটি অণুর কেন্দ্রে সবসময়ই থাকে একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু — 'কার্বন'। কোনো অজৈব পদার্থের অণুর কেন্দ্রে কখনো কার্বন থাকে না। কার্বনকে বাংলা ভাষায় বলা হয় অঙ্গার। যে কোনো জৈব পদার্থ পোড়ালে অঙ্গার পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো অজৈব পদার্থ পোড়ালে অঙ্গার পাওয়া যায় না। যেমন — কাঁচ, পাথর বা কোনো ধাতু পোড়ালে কিছুতেই অঙ্গার পাওয়া যাবে না। কেননা তাদের কোনো অণুর কেন্দ্রেই কার্বন বা অঙ্গার নেই।

জৈব পদার্থের মুখ্য উপাদান 'কার্বন' হলেও তার সাথে পদার্থভেদে মিশে থাকে — হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক, ফসফরাস এবং আরো অনেক পদার্থ। জৈব পদার্থের অণুর গর্ভে কার্বনের সঙ্গে এদের বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর বিভিন্ন ভঙ্গিতে মিলনের ফলে জন্ম হয় বিভিন্ন জাতীয় জৈব পদার্থের।

৪র্থ ধাপ ঃ প্রোটিন ও প্রোটোপ্ল্যাজম

পূর্বোক্তরূপে হাজার হাজার কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি পরমাণুর সুবিন্যস্ত সংযোগে ও লক্ষ লক্ষ বছর বিবর্তনের ফলে পৃথিবীর আদিম সমুদ্রের জলে জন্মেছিলো এক বিশেষ ধরণের জৈব পদার্থ, যার নাম 'প্রোটিন' এবং তা থেকে জন্ম নিয়েছিলো জীবদেহের মূল উপাদান 'প্রোটোপ্ল্যাজম'।

প্রকৃতির একমাত্র কাজ — পরিবর্তন বা রূপান্তর। একেই বিবর্তন বলা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে প্রাকৃতিক পরিবর্তনে সময়ের ব্যবধান যথেষ্ট। প্রকৃতি দুধকে 'দধি' ও তালের রসকে 'তাড়ি' করতে কয়েক ঘন্টা সময়ের মধ্যেই পারে। কিন্তু রেডিয়ামকে সীসায় পরিণত করতে তার সময় লাগে লাখ লাখ বছর। ঐরূপ কার্বনাদি জৈব পদার্থ হতে একদানা প্রোটোপ্ল্যাজম তৈরী করতে প্রকৃতির সময় লেগেছে প্রায় একশত কোটি বছর।

পদার্থ জৈব বা অজৈব যাই হোক, তা 'জীব' নামে অভিহিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত তাতে জীবনের কোনো লক্ষণ প্রকাশ না পায়। 'জীবন'-এর প্রধান লক্ষণ — দেহপুষ্টি ও বংশবিস্তার। কোনো পদার্থে যদি ঐ লক্ষণ দু'টি দেখতে পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় যে, ঐ পদার্থটি 'সজীব'। এখন দেখা যাক যে, কোন্ পদার্থে ঐ লক্ষণ দু'টি পাওয়া যায়।

প্রোটোপ্ল্যাজমের মুখ্য উপাদান প্রোটিন হলেও তার সাথে মিশে থাকে আরও জৈবাজৈব অনেকগুলো পদার্থ। তা আদিম সমুদ্রে জলে গোলা দ্রব অবস্থায় ছিলো। তাকে ইংরেজীতে বলে 'সলিউশন'। চিনি বা লবণ গোলা জলকেও সলিউশন বলা যায়। কিন্তু প্রোটোপ্ল্যাজম ঐ ধরণের সলিউশন নয়, তা এক বিশেষ ধরণের সলিউশন। ইংরাজীতে বলা হয় 'কলয়ডাল সলিউশন'।

চিনি বা লবণ জলে দ্রবীভূত হলে তা ছাঁকন প্রণালী দ্বারা জল থেকে ভিন্ন করা যায় না। কিন্তু কলয়ডাল সলিউশন ছাঁকুনীতে আটকা পড়ে। তাই বলে এই আটকা পড়াটাই তার বিশেষত্ব নয়। মাটি বা চুন গোলা জলও সূক্ষ্ম ছাঁকুনী দ্বারা ছাঁকলে মাটি ও চুন ভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তা কলয়ডাল সলিউশন নয়। কেননা মাটি বা চুন জলে গোলা হলে সময়ান্তে তা থিতিয়ে পড়ে। কিন্তু কলয়ডাল সলিউশন কোনো কালেই থিতায় না। তা এমন এক বিশেষ ধরণের পদার্থ যে, জলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পূর্ণ মেশে না, অথচ কোনো কালেই থিতায় না। অর্থাৎ অজৈব পদার্থের কলয়ডাল সলিউশন হয়তো জলে সম্পূর্ণ মিশে থাকে, নচেৎ থিতিয়ে পড়ে। কিন্তু জৈব পদার্থের কলয়ডাল সলিউশন জলে সম্পূর্ণ মেশে না, অথচ থিতিয়ে পড়ে না। এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে, অজৈব পদার্থের সাথে জৈব পদার্থের একটি চরিত্রগত পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠেছে। সে এখন থেকে আর জড় পদার্থের নিয়মে অপরের শক্তিতে চালিত হতে রাজী নয়। আর এটাই হচ্ছে জড় ও জীবজগতের প্রাথমিক সীমারেখা।

কলয়ডাল সলিউশনের আর দুইটি বিশেষ গুণ এই যে, জলে অন্য যেসব জৈবাজৈব পদার্থ থাকে, তা আত্মসাৎ করে নিজ দেহ পুষ্ট করতে থাকে। এভাবে লাখ লাখ বছর অতিবাহিত হলে কলয়ডাল জৈব পদার্থটি আয়তনে ও ওজনে বহুগুণ বৃদ্ধি পায় ও শেষে ফেটে দুই টুকরা হয়ে যায়। কিন্তু দুই টুকরা হয়ে ওরা মরে না, আলাদা আলাদা থেকে আগের মতোই পুষ্ট হতে থাকে এবং কালক্রমে আবার দুই টুকরা ফেটে চার টুকরা হয় ও কালে চার টুকরা ফেটে আট টুকরা হয়। এভাবে চলতে থাকে কলয়ডাল পদার্থটির পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধির ধারা। এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে, কলয়ডাল পদার্থটির মধ্যে 'জীবন'-এর সর্বাপেক্ষা বড়ো দুইটি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, একটি 'পুষ্টি'। আর একটি 'বংশবিস্তার'। এই বিশেষ ধরণের কলয়ডাল পদার্থটিরই নাম — 'প্রোটোপ্লাজম' বা 'সেল' (cell), বাংলায় বলা হয় 'জীবকোষ'।

প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শেষের (এখন থেকে ৫৭ কোটি বছর পূর্বের) দিকের কথা। তখন আকৃতি ও প্রকৃতিতে সেল বা জীবকোষগুলো জীব পদবাচ্য নয়। কিন্তু ওতে জীবনের প্রধান দুটি লক্ষণ যখন প্রকাশ পেয়েছে, তখন ওদেরকে আর নির্জীবও বলা চলে না। জীবকোষগুলোর কোনো ইন্দ্রিয় নেই, নির্দিষ্ট কোনো চেহারা নেই, আহার করে সর্বশরীর দিয়ে চুষে। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর আহার পেলে অতিদ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। শরীরের কোনো একস্থানে আঘাত পেলে সর্বশরীর শিউরে ওঠে। এতে দেখা যায় যে, জীবকোষে জীবনের আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে — 'বোধশক্তি'।

আদিম জীবকোষের বংশাবলী আজও দেখা যায় খাল-বিলের নোংরা জলে। তা নরম তুলতুলে জেলির মতো শেওলা জাতীয় এক প্রকার ঘোলো পদার্থ। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখলে ওতে দেখা যায় অসংখ্য বিন্দু বিন্দু 'জীবকোষ'। ওদের এখন বলা হয় — 'এ্যামিবা'। এরাই জীবজগতের আদিম প্রাণী এবং এককোষবিশিষ্ট জীব।

৫ম ধাপ ঃ বহুকোষী জীব

কালক্রমে কোনো কোনো জীবকোষ একা একা না থেকে মধুপোকার মতো কতগুলোতে একত্র জটলা করে থাকতে আরম্ভ করে। জটলার বাইরের দিকের কোষগুলো খাদ্য সংগ্রহ করলে ভিতরের কোষগুলো তা চুষে নেয় এবং নিজের জায়গায় বসে ওদের পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। এর ফলে জটলাটির কলেবর বৃদ্ধি পায়। জটলার ভিতরের কোষগুলোর স্বতন্ত্র সত্তা বজায় থাকে, কিন্তু বাইরে হয়ে যায় 'এক'। এভাবে নানা আকৃতির জটলা তৈরী হয়ে সমুদ্রজলে হয় 'বহুকোষী জীব'-এর আবির্ভাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবজগতের বিবর্তন

'বিবর্তন' হচ্ছে প্রকৃতির ধর্ম। দৃশ্যমান জগতের জৈবাজৈব যাবতীয় পদার্থই হচ্ছে প্রকৃতির সেই ধর্ম পালনের পুণ্যফল। কিন্তু সে ফল পার্থিব জগত থেকে জীবজগতেই প্রকাশিত প্রকটরূপে। জীবজগতের বিবর্তন এমনই বিস্ময়কর যে, তা বিশ্বাস হতেই চায় না সাধারণভাবে। সাধারণত বিশ্বাস করা যায় না যে, জলচর জীবেরা স্থলচর জীবের পূর্বপুরুষ, সরীসৃপরা পশুর পূর্বপুরুষ এবং পশুরা জ্ঞাতি মানুষের। কিন্তু বিশ্বাস না করেও গত্যন্তর নেই। কেননা 'বিবর্তন' প্রমাণিত সত্য। যা হো'ক, এখানে এককোষী জীব (এ্যামিবা) থেকে জীবজগতের বিবর্তনের একটি অতিসংক্ষিপ্ত তালিকা লিপিবদ্ধ করছি।

ক. **এ্যামিবা** — এরা এককোষবিশিষ্ট জীব। এদের বিবর্তনে অর্থাৎ কোষ সমবায়ে গঠিত হয়েছে 'বহুকোষী জীব'।

খ. **বহুকোষী জীব** — এরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে এক দল হতে 'অচল উদ্ভিদ' এবং অপর দল হতে জন্মেছে 'সচল জীব'।

গ. **সচল জীব** — এদের এক শ্রেণীর জীবের নাম হচ্ছে 'ট্রাইলোবাইট'।

ঘ. **ট্রাইলোবাইট** — এরা পোকা জাতীয় জলজীব। কালক্রমে এদের এক শ্রেণীর দেহে মেরুদণ্ড জন্মে, তাদের বলা হয় 'মাছ'।

ঙ. **মাছ** — এদের বংশ হতে জন্মে জলচর, উভচর, বিহঙ্গম এবং স্থলচর 'সরীসৃপ'।

চ. **সরীসৃপ** — এদের এক শাখা থেকে জন্মে উষ্ণরক্ত-বিশিষ্ট 'স্তন্যপায়ী জীব'।

ছ. **স্তন্যপায়ী জীব** — এদের এক শাখা হয় বৃক্ষচারী জীব। তাদের বলা হয় 'প্রাইমেট'।

জ. **প্রাইমেট** — এদের মধ্যে জন্মে দ্বিপদ জীব। তাদের বলা হয় 'প্যারাপিথেকাস'।

ঝ. **প্যারাপিথেকাস** — এদের মধ্য হতে একদল জন্মে পুরাপুরি সমতলভূমিবাসী দ্বিপদ জীব। এদের বলা হয় 'এ্যানথ্রোপয়েড এপ' বা 'বনমানুষ'।

ঞ. **বনমানুষ** — এদের ক্রমোন্নতির ফলে জন্মেছে 'অসভ্য' ও আধুনিক 'সভ্য মানুষ'।

উপরোক্ত আলোচনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতীতি জন্মে যে, এক বিশেষ পরিবেশে পদার্থবিশেষের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে এবং তার সহগামী হয়ে এসেছে বোধশক্তি, যার বিবর্তিত রূপ হচ্ছে মন বা জ্ঞান। পক্ষান্তরে সেই আদিম প্রোটোপ্লাজম বা জীবকোষের দৈহিক বিবর্তিত রূপ হচ্ছে বিভিন্ন জাতীয় জীব ও মানুষ। কোনো প্রদীপ নিভে গেলে যেমন তার নির্বাপিত অগ্নিকে পুনরুদ্ধার করা যায় না, তদ্রূপ প্রাণশক্তিটিও দেহবিচ্যুত হলে তার স্বতন্ত্র সত্তা বজায় থাকা সম্ভব নয়। কেননা, তা বিশ্বশক্তি বা পরমাত্মার সাথে একাত্ম হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা

'সমাজ' মানুষ জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও সামাজিকতা দৃষ্ট হয়। সমাজজীবনের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে — সহ-অবস্থান, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি। এ সমস্ত গুণ পশু, পাখী, মৎস্য ইত্যাদি কোনো কোনো ইতর জীবের মধ্যেও দেখা যায় এবং কোনো কোনো কীট-পতঙ্গের মধ্যেও বিরল নয়। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকাও সমাজজীবন যাপন করে থাকে। এমনকি অনেক জাতের জীবাণুও সমাজজীবন যাপন করে। পাঁচড়া, ফোঁড়া, বসন্ত ইত্যাদি স্ফোটক জাতীয় অনেক রোগের কারণ হচ্ছে — জীবদেহের কোনো স্থানে বিশেষ বিশেষ জাতের জীবাণুদের সঙ্ঘবদ্ধ সহ-অবস্থান। আর 'সঙ্ঘবদ্ধ ও সহ-অবস্থান' যদি মানুষের গুণ হয়, তবে ওটাও ওদের গুণ। কেননা ওরা তো আর জানেনা বা বোঝে না যে, ওরা কোথায় বাস করছে, কারো ক্ষতি করছে, এমনকি কারো জীবনান্ত ঘটাচ্ছে। যা হোক, বলা যায় যে, মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও সামাজিকতা আছে। কিন্তু ওদের সংস্কৃতি নেই। ওদের সে সামাজিকতা একই ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছে আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত। আসল পার্থক্য হলো — মানুষ সংস্কৃতিবান, ইতর প্রাণী তা নয়।

AMARBOI.COM

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ

'অসভ্য' বিশেষণটা বজায় থাকলেও মানুষ যখন 'পশু' আখ্যাটা দূর করে 'মানুষ' আখ্যা পেয়েছিলো — আহার, বিহার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তখনো তারা ছিলো কতকটা পশুর মতোই। অতঃপর ধাপে ধাপে মানুষের সমাজ ও সভ্যতা হয়ে চলেছে ঊর্ধ্বগামী। সে ঊর্ধ্বগামিতার প্রধান প্রধান ধাপগুলোর মধ্যে কতিপয় ধাপের উল্লেখ করছি।

আদিম ও মধ্যযুগীয় সভ্যতা

১. **আগুন আবিষ্কার** — আদিম কালের মানবরা অন্ধকারেই বাস করতো। এমনকি কেউ কারো মুখ পর্যন্ত দেখতে পেতো না রাতে এবং মাছ-মাংস খেতে হতো কাঁচা। শীত নিবারণ করা, মাছ-মাংস সিদ্ধ করে খাওয়া ইত্যাদি অভিনব কাজ মানুষের আয়ত্তে এলো আগুন আবিষ্কারের পরে।

২. **কৃষি ও পশুপালন** — পূর্বে মানুষের আহারের ব্যবস্থা ছিলো পশু-পাখিদের মতোই। লড়ে-ঝাঁপিয়ে ও কুড়িয়ে যা পাওয়া যেতো, তা দিয়েই খেয়ে-না-খেয়ে দিন কাটাতে হতো। খাদ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারে মানুষ স্বাবলম্বী হতে পেরেছে কৃষি ও পশুপালন প্রথা প্রবর্তনের পরে।

৩. ধাতু ও গৃহ — আদিম মানবরা পর্বতের গুহায় বা বৃক্ষকোটরে বাস করতো এবং মাছ-মাংস খেতো থেঁতিয়ে বা ছিঁড়ে। কেননা 'হাতিয়ার' বলতে তাদের কিছুই ছিলো না হাতের ও দাঁতের জোর এবং পাথর ছাড়া। মানুষ পশুত্বের সীমানা পার হয়েছে — ধাতু ও গৃহ আবিষ্কারের পরে। বিশেষত লৌহ আবিষ্কারের ফলে।

৪. তাঁত — আদিম মানুষরা উলঙ্গই থাকতো এবং গাছের ছাল ও পাতা বা পশুর চামড়া পরিধান করতো। বসনে-ভূষণে মানুষ সজ্জিত হয়েছে তাঁত আবিষ্কারের পরে।

৫. মাল বহনে পশু ও চাকা আবিষ্কার — পূর্বে মাল বহনের কাজে মানুষ ব্যবহার করতো হাত, মাথা, ঘাড় ও পিঠ। যানবাহনের ক্রমোন্নতি ঘটে মাল বহনে পশু ও চাকা ব্যবহারের পরে।

৬. নৌকা ও পাল — সাগর বা নদী পারাপার তো দূরের কথা, পয়ঃপ্রণালীও পার হতে পারতো না মানুষ সাঁতার কাটা ছাড়া। নৌকা ও পাল আবিষ্কার মানুষকে দান করেছে জলের উপর রাজত্ব।

৭. লিপি ও কাগজ — একের মনোভাব অন্যকে জানাতে হলে মৌখিক আলাপ-আলোচনা বা অঙ্গভঙ্গি ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলোনা আদিম মানুষদের। চিত্রলিপি আবিষ্কৃত হলে লেখার পাতা হয় গুহাপ্রাচীর, পর্বতগাত্র ইত্যাদি এবং অক্ষর আবিষ্কারের পর ব্যবহৃত হয় মৃৎচাক্তি, শিলাখণ্ড, পশুচর্ম, ধাতুপাত, বৃক্ষপত্র ইত্যাদি। এ দেশে তাল, কদলি, ভূর্জ ইত্যাদি বৃক্ষপত্রে লিখন প্রচলিত ছিলো কিছুদিন আগেও। আমিও আমার শৈশবে লিখেছি — স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ তালপাতায় এবং বানান-ফলা কলাপাতায়। মানব সভ্যতার সীমাহীন বিস্তৃতির মূলে রয়েছে লিপি ও কাগজ আবিষ্কার।

আদিম যুগের অসভ্য ও অর্ধসভ্য মানুষ উপরোক্ত ধাপগুলো পেরিয়ে যখন অসভ্যজগত থেকে সভ্যজগতের সীমানায় পা দিয়েছিলো, তখন শুরু হয় মানুষের ন্যায় ও অন্যায় কাজের বিচার-বিশ্লেষণ। অর্থাৎ সৎ ও অসৎ কাজের ভাগাভাগি। এর ফলে উদ্ভব হয় মানুষের ধর্ম ও রাষ্ট্রের।

৮. রাষ্ট্র — এ কথাটি প্রথমেই স্বীকার্য যে, মানব-সভ্যতা বা সমাজ-উন্নয়নের একটি মস্তবড় ধাপ হচ্ছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এর পূর্বে মানব সমাজে ন্যায়-নীতি যে ছিলো না, তা নয়। তবে তা ছিলো ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা স্বেচ্ছাধীন। সৎ ও অসৎ কাজের ব্যাপক ও পাকাপোক্ত ভাগাভাগি সুদৃঢ় হয় ধর্ম ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে। আদিম যুগের সেই পুরোহিততন্ত্রের আমল থেকে শুরু করে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে ধর্ম ও রাষ্ট্রের কঠিন শাসন। এবং মানুষ এখন পৌঁছে গেছে সভ্যতা ও সমাজ-উন্নয়নের চরম শিখরে। কিন্তু বিশ্ব-মানবসমাজে আজও কি পরিপূর্ণ ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? এ বিষয় পরে আলোচিত হবে।

আধুনিক সভ্যতা

৯. বাষ্পীয় শক্তি — প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সভ্যতার উৎস হচ্ছে বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার। এ শক্তিটি আবিষ্কারের পূর্বে যে সকল মামুলি ধরণের যন্ত্র বানানো হতো, তা চালানো হতো মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা পশুশক্তিতে এবং তাতে কাজ পাওয়া যেতো সামান্য। তখনো কোনো কোনো দেশে রেল বসানো রাস্তা ছিলো, কিন্তু তাতে মালগাড়ী চলতো গাধার সাহায্যে এবং ঘোড়ার সাহায্যে চলতো ডাকগাড়ী। ফলত মানুষের সমাজ জীবনের মানোন্নয়নের একটি প্রধান ধাপ হচ্ছে বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার।

১০. বৈদ্যুতিক শক্তি — বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা বর্তমান দুনিয়ায় বহু অসাধ্য কাজ সাধন করা হচ্ছে। বিশেষত বিদ্যুৎভিত্তিক যাবতীয় আবিষ্কারগুলোই অতিশয় আশ্চর্যজনক, বলা যায় অলৌকিক। বিদ্যুৎশক্তি মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে এক যাদুর রাজ্যে।

১১. পারমাণবিক শক্তি — মানুষ আজ পর্যন্ত প্রকৃতির গর্ভে যতোরকম শক্তির সন্ধান পেয়েছে, তন্মধ্যে পারমাণবিক শক্তি অতুলনীয়। এ শক্তিটি মানব-কল্যাণের অসংখ্য সম্ভাবনায় ভরপুর। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে বহুবিধ জনহিতকর কাজে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। কিন্তু নাগাসাকি ও হিরোশিমার বিষাদময় ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটাবার নিশ্চয়তা বিধান এখনো হয়নি। শান্তিবাদীরা যেমন একে সৃজনাত্মক কাজে ব্যবহারের জন্য প্রকাশ্যে চেষ্টা চালাচ্ছেন, তেমন সাম্রাজ্যবাদীরা এর ধ্বংসাত্মক শক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন গোপনে।

পরম সুখের বিষয় এই যে, বর্তমানে প্রায় সকল রাষ্ট্রই পারমাণবিক শক্তিকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে এবং বিজ্ঞানীরা কৃষি, চিকিৎসাদি নানা ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহারের গবেষণা চালাচ্ছেন। বিজ্ঞানীদের কাছে এখন আর 'অসম্ভব' বলে বেশী কিছু নেই। এ পারমাণবিক মহাশক্তির দ্বারা হয়তো সম্ভব হবে মেরু অঞ্চলকে উত্তপ্ত এবং মরু অঞ্চলকে শীতল ও উর্বরা করে উভয়ত্র জীবাবাসের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা, জীবকোষের স্বাভাবিক ক্ষয় রোধ বা পূরণ করে জীবকে অমর বা দীর্ঘায়ু করা এবং হয়তোবা সম্ভব হবে প্রাণ সৃষ্টি করাও।

এ যাবত মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির প্রধান প্রধান যে ক'টি ধাপের উল্লেখ করা হলো, তার মধ্যে প্রায় সবগুলো ধাপই হচ্ছে আন্তর্জাতিক, অর্থাৎ বিশ্বমানবের সম্পদ ; শুধুমাত্র ধর্ম ও রাষ্ট্র ছাড়া। আগুন আবিষ্কার থেকে শুরু করে পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কার পর্যন্ত অন্য কোনো আবিষ্কারেই আঞ্চলিকতা নেই, কিন্তু ধর্ম ও রাষ্ট্র হচ্ছে আঞ্চলিকতায় ভরপুর।

মানুষ সমাজী জীব এবং তারা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে আসছে আদিম কাল থেকেই। তবে সেকালের সেই সমাজ ছিলো একান্তই ঘরোয়া সমাজ। এককালে এক একটি বংশের ছিলো এক একটি সমাজ। তাকে বলা হয় বংশগত সমাজ বা ক্লান। আবার কয়েকটি বংশগত সমাজ বা ক্লান একত্র হয়ে এক একটি মাঝারি ধরণের সমাজ গড়ে উঠতো, যাকে বলা হয় আঞ্চলিক সমাজ বা ট্রাইব। ক্লান বা ট্রাইবের সকল সদস্যরা মিলেমিশে উপার্জন ও ভোগ করতো। 'ব্যক্তিগত' সম্পদ বলতে কারো কিছু তখন ছিলো না। এরূপ সমাজকে বলা হয় আদিম সাম্যবাদী সমাজ। কোনো কোনো সময় কতিপয় ট্রাইব একত্র হয়ে একটি বড় সমাজ গঠিত হতো, যাকে বলা হয় কনফেডারেসি অব ট্রাইব্স বা রাষ্ট্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সব ক্ষেত্রেই যে একাধিক ট্রাইব সমাজের সদস্যরা মিলেমিশে রাষ্ট্রীয় সমাজ গঠন করতো, তা নয়। কোনো কোনো সময় নিজ ট্রাইবের সদস্যদের জীবন ধারণোপযোগী আহার্যের অভাব হলে তখন তারা পার্শ্ববর্তী ট্রাইবের উপর চড়াও হতো এবং জোরপূর্বক তাদের অঞ্চল দখল করতো। এভাবেও একাধিক ট্রাইব যুক্ত হয়ে জন্ম নিতো কোনো কোনো কনফেডারেসি অব ট্রাইব্স বা রাষ্ট্র। এরূপ অভিযানে বা রাষ্ট্র গঠনের কাজে নেতৃত্ব করার মতো যোগ্যতা ও দক্ষতা যে ব্যক্তির থাকতো, সে-ই হতো নবীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা রাজা। অর্থাৎ শুরু হলো 'জোর যার মুল্লুক তার'।

শেষোক্তভাবে যে সমস্ত রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিলো, সেসব ক্ষেত্রে নবীন রাষ্ট্রের বিজিতরা পরিণত হয়েছিলো বিজয়ীদের বিশেষত রাজার আজ্ঞাবহ দাসে। বিজিতরা দাসরূপে শ্রম দ্বারা যা উৎপন্ন করতো, তা ভোগের মালিক তারা ছিলোনা, ভোগ করতো বিজয়ী প্রভুরা। এভাবে কনফেডারেসি অব ট্রাইবস বা রাষ্ট্র গঠনের প্রাক্কাল থেকেই আদিম সাম্যবাদী সমাজ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়েছিলো। যথা — রাজা ও প্রজা, দাস ও প্রভু, শাসক ও শোষিত, ধনী ও ভিখারী ইত্যাদি বহুরূপে। বিশেষত এ সময় থেকেই উদ্ভব হয়েছিলো সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের। হাজার হাজার বছর পূর্বে আদিম যুগের রাষ্ট্র গঠনের প্রথম পর্যায়ে রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, ধনতন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র ইত্যাদি যে সমস্ত মানবতাবিরোধী তন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছিলো, আজও তা বিজয়গর্বে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন দেশে।

উপরোক্ত তন্ত্রসমূহ ছাড়া আধুনিক যুগে আরও দুইটি নতুন তন্ত্র প্রবর্তিত হচ্ছে বা হতে চলেছে। তা হলো — গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। কিন্তু বিশ্বের দরবারে এ দু'টি তন্ত্র এখনো ব্যাপক ও অনড় আসন পেতে বসতে পারেনি পূর্বপ্রচলিত তন্ত্রসমূহের মতো।

'জোর যার, মুল্লুক তার' — এ নীতির উপর যে সমস্ত তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেসব তন্ত্রে তন্ত্রীদের সংখ্যা কোথায়ও বেশী নয়। কেননা, ওর কোনো তন্ত্রই বিশ্বমানবের বা সংখ্যাধিক্যের কল্যাণে নিয়োজিত নয়। তাই ওগুলোকে 'মানবতন্ত্র' বলা যায় না। কিন্তু গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রকে 'মানবতন্ত্র' বলা যায়। কারণ, এ দুটো তন্ত্রই হচ্ছে বিশ্বমানবের পক্ষে কল্যাণকর।

বর্তমান যুগটি হচ্ছে গণতন্ত্রের যুগ। কেননা, বর্তমানে রাজতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ইত্যাদি স্বৈরতন্ত্র কোথায়ও প্রচলিত নেই বললেই চলে। কিন্তু প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে ওগুলোর যাবতীয় কাজই চলে আসছে ধনতন্ত্রীদল বা বুর্জোয়াদলের কারসাজিতে। গণতন্ত্রের নামে দেশে স্বৈরতন্ত্রই চলছে এখন — ছলে, বলে বা কৌশলে।

'বিশ্ব মানব সমাজ' নামে কোনো একক সমাজ নেই। সমাজ বহু শ্রেণী-উপশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে আছে বহুরূপে। ধর্ম, রাষ্ট্র, বৃত্তি বা পেশা ইত্যাদি ভেদে অসংখ্য সমাজ রয়েছে এখন দেশে দেশে। ধর্মভেদে যেসব ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠিত হয়ে থাকে, সেসব সমাজের সদস্যদের রীতি, নীতি ও আচার-আচরণে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। কিন্তু বর্তমান যুগে তা ততোটা দ্বন্দ্বমূলক হয় না। কেননা, তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ আর্থিক সম্পর্ক থাকে না। যেমন — হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খৃষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন সমাজভুক্ত মানুষ এদেশে সহঅবস্থান করে আসছে শত শত বছর যাবত নির্বিঘ্নাটে। যদিও ক্বচিৎ এসব সমাজের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, তবে তা ঘটেছে স্বার্থবাদী কোনো ব্যক্তি বা দলবিশেষের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ও তাদের প্ররোচনায়। কিন্তু বৃত্তিভিত্তিক সমাজে থাকে আর্থিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্ক। তাই তাদের মধ্যে চলতে থাকে স্বার্থের লড়াই। আর এরূপ লড়াই-ই চলছে বর্তমান জগতে — কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারা ও ধনতন্ত্রী সমাজের মধ্যে।

মধ্যযুগের ন্যায় এ যুগের মানুষের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ নেই। এর কারণ হচ্ছে এই যে, মরণান্তে পরকালে স্বর্গে গিয়ে অনন্তকাল রত্নময় প্রাসাদে বসে সুস্বাদু ফল খাবে, না নরকে গিয়ে অগ্নিকুণ্ডে বসে পুঁজ-রক্ত খাবে, এ যুগের মানুষ তা নিয়ে কেউ হৈচৈ করে না বা ওসবের ভাগবাটারা নিয়ে কেউ কারো সাথে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মাথা ফাটাফাটি বা খুনাখুনি করে না। এ যুগের মানুষের গরিষ্ঠসংখ্যকের হৈ-চৈ-এর কারণ হচ্ছে এই যে, পরজীবনে যাই ঘটুক না কেন, ইহজীবনে সমাজের কাছে তারা ন্যায়বিচার পায় না। কেউ নিয়মিত পঞ্চামৃত (দুধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি) আহার করে, আর কেউ পান্তাভাতে শুধু লবণ ও লঙ্কাপোড়া পায় না। কেউ সুরম্য হর্ম্যে বাস করে সাততলায়, কেউ বাস করে গাছতলায়।

মানব সমাজ এখন উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে। মানুষ এখন আকাশ জয় করেছে, পরমাণু ভেঙে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে, হাজার হাজার রকম যানবাহন ও অসংখ্য রকম যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ বর্ধনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সর্বহারাদের ভাত-কাপড় ও গৃহনির্মাণের জন্য একটি যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়নি আজ পর্যন্ত। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন এবং তা প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে গুটিকতক দেশে। কিন্তু তাকে 'যন্ত্র' বলা হয় না, বলা হয় 'তন্ত্র', অর্থাৎ 'সমাজতন্ত্র'। আজ বিশ্বমানবের গরিষ্ঠসংখ্যকের কামনা — তন্ত্রটি পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হোক।

১২. সমাজতন্ত্র — মানব সভ্যতা ও সমাজ উন্নয়নের প্রধান প্রধান ধাপগুলোর মধ্যে সমাজতন্ত্রকে বলা যায় চরম ধাপ। সাম্যবাদী সমাজ গঠনের প্রাথমিক পর্যায় হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এর মূলনীতি হচ্ছে — প্রত্যেকে নিজের 'সাধ্য' অনুসারে সমাজকে দেবে এবং নিজের 'প্রয়োজন' অনুসারে নেবে। এ সমাজে কারো কাজের অনিশ্চয়তা থাকবে না, ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ থাকবে না, মেহনতী মানুষকে শোষণ করার মতো মালিক ও মুনাফাশিকারীর দল থাকবে না, থাকবে না শ্রেণীগত বৈষম্যের বিশাল প্রাচীর।

সমাজতন্ত্রবিরোধী কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মার্ক্সের স্বপ্ন বাস্তবরূপ নিয়ে অনেক ক'টা রাষ্ট্রে নতুন সমাজের পত্তন ঘটেছে, কিন্তু তাই বলে কি সেখানে মানুষের সামাজিক পার্থক্য ঘুচে গেছে? সমাজের সবাই কি একইভাবে পরিচিত হচ্ছে? সামাজিক মর্যাদা কি সকলের সমান হয়েছে? তা হয়নি। সামাজিক মর্যাদার ভিন্নতা রয়ে গেছে আর সামাজিক ভূমিকার ভিন্নতাও রয়ে গেছে।

মার্কসবাদবিরোধী সমাজতত্ত্ববিদদের উপরোক্ত বক্তব্যটি সমাজতন্ত্র ব্যাখ্যার পক্ষে হাস্যকর। শোষণহীন ও শ্রেণীহীন এক কথা নয়। সমাজতন্ত্র চায় শোষণহীন সমাজ গঠন করতে, শ্রেণীহীন সমাজ নয়।

সমাজকে মানবদেহের সাথে তুলনা করা চলে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও হস্ত, পদ, মস্তক ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে যেমন মানবদেহ গঠিত এবং তার প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুষ্ঠু বিকাশ ও কার্যকারিতার উপর যেমন মানবদেহের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভরশীল, তেমন বহু শ্রেণী-উপশ্রেণীভুক্ত মানুষের সমন্বয়ে সমাজদেহ গঠিত এবং তাদের সুষ্ঠু বিকাশ ও কার্যকারিতার উপর সমাজদেহের পুষ্টি ও ক্রমোন্নতি নির্ভরশীল। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন মানবদেহ থাকা যেমন অসম্ভব, তেমন শ্রেণীহীন সমাজ গঠনও কল্পনার অতীত।**

মানবদেহ সুস্থ, কর্মক্ষম ও ক্রমবর্ধমান থাকে ততোক্ষণই, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার শক্তির উপাদান 'রক্ত' বা প্রাণরস দেহের সর্বত্র নিয়মিত প্রবাহিত হয়। কিন্তু তা না হয়ে যদি কখনো দেহের কোনো অঙ্গবিশেষে রক্ত পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে, তখনই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, দেখা দেয় রোগ। আর সেই রোগ যদি কখনো চরমে পৌঁছে, তবে তখন দেখা দেয় দেহের অস্তিত্ব বিলুপ্তির সম্ভাবনা। আবার দেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিকতা ছাড়িয়ে যদি অতিবৃদ্ধি ঘটে, তবে তাতেও ডেকে আনে পঙ্গুতা। সমাজদেহের স্থিতি, বৃদ্ধি, অবক্ষয়ও এর থেকে ভিন্নরূপ নয়।

বেশ কিছুদিন পূর্বে বরিশাল শহরের চকের পোলের উপর বসে একটি লোককে ভিক্ষা করতে দেখেছিলাম। লোকটির বাম পা ছিলো স্বাভাবিক আকারের। অর্থাৎ প্রায় আড়াই ফুট। কিন্তু তার ডান পা লম্বায় ছিলো সাড়ে চার ফুট। অনুরূপ আর একজন ভিখারীকে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে ভিক্ষা করতে দেখেছিলাম, তার ডান হাতখানা ছিলো আকারে স্বাভাবিক, কিন্তু বাঁ হাতখানা লম্বায় ছিলো মাত্র ছয় ইঞ্চি। উক্ত লোক দু'টির দেহের অঙ্গদ্বয়ের স্বাভাবিকতা বজায় না থাকায় ওদের একজন হয়েছে পঙ্গু এবং অপরজন অকর্মণ্য। তদ্রূপ সমাজদেহের অঙ্গবিশেষের অর্থাৎ শ্রেণীবিশেষের অতিমাত্রায় উত্থান ও পতন ডেকে আনে সমাজদেহের পঙ্গুতা ও অকর্মণ্যতা। আর বর্তমান দুনিয়ায় অধিকাংশ দেশের সমাজ ব্যবস্থা এরূপ যে, সমাজের ডান ও বামপন্থী (ধনী ও দরিদ্র)-দের মধ্যে আর্থিক বৈষম্যের পাহাড় শুধু বজায়ই থাকছে না, বরং তা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে দৈনন্দিন। সমাজের এই আর্থিক বৈষম্য দূর করে সমতা আনয়নের মধ্যেই রয়েছে বিশ্বমানবের কল্যাণ নিহিত। আর এই বৈষম্য রোধ ও সমতা আনয়নের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে 'সমাজতন্ত্র'। তাই **'সমাজতন্ত্র' তথা 'সাম্যবাদ' হচ্ছে বিশ্বমানবের মঙ্গল বিধানের একমাত্র মাধ্যম। এ ছাড়া শুধুমাত্র রকেট-রোবট ব্যবহার ও স্বর্গ-নরকের স্বপ্ন দর্শনের দ্বারা সমাজ উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা, তা ভেল্কি বই আর কিছু নয়।**

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্ঘণ্ট

অ

অচেতন মন	৮১
অণু	২৭৪—২৭৫
অবতার	৬৩, ৯৫
অরারট পর্বত	১১৬
অহুরমজদা	১৬১

আ

আউল	১৩১—১৩২
আকাশ	১০৯—১১০, ২৬৬—২৬৭
আছবা	১৩২
আজ্রাইল	৮৬—৮৭
আদম	১১৮—১২২, ১৮৬
আদমে প্রাণদান	২৭৩
আদমের পাপ	৭৯
আদিম সাম্যবাদী সমাজ	২৮০
আদিমানব	১১৮—১২২
আমেনহোটেপ চতুর্থ	১৫২—১৫৩
আল্লাহর রূপ	৬৩
আহমিস প্রথম	১৫২

ই

ইখনাটন	১৫৩
ইন্দ্র	১৪৮, ১৫৬, ১৬২
ইবলিস	৭৯, ১৮০
ইল্লিন-সিজ্জিন	২৭৩
ইসলামের সাথে পৌত্তলিকতার সাদৃশ্য	৯৩—৯৪

উ

উত্তাপবিহীন অগ্নি	১১৪—১১৫

ঋ

ঋভুভেদ	১১৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ

এদন উদ্যান — ৭৬, ১১৮, ১২০—১২২
এস্রাফিল — ৮৬, ১৩০

ক

কনফেডারেসি অব ট্রাইবস — ১৪৮—১৪৯, ২৮০–২৮১
কলয়ডাল সলিউশন — ২৭৫—২৭৬
কসুফ ও খসুফ — ১০০–১০২
কাল — ৬৬
কার্ল মার্কস — ২৮২
কেরামান-কাতেবীন — ৮৭—৮৮
কোরবানী — ১০২—১০৫
ক্লান — ১২১—১২২, ১৪৮—১৪৯, ২৮০

গ

গণতন্ত্র — ২৮১
গেনটাইল সোসাইটি — ১২১
গেন্‌স্‌ — ১৪৮
গেহেন্না-গেহেন্নাম-জাহান্নাম — ৭৬—৭৭
গোর আজাব — ৭২—৭৩, ৮৯

চ

চরক সংহিতা — ১৬৪
চান্দ্র বৎসর — ৯৮

জ

জগত — ২৭০—২৭২
জর্জ অ্যাডামস্কি — ১৬৫
জাম্ববান — ১৪৮—১৪৯
জীবন — ২৭৩—২৭৭
জীবহত্যায় পুণ্য — ১০২
জীবসৃষ্টির উদ্দেশ্য — ৭১
জেন্দআভেস্তা — ১৬১
জেব্রাইল — ৮৪—৮৫
জৈব-অজৈব — ২৭৪—২৭৬

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হজরত মুসা, মোশি ১০৩, ১২২—১২৫, ১৫০—১৫১, ১৫৪, ১৬০—১৬১
হজরত সোলায়মান ১২৫—১২৬
হনুমান ১৪৮—১৪৯
হাই ওয়াতারী ১১৫
হারাম ৮২, ৯২, ২৪৪
হাশর মাঠ ৭৪
হিলা প্রথা ১৩২—১৩৪
হেজরল আসোয়াদ ১০৬—১০৭
হেদায়েতের ঝঞ্ঝাট ৭৮

শ

শক্তি ৬৬, ২৭২
শক্তিকণিকা ২৭৪
শবেবরাত ৯৯-১০০
শয়তান ৭৯—৮২, ১৭৯—১৮৯
শীত-গ্রীষ্ম ২৬৭
শিব ১৬২

স

সত্য ৫০
সপ্তনরক ২৫১
সপ্তস্বর্গ ২৫১
সভ্যতার ক্রমবিকাশ ২৭৮—২৮৩
সমাজ ২৭৮—২৮৩
সমাজতন্ত্র ২৮১—২৮৩
সাম্যবাদ ২৮৩
সিন্ট পুরোহিত ১১৫
সীতাদেবী ১৪৩, ১৪৫—১৪৭, ১৬৩
সীনয় পর্বত, তুর পর্বত ১২৫, ১৫০—১৫১, ১৬০—১৬১
সুগ্রীব ১৪৮
সৃষ্টিকর্তা ১৫৭—১৫৮
সৃষ্টি-প্রলয় ২৭২
স্নান ৬৫—৬৬
স্বর্গ-নরক ৭৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম

মর্গান ১২১, ১৪৮—১৪৯
মনকির-নকির ৭২, ৮৮—৮৯, ২০০
মনু ১১৮
মরিয়ম ১২৬—১২৯
মল-মাস ৯৯
মহাপ্লাবন ১১৫—১১৭
মহাশক্তি ২৭৪
মানবতন্ত্র ২৮১
মানুষ ও পশুতে সাদৃশ্য ১০৮–১০৯
মেকাইল ৮৫
মেঘনাদ ১৬২
মেয়ারাজ, মে'রাজ ৯০—৯২, ১৬৫
ম্যালথুস ৫৬

য

যিহিস্কেল, ইজেকিয়েল ১৫৯—১৬০, ১৬৫
যিহোবা, জাভে ১২৫, ১৫০—১৫১, ১৬০—১৬১
যীশু ১৬১
যীশুখ্রীষ্টের পিতা ১২৬—১২৯
যুগ-উপযুগ-মহাযুগ ৬৮

র

রফরফ ৯০
রাবণ ৭৫, ১৪৩—১৪৭, ১৬২—১৬৩
রামচন্দ্র ১৪৩—১৪৯, ১৬৩
রামায়ণ ১৪৩—১৪৯
রামেসিস দ্বিতীয় ১২৩, ১৫৩—১৫৪
রাষ্ট্র ২৭৯—২৮১
রোজে আজল ১৮৩

হ

হজরত আলী ১৩১
হজরত ইব্রাহিম ১০২—১০৫, ১১৪—১১৫,
১৫৩—১৫৪, ১৬৫
হজরত মোহাম্মদ ৯০—৯১, ১৫১, ১৬৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাথর চুম্বন ১০৬
পাপ-পুণ্যের ডায়রী ৭১
পাপের ওজন ৯২—৯৩
পুষ্পক ১৪৪, ১৬২
পৃথিবী কিসের ওপর ১১১, ২৬৭
পৃথিবীর আকার-আয়তন ২৬৮
প্রোটিন ২৭৫
প্রোটোপ্ল্যাজম ২৭৫—২৭৭

ফ

ফরায়েজ ১৩১—১৩২
ফেরাউন, ফরৌণ ১২২—১২৫, ১৫০—১৫৪
ফেরেস্তা ৮৩—৯০

ব

বজ্রপাত ১১২—১১৩, ২৬৭
বনি ইস্রায়েল ১২২—১২৫, ১৫০
বহুকোষী জীব ২৭৬
বার-এর গুণাগুণ ৯৭
বারচাঁদ ৯৭
বালী ১৪৮, ১৫৬
বাল্মীকি ১৪৭
বিবর্তন ২৭৭
বিশ্ব ২৭০—২৭২
বিষ্ণু ১৬২
বুদ্ধদেব ১৬৩
বেদ ২৪৮—২৫১
বৈতরণী ২৫১
বোরাক ৯০
ব্রহ্মা ১৪৮, ১৫৭, ১৬২—১৬৪

ভ

ভাগ্যলিপি ৭৮—৭৯
ভূমিকম্প ১১২, ২৬৭
ভিন্ন গ্রহবাসী ১২৫, ১৫৯—১৬৪, ১৬৮

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোরোয়াস্টার ১১৫, ১৬১
জোয়ার-ভাটা ১১৪, ২৬৮
জ্যোতিষ্ক ২৭০—২৭২
জ্বীন ১২৯—১৩০

ট

টোটেম ১৪৯
ট্রাইব ১৪৮—১৪৯, ২৮০—২৮১

ত

তালাক ১৩৩

দ

দণ্ডকারণ্য ১৬৩
দশ আদেশ ১৫০—১৫১
দানিকেন ১২৫, ১৫৯, ১৬১—১৬৩
দিবা-রাত্রির কারণ ১১১, ২৬৭
দেবতা ১৫৯, ১৬২—১৬৪
দৈবগ্রন্থ ১৬২

ধ

ধর্মগুরু ২৫০

ন

নক্ষত্র ২৭০—২৭২
নবীদের সংখ্যা ৯৫
নমরূদ ১১৪
নাপাক ৮৩
নামাজের নিষিদ্ধ সময় ৮২—৮৩
নারদ ১৮৯
নীহারিকা ২৭১—২৭২
নূহের জাহাজ ১১৬—১১৭
নেকী ৯২

প

পরলোকের সুখ-দুঃখ ৭১—৭২
পরলোকের স্বরূপ ৭৩—৭৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

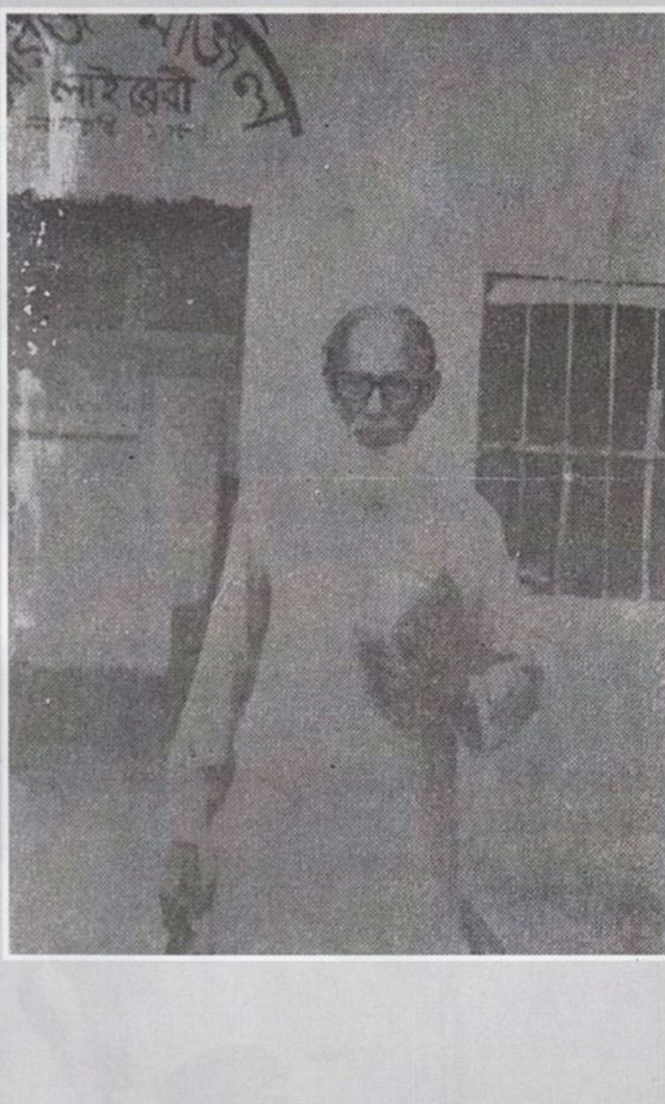

আরজ আলী মাতুব্বর লাইব্রেরীর সামনে দাঁড়ানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলা প্রশাসক আব্দুল আউয়ালের নিকট হতে লাইব্রেরীর জন্য অনুদান গ্রহণ করছেন

লাইব্রেরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি জেলা প্রশাসক সাইফউদ্দিন আহমেদ (চতুর্থ), সর্বডানে অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

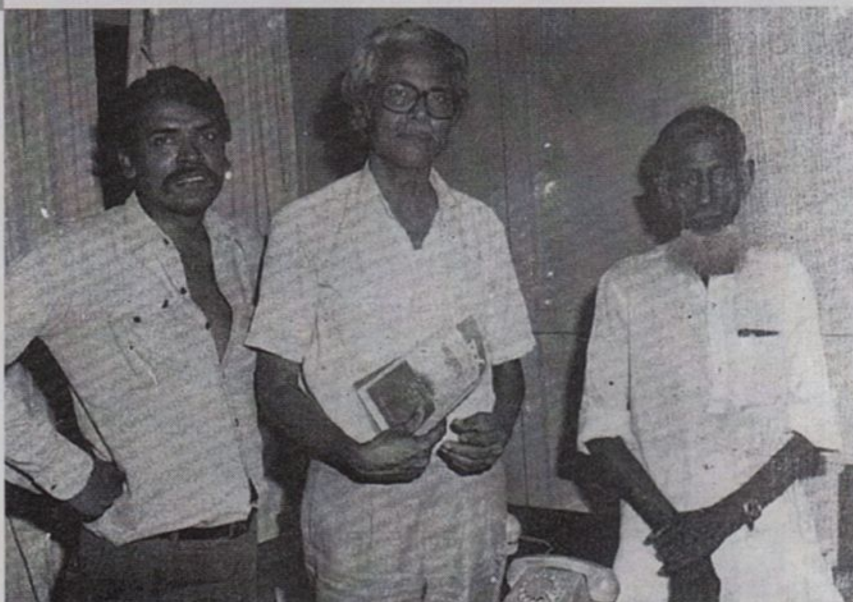

কবি মাকিদ হায়দার ও শিল্পী এমদাদ হোসেন এর সাথে

বিসিক আয়োজিত একটি কারুশিল্প প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্র আবদুল খালেক মাতুব্বর ও
নাট্যভিনেতা খায়রুল আলম সবুজসহ

অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির, অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হক ও
অধ্যাপক শামসুল ইসলামসহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রী ও পুত্রবধূসহ

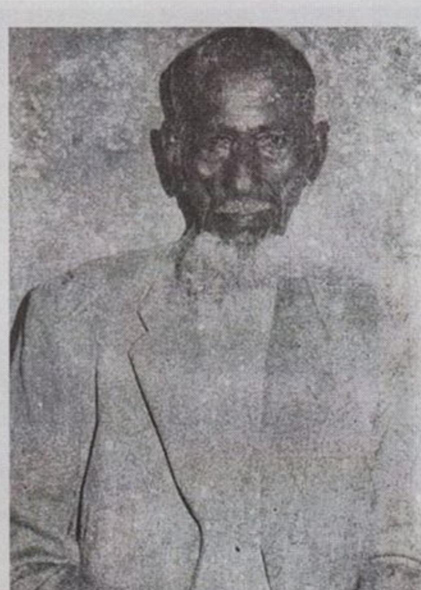

আরজ আলী মাতুব্বর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবারের সকলের সাথে

স্ত্রী, সন্তান, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~